ISSN-2277-8780

আমি অরণি

(সাহিত্য ও গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৪২৩ / এপ্রিল ২০১৬

বৈশাখ সংখ্যা ১৪২৩

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ডঃ কনক মৈত্র, ডঃ দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী, বিপুল রঞ্জন সরকার, গৌতম বসু, ডঃ জয়ন্ত মেটে, বাদল দত্ত, ডঃ চন্দ্রিমা বসু, ডঃ বিশ্বম্ভর মণ্ডল।

সম্পাদক মণ্ডলী

ডঃ বিভাস গুহ, ড. সুব্রত মণ্ডল, ড. অনসূয়া বাগচি, ডঃ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শান্তনু সেন, জয়দেব হালদার, দেবজ্যোতি রায়, মিহির নাথ, গোপাল দে।

প্রকাশক

সুরজিত রায়

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

ঃ যোগাযোগ ঃ

9635359025, 9434552238, 9434165623, 9635508115
e-mail : sanjitdhanicha@rediffmail.com
sarmiladas16@rediffmail.com
amiarani@rediffmail.com

ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ

সঞ্জিত দাস / ডঃ শর্মিলা দাস
গ্রাম ঃ ধনিচা নূতন পাড়া, পোঃ চাকদহ, জেলা - নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ঃ ৭৪১২২২

প্রবন্ধ

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন ঃ আই,এন,এ, বনাম হিন্দুত্ববাদ

- সুকান্ত পাল

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের সত্তর বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত তবুও এর প্রাসঙ্গিকতা এখনো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আই,এন, এ’র দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে তা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অন্যদিকে দেশের বাইরে নেতাজীর নেতৃত্বে বিদেশী শাসনকে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম একসাথে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তারা প্রত্যেকেই হয় ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন অথবা নেতাজী পরিচালিত সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। অথবা মানসিকভাবে তার সমর্থন যুগিয়েছিল।

তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের দুটি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু নেতাজী স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নেতাজীর কর্মকান্ডকে বুঝতে হবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত তাঁর মতাদর্শগত অঙ্গীকার, দ্বিতীয়ত এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তাঁর কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং তৃতীয়ত তাঁর মতাদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো। তাঁর মতাদর্শগত অঙ্গীকার ও উদ্দেশ্যের দুটি স্পষ্ট দিক বর্তমান। পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক এক রাষ্ট্রগঠনের জন্য আপোষহীন ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে জারী রাখা। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন সবলতা ও দুর্বলতার দিকগুলিকে বিশে-ষণ করে তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে বিপ-বের সময় পরিপক্ক হয়ে উঠেছে — কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের ডান ও বামপন্থীরা কেউই সেই রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয়। এই অবস্থায় তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আঘাত করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্রতী হয়েছিলেন।

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যেমন একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও কর্মপন্থা ছিল ঠিক তেমনি এই আন্দোলনের প্রশ্নে মতাদর্শের দিক থেকেই বিশে-ষণ করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে তখনকার জন্য সমর্থন করেনি। কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির থেকেও বড় বিপদ মনে হয়েছিল মানব সভ্যতা বিরোধী নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ। তাই এই সভ্যতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কংগ্রেস দল এবং তাদের এই আন্দোলনের সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণীতেও কিন্তু এই নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছিল। স্বদেশের মাটি

তাঁর কাছে ছিল একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এই স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ছিল তার সাধনার একমাত্র মন্ত্র। দেশের মাটি থেকে বৃটিশ শক্তি এবং তার সহযোগী শক্তির উৎপাটনকেই তিনি জীবনের মহামন্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। “The mission of Netaji was to drive out the British and other alliances from Indian soil... Netaji was a true nationalist.” তাতে বলা হয়, “not only in the interest of India, but also for the safely the world and for the ending of Norism, Faseism, Milination over other.”

অথচ কংগ্রেস দল নিজেই এই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন তথা জনযুদ্ধনীতিকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রচার করে। কমিউনিস্টদের একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ এবং বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানকে একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় ধর্মভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী দল ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন এবং নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনী কর্তৃক সংগ্রামের যে তীব্র বিরোধিতা করে জাতীয় জনমানসকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং এক কথায় সামগ্রিক জাতীয় আন্দোলনের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা যেমন প্রমাণিত সত্য তেমনি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি অন্ধকার দিক। সেই অন্ধকারময় দিকের ইতিহাস এই ছোট প্রবন্ধে উন্মোচনের চেষ্টা করা হলো।

হিন্দু মহাসভার নেতা দামোদর বীর সাভারকার এবং তার দলবল বারবার প্রচার করেছে যে তারা নেতাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পাশে আছে এবং তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে নেতাজীর সংগ্রামী পথের প্রতি। কিন্তু এ ছিল সম্পূর্ণ ভনিতা বা জনগণকে বোকা বানানোর কৌশল। তার কারণ হলো যখন নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য, বিশেষত জাপানের সামরিক শক্তির সাহায্যের প্রচেষ্টায় রত তখন হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে১৯৪১ সালে ভাগলপুরে সাভারকার এক বক্তৃতায় বলেন, “ So far as Indians defence in concerned,Hindudom must ally unhesitatingly, in a spirit of responsive Co-operation with the war effort of the Indian government, in so far as it is consistent with the Hindu interests,by joinng the army, navy and aerial force in as large number ... again it must be noted that Japan’s entry into the war has exposed us directly and immediately to the attack by Britains enemies. Consequently, whether we like it or not, we shall have to defend our health and home against the ravages of the war and this can only be done by intensifying the government’s war effort to defend India. Hindu mahasabhaites must, therefore, rouse Hindus, especially in the provinees of Bengal and assam, as effectively as possible to enter the military forces of all arms without losing a single minute”

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ এর দশক জুড়েই আর.এস.এস. এবং হিন্দু মহাসভা বেশ আগ্রাসীভাবেই ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে জোরদার সওয়াল করে যাচ্ছিল। এর ফলে তারা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যদিও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রতি হিন্দু মহাসভার কোন সমর্থন ছিল না, তথাপি লোক দেখানোর জন্য একটা অঙশ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এই আন্দোলনকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায় - যাকে আমরা 'স্যাবোটেজ' বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে লেখা হয়, "হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে গোপনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, তাদের সংগঠনের একাংশ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারাবার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনে একটা লোক দেখানো অংশগ্রহণ করবে। সে ভাবেই কোন কোন জায়গায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি ৪২ এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে নানা প্রকারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, বৃটিশরা আদৌ আর.এস.এস. এর এই কর্ম পদ্ধতিকে ভালো চোখে দেখেনি। এরফলে এই মহাসভায় প্রধান গোলওয়ালকারের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে যেকোনভাবেই বৃটিশকে তুষ্ট করতে তিনি উঠে পড়ে লেগে যান। এই সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক কুচকাওয়াজ ও বেসামরিক সংগঠনগুলির ইউনিফর্ম পরা নিষিদ্ধ করে একটি সার্কুলার জারি করে। এই সুযোগ গোলওয়ালকর ছাড়তে রাজি ছিল না। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি সার্কুলার জারি করেন তার সংগঠনের উদ্দেশ্যে। এই সার্কুলারে বলা হয়, " We discontinued practices included in the government's easily order on military drill and uniforms .... to keep our work cleanly within founds of Law, as every law alliding institution should ...hoping that circumstances would ease easily, we had in a sense only suspended that part of our training, Now, however, we decide to stop it altogether and abolish the department without waiting for the time of change. "

একদিকে গোলওয়ালকরের আর.এস.এস. আর অন্যদিকে সাভারকারের হিন্দু মহাসভা - এই দুই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এই দুই নেতার নেতৃত্বে যেমন জাতীয় আন্দোলনের তথা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল এবং এই আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল। তেমনি অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের হাতকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন বৃটিশ সরকার তার সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশীয় জনগণের কাছে আবেদন জানায় তখন 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা বলেন, "না এক ভাই, না এক পাই।" অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ তার একটি ভাইকেও যেমন দেবে না তেমনি একটি পয়সাও দেবে না। এক তীব্র বৃটিশ বিরোধী মানসিকতাই গান্ধীর এই শে-াগানে ধ্বনিত হয়। আর এও বলা বাহুল্য যে গান্ধীর বক্তব্যই ছিল তখন জাতীয় কংগ্রেসের বক্তব্য।

কিন্তু ঠিক এর বিপরীত চিত্র পাই হিন্দু মহাসভার প্রধান সাভারকারের কথায়।

তিনি এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্যের দীর্ঘ হাত প্রসারিত করে দেন। মাদুরাতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বলা হয়, " Naturally, the Hindu Mahasabha with a true insight into a practical politics decided to participate in all war efforts of the British governmen in so far as they concerned directly with the question of the Indian defence and raising military forces in India."

সাভারকারের এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন সম্পর্কে এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের প্রতি হিন্দু মহাসভার কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। বলতে দ্বিধা নেই - এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণত জাতীয়তা বিরোধী এবং ইংরেজ তোষনে পরিপূর্ণ।

একদিকে ইংরেজ তোষন অন্যদিকে 'হিন্দুত্ব' ছাড়া অন্য কোন কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই এক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল। অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারা ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলিয়ে সিন্ধু প্রদেশ এবং বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। অথচ জাতীয়তার প্রশ্নে যখন মুসলিম লীগ"ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে সমর্থন করল না এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে " .... for the establishment of Hindu Raj and to deal a death blow to the Muslim good of Pakistan." বলে বর্ণনা করল তাদের সাথেই অর্থাৎ মুসলিম লীগের উপরি সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদেরকে (হিন্দুদের) যারা শত্রুতে চিহ্নিত করল তাদের সাথেই কোয়লিশন সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে কি লীগ, কি হিন্দু মহাসভা করার মধ্যেই কোনো জাতীয় চেতনার প্রকাশ দেখা গেল না। এই নীতিহীন কাজকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য কানপুরে ১৯৪২ সালেই হিন্দু মহাসভার ২৪তম অধিবেশনে তিনি সভাপতির ভাষনে বলেন, " In practical politics also the Mahasabha knows that we must advance through reasonable compromises, witness the fact that only recently in ...., the .... HinduSabha on invitation had taken the responsibility of joining hands with the league itself in running coalition government, the case of Bengal is wellknown."

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও জাতীয় চেতনার থেকেও বেশি দামী ও প্রয়োজনীয় তাদের কাছে মনে হয়েছিল যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় আসীন হওয়া। এক্ষেত্রে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের সাথে হিন্দু মহাসভা সংগঠনের তুলনার মাপকাঠিটি পাওয়া মুশকিল।

আমরা আগেই বলেছি যে এই সময় অর্থাৎ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরে বৃটিশের তোষনে এগিয়ে এসেছিল আরো একটি সংগঠন। তা হলো গোলওয়ালকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। এবং এই সংঘ বৃটিশের কোপানলে না পড়ার জন্য যা করেছিল তাও উলে-খ করেছি। এখন দেখব সাভারকার আর গোলওয়ালকারের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ?

সাভারকারের মতো তিনিও ১৯৪০ এর দশকের প্রথম দিকে ভারতীয় যুবকদের বৃটিশ সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য জোর ওকালতি করেন। এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সাভারকারের মতোই এবং বৃটিশের প্রতি ছিল তার অহিংসবাদী আনুগত্য। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্বন্ধে তাই নির্দ্বিধায় তিনি বলেন, " Definitely there are bound to the bad results of struggle. The boys he come ..... after the 1920 -21 movement. It is an attempt to throw mud at the leaders. But there are inenitable products after struggle. The matter is that we could not properly control there results After 1942, people often started thinking that there was no need to think of the law."

এর ফলে গোলওয়ালকার বৃটিশের প্রচ্ছন্ন মদত পায় এবং বিভিন্ন নথি থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আর, এস, এস, এর দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৪ সালে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৭৬ হাজারে দাঁড়ায়। এই অবস্থা বৃটিশদের সামনে সুযোগ এনে দিল। বৃটিশ ও তাদের চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারকে বেশ সুকৌশলেই ব্যবহার করল। " ঔপনিবেশিক শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে এতটা যুদ্ধকালীন সময়জনিত সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। সাভারকার মহারাষ্ট্রের হিন্দুদের মধ্যে সামরীকিকরণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে বিশেষ আকর্ষনীয় বিষয় হিসাবে উলে-খ করেই লিনলিথগো আলোচনা শুরু করেছিলেন সাভারকারের সঙ্গে। সাভারকারকে একটু উসকে দেওয়ার জন্য লিনলিথগো বলেন, এই ধরণের আদর্শবাদী মানসিকতার ফলেই মারাঠীরা সন্ত্রাসবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করবে। জাতীয় আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে, কংগ্রেসের আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে ক্রমবর্ধমান বামশক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সমঝোতা হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির। অভিন্ন শ্রেণী স্বার্থজনিত কারণে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভাও একটি সমঝোতায় পৌঁছাল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের মতো জাতীয় আন্দোলন আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ প্রচেষ্টা, বাম শক্তির উত্থান সব কিছুকেই নস্যাৎ ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি (হিন্দু মুসলিম উভয়েই) বৃটিশের প্রচ্ছন্ন মদতে জাতীয়তা বিরোধী কর্মকান্ডে যুক্ত হয়। সেখানে সাভারকার ও গোলওয়ালকার হিন্দু মহাসভা এবং আর,এস,এস,এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

১৯৪২ এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে বৃটিশ স্তুতি করতে গিয়ে গোলওয়ালকার যা বলেন তাতে স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক অত্যাচারকে তিনি কখনোই যুক্তিহীন মনে করেননি। তিনি বলেন, " Sangha does not want to blame anybody else for the present degraded state of society. when the people start blaming others, then there is weakness in them. It is futile to blame the strong for unjustice done to them to weak Sangha does not want to waste its invaluable time in a...using or criticizing others. If we know that large fish eat the smaller ones, it is outright madness to blame the big fish. Law of nature, whether good or bad is true all the time."

এর পুরষ্কার আর,এস,এস এবং গোলওয়ালকররা সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশের কাছ থেকে পেয়েছিল। এরপর আর ঔপনিবেশিক শাসকদের আর.এস.এস. সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও ভয় ছিল না। তারা আর.এস.এস. এর বিষয়ে এতটাই নিশ্চিন্ত ও সন্দেহযুক্ত ছিল যে, বৃটিশ তাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক গোপন প্রতিবেদনে এই সংগঠনটি সম্পর্কে বলে, " It would be difficult to argue that RSS constituates an immediate meance to law and order."

শুধু তাই নয়, "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে আর.এস.এস. এর ভূমিকা সম্বন্ধে বলে, " ..... the Sangha has scrupulously kept itself with the law, and in particular, has retrained from taking part in the disturbness that broke out in August 1942."

পরিশেষে বলি, আমাদের উপরের প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য ও বিশে-ষণের পর একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার এক হীন চক্রান্ত এবং জাতীয়তাবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধুই পিছন থেকে টেনে ধরেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ —

১। Chandidas Mukhopadhya and kamakshya charan Pal(ed), main currents of social and political thought in India, Kolkata, 2005, P. - 108 -109

২। Nemai Sadhan Bose, Indian National Movement : An outline, Calcutta, 2000, 3rd (ed), P. - 173

৩। V.D Savarkar, Samagra savarkar waangmaya, Hindu Rashtra Darshan, vol 6, Poona, 1963, P.- 460.

৪। গৌতম রায়, আর.এস.এস. ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিবর্তনের ধারা, (প্রথম খন্ড), কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৬১

৫। Govt. of India, House political (1) no 28.3.43

৬। Samagra Savarkar, op. cit. P.- 428

৭। Nemai Sadhan Bose, op. cit. P.- 175

৮। Samagra Savarkar, op. cit. P.- 479

৯। M.S. golwalkar, Shri Guruji Samagra Darshan (collected works of golwalkar in Hindi) vol 4, Nagpur, P.- 41

১০। গৌতম রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫

১১। Shamsul Islam, India's freedom struggle and RSS.

১২। Home political file, op. cit.

১৩। .....

উনিশ শতকের প্রথম দশকে নদীয়া জেলায় সংগঠিত অপরাধ ও তার প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া

- ডঃ সিরাজুল ইসলাম

আইনত নিষিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের এমন কর্মই অপরাধ। অন্যভাবে বললে ব্যক্তির যে আচরণ আইন ভঙ্গ করে তাই অপরাধ। অপরাধের সংজ্ঞা সমাজ কাল আইন নির্ভর। সময়বিশেষে, সমাজসাপেক্ষে অপরাধের সংজ্ঞা বদলে যায়। আইনসিদ্ধ নয় এমন আচরণ যেমন ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত হতে পারে তেমনি সমষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত আকারেও সম্পন্ন হয়। সমষ্টির দ্বারা সম্পাদিত আইনভঙ্গমূলক আচার আচরণকে সংগঠিত অপরাধ (Organized Crime) বলা যায়। দলবদ্ধ বা সংগঠিত অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই রচনার মূল লক্ষ্য হল এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে নদীয়া জেলায় সংক্রামিত (Organized) অপরাধের বর্ণনা দান। নদীয়ায় এই যূথবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকান্ড বিকশিত হয়েছিল গ্যাং - ডাকাতির মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শাসক প্রতিনিধিবর্গ কিভাবে এই হিংসাশ্রয়ী গ্যাং-ডাকাতি দমন করেছিল সেবিষয়ে আলোকপাত করাও এই প্রবন্ধের আর একটি উদ্দেশ্য।

সংগঠিত অপরাধের তীব্রতা নদীয়ায় এক ভয়াল ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। গ্যাং-ডাকাতদের অত্যাচারে মানুষ হয়ে উঠেছিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। সমগ্র জেলায় বিরাজমান ছিল এক চরম নৈরাজ্য। আইনশৃঙ্খলার ভীষণ অবনতি ঘটে। চার পাঁচ জন সর্দার ডাকাত সমগ্র জেলাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে হিংসাত্মক ডাকাতি চালিয়ে ছিলেন।১ এক একটা দলে ৫০-১০০ জন বা তার থেকেও বেশী ডাকাত থাকত। প্রায় প্রতিটি ডাকাতির ঘটনার সাথে লেগে থাকত খুন জখম যেমন ১৮০৬ সালে ২০টি এবং ১৮০৮ সালে ৩০টি খুনসহ ডাকাতির ঘটনা পুলিশ রিপোর্টে উলে-খ করা হয়।২ এদের কাজকর্ম জেলাশাসকের কর্তৃত্ব খর্ব করেছিল।

নদীয়া তথা বাংলার বহু জেলা গ্যাং-ডাকাতির ঘটনা যখন ঘটেছিল সেইসময় ঔপনিবেশিক শাসন আর শৈশব অবস্থায় ছিল না। কেননা অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ নতুন পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১৭৯৩ সালের পর জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় পুলিশ থানা। স্থাপিত হয় ফৌজদারী আদালত। প্রণীত হয় নতুন নতুন এবং কঠোর থেকে কঠোরতর ফৌজদারী আইন। অর্থাৎ কিনা অপরাধ দমনের জন্য একটা প্রতিষ্টানিক পরিকাঠামো তৈরীর প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বাংলার অধিকাংশ জেলা গ্যাং-ডাকাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তবে নদীয়া জেলার ডাকাতরা হিংস্রতায় ভয়াবহতায় অন্যসব জেলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পঞ্চম রিপোর্টে নদীয়ার ডাকাতদের বীভৎসতার বিবরণ পাওয়া যায়।৩ নদীয়ায় প্রাপ্ত ডাকাতির ঘটনার পরিসংখ্যানও বেশ উচ্চমাত্রার। যদিও শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দিয়ে কোন ঘটনার ব্যাপ্তি বা গভীরতা বুঝা সম্ভব নয়। পরিসংখ্যান কখনই প্রকৃত পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে না। বহু ডাকাতির ঘটনা নানা কারণে পুলিশের নিকট রিপোর্টেই করা হত না। তথাপি এক

ঝলকে কোন বিষয় উপলব্ধির জন্যে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব আছে। নদীয়ায় গ্যাং-ডাকাতির ব্যাপ্তি অনুধাবনের লক্ষ্যে এই পরিসংখ্যানটি দেওয়া হল -

সারণী - ১

নদীয়ার ডাকাতির পরিসংখ্যান ১৮০৩-১৮১০

সাল	পরিসংখ্যান
১৮০৩	১৩২
১৮০৪	১৩০
১৮০৫	১৬২
১৮০৬	১৯১
১৮০৭	১৫৪*
১৮০৮	৩২৯
১৮০৯	৬৫*
১৮১০	১৪*

(সূত্র ঃ ১৮০৩-১৮০৬ বেঙ্গল জুডিসিয়াল ক্রিমিন্যাল প্রসেডিংস, ১৯ জুন ১৮০৭, নং ১০, ১৮০৭,১৮০৯ এবং ১৮১০ বেঙ্গল জুডিসিয়াল ক্রিমিন্যাল প্রসেডিংস ২৪ নভেম্বর ১৮১০, নং ২০, এবং ১৮০৮ এর জন্যে *ঐ বছরগুলির সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত)

১৮০৮ সালে ডাকাতির ঘটনা সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠেছিল। ঐ বছর ৩২৯টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। জেলা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮০৩ থেকে ৬৮৮ জন ঘোষিত ডাকাত নদীয়ায় সক্রিয় ছিল। আর ১৮০৮ সালে ১০০ জন সর্দার তাদের দলবল নিয়ে ডাকাতি করতেন। ১৮০৮ সালে এই জেলায় মোট গ্রাম ছিল ৪২৭০টি, এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ গ্রামে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতদের ভয়ে এমনকি দিনের বেলাতেও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া কঠিন ছিল। ঘরে টাকা পয়সা বা স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রাখা ছিল ভয়ংকর সমস্যার ব্যাপার। ধনী ব্যক্তিরা আতঙ্কে রাতে নিজ গৃহে শয়ন করতেন না। বহু মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় পালিয়ে যায়। জেলাশাসকের এক রিপোর্টে উলে-খিত আছে যে ১৮০৮ এ নদীয়ায় মোট জনসংখ্যা ছিল আট লক্ষ, তার মধ্যে আড়াই লক্ষ মানুষ পলায়ন করেছিল ডাকাতদের অত্যাচারে ও ভয়ে।

এই হিংসাশ্রয়ী ডাকাতির কারণ নিয়ে কোন সুগভীর ব্যাখ্যা সমকালীন সরকারী দলিল দস্তাবেজে অমিল। সরকারী কর্মকর্তারা পুলিশের ব্যর্থতাকেই মুখ্য কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। জেলার থানা বিভাজন যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কোন থানার অধীনে অত্যধিক কোন থানার আওতায় অতি অল্পসংখ্যক গ্রাম ছিল। আবার যে অঞ্চল ডাকাতি প্রবণ সেখানে কোন থানাই স্থাপন করা হয়নি। নীচের টেবিল থেকে থানা চিত্রের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এছাড়া ফৌজদারী আইনের দুর্বলতা, ডাকাত-জমিদার ও ডাকাত পুলিশ যোগসাজসের ফলে অভিযুক্ত ডাকাতরা সহজেই আদালতে খালাস পেয়ে যেতেন। অভিযুক্তদের আদালতে শাস্তি না হওয়া ডাকাতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যদিও পুলিশী ব্যবস্থার দুর্বলতা দিয়ে ডাকাতি বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা অতি সরলীকরণ হবে। এর গভীরতর সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণ নিশ্চয় ছিল।

সারণী - ২

নদীয়া জেলার থানা, ১৮০৮ সালে

থানার নাম	থানার প্রতি গ্রাম সংখ্যা	থানার নাম	থানার প্রতি গ্রাম সংখ্যা
হার্ডি	২২৯	বাগদহ	৩০২
মীরপুর	৩১৫	শ্রীনগর	৪৩৯
কোটেচাঁদপুর	৪৪৮	উলাষী	৩০৮
অগ্রদ্বীপ	২২৬	লুবশা	৩০৪
নওপাড়া	২২৭	বসিরহাট	৫০৭
হাঁসখালি	২৫৬	সুখসাগর	৩২০
দেলতগঞ্জ	২৪৩	শান্তিপুর	১৪৬

কারণ যাইহোক উনিশ শতকের প্রথম দশকের নদীয়া ছিল ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। কুখ্যাত কিংবা অন্য অর্থে বিখ্যাত ডাকাত দলের মধ্যে ছিল সর্দার বিশ্বনাথ ও সর্দার বুধিয়ার গ্যাং, গঙ্গারাম সর্দারের দল, কাশীনাথ, পীতম্বর, শ্রামদাস প্রমুখ সর্দারের দলবল। এছাড়া আরও অনেক দল ছিল যারা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ডাকাতিতে লিপ্ত থাকলেও তাদের মূল ঘাঁটি ছিল নদীয়া। এদের মধ্যে রঘু সর্দারের দল কারাবার চালাতেন বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নাটোর জেলায়। শ্যাম সর্দারের দল লিপ্ত ছিল মূলত নদীয়া ও যশোহর জেলায়। সুবল সর্দারের দল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহীতে। ঠাকুরদাস ও গোবর্ধন সর্দারের দল লিপ্ত ছিল মূলত নদীয়া ও যশোহর জেলার ডাকাতিতে। এই সব গ্যাং জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই ডাকাতিতে পারদর্শী ছিল।

সর্দার ডাকাতরা এক প্রকার কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে তাদের দুষ্কর্ম চালিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসনের তরফে ডাকাতদের দমনের বিশেষ কোন উদ্যোগ ১৮০৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি বিশেষ ডাকাতির ঘটনায় জেলা প্রশাসন নড়েচেড়ে বসে। ঘটনাটি ছিল বিশ্বনাথ সর্দার কর্তৃক নীলকর সাহেব ফ্যাডির বাড়ী আক্রমণ। এই আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন জেলাশাসক তার রিপোর্টে। তাছাড়া এই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাবে কুমুদনাথ মলি-কের নদীয়া কাহিনীতে, গ্যারেটের নদীয়া গেজেটে। ডাকাতরা একজন ইউরোপীয়র বাড়ী আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনা হজম করা ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা এই ঘটনাকে তারা শাসকের কর্তৃত্বের উপর আঘাত হিসাবে দেখেছিল। সুতরাং নদীয়ার ডাকাতদের দমনের জন্যে বাংলার সরকারের তরফে বিশেষ তৎপরতা দেখানো হল।

দিনাজপুর জেলায় গ্যাং-ডাকাত দমনে অভিজ্ঞ জন ইলিয়টকে নদীয়ার জেলাশাসক ও মুখ্য ফৌজদারী বিচারক নিযুক্ত করা হল। এছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা হল তিনজন সহকারী জেলাশাসক। এরা ছিলেন এ. জে. এফ.টাইটলার, মিঃ লিনডন এবং মিঃ ব-্যাকুয়ার। ডাকাতি দমনের জন্যে জেলা শাসকদের দেওয়া হল বিশেষ ক্ষমতা। জেলাশাসককে তার গৃহীত পদক্ষেপের জন্যে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের নিকট জবাবদিহি করা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হল। এই বিশেষ ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে জন ইলিয়ট নদীয়ায় পা দিয়েই জেলার কিছু অঞ্চল সফর করেন। অধিবাসীদের সাথে কথা বলেন এবং এর মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে জমিদারদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত ডাকাতদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন এক প্রকার অসম্ভব। তিনি জমিদার ও তাদের আমলাদের নিয়ে এক বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে তিনি প্রথমে আবেদন জানালেন যে তারা যেন প্রশাসনের পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সর্বান্তকরনে সহযোগিতা করেন ডাকাতদের গ্রেফতারে। একই সাথে প্রায় হুমকির সুরে জানালেন যে তাদের কাছে ডাকাতদের সম্পর্কে যতসব তথ্য প্রমাণাদি আছে সেইসব যেন জেলাপ্রশাসনকে

জানিয়ে দেয়। এর অন্যথা হলে ফল ভালো হবে না। সাথে সাথে জমিদার ও তাদের আমলাদের অভয় দেওয়া হল এই বলে যে আদালতে তাদের যাতে হয়রানি না হয় জেলাশাসক তা দেখবেন এবং আদালত অভিযুক্ত ডাকাতদের বিপক্ষে সওয়াল জবাবে নিযুক্ত থাকবেন সরকারী উকিল। জমিদারের পক্ষ থেকেও জেলা শাসককে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

এই বৈঠকের পর ডাকাত সন্দেহে শুরু হল পাইকারিহারে ধরপাকর। সমগ্র জেলায় তৈরী হল এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি। পুলিশ, গোয়েন্দা, জমিদারী আমলা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই ডাকাত ধরতে নেমে পড়ল। ১৮০৮ এর নভেম্বর মাস থেকে ১৮০৯ এর জানুয়ারী মাস অবধি গ্রেফতার করা হল ৭৩৮ জনকে। গ্রেফতার হওয়া ডাকাতদের পরিচয় ছিল এইরূপ - ৯জন কুখ্যাত সর্দার ডাকাত, ৯৬ জন পেটি সর্দার ডাকাত, ১০ জন ঘোষিত এবং ৬২৩ জন ছিলেন সাধারণ ডাকাত। ১৮০৯ এর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুন অবধি প্রতিমাসে নদীয়ার জেলে বন্দী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৩৬, ১৮৪৪,২০৬৯,২১৬৩,২২২৫ এবং ২৩৭০। গ্রেফতারি এড়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে গা ঢাকা দিয়েছিল বহু ডাকাত। নদীয়া প্রশাসনের অনুরোধে বাংলার সরকার এক আদেশনামা জারী মারফত পার্শ্ববর্তী জেলা ঢাকা-জালালপুর, রাজশাহী এবং যশোহরকে সমস্তরকম সহযোগিতার নির্দেশ দেয়। এই সহযোগিতার ফল স্বরূপ শম্ভুবানিয়া ও কাশীনাথকে আটক করা হল যশোহরে, সন্ন্যাসী বাগদীকে আটক করে নদীয়ায় আনা হল বর্ধমান থেকে। আর গঙ্গারাম সর্দারকে ধরা হল সুদূর পাটনায়। তাছাড়াও বহু মানুষকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে আটক করে অনির্দিষ্টকালের কারাগারে বন্দী করে রাখা হল।

প্রশাসনের তরফে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হলে ১৮০৯ থেকে ডাকাতির ঘটনা হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে সন্দেহের বশে গ্রেফতার হওয়া মানুষদের বিচার প্রক্রিয়া আইনমাফিক হয়েছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। সাক্ষী হিসাবেও কেউ এগিয়ে আসেনি। মুখ্য বিচারক জন ইলিয়ট এমন সব সাক্ষীর সাক্ষ্যকে মান্যতা দিয়েছিলেন যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহের উর্দ্ধে ছিল না। তিনি পুলিশের নিযুক্ত গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্যপ্রমাণ ও বয়ানকে দিয়েছিলেন আইনী মান্যতা। এদের দেওয়া বয়ানের উপর নির্ভর করেই বহু অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়েছিল। জেলাশাসকের যুক্তি ছিল জেলায় চলছে অরাজকতা ও নৈরাজ্য। ডাকাতরা প্রতিশোধ নেবে এই আতঙ্কে কেউ সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেনি। এই অবস্থায় গোয়েন্দাদের দেওয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদিকে আইনী মান্যতা না দিলে অবিযুক্তদের দোষী সাব্যস্থ করা অসম্ভব। সরকার জেলাশাসকের যুক্তি মেনেনিয়েছিলেন। এই বিচার পদ্ধতির সমালোচনা করেন অনেকে। কেননা এই ধরণের বিচার প্রক্রিয়া আইনের শাসন লঙ্ঘনের চুড়ান্ত নজির। সমকালীন এক ব্রিটিশ সাময়িকপত্র লিখেছিল যে, যে পদ্ধতিতে নদীয়াকে ডাকাতমুক্ত করা হয়েছিল তা ইংরেজ আইনের শাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদিও এই পদ্ধতিতেই নদীয়াকে সাময়িকভাবে ডাকাতমুক্ত করা হয়েছিল।

নদীয়ার ডাকাত দমনের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলার সরকার উপলব্ধি করে যে বিভিন্ন জেলার পুলিশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ পদাধিকারী দরকার। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হল সমগ্র বাংলা প্রদেশের জন্য একটি পুলিশ অফিসারের পদ যার পরিচয় হল সুপার - ইনটেনডেন্ট অব পুলিশ হিসাবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই পদটি শুধুমাত্র একটি জেলার সর্ব্বোচ্চ পুলিশকর্তা হিসাবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে।

প্রবীণ মানুষ সমাজের বোঝা ?

- বিপুল রঞ্জন সরকার

প্রবীণ অর্থাৎ যাঁদের বয়স ষাট বা অধিক তাঁরা ২০০৬-এর পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে ছিলেন ৬৯ কোটি, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এগারো শতাংশ। কিন্তু সাধারণভাবে বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা, উন্নত চিকিৎসা এবং প্রযুক্তির দৌলতে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য ২০৫০ নাগাদ পৃথিবীতে বৃদ্ধের সংখ্যা পৌঁছবে ২০০ কোটিতে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। মোটামুটি চার দশকে দ্বিগুণিত হবে। আর ভারতের ক্ষেত্রে ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে ৭.৪৪ শতাংশ ছিল প্রবীণ, অঙ্কের হিসাবে প্রায় আট কোটি। ২০৩০ নাগাদ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে তা হবে কুড়ি কোটি। এই যে বিশেষ ধারা, তাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। ভারত তথা বিশ্বকে প্রবীণের কথা ভাবতে হচ্ছে। বলা যেতে পারে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। তারই স্বীকৃতি মেলে রাষ্ট্র সংঘের সনদে। বয়স্কদের সমস্যা সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাবনার শুরু তখনই, যখন ক্রমশ ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে, অর্থাৎ বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশেষে রাষ্ট্র সংঘ বিষয়টি নিয়ে ভিয়েনাতে ১৯৮২তে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান করে। ২৬শে জুলাই থেকে ৬ই আগস্ট অর্থাৎ এগারো দিন সুদীর্ঘ আলোচনার পর সেখানে একটি 'ইন্টারন্যাশন্যাল প্ল্যান অব অ্যাকশন অন এজিং' গৃহীত হয়। অদ্যাবধি ওটাই বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সার্বিক প্রস্তাব রূপে বিবেচিত। ৪৭/৫-এর প্রস্তাবে ১৯৯৯ সালকে বয়স্ক মানুষের বৎসর রূপে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের দরবারে বয়স্কদের জন্য ১৮টি নীতি প্রণীত হয়। নীতিগুলি স্বাধীনতা, অংশীদারিত্ব, যত্ন, আত্মিক পরিপূর্ণতা এবং মর্যাদা-এই পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত। রাষ্ট্র সংঘের সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ভারত সরকারও ১৯৯৯-এ বৃদ্ধদের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করে। তবে মূল রক্ষাকবচ রয়েছে ভারতের সংবিধানে ৪১ নং ধারায়। ''রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার মধ্যে বৃদ্ধদের সরকারী সহায়তা দানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'' আমাদের সংবিধানে সমান অধিকারের বিধান মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত। সামাজিক নিরাপত্তা কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ দায়িত্ব।

এবার কারা বয়স্ক বা প্রবীণ বা বৃদ্ধ, তাঁদের সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচার কীরকম, সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। রাষ্ট্র সংঘের সংজ্ঞা অনুসারে ষাট বৎসর বয়সী মানুষ বয়স্ক। কিন্তু এই মানদণ্ড পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। জলবায়ু, অর্থনীতি, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, পরিবেশ প্রভৃতি নির্ভর করে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা হয়। আফ্রিকা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পঞ্চাশকে বার্ধক্যের সূচনা বৎসর রূপে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আবার উন্নত দেশগুলি বা উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। উন্নত পশ্চিমি দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে বার্ধক্য ৬০-৬৫-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দেশ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বার্ধক্যকে দেখে, তার সীমারেখা প্রসারিত - ৪০-৭০। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বার্ধক্যকে চিহ্নিতও করা হয় নানা নামে - বৃদ্ধ বয়স, বৃদ্ধ মানুষ (অধিকাংশ দেশে এটাই পরিচিতি), প্রবীণ (আমেরিকান রীতি), প্রবীণ নাগরিক (ব্রিটিশ এবং কোন কোন মার্কিন রাজ্যে), প্রবীণতর প্রাপ্তবয়স্ক (সমাজ বিজ্ঞানী), প্রাচীন ইত্যাদি।

বার্ধক্যের লক্ষণ - নবীনদের তুলনায় রোগব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত বেশি কাতর, দুর্বলতা, কর্মক্ষমতার অভাব ইত্যাদি। বার্ধক্যকে মূলত চারটি বিভাগে চিহ্নিত করার রেওয়াজ বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। ক্রনোলজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল এবং সোস্যাল। ক্রনোলজিক্যাল বয়স মানুষের কর্মকাণ্ডের বয়স বিবেচনায় পৃথক পৃথক ব্যক্তি র ক্ষেত্রে আলাদা রকম হতে পারে। আবার কোথাও সন্তান সন্ততি এবং নাতিপুতি হওয়ার পরে মানুষকে বৃদ্ধ বিবেচনা করা হয়। মনস্তাত্বিক গঠন এবং সক্রিয়তা, সচেতনতা অনুসারেও একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বার্ধক্য বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। সাধারণভাবে ষাট বৎসর সাধারণ লক্ষণগুলি বিচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই তাকে প্রবীণ বা বয়স্ক বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। আবার একই দেশে বিভিন্ন যুগে মানুষের স্বাস্থ্যের বিচারে বিভিন্ন বয়স প্রবীণ বা বৃদ্ধ বলে চিহ্নিত হয়। ভারতে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩৮। প্রায় ছয় দশকের ব্যবধানে তা ৭০ ছুঁই ছুঁই। উপরন্তু নানাবিধ রোগ নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ আহার বিহার নিয়ন্ত্রণ করে অনেক মানুষই ৭০/৮০ পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারে। নাগরিক জীবনে বা শহরাঞ্চলে সচেতনতার দরুণ মানুষের বার্ধক্য নামে যে বয়সে, ভারতেই পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র পীড়িত, অর্থনীতিকভাবে পশ্চাদপদ মানুষের বার্ধক্য আসে অনেক তাড়াতাড়ি। তাঁদের আয়ুর সীমাও অপেক্ষাকৃত কম। আমরা গড় যে ৭০ বছর বয়সের কথা বলি, সেটা সর্বস্তরের মানুষের মিশেল ঘটিয়েই বলা। বিচারের তাই বিভিন্ন নিরিখ। বার্ধক্যে বৈচিত্র্য নিয়ে গেরেন্টোলজিস্ট অর্থাৎ বৃদ্ধদের রোগ বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি বিভাজন করেছেন। অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধ - ৬০-৬৯; মধ্য পর্বের বৃদ্ধ ৭০-৭৯; খুব বৃদ্ধ ৮০ প্লাস। আবার আরেকদল বিশেষজ্ঞ অন্যভাবে উপবিভাগ দেখিয়েছেন। ইয়ং ওল্ড - ৬৫-৭৪; মিড্‌ল ওল্ড - ৭৫-৮৪; ওল্ডেস্ট ওল্ড - ৮৫ প্লাস। অরেকদল বিশেষজ্ঞের মতে ইয়ং ওল্ড ৬৫-৭৪ হলেও ওল্ড বা বৃদ্ধ ৭৪-৮৪ এবং ওল্ড ওল্ড অর্থাৎ বৃদ্ধের বৃদ্ধ ৮৫ প্লাস।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সর্বাগ্রগণ্য সুইজারল্যাণ্ড। পশ্চিমী দেশগুলি অনেকটা এগিয়ে। স্বাভাবিকভাবে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ভারতের অবস্থান মাঝামাঝি। এখানে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আয়কর সীমা বৃদ্ধি, রেল টিকিটে কনসেশন, মেয়াদী আমানতে অতিরিক্ত সুদ, কোন কোন জায়গায় বয়স্কদের জন্য পৃথক লাইন, টেলিফোন সংযোগে সরকারী ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক সুবিধা প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা চালু হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত অপ্রতুল। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতকে বহুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে।

বয়স্ক মানেই জীর্ণ, অশক্ত, অকর্মণ্য বা অক্ষম এই ধারণার কোন অবকাশ নেই। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বয়স্কদের অসামান্য অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা অতীতে গৌতম বুদ্ধ, অতীশ দীপঙ্কর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ অতি প্রবীণ মানুষদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত। আধুনিক ভারতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ঋষি অরবিন্দ প্রভৃতি এই বঙ্গভূমি কী অসামান্য অবদান রেখেছেন, আমরা তা জানি। এঁদের প্রত্যেকের জীবনের পঞ্চাশোর্ধ কাল কর্মকাণ্ডের ঘনঘটায়, সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা মহাত্মা গান্ধিকে স্মরণ করব। ঊনআশি বৎসর বয়সে তাঁর জীবনকে জোর করে ছেঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। আধুনিক বিশ্বের সামনে গান্ধিজি অনুসরণীয় এক আদর্শ, একদৃষ্টান্ত। আমরা আমাদের চারদিকে

বয়স্ক মানুষকে শতবিধ কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত লিপ্ত থাকতে দেখি। তাঁরা কোনভাবে কর্মক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে নেই। তাঁদেরই কর্মক্ষমতাকে স্বীকৃতি দান করতেই হবে। সমাজ এবং রাষ্ট্র এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারে না।

আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সমাজে কোন কোন অংশের কাছে বার্ধক্য একটা বোঝা রূপে বিবেচিত হয়। উপেক্ষিত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী, আমাদের দেশ সহ সর্বত্র, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা এবং গবেষণায় এই দৃষ্টি ভঙ্গি যে সর্বতোভাবে ভ্রান্ত, তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা প্রবীণ, তাঁরা মোটেই নিঃশেষিত নন, কোনকালেই তা ছিলেন না, এখনও নেই। বরং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ইতিবাচক এবং বিশ্বকে প্রতিনিয়ত তাঁরা সমৃদ্ধ করে চলেছেন। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ৬৫ শতাংশ বয়স্ক মানুষ তাঁদের বয়স্ক প্রতিবেশির সহায়ক, সুহৃদ এবং বন্ধু। বহু ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত তরুণেরা বৃদ্ধদের পাশে দাঁড়ায় না বা দাঁড়ানোর সুযোগ পায় না, সেখানেও ওই বৃদ্ধদের ভূমিকা। প্রতিবেশিদের খোঁজখবর, অসুখবিসুখে পাশে দাঁড়ানো বা নিদেনপক্ষে সৌজন্যসূচক ব্যবহারে বয়স্কদের জুড়ি নেই।

বয়স্কদের সমাজজীবনে অবদানও বিশাল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে লক্ষ লক্ষ এইডস্ রোগীর যত্ন ও পরিচর্যার মূল দায়িত্ব পালন করেন তাদের বয়স্ক পিতামাতা। এইডস্ রোগীদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানসন্ততির লালনপালন ও ভরণপোষণের ভারও তুলে নেন বৃদ্ধ ঠাকুরদা-ঠাকুমা। শুধু আফ্রিকায় এভাবে ১৫ বৎসরের নীচে অনাথ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ শিশুর লালন পালন করছেন তাদের পিতামহ-পিতামহী। শুধুমাত্র অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক মানুষ এই পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন এমন নয়, উন্নত দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। আমরা উপরে যে ঘটনা উল্লেখ করলাম, তার বাইরে আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখি, যেখানে পুত্র-পুত্রবধূ পিতামাতার সঙ্গে বসবাসরত, সেখানে নাতি-নাতনির পরিচর্যা ও লালনপালন সহ স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে আসা এবং সর্বদা সঙ্গ দেওয়ার দায়িত্ব ঠাকুরদা-ঠাকুমা পালন করেন। উন্নত স্পেনে নির্ভরশীল কিংবা অসুস্থদের সেবাযত্নের সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেন বৃদ্ধরা, অবশ্য তাতে মহিলাদেরই সংখ্যাধিক্য। খুব নিখুঁত সমীক্ষায় ওখানে দেখা গেছে যাঁদের বয়স ৬৫ থেকে ৭৪-এর মধ্যে, তাঁরা তদোধিক বয়স্কদের সেবায় ২০১ মিনিট ব্যয় করেন; তুলনায় ৭৫ থেকে ৮৪ বয়সের মানুষ ব্যয় করেন ৩১৮ মিনিট। কিন্তু যাঁদের বয়স ৩০ থেকে ৪৯, তাঁরা বয়স্কদের সেবায় ৫০ মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তবে বয়স্কদের এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য সমাজের দায়িত্ব আছে, পরিবারের দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব তাঁদের স্বাস্থ্য রক্ষার। যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় আহার বিহার এবং স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে তাঁদের পক্ষে এই ইতিবাচক অবদান সম্ভব। আমাদের দেশে অনুরূপ সমীক্ষার কোন নজির জানা নেই। কিন্তু সম্ভবত চিত্রটা স্পেনের তুলনায় উন্নততর হবে। আমরা সবাই লক্ষ্য করি, সংসারে বৃদ্ধ স্বামী কীভাবে অসুস্থ বৃদ্ধা পত্নীর সেবা যত্ন করেন। বিপরীত চিত্রটা একইভাবে শুধু নয়, অধিকতর সত্য। এর বাইরেও অনেক বয়স্ক এবং বয়স্কা প্রতিবেশীর সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেন। এই চিত্র শহরজীবনের দুর্লভ দর্শন হয়ে উঠলেও গ্রাম জীবনে এখনও কঠোরভাবে সত্য।

অস্ট্রেলিয়ায় বয়স্কদের নিয়ে নানা ধরনের সমীক্ষা হয়। একটা সমীক্ষায় প্রকাশ পায় ওই দেশে বয়স্ক নারীরা যে পরিমাণ স্বেচ্ছায় শ্রম ও সেবাদান করেন, বিশেষত তরুণতর প্রজন্মের

জন্যে, তার আর্থিক মূল্য চার হাজার একশো বিলিয়ন ডলার। যাঁরা ইয়ং ওল্ড অর্থাৎ ষাট থেকে সত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে, তাঁদের সেবা কাজের পরিমাণই সর্বাধিক।

সমাজে বয়স্কদের ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি অল্প বয়স্কদের সংখ্যা হ্রাসের ইঙ্গিতবহ। অনেক উন্নত এবং শীতপ্রধান দেশে ইতিমধ্যে ভারসাম্য বয়স্কদের অনুকূলে ঢলে পড়ছে। তাতে ওয়ার্কিং ফোর্স অর্থাৎ যাঁরা শ্রমসাধ্য কাজকর্ম করে সমাজকে সমৃদ্ধ করবেন, তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে ঘাটতি হতে পারে। এটা নেতিবাচক। কিন্তু আবার বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করে। অস্ট্রেলিয়ার ইনস্টিটিউট অব ক্রিমিনোলজি এক সমীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ২০৫০ নাগাদ দেশে আইন মেনে চলা নাগরিকের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশে খুনের মত অপরাধের সংখ্যা অন্তত ১৬ শতাংশ কমে যাবে। এর ফলে কমবে কারাগার বা সংশোধনাগার তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ের বোঝা। সেই অর্থ ব্যয় করা যাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে। সেখানে এখনই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি, সংগঠন, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, নাট্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে তরুণদের তুলনায় বয়স্কদের আনাগোনা অনেক বেশি।

উপরন্তু বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে সমাজে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারে কাটছাঁট। এটা সুস্থ সমাজ রচনার এক গভীর অঙ্গীকার। বয়স্কের সংখ্যা বাড়বে, আনুপাতিক হারে ভোগ্যপণ্যের বাজার হ্রাস পাবে, বৃদ্ধি পাবে বইপত্র বিক্রি, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি প্রভৃতি। সুতরাং বয়স্ক মানে সবই নেতিবাচক, সবই নিঃশেষিত, তাঁদের সমাজে কিছুই দেবার নেই, এই ধারণা ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন। আমাদের দেশেও আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন সামাজিক, ক্রীড়া, নাট্য প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার প্রভৃতির সদস্য সংখ্যা বিচারে তরুণদের তুলনায় বয়স্করা পিছিয়ে নেই, ক্ষেত্রবিশেষে এগিয়ে। পাঠাগারে পাঠক বয়স্করা বেশি। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য, খেলোয়াড়দের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কিশোর ও তরুণদের একচ্ছত্র আধিপত্য, সেটা থাকবে এবং সেটা থাকা উচিত। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উঠে আসা প্রবীণদের বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, পরামর্শ, উপদেশ ছাড়া প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই অচল। রাষ্ট্রের কথা ধরলে ভারতে নির্বাচিত প্রত্যেক রাষ্ট্র পতির বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৮৫। প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে দুজন ছাড়া সবাই ষাট ছাড়িয়ে তাঁদের প্রশ্নাতীত দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করেন। লোকসভা-রাজ্যসভা সহ রাজ্যের আইনসভাগুলি ও মন্ত্রীসভায় বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য। তাঁদের অবদান ইতিবাচক বলেই সমাজ এবং রাষ্ট্র তাঁদের উদারভাবে গ্রহণ করছে। এই ধারা সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, অভিনয় প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত।

পরিশেষে একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রবীণ এবং বয়স্ক মানুষ সাধারণভাবে অপরিমেয় স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসার আধার। তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় যে শিশুরা লালিত, তাদের মানসিক উৎকর্ষ এবং মানবিক গুণ নিশ্চিতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি, তাদের জীবন অনেক বেশি পরিপূর্ণ, তাদের প্রাপ্তি অসামান্য। আমাদের আধুনিক নিউক্লিয়ার পরিবারকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। এটা আমাদের সবার নজরে পড়ছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এটা একটা ট্রানজিটরি পিরিয়ড - পরিবর্তনের সময় এবং তা কখনো স্থায়ী হতে পারে না। নানা সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় এই পর্বের একটা অবসান কিছু আগে বা পরে হোক, হতে হবে। মানুষকে মানুষের মত হতে হবে, অর্থাৎ হতে হবে জীবনমুখী। অর্থবিত্তের আশ্রয়ে কিংবা বৈভবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে পারে না, ভারতীয় সংস্কৃতিও তাঁর অন্তরায়। সুতরাং এই অস্থায়ী পর্বের অবসানে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা থাকব। সে সূর্যোদয় নবীন এবং প্রবীণের হাত ধরাধরিতেই সূচিত হবে।

জীবনানন্দের - 'লাশ কাটা ঘর'- ও মৃত্যুচেতনা

- কাকলী ভৌমিক

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যমাত্রই ছিল আখ্যানধর্মী ও গীতিময়তায় পরিপূর্ণ। চর্যাপদের পদগুলোতে যে বাক্-সংহতি, অলংকার প্রয়োগ ও আবেগের অকৃত্রিমতা দেখা যায় তার কাছে বাংলা কাব্য অনেকাংশে ঋণী। আধুনিক যুগে ঈশ্বরগুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় - এর হাত ধরে কাব্যের বারবার নবজন্ম হয়েছে। ভাষার ঔদার্যের ফলে গদ্য ও পদ্যের বিভেদ ও অনেকটাই অন্তায়মান। উনিশ শতকের কবিরা ইংরেজী কবিতার অনুবাদেও আগ্রহী হন। "সংবাদ প্রভাকরে রঙ্গলাল ইংরেজী কবিতা অনুবাদ করেন। এগুলোর বিষয়গত অভিনবত্ব লক্ষ্যনীয়। এমন কী স্তবক বিভাগ, মিল-রচনাও নবীন পথ - অনুসারী।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, মানকুমারী বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের হাত ধরে সেই গীতিকাব্যের ধারা জীবনানন্দ - এ- ও পৌঁছে যায়।

আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দের কাব্যেই এযুগের ক্ষতবিক্ষত মানবহৃদয়ের রক্তাক্ত চিত্রটি পরিস্ফুট। তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৮)। এই কাব্যের কবিতাগুলোতে মানবহৃদয়ের প্রেম ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া 'সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, জীবনানন্দের লেখা কাব্যগুলোও বাংলা কাব্যধারায় এক নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করে।

বিশেষ করে বহু আলোচিত দীর্ঘ নাট্য বিবরণধর্মী কবিতা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি প্রথম প্রকাশ পায় 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ এর চৈত্র সংখ্যায়। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতার অন্তস্থলে রয়েছে একটি গল্পের প্রেক্ষাপট। একটি মৃত মানুষের গল্প। স্ত্রী ও শিশুসন্তান নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের সুখের সংসার। তবুও সে কোন অ-সুখের বিড়ম্বনায় ফাল্গুনের রাতে পঞ্চমী তিথির চাঁদ অস্তমিত হয়ে গেলে একাই বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। সময়টা ছিল বসন্ত কাল তবুও সেই মিলনঋতুতে স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চেয়েছে। ....'মরিবার হল তার সাধ।' তার জীবনে 'প্রেম ছিল, আশা ছিল - জ্যোৎস্নায়, তবু সে দেখিল কোন ভূত ? আসলে এ কবিতার ভেতরেই রয়েছে জীবন মৃত্যু ও একাকীত্বের রহস্যকে জড়িয়ে এক গভীর জিজ্ঞাসা।

নিজের কবিতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য - "আমার কবিতাকে বা একাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন - এ কবিতা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার .....।"

আসলে আট বছরের আগের একদিন কবিতাটি মৃত্যুর কবিতা না জীবনের এ নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। মানুষটি নিদ্রাভঙ্গ হবার পরই মৃত্যুর বাসনা জাগে, না কি সে মরণকে আপন করে নিয়েই ঘুমিয়েছে এ এক গভীর মর্মভেদী প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে

দেয় পাঠককে।

ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দ তথা আধুনিক কাব্যের একটি নতুন ধারা। এই মৃত্যুচেতনা কিন্তু সবসময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়নি। "যুগের বন্ধ্যারূপে জীবনের অচরিতার্থতা এবং আর এক সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর জীবনের আশা সবই মিশ্রিত হয়ে আছে এর মধ্যে। 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থের পাতায় পাতায় রয়েছে এর অসংখ্য উদাহরণ -

"সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।

সার্কাসের বন্দী সিংহের সঙ্গে বন্দী, ব্যথিত বিগত যুগের স্বপ্নে নিমজ্জিত মানবাত্মার তুলনা করেছেন কবি এখানে। মৃত্যুমুখে পতিত মানুষটি যেন সার্কাসে বন্দী সিংহের মতই মৃত্যুর সময় ছটফট করেছে। মৃত্যুতে জীবনে স্বস্তির বদলে কবি তার মুখে দেখেছেন এক বিকৃতি কুৎসিত রূপ।'এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি / রক্তফেনমাখা মুখে মড়কের মতো ঘাড় গুজি / আঁধার খুঁজির বুকে ঘুমায় এবার।" যুগে যুগে অনেক মহাপুরুষের জীবন সংগ্রামে চিত্র খুঁজলে দেখা যায় অনেক মানবই তাঁদের সুখের সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছেন অনির্দিষ্টের লক্ষ্যে। রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধও একসময় তাঁর স্ত্রী পুত্রকে ত্যাগ করে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসে। আলোচ্য কবিতার মানুষটিও আত্মহত্যা করতে বেছে নিয়েছে একটি অশ্বত্থ গাছের ডালকে। কোন এক বসন্তের রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে পেয়েছিল এক মরে যাওয়া চাঁদের আলোর কাছে মৃত্যুর হাতছানি। সাধারণত জানা যায় মৃত্যুতেই জীবনের অবসান। মৃত্যুজীবনের অনিবার্য নিয়ম হলেও বেঁচে থাকাটাও তো মানবজীবনের ধর্ম। তবু ব্যক্তিটি কেন আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছিল। 'একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিল তবু একা - একা; যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা।" এই পংক্তিগুলোতে কবি যেন আত্মহননের স্থান কাল ও প্রক্রিয়ার কথা উলে-খ করে দিতে চেয়েছেন।

কবির কাব্যে বার বার মৃত্যুর চেতনা ঘুরে ফিরে এসেছে জীবনের প্রতি অপরিষীম বিতৃষ্ণার চিত্র আরো বেশী গাঢ় হয়েছে। অন্ধকার কবিতায়। এখানে তিনি যেন জীবন সম্বন্ধে আরো উদাসীন তিনি আর জীবনের মুখোমুখি হতে চাইছেন না। তাঁর আশ্রয়স্থল যেন মৃত্যুর কাছে, রাত্রির অন্ধকারের কাছে, সূর্যের রৌদ্র আক্রান্ত পৃথিবী তাঁর কাছে কোটি কোটি শূয়রের মতো মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন

"আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।" (অন্ধকার)

তিনি মনে করেছেন মরণেই আছে জীবনের নিশ্চয়তা। 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ।' আবার 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় দেখা যায়, পৌষ সন্ধ্যার নির্জন ক্ষেত, সবুজপাতার হলুদ হয়ে আসা, নম্রনীল জ্যোৎস্নার আলো ছায়া রচনা প্রভৃতি প্রকৃতির। এইরূপে যারা মুগ্ধ তাদের জীবনে কোনো ভয় নেই। এই কবিতায় মনে হয় সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে কবি জীবনের পাত্রে মৃত্যুর রস পান করেছেন। মৃত্যু ও জীবনসন্ধির টানাপোড়েন জীবনানন্দের কাব্যে বার বার

দেখা দিয়েছে। মর্গ ও লাশকাটাঘর এখানে মিলেমিশে এক অবসাদের তাড়নাকে স্পষ্ট করেছে। এর পূর্বে কোনো কবির ভাষায় এই অবসাদ ও আত্মহননের চিত্র দেখা যায় না। - "এজন্য জীবনানন্দকে ঠিক morbid কবি বলা চলে না। কারণ সে যুগের তিনি মানুষ তারই সমাধি তিনি দেখেছেন এবং বলতে গেলে, সে তাঁর একপ্রকার আত্মিক মৃত্যু। জীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি ও আকর্ষণেরই একদিক এই মৃত্যুচেতনা।

কিন্তু কেন মানুষের জীবনে এত অবসাদ এত ক্লান্তি, অর্থ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন এই আত্মহননের পথ মানুষ বেছে নেয়। আসলে হয়তো সৃষ্টির তাড়না মানুষকে অবসন্ন করে দেয়। কবিতাটি আগাগোড়া এক কথকের মুখে বিবৃত। আবার কবিতায় একটি চরিত্র 'থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা'; বার্ধক্যের কারণে সে দৃষ্টিহীন ও উড়তে অক্ষম। তথাপি এই অক্ষম অবস্থাতেও তার জীবনের বাসনা অবদমিত হয়ে যায়নি। চাঁদের আলো ডুবে গেলে সে অন্ধকারে দু'একটা ইঁদুর যাতে আত্মস্মাৎ করে পারে সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নার মায়াবী সৌন্দর্য্য তার কাছে কোন আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না কেননা প্যাঁচার জৈব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চাঁদের আলোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই প্যাঁচার উক্তি —'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে।' এই প্রশ্নের অন্তরালে রয়েছে এক ক্রুর ব্যঙ্গ এক নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গ। আসলে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় মানবজীবনের একটি নিষ্ঠুর দিক উন্মোচিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষেরাও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন কখনও সেই সংগ্রামে জয়ের জন্য অমানবিক ও নির্মম হতেও দ্বিধান্বিত হয় না। খাদ্য সংগ্রহের জন্য অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও কাজে লাগানো হয়। প্রয়োজনে তাদের গৃহ ত্যাগ করিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ও নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করে রেখে আসা হয়। নির্জন ও নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে, রেখে আসা হয় নদীর কোনো চরে যেখানে বানের জল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাদের। ক্ষুধায় জর্জর প্রাত্যহিক সংগ্রামে কমে যাবে কতিপয় অপারক দাবিদার। এই কবিতার বৃদ্ধ সংগ্রামী প্যাঁচাটি 'চাঁদকে' যেন এই পরিত্যাগী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ বুড়ি চাঁদ ভেসে চলে গেলে প্যাঁচাটি দু'একটি ইঁদুর ধরে তার বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু একটি প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য যে তৎপরতা প্যাঁচার মধ্যে দেখা গেছে, আত্মঘাতী মানুষটির মধ্যে জীবনের সে তৎপরতা দেখা যায় নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় যে অশ্বত্থের ডালে ঝুলে মানুষটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সেই অশ্বত্থের ডালে বসেই বৃদ্ধ প্যাঁচাটি বাঁচার তাগিদ কেন করে ? এর মধ্যেই নিহিত কবিতার অন্তর্নিহিত বীজ মৃত্যু জীবনের চরম সত্য, সেই অনন্ত ষড়যন্ত্রের ভেতর সঞ্জীবনের এই বীজকণিকার সত্যও তিনি লাভ করেছেন। জীবনের এই গভীরতর বোধ তাঁর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

"আমার এই ক্ষতবিক্ষত আনন্দ কোকিলের গানে মৃত্যুকে
চূর্ণ করে দেয়।
বেদনাকে গোধূলির জাফরান সমুদ্রের মতো সুন্দর
করে তোলে।"

সৃষ্টির রহস্যই যেন মানবজীবনের এক শিকারী আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার শিকার চলছে আবহমান। তাই তাঁর মনে হয়, 'এ পৃথিবী স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।'

মানুষের জীবনের প্রতিদিনকার যে স্বপ্ন যে ভাবনা তা তার স্বতন্ত্র ভাবনার ফসল। মৃত্যু সম্বন্ধে অবগত হয়েও সে উড়ে যেতে পারে স্বপ্নের জগতে। ক্ষণিকের হলেও সে ভুলে যায় - "গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন/ হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাইতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।' তিনি ছিলেন 'নির্জনতম কবি'। এই নির্জনতা কী তাঁর নিঃসঙ্গতার প্রতীক? কিংবা এই নিঃসঙ্গতাই কী সংসারের সব সুখ থাকা সত্ত্বেও 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় মানুষটিকে বাধ্য করে আত্মহননের পথ বেছে নিতে। শুধু প্রকৃতিকে ভালোবেসে নয়, তার মধ্যে নারীর মদির মাদকতার রস উপলব্ধি করে কবি যখন ডুবে যেতে চেয়েছেন, তখনই আবার পৃথিবীর বেদনা থেকে মুক্তির কামনাও আহ্বান করেন —

" পৃথিবীর বাধা এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বেদনায় আক্রোশে
ভরে গিয়েছে।"

উজ্জ্বলের রঙের সঙ্গে ধূসর রঙের মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। 'রূপসী বাংলা'য় রামধনুর সবকটি রঙের তিনি উলে-খ করেছেন তথাপি সেখানেও ভোর ও দুপুরের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সন্ধ্যা আর রাত্রির ছবি। 'রূপসী বাংলা'র সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে গেছে কবির অসম্ভব বেদনার পরিপূর্ণ রূপ মৃত্যুচিন্তা। প্রকৃতি বাংলার অপার সৌন্দর্যও সেই চিন্তাকে মুছে দেয়নি, তিনি বলেছেন-

"একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে
আর, জানি;
হৃদয়ের পথ চলা শেষ হল সেই দিন
গিয়েছে সে শান্ত হিম ঘরে।'

কবির জীবনের এই বিপন্ন বিস্ময়ে সমগ্র কবিতা রচনার ভিতরে এক ভয়াল অন্তঃস্রোতের প্রবাহ দেখা গেছে। 'এ কী অস্তিত্ববাদের প্রতিচ্ছায়া নাকি দুঃসময়ের আত্মিক সংকট ? এই মৃত্যুবোধ আক্রান্ত অস্তিত্বের চেতনা, তড়িৎ আহত বিপন্নতা ও অর্থহীনতার প্রতীক লাশকাটা ঘর কবরের স্মৃতিফলকের মতন স্থায়ী চিহ্ন হিসাবে তাঁর সমস্ত কাব্যে গেঁথে আছে।'

মানুষের জীবনের নিদারুণ ও মর্মান্তিক পরিণতির যে ঘর লাশকাটা ঘর বা মর্গ সে বিষয়টিও যে কাব্যে স্থান পেতে পারে জীবনানন্দের পূর্বে কেহই তা উপলব্ধি করতে পারেননি। কবিতার আবহ সৃষ্টিতেও কবির ভাবনা অবিস্মরণীয় ফাল্গুনের রাতের অন্ধকারে যখন পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে ঠিক তখনই 'মরিবার হল তার সাধ'। যেন জীবনের সহজ সাবলীল চাওয়া পাওয়া, সুখ-দুঃখের মাঝখানে হঠাৎই ছেদ পড়ল। পাশে শায়িত নারী, শিশু, প্রেমকে অবজ্ঞা করে প্রাধান্য পেয়ে গেল ভূত। তার জীবনে কী কোন অপূর্ণতা ছিল? সে কী ভেবে নিয়েছিল ধূলো আর কাঁদা ঘেটে এই ক্লেদাক্তময় পৃথিবীতে আর কোন তৃপ্তি নেই। তাই তার মধ্যে এক আত্মঘাতী বিনষ্টির বোধ অঙ্কুরিত হয়। জীবনানন্দ ছিলেন তৎকালীন সময়ের ক্রান্তিদর্শের কবি, এই অন্ধকারকে ক্রমশ তিনি অন্তসত্ত্বার কেন্দ্রে দেখতে

পেয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন এক গূঢ় চেতনার উৎসে এই অন্ধকার চির সত্য ঃ

"অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকারে ঘিরে আছে সব,
জানে তাহা কীটেরা ও পতঙ্গেরা শান্ত শিব
পাখির ছানাও;
... হে সৃষ্টির বনহুসী, কি অমৃত চাও ?

আসলে 'নির্জনতম কবি' জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের যে অন্তঃস্থল তা গভীর কুয়াশায় তমসাচ্ছন্ন। কোন এক অমোঘ নিয়তির অঙ্গুলী লেহনে মনুষ্যজীবন প্রতিনিয়ত আলোড়িত হয়। এই আলোড়ন দেখা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' - র চরিত্রসমূহে। শশী - কুমুদ প্রত্যেকেই যেন পুতুলের নাচের মহড়া দিয়ে গেছে উপন্যাসে জীবনানন্দও একই পথের দিশারী হয়ে বলেন —

"কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই ;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।"

এই উদাসীনতা কবি ইয়েটসও লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে কবি ইয়েটসও — "হিম শীতল চোখে জীবন মৃত্যুর দিকে তাকিয়েছিলেন'।

"Cast a cold eye
On life, on death
Horseman,pass by !"

জীবন মৃত্যুর অন্তিমলগ্নে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবিদ্বয়ের সুর কোথায় যেন একই সুরে ধ্বনিত হয়।

তথ্য সহায়ক ঃ —

১। সুরেশচন্দ্র মৈত্র - বাংলা কবিতার নবজন্ম - রত্নাবলী পৃঃ - ৭৯।
২। ডঃ কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - বাংলা কাব্য বীক্ষণ পৃঃ - ১১৪।
৩। দীপ্তি ত্রিপাঠী - আধুনিক বাংলা কবিতা পৃঃ - ১৪০।
৪। দীপ্তি ত্রিপাঠী - আধুনিক বাংলা কবিতা পৃঃ - ১৪৬।
৫। জীবনানন্দ দাশ - (জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা) পৃঃ - ৫৯৪।

মাধ্যমিক স্তরে পাশ ফেল ঃ যুক্তি ও তর্কে

- ডঃ শিশির কুমার বিশ্বাস
বাংলা বিভাগীয় প্রধান, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘটে যায় অজস্র ঘটনা। গুরুত্বের বিচারেও সেগুলি সমান নয়। কতগুলি গুরুত্বহীন ব্যাপার রোজনামচার তালিকাভুক্ত হয়ে বিস্মৃতির রাজ্যে প্রবেশ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। বিপরীতে কতিপয় ঘটনা বৃহত্তর তাৎপর্যের নিরিখে সকলকে ভাবিয়ে তোলে। সাংবাদিক বন্ধুদের লোভনীয় খাদ্য হয়ে ওঠে, বারংবার সেগুলি উঠে আসে সংবাদপত্রের শিরনামে। শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মগ্ন চৈতন্যে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয়। আয়োজিত হয় বিতর্ক সভা - তর্কে বিতর্কে জমে ওঠে চায়ের দোকান থেকে অফিস আদালত সহ বিবিধ আসর। বিগত ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় পাশ ফেল ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার বিষয়টি সমগ্র দেশব্যাপী বিতর্কের ঝড় তুলেছে। ভাবিয়ে তুলেছে নাগরিক সমাজকে। পক্ষে বিপক্ষে উত্থাপিত হয়েছে নানা যুক্তির জাল। অবশ্য অধিকাংশ রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। দেরিতে হলেও আমাদের রাজ্য একই সুরে তাল তুলেছে।

বিগত শতকের আটের দশকে বামফ্রন্টের শাসনকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে পাশ ফেল তুলে দেওয়া হয়। গ্রাম বাংলার অসংখ্য দরিদ্র ঘরের সন্তানদের কথা ভেবে এই নীতি গৃহীত হয়। কেননা তারা দারিদ্র্য হেতু বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে হাজির হতে পারত না কিংবা নানা কাজে যুক্ত থাকায় লেখাপড়া করার মত পর্যাপ্ত অবসর পেত না। ফলে পরীক্ষায় ফেল করাটা ছিল তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরেই তাদের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ত। স্কুল ছুটের সংখ্যাও ছিল অত্যধিক।

প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্তের পেছনে তাত্ত্বিক যুক্তিও নিহিত ছিল। শিক্ষা লাভ একটি স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। সেখানে বাধ্যতা, ভীতি প্রদর্শন বা শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানের কোন ভূমিকা নেই। অথচ তখন সমাজের দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার বিভীষিকা ও ফেল করার অজানা আশঙ্কায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছুটে পালাতো। ফলস্বরূপ সিংহভাগ শিশুর ন্যুনতম প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ও অসমাপ্ত থেকে যেত। এই বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে পাশ ফেল প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিগত শতকের নয়ের দশক থেকে কেন্দ্র সরকার আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সর্বাধিক সংখ্যক ছেলেমেয়েদের কাছে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার সদিচ্ছা এবং বিদ্যালয় ছুটের প্রবণতা রুখতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সরকারের এই পদক্ষেপে মুখ্যত সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উপর সমধিক জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার মনোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাক্ষভিক পরিনমন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি আদর্শগুলির

কথা ভাবা হয়নি তেমনভাবে। পরিমাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ অবহেলিত হয়েছে নিদারুণভাবে।

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলিত। যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের মাপকাঠি হিসাবে স্বীকৃত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিদ্যাচর্চার মান যাচাই করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় উচ্ছেদ মানেই শিক্ষায় সর্বনাশ ডেকে আনা। তাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথার বিলোপের ঘটনায় সমাজের সর্বস্তরে গেল গেল রব উঠেছিল। সাধারণ লোক তত্ত্বকথার ধার ধারে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কের তারা যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয়, মতামত পোষণ করে।

[২]

আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে প্রায়শই একটা বিরোধ ভাব লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বজ্ঞরা উন্নত আদর্শ চিন্তার গভীরে ডুব দেন। আবিষ্কার করেন নিত্য নতুন তত্ত্ব। সেটা বাস্তবে বা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ যোগ্য কি না তারা তা নিয়ে ভাবিত নাও হতে পারেন। আর সাধারণ লোক তত্ত্বকথার ধার ধারে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সে বিষয়ে তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। আবার হাতে হাতে তারা ফল পেতে চায়। যেটা সহজে মেলে তার প্রতি তাদের আগ্রহ অধিক।

সাধারণ পরীক্ষায় বৎসরান্তে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উৎকর্ষ যাচাই করা সম্ভব না। কেবল পারদর্শিতা বা দক্ষতা যাচাই করা যায়। তাতে শিক্ষার্থীর লক্ষ্য পূরণ হল কি না তা জানা যায় না। এই পরীক্ষা ব্যবস্থা নানা দিক থেকে ত্রুটি পূর্ণ। অথচ সাধারণ লোক সে খবর রাখে না।

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা বিরূপ ধারণা বহুদিন ধরে প্রচলিত। অনেকের মতে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অমানবিক। এই পরীক্ষার পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়ণ পদ্ধতি বা শিশু কেন্দ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন শিক্ষাতাত্ত্বিকগণ। আসলে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারতীয় শিক্ষাকমিশনগুলিও প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলির বিষয়ে সচেতন ছিল। হান্টার কমিশন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে এই বিষয়ের মন্তব্য — “ For nearly a half century, the examination has been recognised as one of the worst features of Indian Education.”

আবার পরীক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের মন্তব্য — “ External examinations are exercising a restricting influnence over the entire field of education to such an extent as almost to rectifly its real purpose.”

বাস্তবিকই শিক্ষায়তনে যে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তা নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব পড়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। আবার কোন

শিক্ষার্থী বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেও তার পরীক্ষার ফল ভালো না হতেও পারে। তাই এই পরীক্ষা শিক্ষালাভের উৎকর্ষের মাপকাঠি হতে পারে না। কখনও কখনও পরীক্ষায় পাশ করার কথা মাথায় রেখে শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বা সাজেশন ভিত্তিক পাঠদান করে থাকেন। এতে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটে থাকে।

নৈতিকতার দিক থেকেও পরীক্ষা ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করা বা শুধুমাত্র পাশ করার তাগিদে অনেক শিক্ষার্থী অসৎ উপায় অবলম্বন করে। কাগজে টুকলি, পরীক্ষা হলে মোবাইল ও ব-টুথ এর ব্যবহার, এমনকি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক কলম ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা অসৎ উপায় অবলম্বনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। কোন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের এই অসৎ উপায় অবলম্বনে বাধা দেন তবে তার কপালে ঝোটে নানাবিধ বিভীষিকা। চোখ কান খোলা রাখলে অহরহ শিক্ষার্থীদের বেপরোয়া ও বিশৃঙ্খল আচরণের সংবাদ পাওয়া যায়। একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী —

“ নানা জেলার স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ক্লাসে এ - ওর থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া, (‘হল কালেকশন’) এমন হারে চালু হয়ে গিয়েছে, যে বাধা দিয়ে লাভ হচ্ছে না। জোর করতে গেলে উত্তর সম্পূর্ণ না করেই খাতা জমা দিয়ে চলে যাচ্ছে ছাত্ররা, দেখা যাচ্ছে কিছু স্কুলে। কী করে এত বেপরোয়া হয়ে উঠল পড়ুয়ারা ? দুর্গাপুরের স্কুল শিক্ষকেরা বলেছেন, এর কারণ ‘অবজেক্টিভ’ বা ছোট প্রশ্নের আধিক্য।” (১০.১০.১৫, রবিবার, আনন্দবাজার)

পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থায় তাদের বিদ্যালাভের প্রতি মনোযোগ , সততা, উদারতা, সামাজিকতা, উদ্যম ইত্যাদি গুণাবলী বিকশিত হয় না। তাছাড়া প্রকৃত শিক্ষা হল - ‘All round development’ বা সার্বিক বিকাশ। পরীক্ষার বৈতরণী অতিক্রমের চেষ্টায় শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। উপরন্তু সাধারণ বা দুর্বল শিক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষা ভীতি স্বরূপ। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে পরীক্ষা মানসিক অবসাদের জন্ম দেয়।

তাত্ত্বিক বিচারে পরীক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটির কথা নির্দেশ করা যায় একথা সত্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার কোন গুরুত্ব না থাকলেও অসংখ্য সাধারণ শিক্ষার্থী বা পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের কাছে পরীক্ষা যেন ঔষধী স্বরূপ। পরীক্ষা না থাকলে তারা লেখা পড়ার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পরীক্ষা এলে তারা বুঝে না বুঝে, কেবলমাত্র মুখস্থ করেও কিছু শেখে বা শেখার চেষ্টা করে। আর পরীক্ষা না থাকলে বিদ্যার্জনের প্রতি ন্যুনতম আকর্ষণও তাদের মনে অবশিষ্ট থাকে না।

বিগত তিন দশক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিগত দুই দশক নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। তত্ত্বগত দিক থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা বা পাশ ফেল না থাকলেও শিক্ষার মানের অবনতি ঘটার কথা ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ প্রায় ত্রিশ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না। অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের একটা বড়ো অংশ প্রাথমিক স্তরের ন্যুনতম ধারণাও লাভ করেনি। এই করুণ পরিণামের হেতু নিশ্চয় পাশ ফেল প্রথার বিলোপ সাধন। পাশ ফেল প্রথা বহাল থাকলে শিক্ষায় এই দুরবস্থা দেখা দিত না। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি সমীক্ষার ফলাফলে

প্রকাশ পায় —

"রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী রিডিং পড়তেই শেখেনি। লিখতে শেখেনি ৩২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ অভিযান সংক্রান্ত সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। রাজ্যের সবকটি জেলার বাছাই করা স্কুলগুলির উপর সমীক্ষা চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে এই পরিসংখ্যান।

"উলে-খ্য ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাদপ্তর এবং আই আই এম এই ধরণের একটি সমীক্ষা করেছিল। সাম্প্রতিক সমীক্ষার তথ্য বলছে, গত ৩৬ বছরে লেখা ও পড়ায় সামান্য উন্নতি হয়েছে। ২০১৩ সালের এই রিপোর্ট বলছে, বাচ্চাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ পড়তে এবং ৬৮ শতাংশ লিখতে পারছে। অঙ্ক করতে পারছে ৭৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী।"(১৮.০৪.১৪ শুক্রবার উৎকর্ষ অভিযানের রিপোর্ট বর্তমান)

[৩]

পাশফেল ব্যবস্থার বিলোপসাধনে নেতিবাচক ফলাফল বিষয়ে নাগরিক সমাজের একাংশ ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠেছে। 'Save Education' নামে একটি শিক্ষা আন্দোলনকারী কমিটির উদ্যোগে বিদ্যালয় স্তরে পাশফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ চলেছে দীর্ঘদিন ব্যাপী। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত হয়েছে আলোচনা সভা, সংগৃহীত হয়েছে স্মারকলিপি এবং সচেতনা বৃদ্ধির নানা কর্মসূচী হয়েছে গৃহীত। এইভাবে এই ফোরাম শিক্ষাদপ্তর তথা সরকারের উপর নানাভাবে চাপ বৃদ্ধি করে চলেছে।

রাজনৈতিক নেতা ও সরকারও নিশ্চিন্তায় ঘুমিয়ে নেই। দেরিতে হলেও তাদেরও টনক নড়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্র সরকার সদর্থক ভুমিকা পালনে উদ্যোগী হয়েছে। তবে তারা সবদিক বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সম্মতিক্রমেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল ব্যবস্থাকে পুনরায় বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে ফিরিয়ে আনতে চায়। রাজ্যসরকারও এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী। এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে একটি প্রথম সারির সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয় —

" অষ্টম শ্রেণি অবধি ফেল না করাইলেই একমাত্র ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভে উদ্বুদ্ধ হইবে, নতুবা হইবে না; এই যুক্তি রাজনীতির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের উপযোগী কী? প্রশ্নটি আপাতত বিবিধ স্তরে গুঞ্জরিত হইতেছে। গুঞ্জরনটি অবশ্যই নূতন নহে, আগেও শোনা গিয়াছিল। ২০১১ সালে যখন শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ করিবার উদগ্র আগ্রহে গোটা দেশে অষ্টম শ্রেণি অবধি পাশ ফেল উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক, তখনই নানা পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিয়াছিল। ইহাতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি অপেক্ষা অবনতিরই অধিক সম্ভাবনা; এমন বলা হইয়াছিল। সংস্কারের উত্তেজনায় মত্ত দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার মোটেও কর্ণপাত করে নাই। পরিস্থিতি বলিতেছে, পদক্ষেপ দ্রুত জরুরি হইয়া উঠিতেছে। বেশ কিছু রাজ্যের পক্ষ হইতে চাপ আসিতেছে, যাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী উভয়েরই মতে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ ফেল উঠাইয়া ভাল হয় নাই। শীঘ্র তাহা ফিরাইয়া আনা দরকার। মোদি সরকার তথা স্মৃতি ইরানির দফতর রাজি হইলেই, তাঁহারা প্রতি সংস্কারে ব্রতী হইবেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঃ পাশ ফেল থাকিলেই বালক বালিকারা পড়াশোনা করিতে বসিবেন, পিতামাতারাও

আর একটু যত্ন লইবেন। এখন যাহা চলিতেছে, তাহা বিদ্যালয় শিক্ষার নামে নির্ভেজাল ফাঁকিবাজি।" (০১.১০.১৫ বৃহস্পতিবার - আনন্দবাজার)

একণ কূট তর্ক উঠতে পারে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল তথা পুনঃপ্রবর্তিত হলে শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটবে কি না? অনেকে সহজভাবে উত্তর দেবেন - নিশ্চয়। তবে এত সহজে বিষয়টির মীমাংসা সম্ভব নয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যভস্থার একটি অংশমাত্র পরীক্ষা ব্যবস্থা। তাই পরীক্ষায় পাশ ফেল থাকা বা না থাকার উপর শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে না। যেমন একটি বৃহৎ অট্টালিকার অংশ বিশেষে কয়েকটি ইট খসে পড়লো সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অনুরূপভাবে পাশ ফেল প্রথা না থাকলেই শিক্ষার মানের অবমানন ঘটবে। এমন সরল উত্তর অজ্ঞতারই নামান্তর।

আধুনিক শিক্ষাকে সর্বাত্মক ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষাবিদগণ ত্রুটিপূর্ণ, পরীক্ষা ব্যবস্থার স্থলে মূল্যায়ণ পদ্ধতির প্রবর্তনের কথা বলেছেন। কেবল সংকীর্ণ পরীক্ষা ও তার পাশ ফেলের মধ্য দিয়ে পঠন পাঠন সার্থক হয়ে ওঠেনা। যথার্থ মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে Remers এবং Gaze - এর মতে — " Evalution assums a purpose or an idea of what is good or desirable from the standpoint of the individual or society or both."

অর্থাৎ ব্যক্তি বা সমাজ বা উভয়ের বিচারে যা ভালো বা বাঞ্ছনীয় মূল্যায়ণ তাই বিবেচনা করে।

মনোবিদ Wesley বলেন - মূল্যায়ণ হচ্ছে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও উপায় যার সাহায্যে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলি পরিমাণগত ও গুণগতভাবে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা পরিমাপ করা। মূল্যায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সামগ্রিক ও চরম নির্ধারক।

মূল্যায়ণের প্রধান তিনটি দিক — ক) লক্ষ্য নিরূপণ খ) শিখন অভিজ্ঞতা গ) বিভিন্ন কৌশলের শিখন অভিজ্ঞতাগুলির কার্যকারিতার যাচাইকরণ। পরবর্তীতে এর সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হয়েছে — 'Value Education' বা মূল্যবোধের শিক্ষা।

[৪]

পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে যতই সুচারু করে তোলার চেষ্টা করা হোক না কেন তাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার নিশ্চয়তা নেই। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়োজনে চাই যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ বিদ্যালয় স্তরে ও প্রশাসনিক স্তরে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ শিক্ষার মানোন্নয়ণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলি পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, শিখন পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পনা, অপচয় ও অনুন্নয়ণ নিবারণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ ইত্যাদি।

বিদ্যালয় স্তরের পরিকল্পনা আসলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। সেই পরিকল্পনাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে না পারলে সেগুলি খাতা কলমেই রয়ে যাবে। সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার (Management) মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। অথচ আমরা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কথা মনে না রেখে কেবলমাত্র

পরীক্ষাগ্রহণ বা পাশ ফেল প্রথাকেই শিক্ষার মানোন্নয়ণের চাবিকাঠি হিসাবে ধরে থাকি - এ যেন দৃষ্টিহীনের হস্তী দর্শন।

ব্যবস্থাপনার তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি ঃ

সময় তালিকা প্রস্তুত ঃ - বয়স, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী সময় তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অঙ্ক, ইংরাজী, বিজ্ঞান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি সময় তালিকার শুরুতেই রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা ঃ - শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মী সকলের সহযোগিতা ও সমবেত চেষ্টায় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা পরায়ণতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। শৃঙ্খলারক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব থাকবে ব্যবস্থাপকের হাতে।

বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা ঃ - যথাযথ ব্যবস্থাপনার দ্বারা গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, মিউজিয়াম ইত্যাদি বিভাগগুলি পরিচালিত হবে। নচেৎ পরিচালনাগত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

রেকর্ড সংরক্ষণ ও বিবরণ দান ঃ - পরীক্ষার খবর অভিভাবকদের কাছে জানাতে হবে। শিক্ষার্থীদের ফলাফল ও মূল্যায়ণ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সভায় মিলিত হবেন। বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে তথ্যাবলী মজুত রাখা ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেবামূলক কর্মসূচী ঃ - নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর বাইরে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সেবামূলক কাজের সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। N.S.S বা জাতীয় সেবা প্রকল্প, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

শিক্ষা বহির্ভূত বিষয় বর্জন ঃ - সরকারী প্রকল্পের কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের বহির্ভূত বহু বিষয় ক্রমশ যুক্ত হয়ে পরেছে। যেমন - স্কলারশিপ প্রদান, মিডডে মিল, জামাকাপড়, সাইকেল বিতরণ এর মত ঘটনা। এতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আর্থিক দূর্নীতির অভিযোগ ওঠে বারংবার। শিক্ষকদের সকলেই ধোয়া তুলসী পাতা এমন কথাও বলা যাবে না। এই সকল অবাঞ্ছিত বিষয় বর্জিত হলে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে পঠন পাঠন পরিচালনা অনেক সুবিধার হত। পোশাক বিতরণ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হয় সংবাদ পত্রে —

" পড়ুয়াদের পোশাকের জন্য বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কালীগঞ্জের হাটগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ নৈমুদ্দিনের বিরুদ্ধে শ'খানেক ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগ পত্র জমা পড়েছে স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এছাড়াও অভিযোগের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে কালীগঞ্জের ওসি., বিডিও, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) ও নদিয়ার জেলাশাসক পি.বি. সালিমকে।" (২৩.০৭.১৪ - বুধবার - আনন্দবাজার পত্রিকা)

শিক্ষকরা মিডডে মিলের বাজার করা, হিসাব রাখা, রান্নার তত্ত্বাবধান ও খাদ্য পরিবশেন পরিচালনা, পোশাকাদি বিতরণ ইত্যাদি কাজে যুক্ত থাকায় তাদের প্রধান কাজ

পাঠদানের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন। 'এ যেন ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি।'

সমন্বয় সাধন ঃ - শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সুসমন্বয় স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলেই গণতান্ত্রিক উপায়ে সুচারুরূপে পঠন পাঠন প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হয়।

পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশ ঃ - সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যবধানে তার ফল প্রকাশ হওয়া দরকার। বিজ্ঞানসম্মত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাবর্ষের সূচনাতেই কোনসময় কোন কোন বিষয়ে পাঠদান করা হবে, কোন শিক্ষক পাঠ দান করবেন, বৎসরে কটি এবং কোন কোন সময় পরীক্ষা গৃহীত হবে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ঃ - উপযুক্ত সংস্থার দ্বারা আয়োজিত যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। একজন ব্যক্তিও যেন অর্থের বিনিময়ে বা স্বজন পোষনে শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার না পায়। কেননা অসৎ শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীর সৎ চরিত্র গঠনে সহায়ক হতে পারেন না।

শিক্ষকদের মূল্যায়ণ ঃ - গতানুগতিক রীতিতে শ্রেণিতে পাঠদান করেই শিক্ষকের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়। শিক্ষকের পাঠদান শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা, সেই পাঠদান শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে বা পারেনি ইত্যাদি এতদিন যাচাই করা হত না। এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার শিক্ষকদের পঠনপাঠনের মূল্যায়ণ করবেন। এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক। সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী ঃ —

"ক্লাসে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেই দায়িত্ব শেষ, এমন রুটিনপর্ব এবার শেষ হতে চলল শিক্ষক - শিক্ষিকাদের। কী পড়ালেন, কতটা পড়ালেন, ছাত্রছাত্রীরাই বা তার কতটা বুঝল, এবার তার হিসাব কষা শুরু হবে। অর্থাৎ শিক্ষকতার মান যাচাইয়ে রাজ্যে এবার রীতিমতো মূল্যায়ণ হবে। প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষকদের এই মূল্যায়ণ যৌথভাবে করবেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা।" (২ জুন, ২০১৪ সোমবার, বর্তমান)

সাধারণ লোক মনে করে বিদ্যালয়ের পাশ ফেল ব্যবস্থা শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রধান নির্ধারক। প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। শিক্ষার উৎকর্ষের সাথে নানাবিধ বিষয় জড়িত। তাদের সুসমন্বয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষক শিক্ষিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় এবং শিক্ষকরা তাদের সন্তান সম জ্ঞানে আন্তরিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে পাঠদানে ব্রতী না হন তবে সমস্ত আদর্শের বুলি কাগজে - কলমেই বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকবে। তাই উচিৎ কাজে লেগে পড়া। তাহলে ফল নিশ্চয় ফলবে।

মানবিকতাবাদ এবং চৈতন্য রেনেসাঁস

ডঃ নন্দিতা পাল, কালনা কলেজ, কালনা, বর্ধমান

''মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনই উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিয়া দিল।''[১]

মানুষে-মানুষে, পুরুষে-নারীতে, নারীতে-বিধবায়, রাজা-মহারাজা-রাজকর্মচারীতে, ধনী-দরিদ্রে, পণ্ডিতে-মূর্খে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে, হিন্দু-অহিন্দুতে ভেদাভেদ বিদীর্ণ ধর্মীয় সংকীর্ণতায় কলুষিত সমকালীন রাজনৈতিক অশান্তি ও চরম সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত প্রতিকূলতার উর্দ্ধে উঠে আপামর সমস্ত মানুষকে এক সর্বমানবিক প্রেমধর্মে বক্ষে টেনে নিলেন এবং সবার সাথে একত্রে সমবেত হয়ে দু-বাহু উর্দ্ধে তুলে হরিণাম সংকীর্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলে এক অভিনব 'জনজাগরণ ঘটালেন।''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।অমানিনা মানদেন কীর্তনিয় সদাহরি।।''[২]

অর্থাৎ প্রকৃত বৈষ্ণব সেই যে তৃণের চেয়ে নীচ, তরুর মতো সহিষ্ণু, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে মানহীনকেও সম্মান করে সদা-সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ' শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকটি মহাপ্রভুর শিক্ষাস্টকের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, যেখানে মহাপ্রভুর মানবিকতাবাদের প্রকাশ ঘটেছে সুন্দর সুস্পষ্ট রূপে।

'জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনার জন্য নাম সংকীর্তন - মূলত এই ত্রিবিধ আদর্শের উপর চৈতন্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত'[৩] হলেও 'মানুষের দিকে, বাস্তবজীবনের দিকে মহাপ্রভু মানুষের প্রেম দৃষ্টিকে প্রেম স্বভাবে স্বচ্ছ মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর'[৪] হয়ে জাতি-ধর্ম-অর্থ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে সমসাময়িক মানুষের হৃদয়ে মুক্তির বাণী প্রচার করে উদার মানবিকতাবাদই প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচলিত লোকাচার ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এতো রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা। উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে সমাজে যারা 'অচ্ছুৎ', 'জল-অচল' তাদেরকেও তিনি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈশ্যদের পাশাপাশি বৈষ্ণব সমাজে উঁচু আসন দিলেন। অনুপম প্রেমে যবন হরিদাসকে বক্ষে টেনে নিলেন জগাই-মাধাইয়ের মতো দুর্বিনীত রাজ্যপাট ত্যাগ করে গৌরাঙ্গের সংকীর্তনে যোগ দেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রয়ানের পরে মহাপ্রভু তাঁকে কোলে নিয় নৃত্য করেন। প্রখ্যাত সনাতন গোস্বামী নিজেকে হীন ও অস্পৃশ্য বলে দেহত্যাগ করতে চাইলে মহাপ্রভু বলেন-

-''নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলার্দি বিচার।।''[৫]

এইভাবেই উচ্চ নীচের বিভেদ অতিক্রম করে প্রেমভক্তিকেই সর্বগুনের আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রী চৈতন্যদেব পরম মানবতাবাদী হিসাবে মানুষের প্রেমভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। প্রচণ্ড ব্যয় সঙ্কুল হিন্দু ধর্ম পালনে অনাসক্ত ধর্মত্যাগী দরিদ্র মানুষকে তিনি আবার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনলেন–কোন রকম নৈবেদ্য উপাচারে, পুরোহিত ব্যয়-বহুল আচার অনুষ্ঠানে নয়, পবিত্র দেহমনে ভগবানের নাম নিয়ে তাকে পাওয়ার পথ দেখিয়ে। এমনকি পর্যন্ত মহাপ্রভুর প্রভাবেই বৈষ্ণবযুগে বাংলাদেশের সমস্ত শ্রেণীর নারীর যথার্থ মুক্তি ঘটে। ''এমনকি হিন্দু সমাজের বৈধব্য লাঞ্ছিত নারীও কৃষ্ণনাম জপের অধিকার লাভ করে মর্যাদাময় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেছিল।''[৬]

বাংলার হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রীঃ) রাজত্বকালের এক রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক সংকটের সন্ধিক্ষনে (একদিকে ইসলামি আধিপত্যের পাঠান অপশাসনের নিষ্ঠুরতা, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে ধর্মের নামে ভক্তি বর্জিত নানা বাহ্য বাড়ম্বর এমনকি ব্যাভিচার লিপ্ত বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হিন্দু ধর্ম ও সমাজ) নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এমতাবস্থায় সমস্ত রকম সংকীর্ণতা প্রথাবদ্ধতা আচার সংস্কারের উর্দ্ধে উচ্চ-নীচ সকলকে আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে 'জনগণমন অধিনায়ক' শ্রীচৈতন্যদেব 'মর্ত্যধূলির মাঝে মানুষ ও দেবতাকে এক করে দেখেছেন।'' অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন–

''শ্রীচৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি যুগের প্রতিনিধি –শুধু একটা যুগের প্রতিনিধি নয়, সর্বযুগের প্রেমভক্তি,ত্যাগ, তিতিক্ষার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন''

সামাজিক অবক্ষয়ের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে হিন্দু জাতিকে তাদের চরম সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে বিরোধী ধর্মাবলম্বী শাসকশক্তি এবং তথাকথিত শক্তি সংস্কার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেব অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। **প্রথমতঃ,** শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি বাড়ি ভক্তি অনুশীলনের স্থান নির্ধারণ করলে, সেখানে অচিরেই এসে উপস্থিত হন অদ্বৈত প্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু। এরূপ প্রেমাতুর সাহচর্যে অত্যুৎসাহের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য বিপুল ভক্ত সমাগমে পথে পথে নাম সংকীর্ত্তন করতে থাকলে 'গৌড়ের সিংহাসনে বামুন রাজা বসিবে একথা বুঝি বা ফলিয়া যায়' আশঙ্কার অম্বুকা মুলুকের (নবদ্বীপ অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত ছিল) কাজীর কাছে 'চৈতন্য লোক খেপাচ্ছে' বলে অভিযোগ করে মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর রাজ কর্মচারীরা। ক্রুদ্ধ কাজী সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে একদল সংকীর্তনকারীদের মৃদঙ্গ ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিলে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ হিসাবে চৈতন্য কাজীর বাড়ি পর্যন্ত মশাল মিছিল নিয়ে যান। চৈতন্যদেবের অভয় বাণীতে কাজী বাড়ির বাইরে এসে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে অবশেষে সংকীর্তন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। **দ্বিতীয়তঃ,** সমন হরিদাসকে তিনি তাঁর বক্ষে টেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভরিভক্তি পরায়ণঃ', **তৃতীয়তঃ,** নিত্যানন্দ হরিদাস চৈতন্যর অনুমতি নিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম প্রচার করে বেড়ানোর সময় একদিন দুই ঘোর তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ গুণ্ডা জগাই-মাধাই নামক দু'ভাইয়ের সামনে পড়ে

হরিনামের উপদেশ দিলে বেধড়ক প্রহৃত হন। খবর পেয়ে চৈতন্য ছুটে এলে তাঁর ক্রোধান্বিত সুদর্শন চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে আপ্লুত হয়ে অত্যাশ্চর্যভাবে সেই দুষ্ট জগাই-মাধাইয়ের মন গলে যায়। গুণ্ডাবৃত্তি ছেড়ে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তারা বৈষ্ণব ভিখারির বৃত্তি নেয়। শোনা যায়, জনসাধারণের স্নানের সুবিধার জন্য তারা গঙ্গার ঘাটও বাধিয়ে দেন। **চতুর্থত ঃ,** বৈষ্ণব শুস্ক নীতিতত্ত্ববাদী নৈয়ায়িক সার্বভৌম ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মকে স্বীকার করে নিয়ে প্রেমময় হয়ে ওঠেন। **সর্বোপরি,**স্বয়ং নৃপতি হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের প্রতি সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করে তাঁকে অবাধে ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেন-

''যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুণ বিধানে।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউক যে কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব গর্দান।।''

এইভাবেই সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই তাঁকে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানবতার আদর্শ প্রচারকারী চিরকালের আলোর মানুষ, যিনি মাটির পথে বাস্তব ভূমিতে জীবিত মানুষদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতার নিরিখে। তিনি যে শুধুমাত্র মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-মুসলমানকে সমান নজরে দেখেছিলেন তাই-ই নয়, পুরুষ-নারীতেও ভেদাভেদ সরাতে পেরেছিলেন, এমনকি নারী সমাজকে বাধ্যতামূলক বৈধব্য থেকেও মুক্তি দিয়েছিলেন। ''বর্ষা ঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পর বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল, তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আদ্র হইয়াছিল, তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন কথা তুলিয়া দাঁড় হইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে এত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।''[৯]

বাঙালীর সমাজ-ধর্ম-আদর্শ-সাহিত্য-সমগ্র জীবন চেতনায় শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এরূপ চৈতন্যোদয় ইতিপূর্বে এবং পরবর্তীতেও (ব্যতিক্রম উনবিংশ শতাব্দী) আর একটি বারেও দেখা যায়নি কারো একক প্রচেষ্টায়।

কেবল সমাজেরই নয়, সাহিত্যেরও মুক্তি ঘটেছিল এসময়ই। রবীন্দ্রনাথের কথায়–

''বাংলাদেশ আপনাকে যথাযথভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। এই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা আলোক সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের যাহা এদেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। .....বৈষ্ণব এইরূপ ভেদের উপর সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেম প্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন।''[১০]

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে এইসময়ের সাহিত্যের **মানগত-ভাবগত-অন্তর্গত এমনকি পরিমাণগত পরিবর্তনে যথাথই ষোড়শ শতাব্দীকে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বা চৈতন্য রেনেসাঁস যায় বলা হয়।** চৈতন্য-পূর্ব যুগের বৈষ্ণব আখ্যান হিসাবে উল্লেখযোগ্য

জয়দেবর 'গীতগোবিন্দম্'[৫] বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', ঈশ্বরপুরীর 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত', বাংলায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য এবং অবশ্যই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখের অমূল্য পদাবলী। এঁদের রচনায় বা প্রাক্ চৈতন্য পর্বে অদ্বৈতমতের সমধিক প্রসারে বিষ্ণু দেবতা প্রাচীন বৈষ্ণব এবং লোকসমাজের কাছে মূলত 'বিশ্বম্ভর আশ্রয়'। 'কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবে এবং গোপাঙ্গনাদের ভক্তিভাবের ভূমিতে' পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিতা লালিত। চৈতন্য প্রভাবে **পদাবলী সাহিত্যে ভাবগত দিক দিয়ে** এক বিরাট পরিবর্তন আসে। দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার সম্প্রদায়; জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের কাব্যধারা; চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিভাব বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভক্তি পদাবলীকে ব্যক্তি ভাবনার উর্দ্ধে রোমান্টিকতা ও ধর্মাদর্শে মিশ্রিত করে মিষ্টিক করে তুলেছে। এইভাবেই পদাবলী সাহিত্যে স্বতন্ত্র্য এবং বহুমুখী বিস্তার এসেছে। চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলীকার গোবিন্দ দাস, জ্ঞানাদাস, বলরাম দাস, বাসু ঘোষ প্রমুখ এবং চৈতন্যোত্তর পদাবলীকার হিসাবে (সপ্তদশ-অষ্টদশ) ঘনশ্যাম দাস, মনোহর দাস, দীনবন্ধু দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রসের দিক দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কথা ছিল শুধুমাত্র শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে পঞ্চরস-শান্ত (প্রার্থনা), দাস্য (ভক্তিমূলক), সখ্য (গোষ্ঠ), বাৎসল্য (বাল্যশীলা) মধুর রস সম্বলিত হল।

পরিমাণগত দিক দিয়ে, বৈষ্ণব সাহিত্যে যুক্ত হল (১) চরিত সাহিত্য- চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত (২) কৃষ্ণলীলা কাব্য-রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ে আখ্যানধর্মী রচনা (৩) কড়চা প্রবন্ধ-বৃন্দাবনের বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্ব ও সাধনঘটিত পুস্তিকা।

এইভাবেই ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে জন-জাগরণ ঘটিয়েছিলেন চৈতন্যদেব এককভাবে, তাতে মানুষের আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বৌদ্ধিক বিকাশেরও এক উন্নত পরিণতি, ধর্মের মধ্যেও মানবিকতাবাদের এক সার্বিক উপস্থিতি এবং বাঙলা সাহিত্য ও এক সর্বশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, ঘটেছিল **চৈতন্য রেনেসাঁস।**

সহায়কগ্রন্থ সমূহ ঃ-

১. সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ৬৯; কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩.৪.৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; শ্রীমন্ত কুমার জানা।

৫.৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬.৯ সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. সাহিত্য, র.ব.প.ব দশমখণ্ড, পৃঃ ৩৬১।

বেগম রোকেয়া -
মুসলিম সমাজের এক আলোর দিশারী

- ডঃ শর্মিলা দাস

অধ্যাপিকা,শিমুরালি শচীনন্দন কলেজ অফ এডুকেশন

মুসলিম সমাজে নারীরা চির অবহেলিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ধর্মীয় গোঁড়ামির অজুহাতে অত্যাচারিত। সেই সমাজে আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বের এক নারীর অসামান্য অবদান এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। যিনি ধর্মীয় ভাবনাকে অবহেলা না করেও নারীর মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন সারা জীবন। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাঁর প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও শতকোটি প্রণাম।

অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ভারত তথা বাংলায় নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। এ অধিকার অর্জনের জন্য ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে বাংলায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজে নবজাগরণ শুরু হয়। সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং নারী মুক্তিই ছিল তার মুখ্য বিষয়। নারীদের শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। তবে দূর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম নারী সমাজ এই আলোর পরশ থেকে ছিল বঞ্চিত। ধর্মীয় বাধা নিষেধের নাগপাশে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে মুসলিম নারী সমাজ। মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অবমাননা থেকে নারীদের মুক্ত করে আলোর দিশা প্রথম দেখিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়েছিল তৎকালীন চূড়ান্ত রক্ষণশীল পরিবারে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হয়েও শিশু বয়স থেকে পর্দা প্রথা মানতে হত কঠোরভাবে। শুধু যে ছেলেদের সামনে বেরোনো মানা তা নয়, পরিবারের বাইরে মেয়েদের বেরোনো চলত না। ফলে এরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েদের পড়াশোনা করার প্রশ্নই উঠত না। তবে রোকেয়ার দাদা ইব্রাহিম সাবের তাকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করেন। দাদা ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। তিনি বোনকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত করে তোলে। কঠোর শাসন উপেক্ষা করে গভীর রাতে বাড়িতে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই সময় মোমের বাতি জ্বেলে ছোট্ট রোকেয়া পড়াশোনা করতেন দাদার কাছে। দাদার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধায় রোকেয়া লিখেছিল — " আমি আশৈশব তোমার স্নেহ সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমি হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয় - আমি কেবল তোমাকেই জানি।"

তৎকালীন সময়ের তুলনায় একটু বেশী বয়সে অর্থাৎ ষোল বছর বয়সে তার বিবাহ হয় আটত্রিশ বছরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। কিন্তু বয়সের ব্যবধান তাদের মনের ব্যবধান তৈরী করতে পারেনি। সাখাওয়াত ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। তার সাহচর্যে রোকেয়ার জীবনচর্চা ও শিক্ষা আরও সমৃদ্ধ হয়। তিনি তৎকালীন নব্য শিক্ষিত উদারপন্থী মুসলমানদের মতো স্ত্রীকে কিছু সীমাবদ্ধ সুযোগ দেন। তারই সুবাদে বেগম রোকেয়া হয়ে ওঠে নারী জগতের এক অনন্যা।

সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে মাত্র ১৪ বছর তিনি বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেন। স্বামীর সাহচর্যে ও উৎসাহে তিনি উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় সমৃদ্ধ হন। আবার সাখাওয়াতের আগ্রহে রোকেয়া তাকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়। ১৯০২ সালে রোকেয়ার সাহিত্য প্রকাশিত হয় - পিপাসা। এর পরে একে একে প্রকাশিত হলো উপন্যাস পদ্মরাগ, মতিচুর ও ইংরেজী ভাষায় রচিত কল্পবিজ্ঞান রচনা Sultana's Dream. এর সব রচনাতেই মূল সুর ছিল মেয়েদের শিক্ষিত হবার ডাক ও নতুন চিন্তাভাবনার প্রকাশ।

বেগম রোকেয়া তার 'সুগৃহিনী' রচনায় লিখেছেন - মুসলিম বা হিন্দু যে কোন মেয়েই তার মতে সুগৃহিনী হতে চায়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলে তা হওয়া যায় না। কারণ এক্ষেত্রে যে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক তা অনেক মেয়েদেরই নেই। সমাজে উচ্চশিক্ষা লাভকে তিনি আবশ্যক মনে করতেন না। মেয়েদের যেহেতু অর্থ উপার্জনের আবশ্যিকতা নেই, তাই তাদের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রয়োজন নেই, একথা সঠিক নয়। মেয়েদের বিশেষ বুদ্ধি ও শিক্ষা না থাকলে 'সুগৃহিনী'ও হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তার মহত্ব - পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া 'মানুষ' হওয়ার শিক্ষাকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের কাছে তাই তিনি পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা।

রাজা রামমোহন রায় চেয়েছিলেন মেয়েদের শিক্ষিত করে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ তৈরী করতে। যে সমাজে শিক্ষিত হলে মেয়েরা বিধবা হয় তা প্রচলিত আছে। তাঁর ভাবনার অপর দিক হল মেয়েরা শিক্ষিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হবে। কারণ প্রবাদ আছে - "মায়ের শিক্ষা আগে হলে, শিশু শেখে মায়ের কোলে।" রোকেয়া বেগমও এমতের পূজারী ছিলেন। তিনি মায়ের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তার মত ছিল - সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনো নিরক্ষর হয় না। তার মতাদর্শেরই অনুরণন দেখা যায় পরবর্তীকালে সাক্ষরতা অভিযান।

মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়নি। তার স্বামীর স্বপ্ন পূরণের জন্য এবং তারই গচ্ছিত অর্থ ব্যয়ে ভাগলপুরে প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। (১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর) কিন্তু সেখানে পারিবারিক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল-হ লেনের ছোট একটি বাড়িতে দ্বিতীয়বার মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যা আজও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল নামে খ্যাত। অসহায় মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিণত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

বেগম রোকেয়া আজ থেকে শতবর্ষের অধিক পূর্বে স্ত্রীলোকের সক্ষমতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ব্যতিরেকে যে স্বাধীনতা ভোগ হয় না তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ দেখান মহিলাদের। রোকেয়া এই চেতনা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী বিশেষ করে মুসলিম সমাজের কাছে। নারী জাগরণের শুরু যদি শিক্ষার মাধ্যম হয়, তবে নারী মুক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের মাধ্যমে - একথা মহামতি এঙ্গেলস 'পরিবার, ব্যক্তিগত, মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে সেই সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। তারই প্রতিফলন রোকেয়ার চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধিতে।

নারী শিক্ষা ও উপার্জনই নয়, সুস্থ সুন্দর দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নও দেখেছিল তিনি। সুস্থ সমাজ গঠনে দাম্পত্য সম্পর্ককে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। বর্তমান ভগ্নপ্রায় দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি এক উদাহরণ। এই সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য নয় দেশের ও দশের জন্যও প্রয়োজন কেননা এর ভিতের উপরই দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী প্রজন্ম। যা আমাদের ভবিষ্যৎ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বেগম তা বুঝেছিলেন, তাই তার এই অসামান্য ভাবনা।

বেগম রোকেয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু পরোক্ষভাবে সর্বতঃই স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯০৫ সালের ঈদের দিনে বাংলা তথা বাঙালীর জীবনে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন তিনি। তিনি উপলব্ধি করেন হিন্দু মুসলিমের মধ্যে একটা বিভেদ তৈরী হচ্ছে। তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে রোকেয়া লেখেন - "আজি আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। সমুদয় মুসলিম সমাজের সম্মিলনের দিন। ..... এমন ঈদের শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা ? ..... ভ্রাতৃবিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুন" (নবনূর, ১৩১২)। আবার মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চরকা কেটে প্রচুর পরিমাণে সুতো তৈরী করে খদ্দর তৈরী করতে সাহায্য করেছেন। বিলেতী দ্রব্য বয়কট সমিতির কর্মীরা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শুধুমাত্র নারীদের শিক্ষা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন তা নয়। দেশের দরিদ্র কৃষকদের সম্পর্কেও তার ভাবনা ছিল গঠনমূলক। তার মতে দেশের কৃষকদের দারিদ্রের মূল কারণ দেশীয় কুটির শিল্পের প্রতি অবহেলা এবং পরিশ্রমবিমুখতা ও অনুকরণপ্রিয়তা। কুটির শিল্পের ঐতিহ্যকে তিনি পুনর্জাগরিত করার জন্য লেখনী ধরেন, সৃষ্টি করেন 'চাষার দুক্ষু' এবং 'এন্ডি শিল্প' নামে দুটি প্রবন্ধ। সারাজীবন স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাপন করেও চাষীর দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তার এই মহানুভবতা আমাদের বিস্মিত করে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার. নারীর অধিকার রক্ষা, মুসলিমদের ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বহু প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সারা জীবন তিনি সোচ্চার হয়েছেন। কোন বাধার কাছেই তিনি মাথানত করেননি। এমনকি মৃত্যুর আগের দিন রাত ১১টা পর্যন্ত তিনি 'নারীর অধিকার' নামে তার সাধনা ও নারীমুক্তির স্বপ্ন নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা আজও মুসলিম সমাজে নারী মুক্তির দলিল রূপে খ্যাত।

তথ্যসূত্র ঃ -

১। ডঃ বিজিত ঘোষ — স্মরণীয় যারা, পুনশ্চ

২। কৃশান ভট্টাচার্য্য — নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রপথিক রোকেয়া, গণশক্তি, ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৫

৩। বনানী বিশ্বাস — অসামান্য বেগম রোকেয়া, গণশক্তি, ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৫।

নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে স্বামীজির ভাবনা

- তনুশ্রী নস্কর

রামমোহন রায় সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যখন সতীদাহ, বহুবিবাহ রদ করার জন্য লড়াই করছেন বিদ্যাসাগর তখন নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহকে সমাজে প্রবর্তন এর জন্য জীবনপাত করেছেন ; সেই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারক হতে চাননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন "সমাজ সংস্কার যাহারা চাই, তাহারা কোথায় ? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই ? অল্প সংখ্যক কয়েকটি লোকের কোন বিষয়ে দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা বুঝে নাই।" সমাজ সংস্কার বিরোধী না হলেও তাঁর মত - "এখন এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মতামত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই।" এ বিষয়ে তাঁর মতামত — "প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, তিনি বুঝেছিলেন - সমাজকে নতুন করে গড়তে গেলে প্রথমে লোকশক্তি গঠন করা দরকার আর এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোকশিক্ষা।

বিভিন্ন দেশ ও দেশের মানুষকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করা এই সন্ন্যাসী উপর উপর সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি — "স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ওদিকে নয়' - বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উহাকে দিয়া দাও। কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে।" কোন দেশ বা জাতি হঠাৎ করে একদিন উন্নত হয়ে ওঠে না। তাই আমরা কোন উন্নত জাতির আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে রাতারাতি উন্নত ও আধুনিক হয়ে উঠবো না কারণ "সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত শতাব্দীর অতি মৃদু ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলিরই গভীর অর্থ আছে।"

মাদ্রাজী ভক্তদিগকে লিখিত এক পত্রে তিনি আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন "আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্খা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব - যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক বা নারীই হউক - নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।" তিনি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কোন কিছু চাপিয়ে দিতে নয় — "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম" - আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। অতএব সমাজকে সংস্কার করার পেছনে স্বামীজির ছিল নিজস্ব উদারনৈতিক মতামত। স্ত্রীজাতির উন্নতির বিষয়টি তিনি সমগ্র জাতির উন্নতি রূপে বিবেচনা করেছিলেন "ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভবনা নাই।' একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই কারণে তিনি স্ত্রী শক্তির উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। আর এই উন্নতির একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। সেই কারণেই তিনি স্ত্রী মঠ স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন — " গঙ্গার ওপারে

একটা প্রকান্ড জমি লওয়া হইবে। তাহাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে আর বিধবা ব্রহ্মচারিনীরা থাকিবে। আর ভক্তিমতি গৃহস্থের মেয়েরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতে পাইবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকিবে না। পুরুষ মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর হইতে স্ত্রী মঠের কার্যভার চালাইবে। স্ত্রী মঠের মেয়েদের একটি স্কুল থাকিবে, তাহাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, এমনকি অল্প বিস্তর ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেবল "পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থুল বিষয়গুলিও শিখানো হইবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা - এইসব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকিবেই।" মঠ মানেই যে সেখানে সন্ন্যাসিনী হতে হবে এমনটি নয়। তাঁর ভাবনায় "যাহারা বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে এখানে থাকিতে পারিবে, তাহাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ হইতেই দেওয়া হইবে। যাহারা তাহা পারিবে না, তাহারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীরূপে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে।" মঠের শিক্ষায়িত্রী সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা "এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিনীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইবে।" "যাহারা চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহারাই কালে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হইয়া দাঁড়াইবে এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া মেয়েদের শিক্ষাবিস্তার যত্ন করিবে।" বিবাহের পক্ষপাতী হলেও তিনি বাল্যবিবাহ রদ করার পক্ষেই ছিলেন — "মেয়েপুরুষদের সকলেরই বেশি বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তাহা না হইলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হইবে।" "এই মঠে ৫/৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাহাদের বিবাহ দিতে পারিবে"। তিনি মনে করতেন "পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হইলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কীরূপে ? লেখাপড়া শিখিয়া একটু বয়স হইলে বিবাহ দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান সন্ততি জন্মাইবে, তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে।" এবং বিধবা নারীদের সমস্যা সমাধান সম্পর্কেও তার ধারণা এরূপ —" তোমাদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা, তাহার কারণ হইতেছে এই বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ কমিয়া গেলে বিধবার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে।" আসলে তিনি যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য মূল থেকে সমস্যাটিকে চিনতে চেষ্টা করেছিলেন সেই সময় সমগ্র জাতীয় অবনমনের পিছনে যে শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবা নারীদের সমষ্যাগুলি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল তা বুঝেই এই ধরণের সমাধানের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন।

মনু বলেছেন —

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রীয়া।।"

অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের - সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নারীরা অতীতে আবলা ছিল না। স্বামীজি প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী - প্রমুখ মহীয়সী নারীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সীতার মত সর্বংসহা নারীই পারে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। হিন্দু ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর — "বৈদিক যুগে, উপনিষদ এর যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী

প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্ম বিচারে ঋষি স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইসব আদর্শ স্থানীয়া মেয়েদের যখন আধ্যাত্ম জ্ঞানে অধিকার ছিল তখন, এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একাবর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন - "শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত, বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার।"

বর্তমানকালে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীতে যে জাগরণ ঘটেছে আজ থেকে শতাব্দীকাল আগে নারী সম্পর্ক বর্জিত সন্ন্যাসী হয়ে স্বামীজি সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাশ্চাত্য রমনীগণকে দেখে তিনি বুঝেছিলেন নারীরা হবে মুক্ত বিহঙ্গের মত। শিক্ষিতা নারী সমাজ উন্নতিতে কতটা প্রয়োজনীয় এবং তৎকালীন নানা প্রকার সমস্যায় জর্জরিত সমাজকে উন্নতভাবে গঠনের জন্য তিনি যে সকল উপায় বলেছিলেন তা সবই "আমূল সংস্কার" বা "প্রকৃত সংস্কার"। তাঁর মতে "মূল দেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশ উর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখন্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।

শিক্ষা নিকেতনে র‍্যাগিং - এর উৎস সন্ধানে

- অহীন্দ্র তরফদার

আমরা হামেশাই দেখতে ও শুনতে পাই বহু উচ্চ শিক্ষা নিকেতনে পুরাতন ছাত্র/ছাত্রীরা নবাগতদের মজা করার অজুহাতে র‍্যাগিং নামক এক পৈশাচিক আচরণ করে থাকে। যাহা কোন সভ্য দেশে ঐরকম আচরণ ভাবাই যায় না। অথচ আমাদের এ পোড়া দেশে ঐরকম পৈশাচিক আচরণ প্রায়ই ঘটেই থাকে। যার ফলে অনেক শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এমনকি শিক্ষাগ্রহণ স্তব্ধ হয়ে যায়!! কখনও কখনও জীবনহানিও ঘটে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে — এইরকম আচরণের হেতু কি ? যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আসে, তাহারা সকলেই মেধাবী ও অনেকেই বিত্তবান ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তবে কেন এইরকম আচরণ হয়ে থাকে ? প্রশ্নটা গভীরভাবে ভাবার বিষয়! একটু চিন্তা করলেই ইহার উৎস উৎঘাটন হবে। মনোবিজ্ঞান মতে — বৃক্ষ যেমন ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে নিহিত থাকে — তেমন এইরকম আচরণের নিশ্চয়ই নিগূঢ় কারণ আছে। আমরা বিজ্ঞানমতে জানি একটি ক্ষুদ্র কণা বা এ্যাটম থেকে ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক বোমা তৈরী হয়। যার দ্বারা প্রলয়ংকর ধ্বংস সাধন হয়ে থাকে। তেমনই আমাদের ছোট ছোট আচরণের মধ্যেই ধ্বংসাত্মক ক্রীয়া বর্তমান। আমরা প্রায়শই উপেক্ষা করি — যাহার প্রতিকারে বিমুখ হই বা অবহেলা করি। আমরা অনেকেই জানি টিভির পর্দায় রাম - রাবণের যুদ্ধ দেখে বহু শিশু তীর + ধনুক দ্বারা নিজেদের চক্ষু নষ্ট করেছে বা প্রকাশ্যে মুরগী নিধন দেখে কোন কোন শিশু সেই মুরগী নিধন অনুকরণে এক শিশু অপর শিশুর মুন্ডছেদ করেছে। এমন ঘটনা বিরূপ নয়। তাই প্রবীণ শিক্ষক হিসাবে — আমার অনুরোধ আমরা, অভিভাবকেরা বা গুরুজনরা নিজেদের আচরণ সতর্ক করে শিশুদের আচরণ পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবে। প্রতিটি কাজের প্রতিক্রিয়া আছে। জল যেমন বিশুদ্ধ বা ফিল্টার করে পান করি সেই রূপ আমাদের আচরণও পরিশুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। সিনেমা - থিয়েটার - টিভি সিরিয়াল প্রতিটি প্রচার মাধ্যমই জনশিক্ষার মাধ্যম। তাই গুরুজনদের এবং আমাদের সরকারকে দেশের / সমাজের মঙ্গলার্থে হুঁশিয়ার হবার দাবী রাখি। দেশের সেনসর বোর্ড কঠোরভাবে — সুবিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে সরকারকে সচেতনভাবে কঠোর হতেই হবে। আমরা প্রায়শই দেখি প্রচার মাধ্যম নগ্ন নারী চিত্র বা টিভি / সিনেমায় হিংস্র ও প্রতিক্রিয়া পরায়ণ কার্যকলাপ যাহা মানুষের মনে বিশেষ করে — শিশু মনে বিরাট ছাপ পড়ে যাহা পরবর্তীকালে বিরাট রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। ছোটবেলায় অনেক শিশুই ফড়িং ধরে ডানা ছিঁড়ে বা নানা ভাবে কষ্ট দেয় এবং কুকুর / বিড়ালকে অকারণে নানাভাবে কষ্ট দেয়। ব্যাঙ দেখলেই ইঁট দিয়ে থেতলে মেড়ে আনন্দ উপভোগ করে — এইসবই হিংস্রতার অনুশীলন। বড়দের হুঁশিয়ার হতে হবে, বন্ধ করতে হবে।

আমরা পরিবারে প্রায়শই দেখি দাদু— একটি শিশুকে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি দিয়ে মুখ ঘষে দেয় আর শিশুর কোমল ত্বকে যন্ত্রণা হয়। সে তারস্বরে কাঁদে আর দাদু আনন্দে

উৎফুল-তা বোধ করেন। দাদুর কান্ডজ্ঞানই নেই — যে শিশুটার কষ্ট হচ্ছে। পরপীড়ন করে নিজের আনন্দ উপভোগ করা মহা অপরাধ — অমার্জনীয় অপরাধ। আবার দেখি আদিমকাল থেকেই ষাঁড়ের লড়াই বা মুরগী লড়াই দেখে আমরা পরম আনন্দ উপভোগ করি। এগুলিও হিংস্র আচরণের অনুশীলন মাত্র, বর্বরতার নামান্তর মাত্র। ইহাও ছোট / বড় সকলের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে থাকে। শুরু থেকেই এসব বন্ধ করতে হবে ঐসব নিষ্ঠুর আচরণ যাহা ভবিষ্যতে প্রকট রূপে দেখা দেবে। তাই বলি আসুন আমরা প্রেম - প্রীতি - সহানুভূতি - পরসেবা - পরোপকার প্রভৃতি সৎকাজের অনুশীলন করি। তবেই আমাদের দেশ - সমাজ সুন্দর ও শান্তির হয়ে উঠবে। যুদ্ধ চাই না — শান্তি চাই মুখে বললেই হবে না। অনুশীলন করতে হবে। আমাদের ব্যক্তিজীবনে যেমন একজন ব্যায়ামবীর অনুশীলন দ্বারাই সেরা, বিশ্বসেরা হয়। আমরাও ভাল কাজ ও ভাল চিন্তার অনুশীলন শুরু করি। তবেই নিজেও সুখ শান্তি পাব — অপরেও পাবে। সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে।

তাই তো যুগ যুগ ধরে বুদ্ধদেব - যীশু - বিবেকানন্দ আমাদের সচেতন করে গেছেন। অহিংসাই পরম ধর্ম / সেবাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আসুন সকলে তাঁদের কথা স্মরণ - মনন ও আচরণে ব্রতী হই শিশুদের কাছে তাঁদের কথা বারবার আলোচনা করি - জাগিয়ে তুলি। পরিশেষে বলি যে, অভিভাবক + শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সরকার একত্রে এই পৈশাচিক কার্যকলাপ নির্মূল করতে সচেষ্ট হতে প্রস্তাব রাখি।

সবাই ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকব। কারণ আমরা সমাজবদ্ধ জীব পরস্পরের সহানুভূতি ব্যতিরেকে কেহ শান্তিতে বাস করতে পারে না। সকলে শান্তিতে থাকুক। ভাল থাকুক, এই আশা করি।

বাংলা সাহিত্যের বিপর্যস্ত সময়ে কবিগান ঃ সেকাল থেকে একাল

- সোমনাথ সোম

বাংলা সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা কবিগান। সুবিশাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাত্র সাত বছরের অতি ক্ষীণ পরমায়ু নিয়ে এক বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবিয়াল বা কবিওয়ালাগণ। নিছক সাহিত্য সৃষ্টি নয়, লোকের অবসর মনোরঞ্জনই ছিল কবিওয়ালাদের উদ্দেশ্য। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর - এর মৃত্যুর পর (আনুঃ ১৭৬০ খ্রিঃ) থেকে ১৮৬০ খ্রিঃ দীর্ঘ একশত বছরের বাংলা সাহিত্যের বিশালায়াতন শূণ্যতার প্রেক্ষাপটে কবিগানই প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা কাব্যে মধ্যযুগীয় কার্বাদর্শ পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৭৬০ খ্রিঃ থেকে ১৮৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যে 'ক্রান্তিকাল' হিসাবে ধরা হয়। এই বিশেষ যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রকৃত পরিচয় বিধৃত আছে কবিওয়ালাদের কবিগান রচনার প্রচেষ্টায়। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রিঃ গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলীর আগমন পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নীতিভ্রষ্ট জীবনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। এ সময়ে বাংলায় যে রাজনৈতিক খেলা চলছিল সমকালীন সাহিত্যে তার প্রভাব কোন অংশে কম ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি পুরো শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত না করলেও বাংলার শাসকগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শাসন - শোষণ, অত্যাচার, দেশীয় কর্মচারীর বদলে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে নেমে এসেছিল এক নিদারুণ আঘাত। ব্যবসা - বাণিজ্য, দেশীয় শিল্পের বিনষ্টি, রায়তেরা পরিণত হয় ভূমিহীন কৃষকে। এ পরিস্থিতির সুযোগে মুৎসুদ্দি, গোমস্তার দল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে উৎকোচের বিনিময়ে রাতারাতি জমিদার বনে যায়।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রুজি - রোজগারের প্রয়োজনে বাঙালি হিন্দুর দল নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিজেদেরকে তারা ব্রিটিশের সহযোগি করে তোলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তার উপর আবার ভারতীয়দের বাদ দিয়ে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে দুর্ভোগ নেমে আসে। নবগঠিত কোলকাতা বাংলার ব্যবসা - বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে উঠলে এক শ্রেণির অশিক্ষিত, প্রায় মূর্খ, হঠাৎ বড়োলোক হওয়া লোক কলকাতা ও গ্রামবাংলার মানুষের হর্তা - কর্তা - বিধাতা হয়ে ওঠে। সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। বাংলার সমাজ মনে বাসা বাঁধে নীচতা, ষড়যন্ত্র, মত্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা। সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফলে নীতি, আদর্শ, মনুষ্যত্ব হয় পদদলিত।

নবগঠিত কলকাতায় হঠাৎ বড়লোক হওয়া প্রায় মূর্খ 'বাবু' নামক এক শ্রেণির মানুষের উদ্ভব হয়। এ সম্পর্কে "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন — "এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থাদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণির মানুষ দেখা দিয়েছিল। তাহারা পারসি ও স্বল্প ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগে সুখেই দিন কাটাইত। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ - আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ - প্রমোদ করিয়া কাটাইত।"

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। .... তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুইদন্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত। তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।" এমনই বিকৃত অসুস্থ পরিবেশে বঙ্গদেশে কবিওয়ালাগণের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোকবর্তিকা যখন নিভু নিভু করছিল, এমনই প্রেক্ষাপটে কবিয়ালগণ কাব্যচর্চাকে পেশাদার বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তাকে কদর্য যৌনরুচি, হালকা ভাবের প্রলেপ দিয়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে দৈন্যদশার ছাপ লাগিয়ে দিলেন। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভার অর্পিত হল ভাগীরথী তীরবর্তী কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের নবগঠিত সমাজের উপর।

হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সুবিশাল বাংলা সাহিত্য জগতে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধারা প্রবহমান। বৈষ্ণব পদাবলি, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল,অনুবাদ সাহিত্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের যে বৈচিত্র্যময় স্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি, সপ্তদশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ধারা শুকিয়ে গেলেও অষ্টাদশ শতকে ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের রচনার গুণে বাংলা সাহিত্যের কৌলিণ্য আবার ফিরে আসে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কালকে বাংলা সাহিত্যে 'যুগসন্ধিকাল' বলা হয়। কবিগান বাংলা সাহিত্যের এই 'যুগসন্ধিকালে'রই ফসল।

কবিগানের বিষয়বস্তু একেবারে সাধারণ স্তরের। কবিগান একইসঙ্গে গ্রাম্য ও নাগরিক শিল্প। কবিগানের বিস্তার শহরে হলেও এর উৎস কিন্তু গ্রামবাংলা। কবিগানের রচনাকার মূলতঃ অশিক্ষিত অন্তজ সম্প্রদায়, কখনও সুশিক্ষিত ও ভদ্রলোক। কবিগানের বিষয়বস্তু মূলতঃ দেবদেবী নির্ভর। তবে পলি-র মন ও পরিবেশ দেবদেবী নির্ভর এই গানে লঘুতা ও রঙ্গব্যঙ্গের সুর আগমনী করেছিল। বাস্তব জীবন সমস্যাও ছিল এই গানের অন্যতম উপাদান। কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় যে সমস্ত কবিওয়ালা ও কবিগান সংগ্রহ করেন তাতে তিনি দেখান যে কবিগান মূলতঃ পঞ্চাঙ্গ ভবানীবিষয়ক, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড় ও লহর। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' গ্রন্থে কবিগানের

বিষয়বস্তুকে এইভাবে ভাগ করেছেন — ১) সখীসংবাদ — গোষ্ঠ গৌরচন্দ্রী, ২) মালসী - ডাকমালসী - লহরমালসী, ৩) তরজা, ৪) খেউড়, ৫) আখরাই। ব্রজসুন্দর সান্যাল ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় 'কবির ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট করে দেখান যে, কবিগান এইভাবে বিন্যস্ত — ১) মালসী ২) গৌরচন্দ্রী ৩) সখীসংবাদ ৪) গোষ্ঠ ৫) খেউড় বা কবি। কবিগানের বিশেষ দুটি পর্যায় খেউড় ও লহর শুনবার জন্য সতবেত শ্রোতা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত। কারণ এই দুটি পর্যায় অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। কবিগানের গোড়া থেকে বাদীপক্ষ ও প্রতিবাদী পক্ষের মধ্যে যে উত্তর - প্রত্যুত্তরমূলক নাটকীয়তা থাকত এই খেউড় পর্যায়ে পুরাণের আড়ালে নানা অলৌকিক কাহিনীর আদি রসাত্মক কচকচানি আমদানি করত। শ্রোতাদের বেশিরভাগ অংশই এই গান শুণে বাহবা দিতেন। কবিগান যে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট তা এই খেউড় পর্যায়ের জন্য। খেউড় গানের আদিরসাত্মক অবাচ্য - কুবাচ্য রং তামাশার আক্ষরিক অর্থ কুরুচিকর। একটি নিম্নরূপ ঃ

জোড়াসাঁকো দলের খেউড় (১ম উত্তর)

মাগ বলে, আমার একি দায়, সুপাদ গোছালে
মস্তরাম বাবাজি হয়ে, আমাদের চাও করতে বিয়ে,
তোমার সোহাগিনী বোন ফেলে। .....
আমি যৌনবতী, নবীনে যুবতী, একি জ্বালা হলো,
কথা কওয়ালে আজ কোন্ ছলে।

জোড়াসাঁকো দলের খেউড় (২য় উত্তর)

তুম্ব নাড়া রোগ, বিষম রোগা স্বভাব গেল না।
তিলক কুতলি ঝুলি ধরে, তুলসীতলায় বেড়াও ঘুরে,
তোমার বোনমেগো নাম ঘুচলো না ॥
যা বল তা বল আমায় বেজায় হবো না,
এই আপশোষ, তোমার বোনের দোষ,
দেখেও দেখলে না।
পেট্‌কো মুলুকচাঁদ, পেতে ফাঁদ, বোনকে কলে- বশ।
জেলের হাঁড়ি, সেই কড়ে রাঁড়ী, জানে কত রস।
বকা ধার্ম্মিক হবে, রয়েছ বসিয়ে, ঘরে মজা মেরে,
তুমি ধর্ম্ম পানে চাইলে না।

কবিগানের শেষ পর্যায় লহর - এর অর্থ হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ, রংতামাশা। পরস্পর ব্যক্তিগত আক্রমণ, বাদানুবাদ, অমার্জিত গালাগালি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবির লড়াইয়ে জয় পরাজয় নির্ধারণ হত। রাম বসু রচিত একটি লহরের অংশে কবিয়াল হরু ঠাকুরও তাঁর শিষ্য ভোলা ময়রাকে নিম্নোক্ত ভাষায় গালির খোঁচা দেন —

১ চিতান ।। সকল ভুন্ডু কান্ড ভোলা তোর, তুই পাষন্ড নচ্ছার।
১ পরচিতান।। ভজিস ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর অবতার।
১ ফুকা ।। কিসে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস না সুক্ষ্ম ও মূর্খ দিস কোন্ ঠাকুরের ঠেস্ ?
মেলতা ।। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে করিস পচা ভুর।
মহড়া ।। সে হরি কি তোর হরু ঠাকুর ।।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে কবির লড়াই প্রচলিত। একবার রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকবি কালিদাস ও কবি দন্ডীর কবিত্বশক্তি পরীক্ষা করার জন্য সামনে পড়ে থাকা একটি গাছের গুড়িকে দেখিয়ে এর বর্ণনা করতে বললেন। দন্ডী বললেন — "শুষ্কং কাষ্ঠং তষ্টিত্যাগ্রে।" একই জিনিষ দেখে মহাকবি কালিদাস বললেন — "নীরস তরুবরঃ পুরতো ভাতি।" মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল। বাংলার সেন রাজাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় কবি জয়দেব, ধোয়ি, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য প্রমুখ কবিদের মধ্যে কবিতার বাগযুদ্ধ চলত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র - এর রাজসভায় শাক্তকবি রামপ্রসাদ সেন ও বৈষ্ণব আজু গোঁসাই - এর বাগযুদ্ধের কথা সকলেরই জানা।

সেই প্রাচীন কবিতাশ্রয়ী বাগযুদ্ধের পরম্পরা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলায় কবিগান রূপে দেখা দিয়েছিল। এই সময়পর্বে আবির্ভূত কবির দল নিজেরা মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং নিজেরা দল তৈরী করে মানুষের কাছে তা পরিবেশন করতেন। এদের বলা হত কবিয়াল বা কবিওয়ালা। আবার একদল কবি ছিলেন যারা শুধু গান রচনা করতেন কিন্তু তাদের কোনো কবির দল ছিল না। এদের বলা হত 'দোহার' বা 'বাঁধনদার'।

কবিগান বা কবির লড়াই ছিল সে যুগের লোকের মনোরঞ্জন সাধনের আসর। নানারকম সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, দোল, মেলা, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কবিগানের আসর বসতো। এছাড়া যে সময়ে অভিজাত ব্যক্তিদের বাড়িতেও কবির লড়াই -এর আসর বসতো। অন্তত দুটি কবির দল সেখানে নিমন্ত্রিত হতো। আসর বসতো যাত্রাগানের মতো খোলা জায়গায়। কখনও বা শামিয়ানা খাটিয়ে। কবিগানের আসরের চারপাশে ঘিরে থাকতো শ্রোতারা। যার বাড়িতে আসর বসতো তিনি অথবা গণ্যমান্য কেউ কোনো একটা বিষয় প্রস্তাব করতো। দুই কবির দলের একজন পক্ষে ও অন্যদল বিপক্ষে বলতেন। প্রথমে প্রথমে একজন উঠে দাঁড়িয়ে গাইতেন এবং শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কবি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ও যুক্তি খন্ডন করে নিজের পক্ষের সমর্থনে গান গাইতেন। এমনও হতো যে, একজন কবি কোন একটা সমস্যা উপস্থিত করে সমাধান করার জন্য অপরকে গানের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করতেন। উত্তর - প্রত্যুত্তর গানের মাধ্যমেই হতো। এই উত্তর - প্রত্যুত্তরকে বলা হত 'চাপান' ও 'উতোর'। এই চাপান - উতোরের মাধ্যমেই আসরে কবির দলের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতো। কবির লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্তের ভার থাকত পুরোপুরি

শ্রোতাদের উপর।

কবিগানের মূল লক্ষ্যই ছিল আসরে উপস্থিত শ্রোতার মানসিক মনোরঞ্জন ও নিজ দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, তাই ভাবরুচির সুক্ষ্মতার চেয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রোতার রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী কবিতা রচনা করা। তাই কখনও কখনও আসল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাঁরা পরস্পর ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন যা অত্যন্ত অশ্লীল ও কুরুচিকর। কিন্তু কবির লড়াইয়ে এই ব্যক্তিগত আক্রমণ শ্রোতাদের মধ্যে কৌতুহল ও উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতো। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতো যে দুই কবিয়াল আসরে পরস্পর অতি গোপনে পরস্পরের চাপান ও উতোর জেনে নিয়ে সেইমতো আসরে গান পরিবেশন করতেন। এরকম কবিগানকে বলা হতো 'বাঁধুটি'। যখন দুই কবিয়াল আসরে নেমে পরস্পর তাৎক্ষণিকভাবে চাপান ও উতোর গাইতেন তাকে বলা হতো 'উপস্থিতি'। আমাদের অনুমান, 'বাঁধুটি'ই ছিল কবিগানের পূর্বরূপ। পরবর্তীকালে প্রতিভাবান কবিদের আগমনে তা রূপান্তরিত হয় 'উপস্থিতি'তে।

কবিয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ অভিজাত শ্রেণির লোক হলেও বেশিরভাগ ছিলেন সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা গ্রাম্য মানুষ। কবিয়ালদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন বিশিষ্ট কবি প্রতিভার অধিকারী। আবার এদের শিষ্যরাও হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান।

গোঁজলা গুঁই ঃ - গোঁজলা গুঁই - এর পূর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষে কবিগানের অস্তিত্ব থাকলেও প্রামাণিকতার অভাবে গোঁজলা গুঁইকেই কবিগানের আদিগুরু হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। তিনি ১৭০৪ খ্রিঃ থেকে ১৭১৪ খ্রিঃ জীবিত ছিলেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবি গানের যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে বোঝা যায় তাঁর গান থেকেই বাংলায় কবিগানের সূচনা। গোঁজলা গুঁই - এর তিনজন শিষ্য রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল ও রামজী দাস কবিয়াল হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত সংগৃহীত গোঁজলা গুঁই - এর একটি গান —

এসো এসো চাঁদ্ বদনি।
এ রসে নিরসো করো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতনমণি
তোমাতে আমাতে একই কায়া আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।।

লালু নন্দলাল ঃ - লালু নন্দলাল ছিলেন গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য। ১৭৭৪ খ্রিঃ দিকে তিনি জীবিত ছিলেন এবং গান রচনা করেছিলেন। নিতাই দাস বৈরাগী ছিলেন লালু নন্দলালের শিষ্য। কবির একটি মাত্র গান পাওয়া গেছে। গানটিতে ''ডুবেছি না ডুবে দেখি পাতালো কতদূর'' — এ উক্তি প্রশংসা দাবি রাখে।

রঘুনাথ দাস ঃ - গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য রঘুনাথ দাস ১৭২৫ - ১৭৯০ খ্রিঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন। হরুঠাকুর, রাসু নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন তাঁর শিষ্য। রঘুনাথ দাস রচিত একটি খেউড়ের অংশবিশেষ নমুনা দেওয়া গেল —

শুন ওরে মুনির সন্তান, দেবতাগণের সভাতে হয়েছে বদনাম,
তাই আবালবৃদ্ধ নারী সবে দিচ্ছে টিটকারী,
দোলাতে তিন পতি তায় একটি নারী।
.....
সে দুনিয়াতে মুনি রাজা যেতে পাচ্ছে কি।
এ কথাটা বল আমায় তোমায় জিজ্ঞাসা ।।

রামজী দাস ঃ - গোঁজলা গুঁই - এর আরেক শিষ্য রামজী দাস। ভবানী বেনে ছিলেন রামজী দাসের শিষ্য। রামজী দাস রচিত লহর পর্যায়ের একটি গানের অংশবিশেষ নমুনা নিচে দেওয়া হল ঃ —

শুন ভাগিনা ভীমে, কথা মোর কই তোমার স্থানে
জেনে শুনে তোর মামি এমন হয় কেনে,
শাঁখা পড়িতে সাধ, সদাই করেন বাদ,
আমার দিবানিশি করে পরমাদ,
আজ শাঁখার জন্য বিনয় ধরেছে সে আমার পায়,
আমার হলো একি দায় তোর চাষা মামি শাঁখা চায়।।

রাসু - নৃসিংহ ঃ - চন্দননগরের গোন্দলপাড়া ১৭৩৫ খ্রিঃ রাসু এবং ১৭৩৮ খ্রিঃ নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এই ভ্রাতৃদ্বয় নিজের কবির দল তৈরী কলকাতার ধনিগৃহে সখীসংবাদ ও বিরহের গান শুনিয়ে একইসাথে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ১৮০৭ খ্রিঃ রাসু ও অল্পকাল পরে নৃসিংহ পরলোক গমন করেন। রাসু - নৃসিংহ রচিত সখীসংবাদ পর্যায়ের একটি গান —

প্রাণনাথো মোর সেজেছে শঙ্করো, দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে,
অপরূপো দরশনো আজ প্রভাতে ।।
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।
পার্ব্বতীনাথেরো অধশশ ধরো সবিতা অর্ধ কপালেতে,
আমারো নাগরো সেজেছেন সুন্দরো চন্দনো সিন্দূরো
ভালেতে।

তাঁরা প্রেমানুরাগকে কবিওয়ালাদের ইতর কচকচি থেকে উদ্ধার করে হৃদয়াবেগকে সমুন্নত আদর্শলোকে স্থাপন করেছেন।

হরুঠাকুর ঃ - কলকাতার শিমুলিয়ায় ব্রাহ্মণ বংশে ১৭৩৮ খ্রিঃ হরুঠাকুরের জন্ম। তাঁর আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (দিঘাড়ী)। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। হরুঠাকুর সখীসংবাদ, ভবানী বিষয়ক, বিরহ, খেউড় ও লহর বিষয়ে গান রচনা করলেও খেউড় ও লহর গানের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন রচনাকার, সুরকার, সুরশিল্পী ও গায়ক। হরুঠাকুরের তিন শিষ্য — নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলা ময়রা পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হরুঠাকুর ছিলেন তৎকালীন কবিওয়ালাদের কাছে গুরুস্থানীয়। হরুঠাকুর রচিত নির্বেদ

বৈরাগ্যের এই গানটি একদা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

হরিনাম লইতে অলসো করো না, রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি ঢেউ দেখে লা ডুবাবে ॥

নিতাইদাস বৈরাগী ঃ - নিতাই দাসের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। চন্দননগরের বৈষ্ণব বংশে ১৭৫১-৫২ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। জনসমাজে তিনি নিতে বৈরাগী নামে খ্যাত। দক্ষ কবিওয়ালা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করলেও রচনাকার হিসাবে ততটা পারদর্শী ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত নবাই ঠাকুর ও কলকাতার সিমলাবাসী গৌর কবিরাজের কাছ থেকে গান তৈরি করে নিতেন। নিতাই কবিরাজের রচনা দু' একটি গানে উলে-খ করা হল —

"যে কালে সলিলে বটপত্রে ভাসেন শ্রীপতি।
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতি।"

"কহ দেখি সখি রাধারে কেন, 'মা রাধা' কেউ বলে না।
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে, জড়তা হয় রসনা।"

১৮২১-২২ খ্রিঃ নিতাইদাস কাসিমবাজারের রাজবাড়িতে কবিগানের আসরে অসুস্থ হয়ে প্রায় সত্তর বছর বয়সে মারা যান।

ভবানী বেনে ঃ - তিনি ছিলেন রামজী দাসের শিষ্য। বর্ধমানে জেলার অম্বিকা-কালনায় জন্ম হলেও কলকাতার বরাহনগরে এসে বসবাস করেন। কবির দল তৈরী করে তিনি অর্থ ও খ্যাতি দুই লাভ করেন। কবিয়াল নিতে বৈরাগী ও ভবানী বেনের কবির লড়াই সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কেষ্টা মুচি ঃ - প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। কেষ্টা মুচি ছিলেন কবিয়াল লালু নন্দলালের সমসাময়িক। কবি হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। কেষ্টামুচি অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত হলেও উচ্চ সমাজের অনেক লোকই তাঁর গান শুনতে পছন্দ করতেন।

রাম বসু ঃ - রামমোহন বসু বা রাম বসু অল্প বয়স থেকেই কবিগান রচনায় মনোযোগী হয়। তিনি ছিলেন পুরাতন যুগের শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রতিনিধি। রাম বসু কবি হিসাবে ছিলেন আধুনিক মানসিকতার লালিত এবং তাঁর কবিগানে পাওয়া যায় আধুনিক জীবনের স্পর্শ। মানবমুখী বাস্তবতা ছিল তাঁর কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ে শালিখা গ্রামে ১৭৮৬ খ্রিঃ কায়স্ত বংশে রামবসুর জন্ম। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খ্রিঃ খ্যাতিমান কবির অকালমৃত্যু হয়।

নায়কের বিরহ - বঞ্চনা ও প্রত্যাখ্যানে নায়িকার আর্তিই হচ্ছে রাম বসুর গানের মূল সুর। নিচে তাঁর গানের একটি নমুনা তুলে ধরা হল —

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।

মরমে মরমে কথা কওয়া গেল না।

রাম বসু আসরে বসেই উত্তর - প্রত্যুত্তর দেওয়ার রীতি চালু করে কবিগানের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। রাম বসু রচিত লহরের একটি অংশ নিচে দেওয়া হল —

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ এক্‌টিন॥
যেমন ঢাকের পীঠে বায়া থাকে বাজে না ক একটি দিন।।
.....
তেমনি শ্রীছাঁদ, এই পেটকো মুলুকচাঁদ তরেন রামপ্রসাদ
ধরেন কৃষ্ণপ্রসাদ
যেমন জন্মে কভু হাত পোড়ে না দোলে লবেদার আস্তিন।।

ভোলা ময়রা ঃ - ভোলা ময়রার প্রকৃত নাম ভোলানাথ নায়ক। তাঁর জাতিগত বৃত্তি ছিল মিষ্টান্ন তৈরি করা। কলকাতার বাগবাজরের কাছে তাঁর পিতার যে মিষ্টান্নের দোকান ছিল, সেই দোকান তিনি চালাতেন। ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায় তাঁর জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শেখেন এবং অল্প বয়সেই কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষত প্রতিপক্ষের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে চটকদারী জবাবের জন্য ভোলা ময়রার জুড়ি মেলা ভার। তীক্ষ্ণ রসবোধ ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। ভোলা ময়রা ছিলেন হরু ঠাকুরের শিষ্য। ভোলা ময়রা ৭০ - ৭২ বছরে বয়সে দেহত্যাগ করেন।

যজ্ঞেশ্বরী ঃ - তিনি মহিলা কবিয়াল হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নিজে কবির দল তৈরি করে কবিওয়ালাদের সঙ্গে রীতিমতো কবির লড়াই করতেন। তিনি ছিলেন কবি প্রতিভার অধিকারিনী। তার গানে নারীর মনোবেদনা অত্যন্ত সাবলীলভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ঃ - সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৬ - ৩৭ খ্রিঃ মারা যান। তিনি জাতিতে ছিলেন পোর্তুগীজ খ্রিষ্টান। সৌখিন কবিওয়ালায় পরিণত হন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সময়ে এক বিশেষ যুগে কবিগান শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ইতর, ভদ্র সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় - চতুর্থ দশক পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় কবিগানের বিশেষ সমাদর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতার শিক্ষিত মহলে কবিগানের জনপ্রিয়তা একটু একটু করে কমতে থাকে। তখন কবিওয়ালারা নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। যশোহরের রামমোহন দাস, কালীচরণ দাস, অক্ষয়দাস বৈরাগী, আনন্দ সরকার, পঞ্চানন দত্ত, বীরভূমের বলহরি রায়, কৈলাস ঘটক, সৃষ্টিধর ঠাকুর, বামাই ঠাকুর, চাকর যুগী, সারদা ভান্ডারী, ময়মনসিংহের লোচন কর্মকার, হারাইল বিশ্বাস, লালমাসুদ, রামগতি, রামকানাই, রাম সরকার, তারাচাঁদ, ঢাকার প্রাণকৃষ্ণ, কৈলাসচন্দ্র, হরিমোহন আচার্য প্রমুখ কবিওয়ালারা কবির দল তৈরি করে কবিগানের লোকধর্ম

বজায় রেখেছেন। বারাসাতের মহেশকানা নামে এক জন্মান্ধ কবিওয়ালা কবিগান রচনা করে ঈষৎ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে নবযুগের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবলতার ফলেও আধুনিককালে কোন কোন লোক কবি কবিগানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। চট্টগ্রামের রমেশ শীল, মুর্শিদাবাদের শেখ গোম্‌হানী দেওয়ান, শ্রীহট্টের প্রসন্ন কুমার, ফণীন্দ্র চন্দ্র দাস, চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত পাঁচখাইন নামক গ্রামে ১৯১৫ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করে উত্তরকালে অবিভক্ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিয়ালদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। ২০০১ সালে ফণী বড়ুয়ার জীবনাবসান হয়। এছাড়াও আরও কয়েকজন কবিয়াল - এর নাম করা যায় যাঁরা কবিগান রচনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা হলেন বলহরি রায় (১৮৪৩ - ১৮৪৯), শম্ভুনাথ মন্ডল (১৭৭৩ - ১৮৩৩), তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫ - ১৯১৪), হরিচরণ আচার্য (১৮৬১ - ১৯৪১), রমেশচন্দ্র মীল (১৮৭৭ - ১৯৬৭), রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২ - ১৯৭৪), নিশিকান্ত রায়সরকার, বীরভূমের কবি লম্বোদর চক্রবর্তী।

আধুনিক যুগের বিচ্ছেদী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা, সুরকার, গায়ক কবিয়াল বিজয় সরকার। কবিয়াল বিজয় সরকার অখন্ড যশোহর জেলার বর্তমান নড়াইল জেলার সদর থানা বর্তমান সদর উপজেলার ডুমরি গ্রামে ১৯০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালের ৬ নভেম্বর ভারতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবিয়াল বিজয় সরকারের কয়েকটি অসম্ভব জনপ্রিয় গান হলো —

১. পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে
২. এই পৃথিবী যেমন আছে তেমনই ঠিক রবে
৩. নকশি কাঁথার মাঠে রে আজও কাঁদে রূপাই মিয়ার বাঁশের বাঁশি
৪. শুধু পাষাণ নয় এই তাজমহলের পাথর
৫. আমায় পাগল পাগল করেছে কালার বাঁশিতে।

বর্তমানে বাংলার অবলুপ্ত প্রায় এক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন কবিয়াল অসীম সরকার ও অমল সরকার এবং তার সম্প্রদায়।

কবিওয়ালাগণ মুখে মুখে কবিতা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই এগুলি লিখে রাখেননি। লক্ষ্যণীয় যে, ঐ সময় কোন ছাপাখানাও ছিল না। তাছাড়াও তাদের সমর্থক কিংবা পৃষ্ঠপোষকগণও কখনো কবিগান সংগ্রহ করার কথা ভাবেননি। তৎকালীন সমাজজীবনে উৎসব -আনন্দের প্রয়োজনে কবিগানের আসর বসতো। এবং এ আসর বসার মাঝেই ছিল কবিগানের সার্থকতা ও সফলতা।

ঐতিহাসিক সুশীলকুমার দে কবিগানকে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয় রূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে কবিওয়ালাদের তিনি প্রশংসাই করেছেন। তাঁর মতে, এঁরা ছিলেন সমাজের নিচু তলার মানুষ। সমাজের নিচু তলার মানুষদের মধ্যেই ছিল এঁদের জন্ম ও বিচরণ। তাই এই সমাজের চিন্তাভাবনা অনুভূতিগুলি তাঁরা ভালই বুঝতেন। আধুনিক সাহিত্যকারগণ

সমাজের যে অংশকে অশিক্ষিত মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, সেই অংশে এঁদের জনপ্রিয়তা ছিল অবিসংবাদী।

কবিগানে অবক্ষয়ের চেহারা স্পষ্ট। এই অবক্ষয় ঐতিহাসিক সত্য। কবিওয়ালাগণ এক বিপর্যস্ত সময়ে বাংলা কাব্য কবিতার অস্তিত্ব সংকটকে বহন করে আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস কবিগানে না পাওয়া গেলেও এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে তাঁরা যা কিছু রচনা করেছিলেন বা গেয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের অন্তত একশ বছর সময়কে শূণ্যতার হাত থেকে বাঁচিয়ে পরবর্তী যুগের সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করেছে তা কোন অংশেই কম নয়। নিছক মধ্যযুগীয় কাব্য - ঐতিহ্য অনুসরণ নয়, কবিগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক মানবিকতাবোধ। কবিগানের ভাষায় কুশ্রিতা থাকলেও দেব - দেবী বন্দনামুক্ত মর্ত্য মানব - মানবীর মান - অভিমান, জ্বালা - যন্ত্রণা প্রকাশের মধ্যে যে ব্যক্তি চেতনার প্রকাশ, তাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একুশ শতকের চলার পথে বাংলার অজ - পাড়াগাঁয়ে এমনকি শহুরে মঞ্চেও কবিগানের আসর বসে। তবে জনপ্রিয়তা বিলীয়মান। তবে একতা অস্বীকার করা যায় না যে, কবিগানের অস্তিত্বের সংকটের মাঝে কবিগানের নতুন স্বাধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বাংলার গানওয়ালা বাংলা ব্যান্ড।

তথ্যসূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খন্ড) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস (২য় খন্ড) — সুকুমার সেন
কয়েকজন লোককবি — সুধী প্রধান (সম্পাদিত)
প্রাচীন কবি সংগ্রহ — গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালি — ডঃ সুকুমার সেন
প্রাচীন কবিওয়ালার গান (সংকলন) — ডঃ প্রফুল-চন্দ্র পাল
কবিয়াল কবিগান — দীনেশ চন্দ্র সিংহ
বাংলাদেশের ইতিহাস — রমেশচন্দ্র মজুমদার
কবির ইতিহাস (প্রবন্ধ) — ব্রজসুন্দর সান্যাল

আদিবাসী বিদ্রোহের জীবন্ত দলিল ঃ ‘অরণ্যের অধিকার’

- নীলেন্দু বিশ্বাস

ভারতের অরণ্যচারি ও পাহাড়িয়া আমি জনজাতি আবহমান কাল ধরে সভ্য সমাজ বহির্ভূত এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে কালযাপন করে আসছে। একদিকে অর্থকৌলিন্যহীনতায় সভ্য জগত থেকে পিছিয়ে পড়া এবং অন্যদিকে শিক্ষা - দীক্ষা, সভ্য আচারসর্বস্বহীনতায় তারা সমতলের মানুষের চোখে পতিত, মর্যাদাভ্রষ্ট। যুগ যুগ ধরে এহেন সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে তারা লড়াই বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে অজস্রবার। কিন্তু একশ্রেণীর কুচক্রী, স্বার্থান্বেষী শোষকের চক্রান্তে তারা নিদারুণ ব্যর্থতায় জর্জরিত - হতাশাক্লিষ্ট, তাদের স্বাধীনতা বিকাশের পথ রুদ্ধ। কখনো বা ক্রীতদাসের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। চতুর্থবর্ণের ঘৃণ্যজীবন বা ‘বন্য’ - ‘বর্বর’- ‘জংলী’ জাতির আখ্যা প্রাপ্তি ব্যতীত আর কোন সৌভাগ্যের আলো তারা দেখেনি। ধর্ম বর্ণ তথা জাত্যভিমান সর্বস্ব মানুষের কাছ থেকে দূরে নিভৃতে নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে আদিবাসী সমাজ দীন-হীন জীবনে আবদ্ধ। **‘সমাজের মূল স্রোতের নিদারুণ উপেক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য আদিবাসী সমাজ কখনও মূলস্রোতের সঙ্গে মিশতে পারছে না, অথচ এই ব্যবধান ঘোচাবার দায় মূলস্রোতেরই ছিল’। ১**

মহাশ্বেতা দেবী যথার্থই উপলব্ধি করেছেন আদিবাসী সমাজের মধ্যেকার ধর্ম-বর্ণ-সংস্কারগত অচলায়তনের প্রাকার ভেঙে চুরমার করা ও তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সংঘটন একান্ত জরুরি। তাই তিনি আদিবাসী সমাজকে সভ্য জগত বা সুস্থ সবল জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে শপথ নিয়েছেন। একদিকে তার লেখনী আদিবাসী জীবনকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর, তেমনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুখ দুঃখের সহচর হয়ে সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও সংকল্পবদ্ধ। আশির দশক থেকেই তিনি কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন সামাজিক নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার নগ্ন আসরে। কেবল লেখার জগতে বিচরণ বা তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বার বিস্তার নয়, তিনি বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকার উপর প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন কায়ক্লেশে। সত্তরের দশকে সরকার যেখানে সন্ত্রাসের মোকাবিলার নামে নকশাল নিধন যজ্ঞে ব্যাপৃত, তখন মহাশ্বেতা অকুতোভয়ে লিখে চলেছেন প্রতিবাদী রচনা সমূহ। বস্তুত লেখিকা হিসাবে বর্তমান চলিষ্ণু জীবনের ঘটমানতা তুলে ধরতে তার ভাষ্য রচনার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদী সত্ত্বা অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়াসী। তিনি কোন দলের হয়ে নন, কোন নির্দিষ্ট বিপ-বী দলের সদস্য রূপেও নন, একজন যথার্থ সৎ বিবেকী মানুষ হয়ে লেখিকা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যেতে চান। অর্থাৎ, মহাশ্বেতার সৃষ্টিধর্ম বা কর্মের মধ্যে সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠা বা তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা ব্যতীত কোন রকম মিথ্যাচার, ভন্ডামি বা মেকি বিপ-বীয়ানার প্রকাশ পায়নি। তাঁর অসাধারণ প্রতিবাদধর্ম বা প্রতিবাদী সত্ত্বা তাঁর সৃষ্ট চরিত্র গুলির মধ্যে কোথাও জোর করে আরোপিত হয়নি, বরং এক অমোঘ

নিবিড় কাল চেতনার গর্ভে কার্যকারণ সূত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে প্রতিবাদের সুসংহত রূপ। আমরা দেখতে পাই, চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও সমাজসত্ত্বার গভীরে দেশ-কাল, জীবন-মান-মূল্যবোধ সম্পর্কে মহাশ্বেতার যে অনুসন্ধান, সেটা তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচায়ক। তিনি বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ও সামাজিক মানুষকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিধর্মে ও কর্মে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সমাজ বাস্তবতা সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতিবাদমুখর চরিত্রগুলি অসাধারণ নতুন মাত্রায় পরিবেশিত।

আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষের সমাজদেহে শ্রেণিগত জটিল সমস্যা কালান্তক ব্যাধির মত বিরাজমান। ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথার একেবারে নীচের দিকে রয়েছে অন্তবর্ণজাত ও বৃত্তিগত ঘৃণিত কর্মজীবী দরিদ্র মানুষ, এরা সকলেই তথাকথিত ‘নিম্নবর্গ’। মহাশ্বেতা দেবীর রচনার বিস্তীর্ণ পরিসরে ধরা পড়েছে অন্ত্যজ ও হিন্দুদের বর্ণাশ্রম- বহির্ভূত আরণ্যক ও পাহাড়িয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন ও সচেতনার বিশেষ রূপ। ১৮৯৫ - ১৯০০ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া মুন্ডা বিদ্রোহ অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন ‘অরণ্যের অধিকার’, যেখানে লাঞ্ছিত পদদলিত জনপদ জাতির চেতনার জাগরণ ও শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিপথে প্রতিনিয়ত উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই সত্য হয়ে উঠেছে। কোন মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি নয়, ইতিহাসের পরম্পরায় সংঘটিত শ্রেণি সংগ্রামই মহাশ্বেতা দেবীর উপজীব্য বিষয়। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব তথা সমাজ বাস্তবতার যথাযথ চিত্রাঙ্কনে ঐতিহাসিক সূত্র ও তথ্যাদি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। বস্তুত ইতিহাস তথ্য ও পরিপূর্ণ জীবন তথা বিপর্যস্ত মুন্ডাদের সংগ্রামী জীবন ও চেতনার সহযোগে লিখিত এই উপন্যাস যে মর্মস্পর্শী, পাঠকের নিকট এর সবিশেষ আকর্ষণ প্রমাণ দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মুন্ডাদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের জীবনের নানান ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও প্রত্যক্ষ করেছেন কাছ থেকেই। তিনি হৃদয় দিয়েই তাদের হৃদয়ের কথা অনুভব করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার দর্পণে ধরা পড়েছে মুন্ডাদের দারিদ্র্য, তাদের প্রতি উচ্চবর্গের ঘৃণা - বঞ্চনা, অপাঙক্তেয় পতিত জীবনের দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রণা। মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা কেবল মুন্ডা জাতির মুক্তির জন্য নয়, অরণ্যের সমস্ত আদিবাসীর মুক্তির জন্য অরণ্যের অধিকার দাবী করে। তার এই দাবীই ছিল ‘উলগুলান’ বা মহাবিদ্রোহ।

মহাশ্বেতা দেবী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব তথা সমাজ বাস্ত বতার যথাযথ চিত্রাঙ্কনে ঐতিহাসিক সূত্র ও তথ্যাদি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। বস্তুত ইতিহাস তথ্য ও পরিপূর্ণ জীবন তথা বিপর্যস্ত মুন্ডাদের সংগ্রামী জীবন ও চেতনার সহযোগে লিখিত এই উপন্যাস ‘অরণ্যের অধিকার’ যে মর্মস্পর্শী, পাঠকের নিকট এর সবিশেষ আকর্ষণ প্রমাণ দেয়। মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে মুন্ডা বিদ্রোহের উদ্ভব, মূল বৈশিষ্ট্য, প্রস্তুতি পর্ব, বিস্তার, পরিণতি ইত্যাদি এক সরলরেখায় সজ্জিত করেছেন। মুন্ডাদের নিকট জঙ্গল - পাহাড়-ঝর্ণা তাদের মা। বিরসা মুন্ডা তাদের সমাজের সমস্ত প্রকার সংস্কার পাপবোধ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়, তাঁর রক্তে জমতে থাকে প্রতিবাদ। সে শুনতে পায় বৃহত্তর জীবনের হাতছানি।

বিরসা মুন্ডার পিতা সুগানা মুন্ডা ভিখারিরর অধম হলেও প্রচলিত নিয়মনীতিকে

মেনে নিয়েছেন। তার কপালে-পেটে-মনে আগুন থাকলেও নেই কোন প্রতিবাদ। কিন্তু ছেলে বিরসা অন্য ধাতের মানুষ, তাঁর রক্তে মহাবিদ্রোহের ফুলকি ছড়িয়ে দিয়েছে প্রাচীন ধানি মুন্ডা। বিরসার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান মুন্ডাদের ভগবানকে, যে মুন্ডাদের দুঃখ - দুর্দশা ঘোচাবে। যত বন পাহাড় আছে সবই বিরসার বলে দাবী করে ধানি মুন্ডা তার মধ্যে অধিকারবোধের চেতনা জাগায়। ভবিষ্যতে বিরসাই হবে 'উলগুলান' বা মহাবিদ্রোহের নায়ক। বস্তুত সংস্কার তথা পুরানো ধ্যান ধারণার গন্ডি অতিক্রম করতে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে কিংবা অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে যথাযথ ভাবে গড়ে তোলা দরকার। এই প্রয়োজন বোধেই বিরসা চাইবাসার জার্মান মিশনারী রেভারেন্ডের কাছে দুবছরের লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যায়। সে জানতে চায় পৃথিবীকে, কারণ এক অজানা পৃথিবী তাকে ডাকে, যেখানে ভাত - কাপড়ের অভাব নেই, নেই দিকু, আড়কাঠির শোষণ - প্রতারণা, অত্যাচার চোখরাঙানী, সেখানে পাওয়া যায় শীত প্রতিরোধের তুষের বস্ত্র, কড়ুয়া তেল, খাবার কালো নুন, বনের শেকড় মধু, পশু-পাখীর মাংস।

বিরসা লেখাপড়া শিখে সাহেবদের মতো হতে চাইলেও বৃদ্ধ ধানি মুন্ডা চেয়েছে বিরসার মনে আগুন জ্বালাতে। আদিপুরুষের সৃষ্টি ছোটনাগপুর, সেখানে কেবল মুন্ডাদেরই অধিকার। তাই দেখা যায় বিরসা মিশনের উপর অত্যাধিক বিশ্বাসী হলেও ফাদার নট্রট সাহেব মুন্ডাদের 'জোচ্চোরর' বলায় বিরসার 'কিংডম অব হ্যাভেন' ভেঙে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। বিরসা একজন মুন্ডার সন্তান, মুন্ডারা কখনও 'জোচ্চোর' হতে পারে না। মুন্ডারা লড়ছে, কয়েদ হচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে - সেতো কেবল তাদের হকের ভূমি, জন্মের দেশ পুনরুদ্ধার করতে। তাই সাহেব সরকার নতুন আইন জারি করেছে পালামৌ-মানভূম-সিংভূমে জমি ও জঙ্গলের উপর মুন্ডাদের কোন অধিকার নেই। এমনকি অরণ্যের ভেতরে মুন্ডাদের গ্রামগুলিও উচ্ছেদ করে দেয়। তাই মুন্ডারা নিজেদের অধিকার আদায়ে বিরসার নেতৃত্বে জঙ্গল আপিসে দাবী করে, 'জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে।' এখানে বিরসা এক ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন মুন্ডা, দুঃসাহসী নির্ভীক, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। জঙ্গল আপিসের বাবুদের লক্ষ্য করে বিরসা ছুঁড়ে দেয় তার দ্রোহবাণী - **'এই দিকু। আমার নাম বিরসা। আমি সাহেব ডরাই না।** ২ বলাবাহুল্য,অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিরসার এহেন প্রতিবাদ 'উলগুলান' -এর অঙ্কুরিত বীজ। বিরসা শুনতে পায় বৃহত্তর জীবনে ডাক, শুধু নিজের নয়, সমগ্র মুন্ডা সমাজের দুঃখ ঘোচাতে হবে, সকলের শৃঙ্খল মোচন করতে হবে, অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিতে হবে। অধিকার রক্ষার এই চেতনায় 'উলগুলান' - এর জন্ম দেয়, আর সেই বিদ্রোহের জন্মদাতা তো বিরসা। বিরসার এই উপলব্ধি মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, **'ওর অরণ্য জননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে, আইনের হাতে বন্দিনী। জননী অরণ্য বলেছিল, মোরে বাঁচা বিরসা ! আমি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক হব।'** ৩ বিরসা তাঁর অরণ্য জননীকে প্রতিশ্রুতি দেয়, **'আমি তোমারে রক্ত দিব।'৪বিরসা মুন্ডার জেদ, প্রতিজ্ঞা, দৃপ্ত পৌরুষ তেজ দেখে সমগ্র মুন্ড সমাজের বিশ্বাস জন্মায়, বিরসা তাদের ভগবান, সে দিকুদের তাড়াবে, তাদের জঙ্গল ফিরিয়ে দেবে, সে পারবে- তার জন্যই সকল রুখা-ভুখা বাঁচবে, মরাকে জিয়াবে,**

ভুখাকে ভাত দিবে।৫ অরণ্যের অধিকারের শুরুতে জানা যায়, **'মুন্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। খাটো একমাত্র খাদ্য যা মুন্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন। কোন না কোন ভাবে ভাত বিরসার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। তাই সে বলতে পারে, 'মুন্ডা শুধু খাটো খাবে কেন ? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না।৬** লড়াই ছাড়া যে মুন্ডাদের বাঁচার উপায় নেই, এই চরম সত্যটি বিরসা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর প্রত্যয় সিদ্ধ উক্তি, **'আমি ভগবান। মুন্ডাদের ভগবান। বিরসা আর কারো নয়, কেবল মুন্ডাদেরই ভগবান, সে ধরতি আবা, তাঁর বিনাশ নেই, পুলিশের হাতেও না।'৭**

বিরসার প্রভাবে মুন্ডারা জমিদার - মহাজনদের অগ্রাহ্য করতে শুরু করে, তারা ক্ষেতমজুর বা 'বেঠবেগারী' -র কাজে ইস্তফা দিয়েছে। উপবাস অনাহারে তারা আদৌ ভীত নয়। মুন্ডারা চাষবাসে যাচ্ছে না, ঋণ নিচ্ছে না, ভিক্ষাও চাইছে না। এই সব দেখে জমিদার - মহাজনদের সন্দেহ হয় বিরসা সাধারণ মুন্ডাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাই মুন্ডাদের মনোবল সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে ১৮৯৫ সালের আগষ্টে বিরসাকে বন্দি করা হয়। মুন্ডাদের ক্ষেপিয়ে তোলা, খাজনা বন্ধের ডাক, বিক্ষোভের স্রষ্ঠা ইত্যাদি অপরাধে বিরসাকে দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। কিন্তু অরণ্যের প্রকৃত সন্তান বিরসাকে এত করেও দমন করা সম্ভব হয়নি। দু'বছর কারাদন্ড ভোগ করে বিরসা আরো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শুধু দিকুই নয়, ইংরেজ সরকারও মুন্ডাদের শত্রু, কারণ সরকার তাদের 'খুটকাট্টি' গ্রামগুলো জমিদারদের হাতে তুলে দিয়েছে। এহেন শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া বাঁচার পথ রুদ্ধ। তাঁর ঘোষণা, **'দুশমন সবাই। সকলের সাথে মোদের লড়াই হে। এমন লড়াই মুন্ডা কখনো লড়ে নাই। সকল দিকুদের সঙ্গে লড়াই, লড়াই সরকারের সঙ্গেও।৮**

১৯০০ সালের জানুয়ারিতে মুন্ডাদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। ৩০০ জন মুন্ডা যুবক তির, ধনুক, বল-ম,টাঙ্গি, খড়্গ নিয়ে খুনটি থানা আক্রমণ করে। পরে পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে প্রচুর সৈন্যবাহিনী এসে মুন্ডাদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা ধরা না দিয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। উভয় পক্ষে ব্যাপক লড়াই শুরু হলে বিরসা উপলব্ধি করে আধুনিক রাইফেলের সঙ্গে মুন্ডারা পেরে উঠবে না। তাই মুন্ডারা নিকটবর্তী অরণ্যে আশ্রয় নেয়। পুলিশ বাহিনী তাদের পশ্চাদ অনুসরণ করে অরণ্যে প্রবেশ করে বিরসার অনুচরদের বন্দি করে। কিন্তু বিরসাকে ধরা সম্ভব হল না। শেষে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের প্রচেষ্টায় বিরসা বন্দি হয়। রাঁচি জেলে ঐতিহাসিক মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসার স্থান হয়। সেখানেই বিচার শেষ হবার আগেই বিরসার মৃত্যু হয়। কিন্তু জীবন, বিদ্রোহ যা কিছু চলমানতার সত্যতা কোন কালে কোন দেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয়না। কালে কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ-ব। বিদ্রোহ থেকে বিপ-ব সৃষ্টির জন্য এক বিরসা শত শত বিরসার জন্ম দিয়েছে। সে বলেছিল জঙ্গলে ছাই উড়িয়ে দিলে জঙ্গল জানবে বিরসা তাদের ভোলেনি। তাদের মুখেই উচ্চারিত হবে, **'উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই।'৯**

বিরসা কিংবদন্তির নায়ক, ঐতিহাসিক নায়ক। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে তাকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত নায়ক থেকে বাস্তবের পটভূমিতে বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিবাদী চরিত্রের

মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত ইতিহাসের গর্ভে বিরসার জন্ম, তাঁর স্বাজাত্যবোধ, প্রতিবাদ প্রবণতা, দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের ব্যাগ্রতা ইত্যাদি নিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রের মহিমা অপেক্ষা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতায় উন্নীত চারিত্রিক মহিমা সে লাভ করেছে। বিরসার কৃতিত্ব নিয়ে ডক্টর রজার্স বলেছেন, **'ইংরেজ হিসাবে, ক্রাউনের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে আমি তার মনোভাব সমর্থন করতে না পারি, তবু তাকে দোষ দিতে পারিনা। বিরসা তার ভক্তদের মনে একটা আত্মবিশ্বাস জাগাতে পেরেছে। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, মুন্ডা, মুন্ডা হয়ে জন্মেছে বলে গর্ববোধ করেছে, এতদিন মুন্ডা জন্মের জন্য মুন্ডা নিজেকে দোষ দিত, দুঃখ করত।১০**

তবে মহাশ্বেতা দেবী বিরসা চরিত্রের উপর দেবত্ব আরোপ করে তাকে ধর্মীয় নেতায় রূপান্তরিত করেছেন বা দেবত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিশেলে বিরসা ঠিক ইতিহাসের ভারসাম্য হারিয়েছে কিনা - এই প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আসলে সিংবোঙার উপাসক হয়ে মুন্ডারা ঘৃণিত, ঠিক এই কারণে তাদের ধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই বিরসা বিদ্রোহের নায়ক হয়েও ধর্মকে অবলম্বন করে অজ্ঞ মুন্ডাদের কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। সে মুন্ডাদের 'ধরতি আবা' বলে প্রতিপন্ন করে এক মহান নেতা ও জনসেবক রূপে পরিচিত। মুন্ডা বিদ্রোহের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে মহাশ্বেতা দেবী যেভাবে তাঁর কলমের আচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সৃষ্ট 'অরণ্যের অধিকার' তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছে 'সাহিত্য আকাডেমি'র বিজয় মাল্য।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

১। মহাশ্বেতা দেবী ঃ ব্রাত্যজীবনের সংগ্রামী কথাকার, তাপস ভৌমিক ও নিতাই বসু সম্পাদিত। কোলকাতা, ২০০৩, পৃ-২৮।
২। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ৮৫।
৩। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ৯০।
৪। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ৯১।
৫। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ৯৫।
৬। বিরসা মুন্ডা, মহাশ্বেতা দেবী, প্যাপিরাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০২। পৃ - ৪৮
৭। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ১১৪।
৮। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ১৬৫।
৯। প্রতিবাদের উপন্যাস, দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত, বাংলার মুখ, ২০১২, পৃ - ৪১০।
১০। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী। কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ - ১১৯।

সত্যের সন্ধানে - ভগিনী নিবেদিতা

- ভাস্বতী চক্রবর্ত্তী

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। প্রতীচ্য পরিবেশে জন্ম ও বেড়ে ওঠা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ভগিনী নিবেদিতার জীবন ছিল একাধারে যেমন ভাবগম্ভীর অন্যদিকে তেমনই প্রাণবন্ত। শিশুকাল থেকেই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন দেশানুরাগের পাশাপাশি ধর্মানুরাগও। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ডের উপাসনা পদ্ধতি কিংবা বাইবেলের কাহিনীসমূহ ভগিনী নিবেদিতার শিশুমনকে যে শুধু আকৃষ্ট করতো তাই নয়, নিয়ে যেত অদ্ভুত এক রহস্যময় কলুজগতে। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ধর্মের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ, ঐকান্তিক ভক্তি ক্রমশই তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। প্রথম থেকেই ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন সবরকম সংকীর্ণতার উর্দ্ধে সেই কারণেই চার্চ পরিচালিত ধর্মজীবনের অসহিষ্ণুতা, কঠোর বিধিনিষেধ, অন্য ধর্মের প্রতি অনুদারতা এসবই নিবেদিতার কোমল মনকে অহরহ বিদ্ধ করতো। তাঁর মনের অন্তরাজ্যে চলতো অনবরত নিজের সাথেই নিজের লড়াই, মনের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তের জন্য সর্বদাই সে খুঁজে বেড়াতো ন্যায়পরায়ণ, সত্য নির্ভর এক উদার মানব ধর্মকে।

প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তিনি এক সময় গীর্জার সংস্রব ত্যাগ করে বিজ্ঞানের অনুশীলনে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন বিজ্ঞান - ই এমন এক জায়গা যেখানে কল্পনা ও ভাবুকতার কোন স্থান নেই। কিন্তু এর মাধ্যমেও তিনি সেই ধর্ম ও সত্যের সন্ধান পেলেন না যেখানে থাকবে না কোন স্ব-বিরোধীতা। আসলে ভগিনী নিবেদিতা সবসময়ই চেয়েছিলেন 'ধর্ম' ও 'সত্যের' অভিন্ন রূপকে জানতে ও প্রতিষ্ঠা করতে।

তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে ঠান্ডা পানীয়ের অনুরূপ গৌতম বুদ্ধের জীবনী 'Light of Asia' আগ্রহের সাথে পাঠ করেও যে তিনি তাঁর তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের দুরন্ত পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেননি তা নিজেই স্বীকার করেছিলেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সহচার্য কিংবা ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারাও যে এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করতে পারেনি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ধর্মের প্রত্যক্ষ রূপ উদঘাটনের ক্রমাগত চেষ্টা ও পরিণামে ব্যর্থতায় যখন ভগিনী নিবেদিতা প্রায় ক্লান্ত অবসন্ন এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে নিবেদিতার জীবনের সকল সংশয় ও দ্বন্দ্ব দূর করতে অমৃতলোকের সন্ধান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহুকাল ধরে যে, আহ্বানের অপেক্ষায় ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি অনুভব করলেন এবার হয়তো সেই অপেক্ষার অবসানের মুহূর্ত আহত প্রায়।

স্বামীজির ধর্মবিষয়ক শিক্ষায় নিবেদিতা এক নতুনত্ব লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন এবং সেটিই ক্রমশ তাঁর সম্মুখে উদঘাটিত করে এক নতুন দিগন্তের। কিন্তু তাঁর প্রখর স্বাতন্ত্র্যতাবোধ যেন কোন কিছুকেই সহজে মেনে নিতে দিত না। স্বামীজির যেকোন বক্তব্য প্রসঙ্গেই 'কিন্তু' - 'কেন' এই শব্দদুটি প্রায়ই তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। এতৎসত্ত্বেও স্বামীজির কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ভগিনী নিবেদিতা আসলে এর মাধ্যমে মনের সকল সংশয় - দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত সেই অতীন্দ্রিয় সত্যকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে স্বামীজির প্রতিটি কথা ও বাণী ভগিনী নিবেদিতার মনে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের

সৃষ্টি করতে থাকে। এমনকি তিনি মনে মনে অনুভব করেছিলেন যে, স্বামীজির প্রতিটি কথার প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা তার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। আর এভাবে ক্রমেই স্বামীজির সান্নিধ্যে এক এক করে চূর্ণ হয়ে গেল তাঁর বহুদিন ধরে ধারণ করে আসা আদর্শগুলি। স্বামীজি একদা বলেছিলেন, 'ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সর্বদা তাদের চেষ্টা দ্বীপেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।' — এই উক্তির যথার্থ অর্থ পরবর্তীতে ভগিনী নিবেদিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সত্যিই এতদিন ধরে ধারণ করে আসা তাঁর আদর্শগুলি সংকীর্ণ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের 'মায়া' সম্পর্কিত বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ভগিনী নিবেদিতাকে। একদা স্বামীজির মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ত্যাগকে জীবনের মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করার পরামর্শ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক নতুন জীবনে দীক্ষিত হওয়ার সংকল্পকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছিল। সর্বোপরি স্বামীজি তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ধর্মকে পরীক্ষা করিয়া লও, ধর্মকে এমন রূপ প্রদান কর, যাহা কিছুতেই সত্যকে ভয় করিবে না, ধর্ম ও সত্য এক মনে রাখিও, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকৃতিই আত্মার জন্য।' বেদান্তের একের পর এক ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বামীজি সর্বদাই সর্বধর্ম সমন্বয়কারী বিশ্বজনীন এক উদার ধর্মমতের শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, 'সকল ধর্মেই সত্য বিদ্যমান।' তাই তিনি মনে করতেন কোন প্রকার পরোপকার বা জাগতিক দান অপেক্ষা 'ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ' এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় সাংসারিকতার স্থান নেই।' সত্যিই এমনই এক নিঃস্বার্থ ত্যাগ সর্বস্ব সত্যনির্ভর ধর্মের অন্বেষণই তো ভগিনী নিবেদিতা করেছিলেন। তিনি অনুভব করলেন স্বামীজির প্রত্যেকটি কথায় ও বাণীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা সহজে উপেক্ষনীয় নয়। তাই এবার সময় হয়েছে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ পরিবর্তনের আর স্থির করলেন এখন থেকে দৃঢ়তার সাথে সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ভূমি ভারতবর্ষই হবে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

১। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ভগিনী নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ২০০৫, পৃ - ১৪-৪৩।

২। স্বামী তেজস্বানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ - ১৩ -২৩।

৩। ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ - ১ - ৩২।

৪। স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ - ১৮৩-১৯৬, ২৩৩-২৪৮।

৫। Pravrajika Atmaprana (Cal), The Complete works of Sister Nivedita (volume-1), Ramkrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls School, Calcutta, 1967, Page - 17-29.

৬। Swami Sarvabhutananda, Nivedita of India, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, kolkata, 2002, page - 2,3,16,17.

লালনের চৈতন্যচেতনা

- ডঃ সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

ফকির লালন শাহ একটি দর্শনের নির্মাতা। তিনি ছিলেন মূলতঃ তত্ত্ব ও দর্শনপ্রিয় সাধক কবি। লালন সম্পর্কে পল্লীকবি জসিমউদ্দীন বলেছেন - 'লালন শাহ ছিলেন তত্ত্বসাধক। তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ এবং তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। দীর্ঘ আধ্যাত্ম সাধনায় তাঁর হৃদয়ে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য তিনি সুর ও ছন্দ অবলম্বন করেন। এ কারণেই তাকে তাত্ত্বিক কবি বলা হয়েছে। তত্ত্ব যার আসল, কবিত্ব সেই তত্ত্ব কথার বাহন মাত্র।' তত্ত্বজ্ঞ লালন ছিলেন আত্মদর্শী। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে তার নাফস্ বা আত্মাকে চিনলো সে তার মালিককে চিনলো। এই আত্মা আবিষ্কারই প্রেমতত্ত্ব বুঝে নেবার উপায়। 'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে /দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে।' এই দিব্যজ্ঞান থেকেই লাভ করা যায় মহাজ্ঞান। জগতের প্রায় সব ভাবদার্শনিকেরা আত্মতত্ত্বে বিভোর ছিলেন। তাঁদের মর্মে লেগেছিল মরমীতত্ত্বের প্রবল তরঙ্গ। সক্রেটিস, পোলেনিয়া, বে-ক, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সানায়ী, রুমি, হাফিজ, সাদী, আলফেসানী, ফরিদউদ্দীন আত্তার, মঈনুদ্দীন চিশতি, আমির খসরু, নিজামউদ্দীন প্রমুখ ভাবদার্শনিকেরা তত্ত্বানুসন্ধানীর শিরোপা লাভ করেছেন।

ষোড়শ শতকের মানবতাবাদের উদ্‌গাতা শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রেম-তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। শুদ্ধভক্তি থেকেই প্রেমের উৎপত্তি। প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মদর্শনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভক্তিতত্ত্বে আত্ম নিবেদন আত্মদর্শনের একটি পর্যায়। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবতত্ত্বে আত্মনিবেদনের বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি আত্মমগ্ন ছিলেন। ভক্তিযোগে নিবিষ্ট ছিলেন। এই শুদ্ধভক্তি সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন —

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে ইহা লক্ষণ কয়।।

জ্ঞান নয় কর্ম নয় শুধু ঈশ্বরের জন্য আকুলতা, ঈশ্বরের বিরহে অস্থিরতা, ঈশ্বরকে প্রিয়জনের মতো ভালোবাসা একটি আবেগ-আন্দোলিত মানসিকতায় ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই হলো ভক্তির লক্ষণ। এই ভক্তি দেখা দিয়েছিল আলোয়ারদের জীবনে কর্মে সাধনায়। এঁরা ঈশ্বরের প্রেমে নিমজ্জিত সর্বক্ষণ। নৃত্য - গীত - বাদ্যে - কবিতায় এই অধীর প্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবও ছন্দবদ্ধ সঙ্গীতকে প্রচারের বাহন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। খোল-করতাল সহযোগে হরিনামের প-াবণ বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আত্মহারা আপনভোলা বাউলের

সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক মহম্মদ আবু তালিব চৈতন্যদেবকে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে অভিহিত করেছেন। এই মন্তব্য সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও লালন যে চৈতন্যদেবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়টি অনস্বীকার্য কারণ পূর্বসূরীর প্রভাব উত্তরসূরীর ওপর পড়বেই। লালনের গানে বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যতদূর মনে হয়, নবদ্বীপ বাসকালে তিনি বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, নানা তীর্থে লোকমেলায় দিন অতিবাহিত করতে করতে তিনি একসময় নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। নবদ্বীপে তখন বহু বৈষ্ণব আশ্রম। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের চর্চা চলেছে নানাভাবে। বহু সাধক সাধিকা আশ্রমে বসবাস করেন। লালন পদ্মাবতী নামে এক বৈষ্ণবীর আশ্রমে আশ্রয় নেন। পদ্মাবতীকে তিনি 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। পদ্মাবতী লালনকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। লালন পদ্মাবতীর কাছ থেকে নানা তত্ত্বোপদেশ শুনতেন এবং সেগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। এই সময় পদাবলী কীর্ত্তন ও শাক্তগীতি দ্বারা লালন প্রভাবিত হন। এছাড়াও প্রথম জীবনে তাঁর জন্মভূমি হরিশপুরে পদাবলী কীর্তনের রসাস্বাদন করতেন প্রাণভরে। ধুয়ো গান, জারিগানও তাকে আকর্ষণ করত। তিনি বয়াতি হয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়েও বেড়িয়েছেন। তবে কৃষ্ণপ্রেমে, চৈতন্যপ্রেমে তিনি যে বিভোর ছিলেন তাঁর বহু গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লালন মানসে কৃষ্ণপ্রেমে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। চৈতন্যপ্রীতিও লালন মানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। চৈতন্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

'যদি গৌরচাঁদকে পাই
গেল গেল এ ছার কুল তাতে ক্ষতি নাই ॥

কি ছার কুলের গৌরব করি
অকুলের কুল গৌর হরি
এ ভব তরঙ্গে তরী
গৌর গোঁসাই ॥

ছিলাম কুলের কুলবালা
স্কন্ধে নিলাম আঁচলা ঝোলা
লালন বলে গৌরবালা
আর কারে ভরাই ॥

কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দুই-ই ব্যাখ্যাত হয়েছে লালন সঙ্গীতে। গৌরাঙ্গকে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পদাবলীর সুরও তিনি তাঁর গানে গ্রহণ করেছেন। 'ব্রজের সে ভাব কি সবাই জানে। / যে ভাবে শ্যাম বাঁধা আছে গোপীর সনে॥' - গানটিতে পদাবলী কীর্তনের সুর আশ্রয় করেছেন লালন।

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা অবলম্বনে অনেকে নিত্য ও শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই সাধনায় ব্রতী হয়ে বহু সাধক ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়েছিলেন এবং এক চিরায়ত সত্যকে প্রচার করারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর জন্যই এই ত্যাগের

বাণী প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তিনি নদিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে শুধু নদিয়ায় নয় সারা বিশ্বকে মানবধর্মের মহান ব্রতে উজ্জীবিত করেছিলেন । লালন নদিয়াবাসীকে সৌভাগ্যবান বলেছেন —

ধন্য রে নদিয়াবাসী
হেরিল গৌরাঙ্গ - শশী।
কিংবা
নদেবাসীর ভাগ্য ভাল,
গৌর হেরে মুক্তি পেল।

এই মহান প্রেমিক পুরুষ মহাভাবের ভাবুক। তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে নারী পুরুষ ঘর সংসার ত্যাগ করেছে। লালনও গৌর প্রভাবিত হয়ে গৌরলীলা বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন।

'বাউল মতবাদ' বলতে মিথুনতত্ত্বভিত্তিক সাধনার একটি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। আদি ভারতীয় যোগ ও তন্ত্র সাধনা 'যৌন যোগসাধনা নামে পরিচিত। এটি মিথুনতত্ত্বেরই প্রতিরূপ। সুফি সাধকরা এ তত্ত্ব তাদের সাধনক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। লালনও সুফি তত্ত্বকে আশ্রয় করেছেন। চৈতন্যদেব একটি গূহ্য সাধন প্রণালী অবহিত ছিলেন। এটি মূলত পুরুষ নারীর মিলন জাত সাধনা। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে একে 'পরকীয়া প্রেম' বলা হয়েছে। এ প্রেম মিথুনতত্ত্বেরই নামান্তর। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, জীব গোস্বামী, রূপ-সনাতন প্রমুখ এ তত্ত্ব জানতেন। এই পরকীয়াতত্ত্ব প্রচারাভিলাসে চৈতন্যদেব নিজেই আউলচাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হন বলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর বিশ্বাস প্রচলিত আছে। আউলচাঁদের পুত্র রাম শরণ। রামশরণের পুত্র দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আউলচাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। আউলচাঁদের শিষ্য মাধব বিবি এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র পরকীয়া সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। এই তত্ত্ব বাউল তত্ত্ব বা বাউল সাধনা। এই তথ্য অনুসারে চৈতন্যদেবই প্রকৃতপক্ষে বাউলতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ফকির লালন মহাপ্রভু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পরিত্যাগ করে নদিয়াতে তাঁর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে —

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো।
তাঁর ব্রজের ভাবে কি অসুসার ছিলো ॥

গোলকেরই ভাব, ত্যজিয়ে সে ভাব
প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিল যেছি ভাব
এবে নাহি তো সে ভাব
দেখি নতুন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হলো।

কলিযুগের ভাব এ কি বিষম ভাব
নাহি ব্রতপূজা নাহি অন্য লাভ

ছিল দন্ডীবেশ
দন্ড কমনডলু
নিতাই আবার তাহা ভেঙে দিলো॥

উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হলো দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়
করলে তিনটি লীলা একা নদিয়ায়
লালন ভেবে দিশা নাহি পেলো ॥

মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত ভাব ভাবনা লালন বুঝতে পারেননি। কখন কীভাবে তিনি তার লীলা প্রকাশ করেছেন তা বোঝা অত্যন্ত দুরুহ। তবে মানুষকে তিনি প্রেমে মাতোয়ারা করেছেন, সে বিষয়ে লালন নিশ্চিত। সাধন ভজন ব্রতপূজা সব ছেড়ে শুধু প্রেম মাহাত্মকেই তিনি প্রচারের মাধ্যম করে নিয়েছেন। তাঁর প্রেমাদর্শ অনুসরণ করেছেন লালন। তাই তিনি বলেছেন —

এনেছে এক নবীন গোরা
নতুন আইন নদিয়াতে।
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে ॥

না করে সে জাতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
সত্য মিথ্যা দেখ প্রচার
সাঙ্গ পাঙ্গ জাত - অজাতে ॥

পেয়ে শুদ্ধ ঈশ্বর চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয় তার উপাসনা
কর দেখি মন, দোষ কি তাতে ॥

বেদ পুরাণের বিধিবদ্ধ রীতি চৈতন্যদেব মানেননি। পূজা পাঠের সহবত তাঁর কাছে বাহ্য আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে 'উপাসনা' বলতে গৌর প্রেমের আদর্শ অনুসরণ বোঝানো হয়েছে। গৌরাঙ্গকে পূজা কিংবা আরাধনা করার কথা এখানে মুখ্য নয়। এই উপাসনা মনতুষ্টি সাধন প্রয়াস বলেই মনে হয়।

অবতারদের মধ্যে ব্রহ্মের অংশকলা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমুখ সে পরম ব্রহ্মের অবতার রূপেই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক ব্যবধান কোনো কিছুই গ্রাহ্য নয়। চৈতন্যদেবের সেই শাশ্বত ভাবনাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন লালন। এককথায় লালন চৈতন্যদেবের গুণমুগ্ধ বলেই তাঁর প্রভাবে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য

- বিপুল কুমার মন্ডল

মহাকবি কালিদাসের নাম শোনেননি এমন পাঠক - পাঠিকা বোধ হয় আঙুলে গুণে বলা অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতির গগনে উজ্জ্বলতম ধ্রুবতারা। তাঁর পান্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। মহা, মহা, মহা, তাই বুঝি তিনি মহাকবি।

প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য উজ্জয়িনীতে সেই সময় কমলা নামে এক বিদূষী অহংকারী রাজকন্যা ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি এই মহাকবি কালিদাসের সহধর্মিনী হয়েছিলেন। সে ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি। কথিত আছে, তিনি তার প্রথম জীবনে বোকা শিরোমনি ছিলেন। সে কথাও আমাদের অজানা নয়।

প্রসঙ্গতঃ উলে-খ্য তিনি ছিলেন রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) এর সভাকবি তথা নবরত্নের শ্রেয়তম জ্ঞানরশ্মি সেকথাও আমরা সবাই কম বেশী জানি।

কিন্তু আজ আমি মহাকবি কালিদাসের জীবনের যে অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে চলেছি তা বোধ করি খু....ব কম পাঠক-পাঠিকা জানেন কিনা সে বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ আছে।

বলাবাহুল্য যে, আপনারা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে মহাকবি কালিদাসের যৌবনের সেই বেদনাবিঁধূর অধ্যায়ের নাম "মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য।" ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই মহাকবির মৃত্যু হয়। একটি রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত আছে তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা কতখানি তা আজও পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

কথিত আছে তাঁর মৃত্যু হয় স্বদেশ থেকে বহুদূরে শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাজা ছিলেন কুমার দাস। তিনি ছিলেন কালিদাসের পরম ভক্ত। কালিদাস অন্তপ্রাণ বললেও বোধ হয় অতিরঞ্জিত করা হবে না। মহাকবি কালিদাস তখন শ্রীলঙ্কায় রাজার অতিথি। রাজা কুমারদাসের আমন্ত্রণে গিয়ে ছিলেন সেখানে। কুমারদাসের অনেক উপপত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক উপপত্নীর বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য রাজা কুমার দাস সেই উপপত্নীর হাতে একটি শে-াক লিখে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, যদি তিনি (সেই উপপত্নী) শে-াকটির সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে রাজা তাকে পুরস্কৃত করবেন। না পারলে ত্যাগ করবেন অর্থাৎ উপপত্নীর অধিকার কেড়ে নেবেন। সেই শে-াকটি ছিল —

" কমলে কমলোৎপত্তি, শ্রয়তেন দৃশ্যতে অর্থাৎ কমলেই কমলের উৎপত্তি বলে শোনা যায়। কিন্তু তা দেখেনি। কিন্তু সেইদিন মানবদরদী মহাকবি কালিদাস সেই মহাবিপদগ্রস্ত উপপত্নীকে রাজা কুমারদাসের লিখে দেওয়া শে-াকটির উত্তর লিখে সহযোগিতা করেছিলেন এইভেবে যে, যেখানে তাঁর মতবিরল পান্ডিত্যের অধিকারী উপস্থিত। তারপরে যেখানে তিনি রাজার সম্মানীয় অতিথি। শুধু কী তাই? তাঁর পরম ভক্তের উপপত্নীর জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকার চরম অগ্নিপরীক্ষা। তাঁর শে-াকের লাইনটিতে তিনি লিখেছিলেন — " বালে তব মুখন্তোষে দৃষ্ট ইন্দিবর দ্বয়ম"। যার অর্থ ছিল — "হে বালা, তোমার মুখপদ্মে

আঁখি রূপ দুটি নীল পদ্ম দৃষ্ট হচ্ছে।”

“কিন্তু হায় হায় হায়,
সেই উপপত্নীর ছলনায় (ষড়যন্ত্রে)
মহাকবি কালিদাস
শ্রীলঙ্কার মাটিতেই
সেই রাজার বাটিতেই (বাড়ীতে)
করলেন ত্যাগ শেষ নিঃশ্বাস ॥

অর্থাৎ সেই উপপত্নীর ষড়যন্ত্রেই মহাকবি কালিদাসকে হত্যা করা হয়। কারণ রাজা পরে যাতে না জানতে পারেন যে কালিদাসের বুদ্ধিতে নয়, তাঁর উপপত্নীর -ই বুদ্ধির সোনালী ফসল সেই শে-াকের উত্তর।

কিন্তু সেই উপপত্নীর অতি দুর্ভাগ্য যে রাজা ঘটনাটির সত্যতা জানতে পারেন এবং শোকে, দুঃখে, উন্মাদ হয়ে কালিদাসের জ্বলন্ত চিতায় সেই উপপত্নীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন।

নারীরা আসলে ভোগের সামগ্রী

- সুভাষ ভট্টাচার্য্য

আমার এই প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে অনেক পাঠক, সমালোচক, পন্ডিতগণ অবাক হবেন - একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। আজ্ঞে হ্যাঁ আমি আমার প্রবন্ধের শিরোনাম সজ্ঞানেই নির্বাচন করেছি। যাইহোক আপনারা হয়ত ভাবছেন আমি হঠাৎ করে এইরকম অদ্ভুত শিরোনাম কেনই বা নির্বাচন করলাম? এর কারণ হিসাবে নিম্নে আলোচিত বিষয়বস্তুর ওপর নজর দিলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

আমরা মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলের শিশুরা অপহৃত হচ্ছে বা চুরি হচ্ছে। সেই শিশুর প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ কন্যা সন্তান। বিশেষত এদেরকে গ্রাম থেকে কিছু লোক পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে দিলি-, কোলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই প্রভৃতি নগরীতে বহুমূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই শিশুগুলির ঠিকানা কোনো হোটেলে বা বেষ্যাপাড়ায় হচ্ছে। তাদের দিয়ে সেখানে আগত দর্শকের মনোরঞ্জন ও মনোবাসনা পূর্ণ করা হয়। সেই সমস্ত অল্পবয়সী বাচ্চাগুলি এর কিই বা বোঝে ? চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদেরকে জোড় করে নোংরা কাজে নামানো হয়। তাতে তারা অসম্মতি জানালে তাদের উপর চলে দৈনন্দিন প্রহার, আধপেটা এমনকি অভুক্ত রাখা হয়। আসলে এদের বয়সতো ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাবার। তার বদলে তাদের গৃহবন্দী, পরাধীন, ভোগের সামগ্রী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। আর এই সমস্ত জায়গায় এদের প্রচুর চাহিদা কারণ বাবুরা এসে ‘নতুন কিছু’ খোঁজে তো তাই। বাবুদের খুশি করার জন্য দিনের পর দিন এইভাবেই শিশু কন্যাগুলি ভোগের সামগ্রী হয়ে উঠছে।

এরপর প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কোনো একটি পূর্ণ বয়স্ক মেয়ে তার পছন্দমতো কোনো পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পছন্দ করে তার সঙ্গে প্রেমালাপ করল। এবং দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হলে তারা দুজনে মিলে বিবাহ করার জন্য মনোস্থির করলে এবং ছেলেটি বেকার হলে মেয়েটির বাড়ি থেকে তাকে ‘নো এন্ট্রি’ সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছেলেটিকে মেয়েটির যতই পছন্দসই হোক না কেন সে যতই মনে করুক না কেন যে সে তার সাথে সুখী হবে তখনই মেয়ের পরিবার তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটির সঙ্গে তারা মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার আরম্ভ করে ছেলেটিকে ভুলে যেতে বলে। তারা কোন মতেই তা মেনে নিতে পারে না। খর্ব করা হয় মেয়েটির সমস্ত স্বাধীনতা, তার চারিদিক দিয়ে গন্ডী করে দেওয়া হয়। তাকে বিভিন্ন ভাবে রাজি করতে বাধ্য করা হয় অন্য ভালো চাকুরীয়ালা বেশি মাহিনা উপার্জিত কোনো সুপাত্রকে বিবাহ করার জন্য। মেয়েটির পছন্দ করা ছেলেটি তার বাবা মাকে সর্বতোভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও তাতে তারা নারাজ থেকে অন্য কোনো নিজেদের পছন্দসই সুপাত্রের হাতে আদরের একমাত্র মেয়েটিকে তুলে দেয়। এতে মেয়েটির তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিবাহের পর বাবা মায়ের পছন্দকরা সেই সুপাত্রের নিকট ফুলশয্যার রাতে নিজেকে ভোগের সামগ্রী

হিসাবে পরিবেশন করতে হয়। চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অপরিচিত, অচেনা, অজানা পুরুষের কাছে নিজের সর্বস্ব নীরবে বিলিয়ে দিতে হয়। বুকের ভিতর তীব্র যন্ত্রণা, বেদনা, অনিচ্ছা, অভক্তি ইত্যাদিকে সঙ্গী করে চাপিয়ে রেখে সেই স্বামীর সতী সাবিত্রী স্ত্রী হয়ে উঠতে হয় তাকে। পরবর্তীকালে ভালো খারাপ ফল যাই হোক না কেন সেই নারীটির তো তখনকার স্বাধীনতা, ইচ্ছা, ভালোবাসা সমস্ত কিছু খর্ব হল। বাবা, মায়ের পছন্দ করা পাত্র যে সবসময় সুপাত্রই হবে তা তো নয়, সে তো ভালো মানুষির পোশাক পড়া কোনো ছদ্মবেশীও হতে পারে।

আচ্ছা এবারে এই সুপাত্রের কথাতেই আসা যাক। আমার দেখা এমন অনেক সুপাত্রই আছে যারা পূর্বের বিবাহ গোপন রেখে একাধিক বিবাহ করে চলেছে। আবার এমন অনেক প্রেমিক আছে যারা সপ্তাহের এক এক দিন এক এক জন বান্ধবীকে ডেটিংয়ের জন্য সময় দেন। আচ্ছা তাহলে এইসমস্ত সুপুত্ররা কীসের যোগ্য, এরা কী আদৌ পুরুষ ? একটি মেয়ে তার জীবন সঙ্গীকে নিয়ে কত না স্বপ্ন বোনে, কত না ভবিষ্যত দেখে আর যাই হোক আমি যতদূর চিনি কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে মন থেকে ভালোবাসে তাহলে সেই পুরুষ সঙ্গীটি শয়তান, বদমাস যাই হোক না কেন শুধুমাত্র তাকেই ভালোবাসবে এবং সেই ছেলেটিকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাকুল চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে অনেক পরিবার তার অবাধ্য ছেলেকে বাগে আনতে একটি নিরীহ নির্দোষ মেয়েকে ছেলেটির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার অদূর ভবিষ্যৎ জীবনকে তীব্র শঙ্কায় ফেলে দিতে দুবার ভাবে না। এক্ষেত্রে আমরা যদি উল্টো হিসাব করি অর্থাৎ কোনো নারী যদি কোনো বেশ্যাপাড়ার সদস্যা হয়, বা আমরা যাকে নষ্ট মেয়েছেলে বলি তাদের কি কখনো ভালোবেসে, সমাজস্বীকৃতি দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় ? হয়ত কোনো সহৃদয়বানের ইচ্ছা জাগলেও সমাজের ভয়ে, সম্মানহানির ভয়ে তারা একাজ করতে পারে না। সমালোচকরা ভাববেন এ আমি কি কথা বলছি ? বেশ্যাপাড়ার মেয়েকে সমাজ স্বীকৃতি ! আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা পুরুষরা যদি চেতন বা অবচেতন অবস্থায় সেই সমস্ত রাতের পরীদের কাছে গোপনে ফস্টি-নস্টি করতে পারলে যদি তাতে কোনো দোষ না থাকে, একটি পুরুষ একাধিক নারী সঙ্গ করার পরও যদি কোন দোষ না থাকে তাহলে নারীর বেলায় দোষের কোথায় ? পুরুষরাই কী শুধু মানুষ ? জীবনের অধিকার কি শুধু পুরুষদেরই আছে ? নারীদের ভোগ করার বেলায় যেমন কোনো দোষ হয় না তবে এক্ষেত্রে তো কোন দোষ থাকার কথা নয়। নারীরা যদি তার পুরুষ সঙ্গীকে ফিরিয়ে আনতে সমস্ত বাধাকে দূরে সরিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, সমুদ্রের অগাধ জলরাশিতে নিজের জীবন তরী ভাসিয়ে কাছে টেনে নিতে পারে, তেমনি আমরা সমাজের কজন পুরুষ নারীর সম্মান ফিরিয়ে তাকে সমাজের মূলস্রোতে আনার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হই ? আমরা পুরুষেরা শুধুমাত্র গোপনে যাই কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের শরীরকে ভোগ করে নিজের শরীরের চাহিদা মেটাতে।

আচ্ছা এই প্রসঙ্গে যখন চলেই এলাম তবে আর একটা কথা না বললেই নয় — কোন অল্পবয়সী বিধবা নারী যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপে মনস্থির করে, সম্পর্কের গভীরে পৌঁছে, পুনর্বিবাহ বা শারীরিক চাগিদার তাগিদে, একে অপরের সাথে মিলিত হতে

চায় তাহলে আমরা সমাজের সভ্য মানুষেরা কেমনভাবে নেব ? আর যাই হোক খুব কম লোকই আছেন যারা ধর্মীয় সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে বিচার বোধকে প্রশ্রয় দিয়ে মানবিকভাবে বিষয়টিকে সমর্থন করবেন। আচ্ছা এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন একজন পুরুষ বিপত্নীক হবার পর সে কী দ্বিতীয় বিবাহ করে না ? কেন করে? সারাজীবন একা থাকতে পারবে না তাই, নাকি তার যৌবনকালের তৃপ্তি মেটে না বলে? অনেকক্ষেত্রে সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহে পুরুষরা লিপ্ত হয় এবং তখন সমাজ তাকে সমর্থনও করে। যাই হোক তাহলে কোনো বিধবা নারীর মনে যদি এমন বাসনা জাগে ? সেও যদি নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত, নিরাপদ আশ্রয়, দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে বা দ্বিতীয় জীবন সঙ্গী বেছে নেয় .....!! তাহলে কি সে কোনো দোষের কাজ করে? ও হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম বলতে সমাজে তবে এক চরম অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটবে। কারণ মহিলা মানুষ হয়ে এতো বড়ো দুঃসাহস !! এই বিষয়ে বলা প্রয়োজন তবে পুরুষে কেন করে? ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পুরুষ নারী উভয়েরই সমান অধিকার। তাহলে পুরুষে যে কাজ কাজ করলে অবৈধ, বেআইনী, অসভ্য, অসামাজিক হয় না ; সেই একই কাজ নারীরা করলেই তাদের সামাজিক রোষ, বঞ্চনা, দৈনন্দিন কটুক্তি, অপমান ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল - পুরুষরা আসলে মানুষ তবে নারীরা কী ? পুরুষদের যৌবন, তৃপ্তি, আনন্দ, ইচ্ছা, আকাঙ্খা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি থাকতে পারে ; তবে কী নারীদের থাকতে নেই? না কি এই চাহিদাগুলি কোনো অন্যায় কাজ ? পুরুষেরা বিপত্নীক হবার পর সে যে কোনো কারণেই হোক নতুন ঘর সংসার করতে চাইলে সমাজের চোখে লাগে না, কিন্তু কোনো নারী যদি এই একই ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে? এই দিক দিয়ে পশ্চিমের দেশগুলিতে এমন সামাজিক গন্ডী, কঠোরতা, শ্বাসরোধ করা চাপানো সিদ্ধান্তকে আমূল দেওয়া হয় না। সেখানে এই বিষয়ে নারী পুরুষের স্বাধীনতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আবার সমাজে এমন অনেক নারী আছে যারা গোপনে বিভিন্ন কুকর্মে লিপ্ত হয়। কুকর্মের সময় যদি কারোর চোখের সামনে পড়ে - তাহলে সেই নারীকে সমাজে অপমান, অপদস্থ, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার করে সমাজচ্যুত করা হয় এবং গ্রাম বা এলাকা থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তখন সে তার সংসার, সন্তানকে বাঁচাতে চলে যায় ভিন্ন কোন আস্থানায় বা নোংরা পাড়ায়। এক্ষেত্রে যে সমস্ত মহান পুরুষ সমাজ তাকে কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত করে গ্রাম ছাড়া করেছিল, তারাই তার কাছে এসে গোপনে ভিড় জমায়। রসের বুলি আওড়ায়, তার ঘরে গিয়ে তার শরীরের উঁচু-নিচু সমস্ত গলিতে হাত বুলায়, আলিঙ্গন করে, মিলিত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন সেই নোংরা নারীটির সঙ্গে যে স্বনামধন্য, মান্যগণ্য মহান পুরুষটি ছিল তাকে কেন সমাজচ্যুত করা হল না? তাকে কেন কলঙ্কের কালি মাখিয়ে গ্রাম ছাড়া করা হল না ? তাকে দু-একটা চড় থাপ্পড় মেরে ঐখান থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হল। তাহলে এ কিরকম আইন, নিয়ম, বিচার ? কেন এমন ভিন্ন বিচার হবে দুজনের একই অপরাধের জন্য? আইন নিয়ম তো সবার জন্য সমান হওয়া উচিৎ। আচ্ছা ওনারা সংসার হোক বা শরীরের যে চাহিদার জন্যই এই কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন তাদেরকে বুঝিয়ে কোন জায়গায় একটা অন্য কোনো কাজ করার পরামর্শ বা চেনা জানা

কোন জায়গায় অন্তত পরিচারিকার কাজেও নিযুক্ত করা যায় না ? কিন্তু আমরা কি আদৌ এই কাজ করি? আমরা পুরুষেরা গোপনে ফূর্তি করার বাসনায় অন্ধকার রাত্রে তাদের শরীরকে ভোগ করি, মজা লুটি, তৃপ্তি মেটাই। নতুন নতুন কাস্টমার ধরিয়ে দিয়ে তাদের নোংরামির পথকে আরও প্রশস্থ করে দিই। তাহলে আসল দোষী কে ?

আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় একজন প্রেমিক খুব অর্থবান, তার সঙ্গে প্রেমালাপ করে সম্পর্কের গভীরে পৌঁছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা অবৈধভাবে আইনি স্বীকৃতি ছাড়াই একাধিকবার স্বেচ্ছায় সহবাস করে থাকে। ফলত যা হবার তাই হয়। কিছুদিন পর মেয়েটি গর্ভবতী হয় এবং মেয়েটি ছেলেটিকে সমাজ স্বীকৃতি দিতে বলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরুষ সঙ্গীটি তার প্রেমিকাকে গর্ভপাত করার পরামর্শ দেয়; তাতে যদি সে রাজি না থাকে তাহলে তার ওপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার চালায়, তাকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হয়। এবং সর্বোপরি তার সঙ্গে বর্তমান সম্পর্কের কথা অস্বীকারও করে থাকে। কেন এমন হয় যখন কোন পুরুষ তার ভালোবাসার সঙ্গীনীকে প্রথম ছোঁয়ার জন্য আকুলপ্রার্থী, তখন কতই না রংবাহারি রসের কথা আওড়ায়, কত রংবেরং-এর কত না জানি স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে সম্মতি ও রাজি করায়। তারপর একটু একটু করে এগিয়ে সহবাস পর্যন্ত এবং ফলাফল গর্ভবতী। সবকিছু হয়ে যাবার পর প্রতিশ্রুতি মতো সে বিবাহের শর্তপূরণের পরিবর্তে বঞ্চনা, অভক্তিবশত 'চায়ের ভারের মতো' চা খেয়ে ভারটিকে ফেলে দেয়। তাহলে এখন কেন তাকে সমাজ স্বীকৃতি দিতে অসম্মত, অস্বীকার করতে হচ্ছে? যদি তোমার মনে এইরকম মতিগতি থাকে যে মধুকরের মতো ফুলের মধু খেয়ে সেখান থেকে উড়ে আবার অন্য কোন ফুলের মধু খাবে, ভোগ করবে, তাহলে এই চিন্তা চেতনাকে আমি ঘৃণ্য বলে মনে করি। তুমি মেয়েটিকে সমাজ স্বীকৃতি দিতে না পারলে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন তাকে ভোগ করলে ? আজ মেয়েটি অসহায়, নিরুপায়, আশ্রয়ের খোঁজে নিজের যোগ্য এবং প্রাপ্য দাবীর কথা তোমায় জানাল এবং গর্ভের সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করায় তাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এখন তবে মেয়েটির গর্ভের সন্তান কোন পিতৃপরিচয়ে জন্মাবে ? মেয়েটিকে এখন পরিবার - পরিজন, সমাজের কাছে অপমানিত, হেনস্থা হতে হবে প্রতিপদে। অবশেষে কোনো কুলকিনারা না পেয়ে বাধ্য হয়ে দুটি অসহায়, নিরপরাধ প্রাণীকে অকালে জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আচ্ছা এমন কেন হবে ? ওরা নারী আমরা পুরুষ বলে? ওরা কি চিরকাল এমনভাবে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হয়েই কি বেঁচে থাকবে?

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় পারিবারিক কোনো অশান্তির কারণে স্ত্রীকে তার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, দেওর দৈনন্দিন প্রহার করছে। অনেক সময় তাকে বাধ্য করা হচ্ছে বাবার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য। কখনো বা যদি এই ব্যাপারে মেয়েটি অস্বীকার বা অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলেও তার উপর চলে দৈনন্দিন প্রহার, খুনের হুমকি। এমনটা কেন হবে ? অগ্নিকে সাক্ষী করে কত সমারোহ, কত ব্যঞ্জন, কত মানুষের সামনে বিয়ের দিন সেই পুরুষটি না প্রতিজ্ঞা করেছিল; আজ থেকে তার স্ত্রীর ভাত কাপড়ের এবং সমস্ত চাহিদা পূরণের সকল রকম দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথভাবে

তৎপর ও সদা সচেষ্ট থাকবে। তাহলে আজ কোথায় গেল সেই দিনের প্রতিজ্ঞার কথাগুলি ? তাহলে সম্পূর্ণটিই কী লোক দেখানো ? এরা কি তাহলে ভালো মানুষের মুখোশ পড়া কোনো ছদ্মবেশী ?

ও ! আমি তো ভুলেই গেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে - আমরা খবরের কাগজে প্রথম থেকে শেষের মধ্যে কোন না কোন পাতায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর রোজ দেখতে পাই। বলুন তো কি ? আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন ধর্ষণ। আচ্ছা এক্ষেত্রে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। ধর্ষণ কি ? কেন করে ? এর জন্য প্রকৃত দায়ী কে ? কি অদ্ভুত প্রশ্ন তাই না .....? আমার ধারণা অনুযায়ী যখন কোন নারী বা পুরুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অবৈধভাবে, নিজের যৌন চাহিদা মেটাবার জন্য ভিন্ন লিঙ্গকে 'বলির পাঠা' বানানো হয় তাকেই ধর্ষণ বলে। এবারে পরের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলতে পারি - কোন একজন বা একাধিক মানুষ যখন কোন একটি সামাজিক ব্যাধির শিকার হয়ে নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ, শালীনতা, সামাজিক রুচিবোধ, ভব্যতা সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মিলিত হবার জন্য চরম লাম্পট্যের স্মরণাপন্ন হয় তখনই সে এই কর্মে লিপ্ত হয়। এই নোংরা, জঘন্য কর্মের পরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় জটিল কাজ। কিছু কিছু সুধী ব্যক্তিরা বলেন এর জন্য মেয়েরাই দায়ী। কারণ তাদের পোশাক পরিচ্ছদের কোনো শালীনতা নেই। রাস্তাঘাটে যাচ্ছেতাই পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তারা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে, আসলে মেয়েরাই ছেলেদের উত্ত্যক্ত করে তাদের চালচলনের মধ্যে দিয়ে। আচ্ছা পাঠকেরাও কি এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন ? যাই হোক আমি তাহলে দুটি উদাহরণ দিই বিষয়টি পরিষ্কার করতে — ধরা যাক, কোনো মিউজিয়ামে আমরা ঘুরতে গেছি, আমরা সকলেই জানি সেখানে অনেক আশ্চর্য ও অতিবিরল জিনিষ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সেখানে গিয়ে দেখলাম দেয়ালের গায়ে লেখা 'কোনো জিনিষে গাত দেবেন না।' তারপরেও কি আমাদের সেই জিনিষটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি স্বপ্ন না বাস্তব ? - আচ্ছা তাহলে এখানে সেই আশ্চর্য বিরল জিনিষটির কি আদৌ কোনো দোষ আছে ? নাকি যে সংরক্ষণ করে এখানে এনে রেখেছে তার দোষ আছে? নাকি 'আমি' অর্থাৎ যার মনের ইচ্ছা জেগেছে জিনিষটিকে ছুঁয়ে দেখার তার কোন দোষ আছে? আরো একটি উদাহরণ দিই - একজন মালী ফুলের বাগান দৈনন্দিন পরিচর্যা করে বাগানে অনেক রংবেরং - এর ফুল ফুটিয়েছেন। সেই ফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে কেউ যদি ফুলটিকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তাহলে দোষী কে ? ফুলটি সুন্দর তাই, না কি যে মালী এতদিন পরিচর্যা করে ফুলের বাগান তৈরী করল, না কি আমার মতো লোভী - যে আত্মসংবরণ করতে না পেরে ফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাকে হাতের মুঠোয় পাবার আশা করছে ? এই বিষয়ে হয়তো আর ভাঙাবার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি জানি পাঠক সকলেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও চতুর। আচ্ছা এই সম্পর্কে একটা কথা বলি - বিশ্বসুন্দরী নাকি বিশ্বসুন্দর কোন শব্দটি শ্রুতিমধুর এবং সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বীকৃত ? নিশ্চয় প্রথমটি। তাহলে সুন্দরী অর্থাৎ নারীদেরকেই সৌন্দর্য বেশী করে শোভা পায়। আসলে এই নারী কে ? এরাতো প্রকৃতি, তাই না। এরা না থাকলে পুরুষের কি কোনো অস্তিত্ব থাকত? আচ্ছা আমাকে অর্থাৎ পুরুষকে কে জন্ম দিয়েছে নারী

না প্রকৃতি? প্রকৃতির জল, মাটি, বাতাস, সূর্যালোক না থাকলে যেমন প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হত না, তেমনি গর্ভধারণের জন্য মা না থাকলে আমাদের জন্মানো সম্ভব হত না। গর্ভবতী অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সন্তান জন্মের ২ বছর পর্যন্ত একজন মাকে প্রতিপদে কতই না আত্মত্যাগ, যন্ত্রণা, কষ্ট সহ্য করতে হয়। আমরা যদিও বিষয়গুলি স্বাভাবিক চোখে দেখি, কিন্তু বিষয়গুলি অত সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক নয়। এই নারীরা জীবনের অধিকাংশ সময়ই সন্তান, স্বামী, শ্বশুরের সেবা করেই অতিবাহিত করে ফেলে। আর আমরা এই প্রকৃতিকেই কীভাবে হরণ করে নিজেদের লালসাকে সংবরণ করতে না পেরে, লাম্পট্যের চরম শিখরে পৌঁছে জোরজুলুম করে নারীর শরীরের সুধা রস তৃপ্তি করে পান করি। একটু একটু করে তার সমস্ত লজ্জাকে নিজের হাতে বলিদান দিয়ে তার যৌবন রসের সবটুকু কীভাবে জোর করে শুষে নিই। আচ্ছা এই 'আমরা' কারা ? আমরা কী পুরুষেরা? এই কী আমাদের পৌরুষত্ব ? ছিঃ !! এটা যদি পুরুষের পরিচয় হয়, তবে আমি নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত, ঘৃণা বোধ করি। আমি একজন পুরুষ, তাই আমার উচিৎ দুর্বলকে ভরসা, বিশ্বাস জুগিয়ে শক্তিশালী করা। আমার উচিৎ নারী অর্থাৎ প্রকৃতিকে হরণ, লুঠ না করে, তাকে যোগ্য সম্মান, মর্যাদা দেওয়া। যদি এই পৈশাচিক বিষয় আমার পরিবারের কোনো মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সাথে ঘটত? তারা যদি এই পৈশাচিক সামাজিক ব্যধির শিকার হত, তখন আমার মানসিক অবস্থা কেমন হয়? ঠিক তেমনি দিনের পর দিন যে নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে তারাও তো কারোর মা, বোন, স্ত্রী বা কন্যা। এরা তো মায়ের জাত, এরা তো আসলে প্রকৃতি। এই নারীকে ধ্বংস করা, লুঠ করা মানে তো প্রকৃতিকে রুষ্ট করা, তাই না? আজ যদি প্রকৃতির জল, মাটি, বাতাস, আলো না থাকত; কোথায় থাকতাম আমরা? আজ যদি নারীরা না থাকত, তার সম্মান না থাকতো। জন্মের পর শিশুকে মাতৃস্তন খাইয়ে, স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে আমাদের বড় করে তুলেছে তারা এইদিন দেখবে বলে? এই নারীরা আর কতদিন বেঁচে থাকবে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হয়ে ? এর থেকে তাদের কী কোন দিনই মুক্তি নেই ?

নৈতিকতা ঃ একটি পর্যালোচনা

- রনজিৎ বর্মন

মানুষের নীতিবোধ ও বিবেকবোধ উপলব্ধি করেই আমার এই যৎসামান্য ভাবনার প্রচেষ্টা মাত্র। আমরা জানি যে নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে উত্তম জীবন যাপন গড়ে তুলতে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখায়। যদিও সমাজে সব মানুষের নীতিবোধ সমান নয়, তথাপি এই বাসনা করি যে নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হলে তা কল্যাণকর ও মঙ্গলময় হয়। আর কল্যাণকর মানুষ নৈতিকবোধের দ্বারা উন্নত জীবন যাপন করে। তাই ভগবদ গীতায় (৬/৪০) বলা হয়েছে —

" ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

অর্থাৎ কল্যাণকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

মানুষের জীবন বিভিন্ন মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত। নৈতিক মূল্যবোধ তার মধ্যে উলে-খযোগ্য। এই নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে শেখায় কিভাবে এবং কেমন করে মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। মূল্যবোধ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে সব রকম মানব জীবন আমাদের কাছে কাম্য হতে পারে না। মানুষ হয়ে কোনো ইতর প্রাণীর ন্যায় আচরণ করা অবশ্যই কাম্য নয়। সৎ ও অসৎ জীবনের মধ্যে পার্থক্য, ভালো মন্দের পার্থক্য নির্বাচন করতে শেখায় নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিকতা আমাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করে যে আমাদের মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়, প্রতারণা করা অনুচিৎ ও অকারণে হিংসা করা মোটেই হিতার্থ নয়। তাই এগুলি আমাদের বর্জন করে চলা উচিত।

নৈতিকতা শব্দটিকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু নৈতিকতা কাকে বলে? বা নৈতিকতা কী? এ প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি দেওয়া বেশ কঠিন। মূলতঃ বিভিন্ন নীতি দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোকপাত করেছেন। বিশপ বাটলারের মতে, নৈতিকতার অর্থ 'জীবনের নৈতিক সংগঠন।' জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে, এমন নীতি অনুসারে আচরণ করা কর্তব্য, যে নীতিকে একই সঙ্গে সর্বজনগ্রাহ্য প্রযোজ্য বিধান রূপে অনুমোদন করা সম্ভব বলে মনে হয়। তিনি নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন আদেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতির ওপরই কোনো কাজের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলে কাজটি 'ভালো' না থাকলে 'মন্দ' বলে বিবেচিত হয়। আসলে নৈতিক শব্দ কোনো কিছুর মূল্যায়ণে সাহায্য করে। তাই এগুলিকে মূল্যবোধক শব্দ বলে। একটা বাক্য নৈতিক বাক্য হিসাবে বিবেচিত হবে যদি এবং কেবল যদি বাক্যটিতে অন্তত একটি মূল্যবোধক শব্দ উপস্থিত থাকে। সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ খারাপ, প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা উচিত ইত্যাদি হল নৈতিক বাক্য।

নৈতিকবোধ প্রকাশিত হয় মানুষের বা সমাজের নীতিবোধের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষের নৈতিকবোধ সমান হয় না। একই সমাজে দেখা যায় বিচিত্র রকমের মানুষ। কেউ চলে নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে, কেউ বা আবার নৈতিক আদর্শকে

তোয়াক্কা না করে অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। নৈতিকমূল্যবোধের অভাবের দরুন সৃষ্টি বিভিন্ন ধরণের অপরাধমূলক কাজকর্ম। তাই প্রয়োজন হয় সঠিক নৈতিক মূল্যবোধের। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছেন —

" এক আদেশে চলে যারা
তাদের নিয়েই সমাজ গড়া।"

যে মূল্যবোধ মানুষের জীবনকে এক আদর্শের পথে পরিচালনা করে তার আলোচনা করে নীতিবিদ্যা। উত্তম জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজন নীতিবিদ্যার চর্চা। এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে নীতিবিদ্যা কাকে বলে? এই নীতিবিদ্যা পাঠের উপযোগিতাই বা কী? এর উত্তরে বলা যায়, যে শাস্ত্র মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে অর্থাৎ কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তা বিচার করে তাই নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বলে নৈতিক আদর্শের মানদন্ডে মানুষের আচরণের গুণাগুণ বিচার করে থাকে অর্থাৎ কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তা নির্ধারণ করে থাকে। এই নীতিবিদ্যা পাঠের ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠে; নৈতিক জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। এর ফলে আমরা সংস্কারমুক্ত নৈতিক জীবন যাপন করতে পারি।

অনেকের মতে নীতিবিদ্যা পাঠ করে মানুষ নীতিপরায়ণ হয় না, আবার নীতিবিদ্যা পাঠ না করেও মানুষ নীতিপরায়ন হয়। কেউ কেউ আবার নীতিবিদ্যা পাঠ করে নীতি ভ্রষ্ট হয়েছে। কাজেই তাদের মতে নীতিবিদ্যা পাঠ প্রয়োজনহীন, সময়ের অপচয় মাত্র - যার কোন নৈতিক মূল্য নেই। যদিও এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।

নীতিজ্ঞান মানুষের বিবেককে, অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং আচার আচরণকে প্রভাবিত করে একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। জীবনে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ তা নীতিবিদ্যা পাঠ করে যত সহজে নির্ণয় করা যাবে, নীতিবিদ্যা পাঠ না করে তা সহজে নির্ধারণ করা যাবে না। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের নীতিবোধ অন্ধকুসংস্কার প্রসূত হওয়ায় তা অত্যন্ত সংকীর্ণ, যার ফলে সে কোনটা ভালো আর মন্দ তা নির্ধারণ করতে পারে না। এদিক দিয়ে নীতিবিদ্যা আমাদের মনকে অন্ধ কুসংস্কার ও বিশ্বাসের সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুক্ত, উদার ও প্রসারিত করে। তাই নীতিবিদ্যার জ্ঞানই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিক পথের অনুসন্ধান দিতে পারে।

সাম্প্রতিককালে নীতিবিদ্যার অপর একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে। এই শাখাটির নাম ফলিত নীতিবিদ্যা। অনেক নীতি দার্শনিক মনে করেন যে, নৈতিকতার আলোচনা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। নৈতিকতার ধারণাটি ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও থাকা দরকার। সমাজের মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত নানারকম নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে র অন্যতম হল আত্মহত্যা, কৃপাহত্যা, বৈষম্য ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী চলছে যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দুর্ভিক্ষ, ধনবন্টনের বৈষম্য ইত্যাদি নানা ধরণের সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যা লাঘব করার জন্য বিশেষভাবে নৈতিক আদর্শের প্রয়োগ অপরিহার্য।

নৈতিক মূল্যের প্রকাশ ঘটে নৈতিক অবধারণের মাধ্যমে। নৈতিক অবধারণের নিজস্ব চরিত্রের জন্য আমরা অনেক সময় মনে করি যে নৈতিক মূল্যায়ণে আমরা একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহার করি যাকে বলা হয় 'নৈতিক ভাষা'। এই ভাষায় আমরা যার বর্ণনা করি তার নৈতিক মূল্য। মানুষের জীবনযাত্রায় এই নৈতিক মূল্য অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবে নৈতিকতা ব্যক্তিজীবনে তথা সমাজ জীবনে স্থান করে নেয়।

মানুষের জীবনকে গঠন করার জন্য একটি আদর্শের অবশ্যই প্রয়োজন যা হবে নৈতিক আদর্শ। যে নৈতিক আদর্শের আলোকে জীবনকে সুন্দর করে তোলা যায় তা সাধারণ মানুষের অজানা। নীতি দার্শনিকগণ নৈতিক আদর্শ নিরূপণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। আর এই দায়িত্বভারের ভাবনাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নৈতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিকদের নৈতিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করতে।

ভারতীয় দার্শনিকেরা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের অনুশাসনের উলে-খ করেছে, যা মানুষের চিত্তশুদ্ধি করে এবং মলিনতা দূর করতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মশুদ্ধির জন্য নিরাশক্তি সর্বজীবে প্রেম, সততা ইত্যাদি মার্গের উলে-খ করেছে। এই দর্শনে যে শীল পালনের উপদেশ আছে তা প্রকৃতপক্ষে চরিত্র গঠনের নির্দেশ দেয়। এখানে বলা হয়েছে বহুজনের হিতসাধনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত জীবনাদর্শ। এই সমস্ত নির্দেশই হল নৈতিক নির্দেশ।

জৈন নীতি দর্শনে বলা হয়েছে ত্যাগ এবং অহিংসা মানুষকে নির্মোহ ও শুদ্ধ করে। আসলে চরিত্র গঠনের জন্য যে সমস্ত সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মূলে রয়েছে একটি পরম নৈতিক আদর্শ যার নাম অহিংসা। অহিংসা থেকেই বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি প্রেমের জন্ম হয়। অহিংসা মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতীয় নীতি দর্শনে নৈতিক ভাবনায় এইভাবে নৈতিক সমাজ এবং মুক্তির ধারণা পরিস্ফূট হয়েছে যা নৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত।

তবে নীতি দর্শনের উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক নীতিবিদরা নানা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। সাম্প্রতিককালের একজন বিখ্যাত নৈতিক দার্শনিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা সক্রেটিসকে নীতি সম্পর্কিত প্রধান ও আদি পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করেন। কারণ কেবলমাত্র 'নীতি' রক্ষার জন্যই তিনি নিজের প্রাণও দিয়েছিলেন। আর কোন দার্শনিককেই দেখা যায়নি যিনি নিজের প্রাণকে ত্যাগ করতে পারেন - কিন্তু নীতিকে ত্যাগ করতে পারেন না। প্রাচীন ভারতীয় চিন্ত াধারায় 'ধর্ম' এবং 'নীতি' অনেক ক্ষেত্রে একাকার হয়েছিল এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে একমাত্র দেখা যায়নি যিনি নীতিরূপ 'ধর্ম' ত্যাগ করতে সম্মত হননি কোন কিছুর বিনিময়ে।

ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতার অবদান অপরিসীম। ব্যক্তির উত্তম ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ঘটে এই নৈতিকতার নিরিখে। নৈতিকতা কেউ জন্মসূত্রে লাভ করেনা। নৈতিকতার উদ্ভব ঘটে সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। তবে নৈতিকতা যেখান থেকেই উৎপত্তি হোক না কেন আমাদের মনে রাখতে হবে নৈতিকতার যেন অবক্ষয় না ঘটে। আমরা যেন এমন নৈতিকতা গ্রহণ করি যা বহুজনের কল্যাণে নিবেদিত হয় এবং বহুজনের সুখার্থে প্রযোজ্য হয়।

পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো শুধুমাত্র মিটিং মিছিল এবং সেমিনার করে সম্ভব হবে না। নৈতিকতার প্রকাশ ঘটাতে হলে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন। সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে নৈতিকতার প্রসার ঘটানোর জন্য। তবে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে নৈতিকতার অবক্ষয় রোধ করা যাবে না।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) ভারতীয় নীতিবিদ্যা — দীপক কুমার বাগচী।
২) নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা — সোমনাথ চক্রবর্তী।
৩) নীতিবিদ্যা — ডঃ নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪) নীতিশাস্ত্র — দীক্ষিত গুপ্ত।
৫) তত্ত্বগত নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা — ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য।
৬) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান — অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মুন্সী, অধ্যাপক রীতেন সরকার, অধ্যাপক ডঃ বেণুলাল ধর।
৭) উপাসনা — সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস।

রাজ আমলে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিকথা

- জয়দীপ পাল

ইতিহাস মানব জীবনের এমন এক বাস্তব সত্য যাকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যোগাযোগ ভিন্ন ভাবের বিনিময়ও অসম্ভব বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ যখন এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হয় তখন এক প্রান্তের সংস্কৃতির সাথে অপর অঞ্চল পরিচিত হয় এবং বলা যেতে পারে এভাবেই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটে থাকে। এই সকল বক্তব্যের যৌক্তিকতার নিরিখে বলা যায় যে, রাজ আমলে কোচবিহার শহর ও শহর সংলগ্ন দিনহাটা অঞ্চলের সাথে সুলভ যোগাযোগ স্থাপন ছিল সময়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা মাত্র। দিনহাটা কোচবিহার শহরের মহকুমা হলেও রাজ শাসনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর প্রধান কারণ হল কোচবিহারের মহারাজেরা ছিলেন আক্ষরিক অর্থে প্রজাবৎসল। আর তার সাথে যুক্ত হয়েছিল মহারাজাদের আধুনিকীকরণের কর্মপ্রয়াস যা এই অঞ্চলের সকল প্রকার ব্যবস্থাপনাকে এক নতুন মাত্রা দান করেছিল। কোচবিহারের আধুনিকীকরণের এই প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ, যা শুধু কোচবিহার শহরের মধ্যেই সীমিত না থেকে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দিনহাটার সাথে সুলভ যোগাযোগ স্থাপন ছিল তারই প্রতিফলন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এক্ষেত্রে কর্মপন্থা ছিল উলে-খ করার মতো। বলাবাহুল্য দিনহাটার সাথে এই সংযোগ স্থাপন প্রকারন্তরে কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে হিতকর প্রমাণিত হয়েছিল। কোচবিহার রাজ্যের এই অঞ্চলের জন্য যে সকল প্রশাসনিক কর্ম ছিল তার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তা ছিল এইরূপ —

কোচবিহারের সাথে মহকুমা অঞ্চল সমূহের উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিষয়ক কর্ম প্রয়াস শুরু হয়েছিল ১৮৭৯ সালে। এসময়ে মেখলিগঞ্জ থেকে দিনহাটা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ শুরু হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে ১৮৭৮ সালের বন্যার সময়ে এই সড়কের কিছু অংশ বিশেষত ধরলা ও সিঙ্গিমারী নদীর মধ্যবর্তী জায়গার ক্ষতি হয়েছিল। তবে নব নির্মিত এই সড়ক পূর্বের তুলনায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং মজবুত। ১. ১৮৭৯ সালেই কোচবিহার থেকে গোসানীমারী পর্যন্ত ৩৫ ফুট লম্বা ব্রীজ সহ একটি সড়ক নির্মিত হয়েছিল। এরপর ১৮৮৩ সালে সাড়ে চার মাইল লম্বা একটি সড়ক নির্মাণ করা হল এবং এর দ্বারা বলরামপুর রোডের দৈর্ঘ্য বর্ধিত হয়েছিল। এই সড়কে চারটি কাঠের ব্রীজ নির্মিত হয়েছিল এবং এর সূচনা হয়েছিল কালজানি নদীর উত্তর দিক থেকে যা মিলেছিল লউকুঠি রোডের সাথে। সরকারী লম্বায় ছিল ১২ মাইল। এই সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন নথীতে বলঅ হয়েছে - 'This road will open direct communications between the north -east cornor. The

most jungly tract of the State of Cooch Beher and the Mogulhat Tramway. উক্ত বছরে চৌধুরীহাট থেকে ধুবরী পর্যন্ত তিস্তা রোডের সন্নিকটস্থ বামনহাট গ্রাম হয়ে একটি সড়ক নির্মিত হল। এই সড়কটি শুধু যোগাযোগ নয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রাজ আমলের প্রশাসনিক নথিতে বিষয়টির উলে-খ পাওয়া যায় (This road will open and tap the South Eastern part of the State of Cooch Beher and give access to the Mogulhat Tramway Station as it will facilitate the traffic from Chowdharihat which is remarkable for its trade in jute.)২. ১৮৯৩ সালে দেওয়ান হাট থেকে বলরামপুর পর্যন্ত ফিডার রোড নির্মিত হয়েছিল। ১৯০২ সালে বক্সা রোডে একটি স্থায়ী সেতু নির্মিত হয়েছিল যা মানসাই নদীর ওপর দিয়ে কাকিনা রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সেতু নির্মাণের ফলে কোচবিহারের সাথে যোগাযোগ অধিকতর সহজ হয়েছিল।৩ এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন কাকিনা রোড রাজআমলে ছিল এই এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রোড। এর পরবর্তী সময়ে দিনহাটা - মেখলিগঞ্জ রোডের উপর বাগদুয়ার ব্রীজ নির্মিত হয়েছিল্ এ বিষয়ে তৎকালীন প্রশাসনিক রিপোর্ট - একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল — 'The estimate for this much needed bridge was Rs. 4,199 of which Rs. 1,753 was expended during the year. Since the close of the year the work has been completed. The bridge is one of three spans of 25'6'' each iron girders on stone piers with a roadway constructed of Baillies patent through." ৪

অনুরূপভাবে সড়ক নির্মাণের প্রক্রিয়া শহরের সাথে সাথে গ্রামের সীমানাও স্পর্শ করেছিল রাজ আমলে। ১৯০৪ সালে দিনহাটার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও যাতায়াত সহজতর করার পদক্ষেপ ছিল উলে-খ করার মত। এবিষয়েও রিপোর্টে যে বিবরণ ছিল তা ছিল এইরূপ — 'Earth work and bridges on the Abutara - Bamanhat road were completed during the year and most of the earth work on the other two roads i.e. Latkabari to Chowdhurihat and Cooch Beher to Baiskuchi. An estimate for Abutara - Bamanhat Road for Rs. 1,309 was framed at first. but this estimate had to be revised on revisev estimate include the cost of the latkabari - chowdhurihat road and the total expenditure comes t Rs. 2,631." ৫ উক্ত বছর বলরামপুর রোডের ওপর ৪৫৮ টাকা ব্যয়ে পূর্বের বাঁশের সেতুর পরিবর্তে একটি পাকা ব্রীজ নির্মিত হয়েছিল।৬ ১৯০৭ সালে বন্যার ফলে বেশ কিছু সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজাদেশে সড়ক সমূহ মেরামত করার জন্য ১৩,৬৭৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই বরাদ্দের ফলে যে সব সড়ক পুনর্নির্মিত হয়েছিল তারমধ্যে ছিল - কাকিনা রোড (এই সড়কে সাত স্থানে গর্ত হয়েছিল), দিনহাটা - মেখলিগঞ্জ - রংপুর রোড (এই সড়কে বৃহদাকার গর্ত হয়েছিল)৭। ১৯০৮

সালে দিনহাটা- মেখলিগঞ্জ সড়কের ওপর ৬ ফুট লম্বা একটি লোহার সেতু নির্মাণ করা হল। এখানে যে বাঁশের সেতু ছিল তা কিছু দিন পর পর মেরামত করা হলেও আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী।৮ উক্ত বছর অনুরূপভাবে সাহেবগঞ্জ রোডের ওপর দুই ফুট লম্বা এবং বলরামপুর রোডের ওপর তিন মাইল যে ব্রীজ নির্মিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোচবিহার - এর প্রশাসনিক নথি থেকে জানা যায় — three wooden bridges in the Kakina Road first portion and onebig brige on the 6th mile became old and rotten and the latter collapsed. It was proposed to replace them by masonry culverts. Two pucca culverts 10ft. and one 3 spansof 12ft. were constructed at a cost of Rs. 3,071 against an estimate of Rs. 2,994."১০. ১৯১০ সাল নাগাদ যে সকল সড়কের ওপর বাঁশের সেতুর জায়গায় স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল সেগুলি হল ----১১. (ক) রাজখোরা (দেওয়ানহাট - বলরামপুর রোড) ৫ মাইল, (খ) মদনদারা ৭ মাইল এবং (গ) ঝানঝানিয়া ৬ মাইল (দিনহাটা - মেখলিগঞ্জ রোড)। উক্তবছর বলরামপুর রোডের ওপর নিম্নলিখিত ব্রীজ সমূহ নির্মিত হয়েছিল ১২

(ক) ১০ ফুট স্প্যান গিরডার ব্রীজ ৭ মাইল দূরত্বে
(খ) ১৫ ফুট স্প্যান গিরডার ব্রীজ ৮ মাইল দূরত্বে
(গ) ৩১ ফুট স্প্যান গিরডার ব্রীজ ৯ মাইল দূরত্বে
(ঘ) এবং (ঙ) দুটি ম্যাসনারী গিরডার ব্রীজ, ২ দুটি স্প্যান ঝার প্রতিটি ১৫ ফুট।

এভাবে সড়ক পথের পাশাপাশি রেলপথেও দিনহাটা রাজ আমলে গুরুত্ব পেয়েছে। এবিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলা যায় তৎকালীন প্রশাসনিক নথিতে (১৯১২-১৩) উলে-খিত রয়েছে যে কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের সফল যাত্রা দিনহাটার পক্ষেও বিশেষত বন্দর যোগাযোগে এক নতুন মাত্রা এনেছিল। দিনহাটা অঞ্চলের রেল পরিষেবা রাজ আমলে ছিল উলে-খ করার মত। ১৮৮৯ সালে কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে তার যে যাত্রা পথ শুরু করেছিল তা কোচবিহার শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকেও সংযুক্ত করেছিল। ১৮৯৪ সালে রেলপথ বিস্তারের নব পরিকল্পনানুযায়ী কোচবিহার শহর ও দিনহাটার যোগাযোগ সুগম করার জন্য তোর্ষা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে ইস্টার্ন রেলওয়ে বোর্ডের আধিকারীকেরা এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন তোর্ষা নদীর বন্যার বিষয়টি।১৩ ফলস্বরূপ ওডলিং ও আন্ডারসন নামে পরিচিত দুজন রেল আধিকারীকেরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আসম্মত হন। ঐবছর কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের জন্য ফকিরকাটিয়া এবং ভেটাগুড়িতে দুটি ফ্যাগ স্টেশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ হয়েছিল কোচবিহার স্টেট রিজেন্সী কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। ১৮৯৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোচবিহার রেলওয়ে পরিষেবায় যাত্রী সুরক্ষার জন্য তেমন কোনো উলে-খযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এসময়ে চৌরাহাট, গিতালদহ ও দেওয়ানহাট স্টেশনে একজন করে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছিল।১৪ ১৮৯৮ সালে রেলপথ ন্যারোগেজ থেকে মিটার গেজে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ১৯৫৫ - ৬০ সালে লালমনিরহাট - গিতালদহ লাইনে বুরিমারী থেকে লালমনিরহাট হয়ে গিতালদহ পর্যন্ত রেল পরিষেবা

বিস্তৃত ছিল।১৫ শুধু রাজআমলেই নয়, আধুনিককালেও যদি দিনহাটা এলাকার রেলপরিষেবা ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বলা যায় বর্তমান-এ রেলপথ কোচবিহার ও দিনহাটার মধ্যে নিম্নরূপ .... দিনহাটা স্টেশন ০ কি.মি., দিনহাটা কলেজ স্টেশন ২ কি.মি., ফলিমারি ৭ কি.মি., ভেটাগুড়ি ৯ কি.মি., নিউগিতালদহ স্টেশন ১২ কি.মি., দেওয়ানহাট ১৩ কি.মি., আবুতারাহাট ১৬ কি.মি., বামনহাট ২৩ কি.মি., নিউ কোচবিহার ২৭ কি.মি.। এইভাবে জলপথে যে নব দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল তার ফলাফল সম্বন্ধে নথিতে বলা হয়েছে .....১৬। the Chowrahat Bunder in Dinhata is another prosperous bunder in the state of Cooch Beher, the importance of which has been considerably enhanced by the opening of the Cooch Beher State Railway. The bunder stands on the Railway and the station was called after it, the name, has, however, been lately changed to Dinhata as being the name of the sub-divisional head - quarters.The market place has been improved by theerection of substantial tin sheds at large expenditure for the convenience of the temporary shop - keepers. শুধু তাই নয়, এসময়ে দিনহাটা, বলরামপুর বন্দর সম্বন্ধে জানা যায় যে, জুট উৎপাদনের বাজার হিসাবে এসকল বন্দর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।১৭ ১৯১৪ সালের পরবর্তী বছরগুলিতেও বন্দর হিসাবে জলপথে বিশেষত দিনহাটার বাণিজ্য ক্ষেত্রে বলরামপুর, দেওয়ানহাট ও চৌরাহাট বন্দর বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল।১৮

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোচবিহারে রাজ আমলে জলপথ ও রেলপথ সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল এবং শুধু তাই নয় বাণিজ্যক্ষেত্রে যে আদিকাল থেকে কোচবিহারের বন্দর সমূহ বিশেষত দিনহাটার বন্দর সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার উলে-খ কোচবিহারের প্রশাসনিক রিপোর্ট থেকেও জানা যায়।১৯ দিনহাটার চৌরাহাট ও গোবরাছারা বন্দর ছিল এই এলাকার বাণিজ্যের প্রধান জলপথ যেখান থেকে কোচবিহারের অন্যান্য বন্দর যথা চ্যাংরাবান্দা, লওকুঠি (বক্সিরহাট বন্দর) হয়ে অসম প্রদেশ পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ চলত। পণ্য সামগ্রীর মধ্যে অবশ্যই তামাক ও পাট ছিল অন্যতম।২০ এছাড়া দিনহাটার সাগরদিঘীহাট, আদাবারিহাট ও ভেটাগুড়ি বন্দর হিসাবে ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জলপথ প্রাচীনকাল থেকেই একটি অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম হলেও আধুনিককালে এর ব্যবহার কোচবিহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কমেছে। যদিও স্থানীয় টাপুরহাট অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপথের ব্যবহার হয় তা সত্ত্বেও বলা যায় দিনহাটা অঞ্চলে এর ব্যবহার রাজ আমলে যেমন হত, রেল পরিষেবা চালু হবার পর এর গুরুত্ব কমেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজ আমলের দিনহাটার যোগাযোগের বিষয়ে একটি বিষয় উলে-খযোগ্য যে কোচবিহারের প্রজাবৎসল মহারাজেরা নগরায়নের তথা আধুনিকীকরণের পরিধি যে শুধু সদর কোচবিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি তা স্পষ্টতই বোঝা যায় এই সময়ে কোচবিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের ইতিহাস আলোচনার মধ্য

দিয়ে। এদিক থেকে বলা যায় - কোচবিহার -এর মহারাজাগণ দিনহাটার ন্যায় মহকুমা অঞ্চলের উন্নয়ণেও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা এই অঞ্চলকে শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রেই নয় বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিকক্ষেত্র হিসাবেও বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছিল বললে অতিরঞ্জিত করা হবে - একথা বলা যায় না। সুতরাং বলা যায় দিনহাটা কোচবিহারের ইতিহাসে বিশেষত কোচবিহারের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে পরিগণিত। এই ধরণের পটভূমিকাই বর্তমান যুগে - এর ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে।

তথ্যসূত্র নির্দেশ ঃ —

১) অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ্ দ্য কোচবিহার স্টেট্ (১৮৭৮ - ৭৯), পৃ : - ৭০
২) অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ্ দ্য কোচবিহার স্টেট্ (১৮৮২ - ৮৩), পৃ : - ৭৬
৩) অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ্ দ্য কোচবিহার স্টেট্ (১৯০১ - ০২), পৃ : - ১৮
৪) অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ্ দ্য কোচবিহার স্টেট্ (১৯০২ - ০৩), পৃ : - ১৭
৫) অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ্ দ্য কোচবিহার স্টেট্ (১৯০৩ - ০৪), পৃ : - ১৬

জীবনানন্দ - কাব্যবীক্ষণ -১

- বিকাশ মৈত্র

কবি জীবনানন্দের কাব্য ভাবধারাকে এ পর্যন্ত অনেকেই - সমালোচক - পাঠক - অধ্যাপক এমন কী সৃষ্টিশীল মানুষ খাপছাড়াভাবে দেখে এসেছেন ও বিশে-ষণ করেছেন বলে মনে হয়। জীবনানন্দ কবি হিসাবে বহুল পাঠ্য এবং এর পাঠকবর্গ তৈরি হয়েছে - ঐ সময়ের নামকরা কবিবর্গ - সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসুকে যতটা নয় - এ পরিচিতি ততটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুল পরিচিত নয়। যতটা জীবনানন্দ দাস - সাধারণ মানুষের সাথে পরিচিত। এর সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কারণ হল জীবনানন্দের কবিতা সুখ পাঠ্য ও শ্রুতিমধুর। বুঝে বা না বুঝেও কবিতা পাঠ করে ও শুনে আনন্দ পাওয়া যায় জীবনানন্দের কবিতায়। ভাবকল্পনা - থেকে থেকে ছোটো ছোটো রূপকল্প, চিত্রকল্পগুলো এত মধুর - যে পাঠকের চিত্তে তা প্রসাদগুণে আপ্-ত হয়। কবিতায় শব্দচয়নে কোনো পান্ডিত্য নেই। নেই কোনো মুন্সিয়ানা। স্বাভাবিক ভাবে সহজ সরল ধারায় ঝর্ণার অবিরাম বেগের মতন কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টির কোটার মতন ঝরে পড়া শব্দ ভান্ডারে সমৃদ্ধ এই কবিতাগুলো। কবিতাগুলির সার্থকতার প্রাথমিক প্রধান রস - ভালোবাসা। জীবনানন্দের কবিতার উত্তরণ মূলত রসসৃষ্টির দিকে।

অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত - সমালোচক বিশে-ষক কিছুটা বিশে-ষণ করেছেন - যা এখনও পর্যন্ত কবিকে চেনার পক্ষে পথ সহায়ক। জীবনানন্দের উপর আলোচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধ অনেকেই করেছেন। কিন্তু সরল অধ্যায়ে জীবনানন্দকে বোঝবার ও বোঝাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হল কবিতাগুলো পড়া ও বোঝা। স্বল্প পরিসর জায়গায় সময় ও যুগকে ধরে আলোচনা না করলেও চেনা যাবে না কবিকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যস্থানে কবিতাকে আলোচনা করলে অনেক সহজবোধ্য হয়। পৃথিবীর যে কোন কবির ক্ষেত্রে যা সত্য - তা জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রেও তা একই। প্রকৃতিপ্রেম - দেশপ্রেম - মন জাতীয়তাবোধ আবার আন্ত র্জাতিকতার দিশা জীবনানন্দের কবিতাগুলোতে আছে। এটাই স্বাভাবিক।

আধুনিক যুগের মন ও মননকে বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে - একটা অস্থিরতা কাজ করছে জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে। এটা অস্থিরতা কবির ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট। কবি ও শিল্পীর জীবন মানে তো তার সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিতেই তা প্রমাণ। যুগের অনুভব যুগ যন্ত্রণার শিকার সকলেই। চিত্রশিল্পী - চিত্রের কর্ম ভাঙছেন। স্বাভাবিক কারণ - মনের ও মননের ফসল। সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থাকরণ ও তার পুঁজিব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক জটিলতা। সেই জটিলতা মন ও মননে উপস্থিত হয়েছে - সাহিত্যে শিল্পে তো বটেই - গোটা সমাজব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ - কোথাও তা স্পষ্ট কোথাও তা অস্ফূট। সামন্ত জমিদারি ব্যবস্থার কুহকের জালে শিল্প সাহিত্যের অন্তরজগৎ কুয়াশাচ্ছন্ন। কোথাও স্থির কোথাও অস্থির। কোনো গতানুগতিক শিল্পতত্ত্বের আওতায় তাকে ফেলা যায় না।

এক্সপ্রেশে নিজস্ব রিয়েলিজম - সুরিয়ালিজম - আইডিয়ালিজম্ - সোসালিস্টিক রিয়ালিজম - রোমান্টিসিজম কোনো ধরাবাঁধা পথে জীবনানন্দের কবিতাকে ছুঁতে গেলে সেটা হবে অন্ধের হস্তিদর্শনের মতন। কাল কবির অন্তর্জগতকে কীভাবে আলোড়িত করেছে - কবির ব্যক্তিসত্ত্বা কীভাবে তাকে গ্রহণ করেছে - 'মন' আর 'মনন' কীভাবে শিল্পে গাটছাড়া বেঁধেছে - সেটা উপজীব্য বিষয়। কবির কোন কাব্যগ্রন্থ একক সত্ত্বায় সন্নিবিষ্ট নয়। 'বনলতা

সেন' কোনো একক প্রেমের কাব্য নয়। রূপসী বাংলা কোনো দেশপ্রেম বা প্রকৃতির এককতায় বিশ্বাসী নয়। ধূসর পাণ্ডুলিপি কবির কোনো একক মনের দর্শনমাত্র নয়। ঝরা পালক, সাতটি তারার তিমির মহাপৃথিবী আলাদা করে সার্বভৌম সত্ত্বা বিশেষ নয় কিংবা বেলা অবেলার কালবেলা - কোনো একক মৌলসত্ত্বা থেকে কবিতাগুলো গ্রথিত হয়েছে।
সমস্ত কাব্য কবিতাগুলি একক কোনো মৌলিক নীতির প্রতিফলন নয়। এরা সকলেই মিলে মিশে একাকার। কাব্যগুলিকে এককভাবে চেনার চেয়ে সঠিকভাবে চেনা, অনেক সহজ হয়। একক জাতি সত্ত্বায় কবিতাগুলি বিশিষ্টতা পায়নি বরং সেগুলির সবগুলোই আন্তর্জাতিক ভাবনায় ভাবিত। আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতন রূপ - অরূপের, সীমা - অসীমের আকারে বেঁধে দেওয়া যায় না। কোনো একটি কবিতা সকল কবিতার অনুরূপ। কিংবা বলা যেতে পারে সকল কবিতাই কোনো একটি কবিতার আশ্রয়। একই আধারে বহুত্বের অঙ্কুরোদগম্ যা প্রকাশ বলা যেতে পারে। কিন্তু এটাও সত্য প্রত্যেক কবিতা এক একটি গোটা কবিতা - কবির মনের ভাবের এক একটি সুনির্দিষ্ট রূপ - রসরূপ - রসের আধার। সেই হিসাবে কবিকে খুঁজে দেখা যাবে সকল আশ্রয়ে - আলাদা আলাদা করে।

নিছক প্রকৃতি প্রীতি, প্রকৃতি প্রেমে তার কবিতার উপজীব্যতা নেই। যেখানে প্রকৃতি প্রেম - নিসর্গ চিত্ররূপ সেখানে উপস্থিত মৃত্যুর মতন চরম সত্যের ছায়া। আবার ইতিহাস পুরান যেখানে সেখানে নির্ভয়ে এসে দাঁড়িয়েছে - প্রকৃতির প্রতিরূপতা, সেখানে ক্ষুন্ন হয়নি। বরং আলাদা একটা ভাব তন্ময়তা করেছে। তাকে দীর্ঘ করেছে। "হাজার বছরের পথ হাঁটাকে, কিংবা গাঙ্গুরের জলে ভেসে চলাকে আরো দীর্ঘায়িত করেছে। কবিকে এখানে চিনতে অসুবিধা হয় না। না তিনি প্রকৃতির , না তিনি প্রেমের, না তিনি মৃত্যুচেতনার, না তিনি ইতিহাস পুরাণের - রোমান্টিকতার আলোছায়া - তাতে থেকেও নেই - বরং জীবন এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে - জীবনের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত আলো অন্ধকারের ভাব বিনিময় খেলা তার প্রতিফলন জীবনানন্দের সমগ্র কবি জীবনের বৈশিষ্ট্য। "রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি" - জীবনবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। বাস্তব জীবনের এতো অসাধারণ প্রকাশ, সেযুগ - এযুগের মধ্যে বিরল। বিরল কবি প্রতিভার কবি তিনি। বাঁধা পথের কবি তিনি নন। হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। এমন কী প্রকৃতির সৌন্দর্য মন্থনে কবি সেকাল - একালকে অতিক্রম করে এক মহাযুগ সৃষ্টির সাক্ষর রেখেছেন। মূলত রূপসী বাংলার কবিতাগুলোতে পৃথিবীর আর সব দেশের প্রকৃতির আলোছায়াকে অনুক্রেমে ধরেছেন - বা বাঁধিয়ে রেখেছেন। সেখানেও প্রকৃতির রূপ এসেছে পুরাণ - ইতিহাস সমাজকে কালকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে। এ এক অন্যতর রূপ। "এই পৃথিবীতে একস্থান আছে - সবচেয়ে সুন্দর করুণ।" প্রকৃতির বর্ণনা, জন্মভূমির প্রতি প্রীতি, মমত্ববোধ এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি। "আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি"। কিংবা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" কিংবা "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" কিংবা "কোন দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল", কিংবা "ঐটি আমার গ্রাম আমার গ্রাম আমার স্বর্গপুরী, ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি - এ পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু জীবনানন্দ যখন বলেন — "সুন্দর করুণ" - করুন শব্দ ব্যবহারটি উলে-খ্য। জীবনানন্দ যতটা প্রকৃতির কবি বলে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা উঠে পড়ে লাগি ততটাই তিনি তার বিপরীত। কোনো স্থানিক বিবরণ ও তার প্রকাশ-ই যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গেলেই ঠকতে হবে। প্রকৃতির কাঁচা গন্ধ যেমন তার কবিতার মধ্যে আছে বাংলার গ্রাম প্রকৃতি যত বেশি সজীব হয়েছে ততটাই ঐ একই কবিতায় তাকে হারাতে হয়েছে। একক মহিমায় কোন ভাবই

প্রতিষ্ঠা পায়নি। বাংলা তথা বরিশালের - অধুনা বাংলাদেশের প্রকৃতির ভিজে নরম সবুজতার গন্ধ তার কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটেছে। কিন্তু সেখানেই কবিতা শেষ হয়ে যায় নি।

জীবনানন্দের প্রেম ভাবনা কোনো একক ভাবনা নয়। প্রেম প্রকৃতি - মৃত্যু একাকার। প্রেম ইতিহাস রোমান্সের এক বাঙ্ময় রূপ। প্রেম পুরাণের মেলবন্ধনে মহাকালের ভাবনা - বিজ্ঞানের সত্যরূপ দর্শন হয়ে উঠেছে। কালিদাসের কাব্যের স্থান কাল প্রেমকে এক আলো আঁধারের রূপ বন্ধনে মূর্ত করেছে। বাস্তব বন্ধনের কোনো নারী জীবনানন্দে নেই। বনলতা সেন , অরুণিমা সান্যাল সুচেতনা মৃণালিণী ঘোষাল এরা কোনো বাস্তবতার নারী নয়। কবি এদেরকে নিয়ে এদের ছাড়িয়ে এক অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছেন - বনলতা সেন সব ঋণ শোধকরা মৃত্যু রূপিনী - । নারী নয় এরা প্রেম ভাবনায় গড়া অবিকল মানুষ নয় - মানুষীর মতন। আসলে আধুনিক কালের মননের মধে যে প্রেম ও মৃত্যু দুই সত্ত্বা একই সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্যই হল অস্থিতি। অস্থিরতা প্রত্যেক জীবনের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। প্রেম মৃত্যুর আলোছায়ারর অস্থিরতা কবি জীবনানন্দের কাব্য চেতনার তথা জীবন চেতনার বৈশিষ্ট্য। জীবনবৃত্তের আবর্তনে প্রেম উঠে আসে বিদ্যুৎলতার মতন চমকে চমকে। "এতদিন কোথায় ছিলেন ?" বেশ একটা প্রেমের শিহরণ পাওয়া যায়। আপনি সম্বোধনে চেনা - অচেনার প্রচ্ছায়া - শিহরিত করে পাঠককে। দেহজ প্রেমের কণামাত্র নেই এখানে। দেহজ প্রেমকে তিনি বলেছে - "ভালোবেসে দেখিয়াছি মোর মানুষেরে / ঘৃণা করে দেখিয়অছি মোর মানুষেরে।" মোর মানুষ শব্দ ব্যবহার কবি সচেতন ভাবেই করেছেন - শরীরী গন্ধ আমার জন্যই।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার অশরীরী রূপের সাথে তুলনা করা যায় ঠিকই। - কিন্তু একদম একরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের তাত্ত্বিকতায় প্রেমকে উপস্থিত করেছেন রোমান্টিক ভাবনায়। তিনি বললেন - "ভালোবেসে প্রেমে হও বলি, চেয়ো না তাহারে, হৃদয়ের ধন কভু না যায় ধরা দেহে।" তাকে ধরতে গেলেই ফস্কে যাবে। বন্ধন মুক্তির প্রজ্ঞায়, পরাবাস্তবতায় প্রেম অশরীরী বিদেহী। বিরহ প্রেমের সুদূর পথের চলার ঝলক ওঠা প্রেম। জীবনানন্দের কাব্যের প্রকৃতিতে প্রেমের প্রচ্ছায়া আছে কিন্তু তার স্থিরতা নেই। "পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়।" প্রেম আর ভালোবাসা - একই সঙ্গে জীবনের আশা ও ঘৃণা - কবি নারীর কাছে প্রেমের আশ্রয় প্রার্থনা করেও তা পান না আসলে সেটাও কবি জানে যে প্রেম ক্ষণিকের আশ্রয়। কবি চান না যে প্রেম আঁকড়ে ধরেই তিনি বাঁচবেন - আসলে এ যুগের আশ্রয় তো কোনো মানুষের কাছেই পাওয়া যায় না। একটা বিশ্বাসহীনতা বিষ বাষ্পের মতন গোটা সমাজে ছেয়ে ফেলেছে। দু-দুটো বড় যুদ্ধের ফল সুদূর প্রসারিত। সেটা একুশ শতকেও ছাড় পাচ্ছে না। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে নারী এসেছেন পথ বিশেষ্য পদ রূপে। এবং তা শুধু বনলতা সেন নাম ছাড়াও সুদর্শনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সবিতা, সুচেতনা। এছাড়াও সর্বনাম পদ হিসাবে - তুমি, আমাকে, তুমি তোমাকে। এইসব কবিতায় নারীর প্রেম মানবজীবনের আশ্রিত প্রেম, কখনো সেই প্রেম আবহমান কালের সৌন্দর্য চেতনা, প্রকৃতির অনন্যরূপের রেশ ধরে এসেছে। সুচেতনা কবিতার প্রেম চেতনা মানব হৃদয়ের মূল্যবোধের চেতনা যা বর্তমান যুগের মানুষের হৃদয়ে অবক্ষয়িত।

মানুষ ও তার ধর্ম এবং আগামী নতুন যুগ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত

- কুমুদরঞ্জন দাস

সুদূর অতীতকাল থেকে এ বৈচিত্রময় পৃথিবীকে মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখে আসছে, ঠিক তেমনিভাবেই চিনতে চেষ্টা করেছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। তবে তার বুদ্ধিবৃত্তির স্তরটি যদিও এতটা উন্নতমানের ছিল না যে বাইরের অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করে অন্য কোনও সত্যের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাবে। তার কৌতুহলী মন সুদূর প্রসারী বলেই তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফলশ্রুতিই হয়েছিল ধর্মানুভূতির প্রথম সোপান।

মানুষের এই উপলব্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষত তার শিশুসুলভ সারল্য। জর্জ টমসন এই অবস্থাকেই তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছেন — " In contrast civilised thought , it is concrete, subjective, deficient in the power of abstraction. এ ধরণের এক নীবিড় কুয়াশাচ্ছন্নতার মধ্যে থেকেই ধর্মচেতনার উষাকাল সূচিত হয়েছে। তাই ধর্ম চেতনার জন্মলগ্নেই সেটি তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ খ্রীষ্টধর্মের প্রথম বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশে-ষণ করতে গিয়ে ধর্মের এই সহজ ভাবমূর্তিটির কথাই ব্যক্ত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে যখনকার কথা উলে-খ করছি তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। মর্ত্যভূমির প্রতিটি ধূলিকণায় ছড়ানো ছিল তার প্রত্যক্ষ জীবনের মূল প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির গহন অরণ্য, উচ্ছল সমুদ্র, আলোকোদ্ভাসিত অনন্ত আকাশ, অগণিত নক্ষত্রমালা, সন্ধ্যা সকাল, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভাবিত গাছপালা, ফুল-ফল, নদী, পাহাড় ও সমুদ্র এসব নিয়েই ছিল তার প্রতিক্ষণের প্রাত্যাহিক জীবন। প্রকৃতির এই অবাধ রহস্যময়তার মধ্যে সে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের অসীম শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে। প্রকৃতি তাই সকল জীবের কাছে পরমারাধ্য। তাই মানুষের নিকটও প্রকৃতি নিত্য প্রাণময় ও চিরন্তন সত্য বলে সর্বজন স্বীকৃত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এ অবস্থানটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন - "আমি ছিলাম অতি ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র-সূর্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।" প্রকৃতির যে দুর্দমনীয় ক্ষমতাকে মানুষ বুঝে উঠতে কিংবা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, যেমন - প্রচন্ড খরা বা অনাসৃষ্টি, ভয়াবহ বন্যা বিধ্বংসী ভূমিকম্প এবং প্রবল জলোচ্ছাস ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এসব দৈব দুর্বিপাকের মধ্যেই মানুষ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সহাবস্থানের কল্পনা করে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে এবং অবলীলাক্রমে মানুষের মনে জেগেছে এক আধ্যাত্মিক চেতনা। প্রকৃতির কবলে অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার চিরন্তন বাসনা ও একান্ত আকুতি পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তৈরি হল বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং নানা সংস্কারের বিধি-বিধান। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক কারণে প্রকৃতি আরও বেশি মূর্তিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে মানুষের চিরন্তন আকাঙ্খার আলোয়। জেমস্ জর্জ ফ্রেজার এই পর্বের এক সুন্দর ও মনোরম ছবি এঁকেছেন তাঁর "দি গোল্ডেন বাউ" নামক গ্রন্থখানিতে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ছিল মানবজীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সুতরাং ধর্মের তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর। বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস্ বেকান মন্তব্য করেন — " Depth in philosophy brong the men's minds about to Religion". এ কথাটি যুক্তি সহকারে বিশে-ষণ করলেও স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করা যায় না। কারণ, ধর্ম ছিল তখন সমান্তরাল বিহীন। কাব্য দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা মানুষের পূর্ণ বিকশিত চেতনার সমস্ত বৈচিত্র ও বৈভব সে সময়ে ছিল প্রায় অজ্ঞাত। এই ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পুরোহিত সম্প্রদায় সমস্ত সামাজিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রনাধীনে রেখেছিলেন। এককথাই তাঁরা ছিলেন দন্ডমুন্ডের কর্তা। ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মের সঙ্গে পুরোহিতদেরও বিশেষ সমীহ করে চলতে লাগলো।

এরই ফলশ্রুতি হিসাবে গোটা সমাজব্যবস্থায় শুরু হলো "পুরোহিততন্ত্র।" চারিদিক থেকেই এই পুরোহিততন্ত্রই সাধারণ মানুষকে তার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো। এ প্রসঙ্গে সেন্ট অগাস্টিন বলেন — " There is no salvation out-side the church." পুরোহিতদের হাত ধরেই প্রতারণা এবং দমন পীড়ন ধর্মকে তত্ত্বাবধান করতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ এক অভ্রান্ত বিশে-ষণ করে বলেছেন - " Deception by the priests soon becomes inaveitable in their further development."

প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বিশেষত ভারতবর্ষে ধর্ম মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে চলেছে। ১৮৫৩ সালের ২ জুন কার্লমার্কস এঙ্গেল্সকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন - প্রাচ্যের দেশগুলির ইতিহাস পড়লে যা কিছু জানা যায়, তা কেবল ধর্মেরই ইতিহাস। তিনি ভারত বিষয়ক একটি প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট করে লেখেন ভারতে কিছু মানুষের বিলাস ও সম্পদের বহু প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি আবার অনেকের নিদারুণ দারিদ্রের মূল কারণ হিন্দু ধর্মের নিজস্ব বৈষম্য ও বৈপরীত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হিন্দুধর্ম কোনও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম নয়, আবার জৈন কিংবা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় কোনও একক ব্যক্তির দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বহুবার নানারকম পরিবর্তনন এসেছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ বর্ণাশ্রমের প্রবর্তনের সাথে সাধারণ মানুষকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। নারীকেও তার সহজাত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য সব ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও এক চুড়ান্ত অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করেছে। মৌর্য শাসন থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন অসহিষ্ণুতার কষাঘাতে চলার পথ অনেকটা পিচ্ছিল হয়েছে। এছাড়া নিজস্ব ধর্মের শাখা-প্রশাখা শৈব, শাক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যেও সংঘাত ও অসহিষ্ণুতার অজস্র দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তবুও হিন্দুধর্ম এক বিশাল মহীরুহের ন্যায় নানা শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। সুতরাং নানা বৈচিত্রে ও বৈপরীত্যে এ ধর্ম অত্যন্ত জটিল ও বিপুলায়তন করেছে। ক্রমান্বয়ে হিন্দুধর্মের প্রাঙ্গণটি মুখরিত ও প্রশস্ত হয়ে উঠেছে অদ্বৈতবাদী বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী ও নানা লোকায়ত দর্শনের বিচিত্র কলতানে।

কিন্তু ধর্মভীরু অদৃষ্টবাদী ও সংগ্রামবিমুখ মানুষেরা ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকদের দাসবৃত্তি করেই মোক্ষলাভে সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন। মূলতঃ এদের নিয়েই জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে কালক্রমে প্রতিবাদী মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে একদিকে যেমন জৈনধর্ম নিঃশেষিত হতে চলেছে, অন্যদিকে

তেমনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও ক্রমশঃ সংখ্যালঘু ও নগন্য হয়ে পড়েছে। হিন্দুধর্মে গুরু পুরোহিত নির্ভরতার অপর একটি প্রধান কারণ হলো সংস্কৃতের ন্যায় এক কঠিনতম ভাষার আবরণে অগাধবিশ্বাস, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি সমস্তকিছুকেই গচ্ছিত রাখার প্রয়াস। বিশেষত সাধারণের বোধগম্য নয় এবং নিত্য ব্যবহারের অযোগ্য একটি ভাষার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই সত্যের প্রকৃত ইঙ্গিত কে দিতে পারে ? সমাজের যে সংকীর্ণ অংশে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছিল সেই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এ ভাষাটিকে "দেবভাষা" রূপে আখ্যা দান করে সাধারণ নিম্নবর্ণীয় সমাজকে দৃঢ় পদক্ষেপে দূরে সরিয়ে রাখার অশুভ প্রয়াস চালিয়েছে।

অপরপক্ষে নতুন প্রাণের পরশে ও সুমধুর ব্যবহারে সততঃ গতিশীল না থাকার কারণে সংস্কৃতাশ্রিত ধর্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ সেই জীর্ণ লোকাচার। "যে জাতি চলে না কভু তার পথ ধরে/ তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।" রবীন্দ্রযুগে "প্রবাসী" পত্রিকায় তাঁর "অচলায়তন" প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই সেটি এক প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রসঙ্গতঃ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ অমলকৃষ্ণ হোমকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তার কিছু অংশ পাঠ করলে ধর্মের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। বিশেষ করে "ধর্মের নামে, সমাজের নামে যে বিশাল কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি, সেই বন্দীশালা থেকে আমাদের সমাজ সংস্কার, যুক্তিবুদ্ধি ও অভ্যাসকে মুক্তি দেবার আহ্বানটিই মূলতঃ অচলায়তনের আহ্বান।" বিশেষত এই মুক্তির জন্যই রবীন্দ্রনাথ যে কোনও আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

সমাজের সাধারণ মানুষকে ধর্মের দুর্বার মোহ থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপারে মার্কসীয় চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে অনেক ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় মহামতি লেনিন এবং স্তালিন উপরোক্ত সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তবে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে গভীর সতর্কতা ছিল। লেনিন ধর্মের জীবাণুবহনকারী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। " Since the hold of religion rested onn the play of economic forces, the work-ing class could not be protected against it by declarations, out only by the struggle against capitalism, and unity in this was of far more importance than unanimity over the affairs of the heaven."

আবার স্তালিন ও Marxism এবং National Question -এ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন - ধর্মকে সমস্ত রকম প্রগতির পরিপন্থী বলে সমালোচনা করতেই হয়, তবে জোরপূর্বক ধর্মাচরণ বন্ধ করে দেবার সময় তখনও সোভিয়েত রাশিয়ায় আসেনি। কারণ, মানুষকে তার স্বগৃহে, সমাজে, স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বকীয় ভূমিকা পালন করতেই হবে। "Religion must be approsed actively, there is no sense in waiting for anything to die out of its own accord."

আমাদের দেশে ধর্মের ধারাবাহিকতার পটভূমিকায় মানুষের অবস্থিতি প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালে "The Alternative Workers party to Religion" -এ মহামতি লেনিনের বক্তব্যটি এ স্থলে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ এই বিশাল ভারতবর্ষের প্রায় অর্ধেক

মানুষই এখনও নিরক্ষর এবং সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বাংলার নব জাগরণের যুগে ধর্মান্দোলন মূলতঃ ছিল ধর্ম সংস্কারেই আন্দোলন। তবে ধর্মকে কিছুটা সংস্কারমুক্ত করে নিয়ে তাকে যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজা রামমোহন থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই চেয়েছিলেন ধর্মের বাস্তব চেহারাটির পরিবর্তন। মধ্যযুগেও ধর্মের মানবতাবাদী বিষয়টিকে এক নতুন দার্শনিক প্রজ্ঞায় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বহু আন্দোলন হয়েছে। চৈতন্যদেব, ভক্ত কবীর ও গুরু নানক প্রমুখ মহাপুরুষগণ মূলতঃ মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে গিয়েছেন। ধর্মীয় চেতনায় তাঁরা মানুষকে কখনও বিভক্ত করতে চাননি। যেহেতু তাঁদের ধর্মীয় প্রভাবটি ছিল সার্বজনীন ও জীবনমুখী।

আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মহান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বেদ ভিত্তিক অদ্বৈতবাদের কথা উলে-খ করেছেন। কবি সাহিত্যিকদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য এমন কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। ধর্মকে তিনি মানুষের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৯ অগ্রহায়ণ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "জগতে যাহা কিছু আমার পরম প্রিয় তাহাই আমার ঈশ্বর। মন্দিরে গিয়া শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ করিয়া যাঁহার পূজা করিয়া আসি সে হলো জড়, পুত্তলিকা মাত্র।" ধর্ম ও মানুষ প্রসঙ্গে তিনি যেকথা বলেছিলেন নতুন করে আজ পুনরায় সে কথাই ভাববার সময় এসেছে। " We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another."

দিনান্তের রাত্রিকালীন অন্ধকার সময়ানুবর্তনের একটি খন্ডাংশ মাত্র। আগামী প্রত্যুষের আলোকাবগাহনের আয়োজনকে সে কখনও পরাস্ত করতে পারে না। রাত্রির তপস্যার মধ্যেই সুপ্ত থাকে দিনের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা। আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সাময়িক দুঃস্বপ্ন কখনও চিরন্তন নয়, অবশ্যই সেটা পরিবর্তনশীল। একবার তুরস্কে ধর্মের নামে ভ্রান্ত অজুহাতে বুদ্ধিজীবিদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। গোটা মিশর জুড়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ঘৃণ্য তান্ডব চলেছে। সমগ্র ইরানে মানবিকতা ও যুক্তিবাদের আদর্শ আজ অচল। গোটা বিশ্বের খ্রীষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে। পাকিস্তান এখন ধর্মের সন্ধি জ্বরে ভুগে সন্ত্রাসবাদী নাশকতার শিকারে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকার ও সেনা বাহিনীর চোখের সামনে ধর্মের নামে বহু ঐতিহাসিক সৌধকে ধ্বংস করা হয়েছে। চারিদিকে চলছে বহু নাশকতামূলক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

যুগের চিরাচরিত ধারানুযায়ী আগামী যুগ এক নতুন সূর্যোদয়ের যুগ। পবিত্র বেদের কথানুসারে মানব হৃদয়ে গভীর বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা যোগায় "জীবাতবে ন মৃত্যবে।" অর্থাৎ আমাদের মূল সাধনা জীবনের জন্য, কখনও মৃত্যুর জন্য নয়। মানব সভ্যতার চরম সংকটকালেও রবীন্দ্রনাথ এক নতুন অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখেছেন। নবগঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার কর্মযজ্ঞে হাত মিলাবার উদ্দেশ্যে গোর্কি সেদিন রাশিয়ার তরুণ সমাজের নিকট এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আগামী দিনে নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সে আহ্বান একান্তভাবে আজও প্রাসঙ্গিক। সুতরাং আগামী যুগটি হলো নতুন সূর্যোদয়ের যুগ। যেখানে পবিত্র বেদের অমৃতবাণী মানব হৃদয়ে এক গভীর বিশ্বাস যোগায়। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি হারিয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবে এক সম্ভাবনাময় নতুন যুগ।

রামায়নী

- বিদিশা বসু

রামায়ণ ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। বৈদিক সাহিত্যের যুগ খ্রিঃপূঃ ১৫০০ থেকে ৮০০, মহাকাব্যের যুগ খ্রিঃপূঃ ৮০০ - ৪০০, পৌরাণিক যুগ খ্রিঃপূঃ ৪০০ - খ্রিঃ৫০০। মহাকাব্যের যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্তী সময়ে প্রবাহিত হয়েছে বৌদ্ধ যুগ। গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে। তাঁর মহাপ্রয়াণ খ্রিঃপূঃ ৪৮৩ অব্দে। গৌতম বুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার সাথে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কোন যোগ ছিল না। দুই ধারাই প্রবাহিত হয়েছিল সমান্তরালভাবে। বৌদ্ধ দর্শন নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধরা পূজার্চনা, যাগযজ্ঞ, বলিদানে বিশ্বাসী নয়। ক্ষমা, প্রজ্ঞা, অহিংসাই বৌদ্ধদের মূলমন্ত্র।

মহাকাব্যের যুগেই রচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত। প্রশ্ন হল, বাল্মীকি ও ব্যাসদেব কি একজন করে ব্যক্তি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "বস্তুত ব্যাস - বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশ্যে নামকরণমাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুটি গুন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়া দুইটি কাব্য। তাহাদের নিজেদের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।"

বল্মীক ভেদ করে যার আবির্ভাব, তিনিই বাল্মীকি। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম, বেদকে যিনি ভাগ করেছেন, তিনিই হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। যা মহৎ ও ভারবহ, তাই হল মহাভারত। রামায়ণের ভিতর দিয়ে একটি যুগ, একটি জাতি, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকাশিত হয়েছে। মহাকাব্যের দুটি ধারা — বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা (Authentic Epic) ও কবির একক কথা (Literary Epic)। মহাকাব্যে বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা যখন মহাকবিরা বলেন, তখন তাঁরা রচনার পশ্চাতে থাকা 'নারাশংসী' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'নারা' শব্দটি এসেছে 'নর' শব্দ থেকে। 'শংসী' অর্থে প্রশংসা। কবি বা স্রষ্টার ভাবনার আলো প্রথম স্পর্শ করে সমাজের উচ্চস্তরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষচনকে। তাই রামায়ণ - মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রই রাজকীয়। রাজকর্তৃত্ব যাঁর হাতে, তিনিই নায়ক। নায়কের পাশাপাশি থাকেন প্রতিনায়ক ও খলনায়ক।

মহাকাব্য একক গল্প নয়, একাধিক গল্প ও বহুল চরিত্র মহাকাব্যের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছে। খ্রিঃপূঃ অষ্টম শতকে রচিত হয় রামায়ণ। তখনও ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি। মৌর্যযুগের আগে কোন্ যুগ ছিল, তা আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কল্পনামিশ্রিত থাকলেও ভারতীয় রীতি-নীতি-সংস্কৃতির সমন্বয় হল 'রামায়ণ'। রামায়ণের কাহিনী মৌর্যযুগের বহু আগের ঘটনা। বৈদিকযুগে লিপি লেখনের ব্যবস্থা নেই। পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' -তে বর্ণ-লিপির প্রসঙ্গ এনেছে। বাল্মীকি মুনি রামায়ণ সম্পূর্ণ একাকী রচানা করেছেন, একথা সর্বৈব সত্য নয়। বাল্মীকি রামায়ণে সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করলে বোঝা যায়, বাল্মীকি রামকথার স্রষ্টা নন, একটি তৎকালীন প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। রামায়ণের আদি শে-াক বলা হয় এই শে-াকটিকে —

" মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা দেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

কিন্তু এটি রামায়ণের প্রথম কান্ডের দ্বিতীয় সর্গের পঞ্চদশতম শে-াক। মৈথুনরত ক্রৌঞ্চযুগলের একটিকে ব্যাধ কর্তৃক হত্যা করতে দেখে বাল্মীকির অন্তর ও কণ্ঠ থেকে এই শে-াক স্বতোঃসারিত হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রামায়ণের প্রথম কান্ডের প্রথম সর্গের প্রথম শে-াক হল—

"তপঃ সাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্ ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনি পুঙ্গবম্ ॥"

অর্থাৎ, মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদগণের শ্রেষ্ঠতম মুনিবর নারদকে সম্বোধন করলেন। নারদের নিকট বাল্মীকির প্রশ্ন ছিল, সম্প্রতিকালে এই ভূলোকে সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ মানব কে? উত্তরে নারদ রামের পরিচয় তথা জীবন বৃত্তান্ত শোনালেন। পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মার বরে রামের অতীত,বর্তমানম ভবিষ্যতকে ছন্দে শে-াকে প্রকাশ করলেন বাল্মীকি। রামকাহিনীর প্রথম বক্তা নারদ, সম্মতিদাতা ব্রহ্মা, রচনাকর্তা ও প্রয়োগকর্তা লব কুশ।

রামায়ণের রামচন্দ্র জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়নীতির প্রতিমূর্তি। একদিকে সীতা, অন্যদিকে অযোধ্যার প্রজা। প্রজাদের ধারণা সীতার অসতীত্বের জন্য অযোধ্যায় অমঙ্গল দেখা দিয়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। সীতা তাঁর নিজের, প্রজারা রাজ্যের। রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণাধিক প্রিয় সম্পদ সীতাকে ত্যাগ করলেন রামচন্দ্র। বৃহতের জন্য ক্ষুদ্র ত্যাগ। রাজ্যের মানুষের সুখের জন্য আত্মসুখ ত্যাগ। বাল্মীকি রামায়ণের তিনটি দিক —

১) রামচন্দ্রকে আশ্রয় করে আর্যসংস্কৃতি বা নরসংস্কৃতি।
২) বানর - হনুমানকে আশ্রয় করে অনার্য বানর সংস্কৃতি।
৩) রাবণকে আশ্রয় করে রাক্ষস সংস্কৃতি।
রামায়ণ — তিনটি সংস্কৃতির মিলন।

আর্য	অনার্য	অন্ত্যজ
(রাম)	(রাবণ)	(হনুমান)
(নর)	(রাক্ষস)	(বানর)

আর্যরা এদেশে আসার আগে প্রাগার্য বা অনার্যরা বসবাস করতো — নিগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চিনীয় গোষ্ঠী। এদেরকেই মহাকাব্যে অভিধা দেওয়া হয়েছে 'রাক্ষস'। আর্যরা পশুপালক ছিল। খাইবার, বোলান গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করতেই অনার্যদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হল। আর্য সংস্কৃতির বিজয়লাভের চূড়ামণির স্লে-াগান - 'রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি'। অনার্যরা দক্ষিণে সরে গেল। যে অনার্যরা আর্যদের আধিপত্য মেনে নিল, তারা হল 'দাস'। সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান - এরা 'দাস'

তথা বানর সংস্কৃতি। যে অনার্যরা আর্যদের আধিপত্য অস্বীকার করে আরো দক্ষিণে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তারা হল 'দস্যু' অর্থাৎ রাক্ষস। রামায়ণে বিরাধ রাক্ষস বধ, মারীচ বধ, তাড়কাবধ — এই ঘটনাগুলি আর্যদের দ্বারা অনার্যবধ বা অনার্যদমনকে ইঙ্গিত করে, যা রামচন্দ্রের বীরত্ব ও প্রতিপত্তিরত পরিচয়বাহী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রক্তকরবী' নাটকে দেখিয়েছেন কর্ষণজীবি ও আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্ব। রামায়ণও আর্য - অনার্যদের দ্বন্দ্ব। মানুষ যখন অরণ্যবাসী ও গুহাবাসীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন সে সংগ্রাহকরূপে বেঁচে আছে। তার কাজ শুধু খাদ্য সংগ্রহ করা। সে তখন Collection করছে, Production-এর দিকে যায়নি। আকর্ষণজীবী থেকে মানুষ ধীরে ধীরে কর্ষণজীবী হয়ে উঠলো। আকর্ষণজীবীর মূল প্রতীক তীরধনুক। রামায়ণে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেছেন। শিকারজীবনকে ত্যাগ করে মানুষের Cultivation-এর জগতে প্রবেশ করার রূপক হরধনুভঙ্গ। লাঙলের ফলাকে বলা হয় 'সীতা'। রামচন্দ্র বড় মাপের কৃষক। তাঁর গাত্রবর্ণ নবদূর্বাদলশ্যাম - এই গাত্রবর্ণের মধ্য দিয়েই কৃষি প্রতীকায়িত। 'কুশ' হল শক্ত আগাছা ঘাস। 'লব' হল, যে উদ্ভিদ বা বীজ বপনে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ কৃষিসভ্যতা পত্তনের কাহিনী তথা আর্যসভ্যতার কাহিনী।

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' শে-াকটির আবার অন্য অর্থ আছে। আক্ষরিক অর্থ হল, ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ ক্রোঞ্চ বধের দৃশ্যে মুহ্যমান বাল্মীকির কণ্ঠ হতে শে-াকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে কৃষিগত দিক থেকে শে-াকটির একটি অন্য অর্থ আছে। 'মা' অর্থাৎ লক্ষ্মী। 'নিষাদ' কথাটির 'নিষদ' ও 'নিষাধ' সমার্থক, যার অর্থ ধরা হয় 'পতি'। 'মা নিষাদ' অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি তথা নারায়ণ। 'নার' অর্থাৎ জল এবং 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয় — জলে আশ্রয় যার অর্থাৎ মেঘ। বসুন্ধরার কন্যা সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা। 'সীতা' অর্থ হলরেখ। কৃষিকাজের সার্থকতা মেঘের বারিবর্ষণে। বিনা জলে কর্ষিত জমি বন্ধ্যা - অ-লক্ষ্মী। ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ রাক্ষস বিশেষ। আদি শে-াকে গ্রীষ্মকালীন দ্যাবাপৃথিবীকে রহস্যে ক্রৌঞ্চমিথুন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূর্য ও পৃথিবী সবসময়েই মিথুনাবদ্ধ থাকলেও দক্ষিণায়নাদির প্রাক্কালে গ্রীষ্মঋতুতে সূর্যতেজে ধরিত্রী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্যে কামমোহিত বলা হয়েছে। আদি শে-াকটির অর্থ তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে, দ্যাবাপৃথ্বীর দৌড়- কে আচ্ছাদিত করে হে লক্ষ্মীপতি, তুমি আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ কর। এই অর্থে আদি শে-াকটি মেঘবন্দনা। ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য। আর্যাবর্ত বা উত্তর দাক্ষিনাত্যের ভূখন্ড থেকে আলাদা। আর্যাবর্তে অরণ্যসম্পদ, পশুপালন, শিকার ছিল মুখ্য। শীতের প্রকোপে অগ্নি ছিলেন প্রধান উপাস্য। ধর্ম ও জীবনধারা যজ্ঞ কর্মে নিয়ন্ত্রিত। বর্ষাকাল সেখানে অভিশাপ স্বরূপ। দাক্ষিণাত্যের সভ্যতায় প্রধান উপজীব্য কৃষি, যা মেঘদেবতার করুণার ওপর নির্ভরশীল। সুস্বাদু পানীয় জল ও প্রচুর ফসলের আশা পূর্ণ হয় সুষম বর্ষণে। মূল সংস্কৃত শব্দ 'রামা' অর্থাৎ লক্ষ্মী দাক্ষিণাত্যের প্রধান উপাস্য। 'রামা' শব্দের পুংলিঙ্গ 'রাম'। আরবী 'রামা' অর্থে নিক্ষেপকারী, মেঘ হতে করুণা স্বরূপ বারিধারা বর্ষণকারী। যেখানে নিম্নচাপ সেখানে মেঘ, আর যেখানে মেঘ সেখানে বর্ষণ। তাই রাম ধনুর্ধারী; ধনু অর্থে চাপ।ধরে নেওয়া যেতেই পারে, রাম নামের উৎস

আদিম কৃষিসভ্যতার মেঘদেবতা, যিনি আদিতে হয়তো 'রামা' নামেই বন্দিত হতেন। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় মেঘ শ্রেষ্ঠ দেবতা। অতএব কৃষিকাজের মধ্যে সুদূর অতীতের স্মৃতি বিজড়িত রাম নামের উদ্ভবের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র দেবতা নন, তিনি মনুষ্যকুলের চন্দ্রমা — 'নরচন্দ্রমা'। চাঁদ যেমন তার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মানুষের মনে প্রশান্তি দেয়, তেমন তার কলঙ্কও আছে। শ্রেষ্ঠমানব রামচন্দ্রের মধ্যেও ত্রুটি বা কলঙ্ক আছে। তা হল সীতা বিসর্জন। রামচন্দ্র আদর্শ প্রজাপরায়ণ রাজা, অসীম বাৎসল্যে পূর্ণ, অপরিসীম তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম, অতুলনীয় তাঁর পিতৃভক্তি, অবিসংবাধী সত্যনিষ্ঠা ও সাহস তাঁর। স্ত্রীকে প্রজানুরঞ্জনে নির্বাসন দিয়েও দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেননি রামচন্দ্র। অশ্বমেধযজ্ঞে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করেন তিনি। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'একপত্নীকব্রতধর'।

রামায়ণ ভারতবর্ষের প্রধান মহাকাব্য ঠিকই, কিন্তু শুধুই মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের আধারে একটি জাতির, একটি রাষ্ট্রের, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের ইতিহাস ও তৎকালীন সমাজচেতনার প্রধান আকর মহাকাব্য রামায়ণ, যা যুগ যুগ ধরে পঠিত হচ্ছে, বন্দিত হচ্ছে, বর্ণিত হচ্ছে, বিনির্মিত হচ্ছে, ভবিষ্যতেও নতুন কোন তথ্য বা নতুন কোন বিশে-ষণে নিয়ে যাবে এই মহাকাব্য। তাই একথা যথার্থ ঃ—

"যৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি"।।

মহাকাব্যের ধারা প্রাচীন। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচলের সকল মানুষের আবেগ যেখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেই রামায়ণ কখনো প্রাচীন হবে না, ক্ষয়ে যাবে না, মানুষ ভুলে যাবে না।

" যে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহাধ্বনিটি আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কালে ।।"

সুবাসিনী দেবীরা এখন কেমন আছে, জানতে ইচ্ছে করে

- সুশীল সরকার

সুবাসিনী দেবীর জন্ম ১৯৪২ এর আগষ্ট মাসে। এই ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসেই গান্ধীজি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সুবাসিনী দেবীর বাবা অমূল্য চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অমূল্যবাবু যশোর জেলার কৃষ্ণপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সুবাসিনী দেবী এই স্কুলের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালে এই স্কুল থেকে সেকেন্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর পর সুবাসিনী দেবীর সাহাপুরের মহাদেব ভট্টাচার্যের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। মহাদেব ভট্টাচার্য যশোর টাউন স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। মহাদেব বাবুদের সাহাপুরে বিরাট বাড়ী। প্রচুর জমিজমা। ছোটো খাটো জমিদার। কপতাক্খ নদীর ধারে বাড়ী মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্য যেমন সাগরদাড়ি গ্রাম বিখ্যাত তেমনি সাগরদাড়ি গ্রাম যে কপতাক্খ নদীর তীরে অবস্থিত বলেই কপতাক্খ নদীকে সবাই চেনে। পৃথিবীকে এমন বহু জায়গা আছে যা ব্যক্তির নামে ধন্য। বিখ্যাত। সুবাসিনী দেবীর বিয়ের দু'বছরের মাথায় কোল আলো করে বুবাই এলো।

বুবাই-এর বয়স তখন একমাসও পূর্ণ হয়নি। হঠাৎ একদিন রাতে গ্রামের চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ। মহাদেব বাবুদের গ্রামে ৫০/৬০ ঘর লোকের বাস। অধিকাংশ হিন্দু। আগে গ্রামে সব হিন্দু বসতি ছিল। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার পর বহু হিন্দু বিনিময় করে হিন্দুস্থানে গেছে। চারিদিকে সবই প্রায় মুসলমান গ্রাম। মহাদেববাবু হৈ চৈ শুনে বাড়ীর উঠানে নেমে আসেন। রাত প্রায় ১২টা বাজে। তিনি দেশের গ্রামের পশ্চিম দিকে রায়পাড়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র গ্রামটায় আলোকিত হয়ে গেছে। লোকজন প্রাণ ভরে পুবপাড়ার দিকে ছুটে আসছে। সবাই বলছে রাইট লেগেছে শিগগির পালাও। রায়পাড়ায় মুসলমানরা লুঠ করে বাড়ী ঘর সব আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

মহাদেববাবু দিশেহারা। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু হাতে আর সময় নেই। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। টাকা পয়সা সোনা দানা যা ছিল টুপলায় বেঁধে নিলেন। এককাপড়ে জান বাঁচনোর জন্য গ্রামের লোকের সাথে মহাদেববাবু বেড়িয়ে পড়লেন। সুবাসিনী দেবী এক মাসের বাচ্চাকে আঁচল চাপা করে অন্ধকারে অজানার উদ্দেশ্যে শয়ে শয়ে মানুষের মিছিলে হাঁটতে থাকেন। কোথায় যাচ্ছেন কিছু জানেন না। শুধু লক্ষ্য ইন্ডিয়ার বর্ডার। ভারতের মাটিতে একবার পা রাখতে পারলেই অন্তত জানটা বেঁচে যাবে। ভোরবেলা হরিদাসপুর বর্ডারে এসে হাজির। নগদ টাকা যা ছিল পাকিস্তান বর্ডারে কেড়ে নিল। ভাগ্যিস সোনার পুটলার সন্ধান পায়নি।

বেলা ৯টায় বনগাঁয় এসে পৌঁছালো। সুবাসিনীর হাতটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। পা-দুখানা আর চলছে না। পথের পাশে শিরিশ গাছের তলে বসে পড়লেন। মহাদেববাবুকে সুবাসিনী দেবী আঁচলে বাঁধা টাকা খুলে দিয়ে কিছু খাবার কেনার জন্য বললেন। মহাদেববাবু

কিছু মুড়ি বাতাসা কিনে আনলেন।

বনগাঁয় মতিগঞ্জে মহাদেববাবুর কাকা থাকেন। মহাদেব বাবু কাকার বাড়ীর ঠিকানা জানেন না। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরপরই প্রাণতোষ ভট্টাচার্য এদেশে চলে এসেছিলেন। চিঠিপত্র আদান প্রদান হলেও যাতায়াত ছিল না। মহাদেববাবু লোক মুখে খোঁজ করতে করতে কাকা প্রাণতোষবাবুর সন্ধান পেয়ে গেলেন। মাসখানেক কাকার বাড়ীতে কাটিয়ে মহাদেববাবু স্ত্রী পুত্রকে এখানে রেখে কোলকাতায় গেলেন। কোলকাতায় সুবাসিনী দেবীর এক মাথা থাকেন। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে মনীষবাবুর বিরাট কাপড়ের দোকান। মহাদেববাবু মামাশ্বশুর মনীষবাবুকে বিয়ের সময় যা দেখেছেন। ভালো করে মনেও নেই কেমন দেখতে। দোকানে গিয়ে পরিচয় দিতেই মনীষবাবু মহাখুশী। দোকানের উপরেই বাড়ী। সঙ্গে সঙ্গে মনীষবাবু জামাইকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

মনীষবাবুর এ তল-াটে ভালো নামডাক আছে। এখানকার ওয়ার্ডের কংগ্রেসের সভাপতিও মনীষবাবু। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মহাদেববাবুর জন্য একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীরও ব্যবস্থা করে দিলেন। মহাদেববাবু বি.এস.সি.পাশ। চাকুরীর সাথে রাতের বেলা প্রাইভেট টিউশনি শুরু করলেন। মনীষবাবুর বাসা থেকে অফিস করেন। প্রায় চার মাস হয়ে গেল। দমদমের বিধানসরণীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিলেন। মনীষবাবুই ঠিক করে দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে সুবাসিনী দেবী এবং ছেলে বুবাইকে নিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে দেশ ছাড়ার দুঃখও ভুলতে লাগলেন। এখন মহাদেববাবু স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভালোই আছেন। বুবাই এখন অনেক বড় হয়েছে। লেখাপড়ায় খুব ভালো। মিত্র ইনস্‌টিটিউশনের মেধাবী ছাত্র। H.S পরীক্ষায় শুধু স্টার পাওয়া নয়, প্রায় ৮০% নম্বর পেয়েছিল। জয়েন্ট পাশ করে M.B.B.S-এ ভালো রেজাল্ট করে। মায়ের ইচ্ছা ছেলেকে বিলেত ফেরত ডাক্তার করতে হবে। সুবাসিনীর সোনাদানা যা ছিল সব মহাদেববাবুর হাতে দিয়ে বলল - এগুলো বিক্রি করে ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। সোনা দিয়ে কি হবে - আমাদের সোনার ছেলে যখন বিলেত ফেরত ডাক্তার হবে তখন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর সোনার গহনা পরলে শুধু আমার দেহ উজ্জ্বল হবে। তুমি কি চাও না আমাদের বুবাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক। মহাদেববাবু কখনোই চান না ছেলে বিদেশে যায়। কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে এবং অফিস থেকে লোন নিয়ে দু'লাখ টাকা জোগাড় করলেন। এমাসের পনের তারিখ শুক্রবার বেলা ৩-৪৫ মিনিটে বুবাই-এর ফ্লাইট। মহাদেববাবু ট্যাক্সি ভাড়া করে স্ত্রী সুবাসিনী দেবী ও বুবাইকে নিয়ে ৩টার মধ্যে দমদম এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেল। বিমান ছাড়ার আগে মহাদেববাবু আর সুবাসিনী দেবী বুবাইকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কান্না তো পাবেই একমাত্র ছেলে পাঁচ বছর বিদেশে থাকবে। বিমান আকাশে উড়তে থাকে, মহাদেববাবু আর সুবাসিনী দেবী এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। এখন বিমান শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাও তাদের সম্বিৎ থাকে না। সিকিউরিটি এসে বলে স্যার আপনারা বাইরে চলে আসুন।

বুবাই বিলেত যাওয়ার ছয় মাস পর মহাদেববাবু অবসর গ্রহণ করলেন। প্রায় চার লক্ষ টাকা তিনি অবসরকালীন প্রাপ্য পেলেন। মহাদেববাবু স্ত্রীকে বললেন - আর ভাড়া বাড়ী নয়। একটা নিজস্ব বাড়ী করা দরকার। মহেশতলায় দু'কাটা জমি কিনে একতলা একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করলেন। বুবাই বিলেত যাওয়ার পর মহাদেববাবু খুব দুশ্চিন্তায়

কাটাল। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। সুবাসিনী দেবী স্বামীকে বোঝান - কেন এতো চিন্তা করো, পাঁচ বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। গৃহপ্রবেশের এক বছরের মাথায় একদিন রাতে হঠাৎ মহাদেববাবুর বুকে ব্যথা। প্রতিবেশী অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা বললেন তাতে সুবাসিনী দেবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেল। এখন কি হবে? সুবাসিনী দেবী বুবাইকে টেলিগ্রাম পাঠালেন। বুবাই উত্তর পাঠালো — এখন যাওয়া সম্ভব না সামনে পরীক্ষা।

ছেলের অবর্তমানে সুবাসিনী দেবী স্বামীর সমস্ত পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করলেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকী। বর্তমান তার অন্ধকার। একমাত্র বাঁচার আলো তার বুবাই। সবসময় ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো গোনেন কবে শেষ হবে পাঁচটি বছর? যে দিন বুবাই এর পাঁচ বছর সময় পূর্ণ হবে সুবাসিনী দেবী ক্যালেন্ডারের সেই তারিখ এর উপর লাল দাগ দিয়ে রেখেছেন। কাজের যে মাসীটা, তাকে প্রতিদিন একবার করে বলা চায় - বুবাই যেদিন আসবে সেদিন কিন্তু পাঁচ পদ রান্না করতে হবে। শিয়ালদার ভারত মিষ্টির দোকান থেকে রসমালাই আনতে হবে। সেদিন সকাল ১১টায় স্নান সেরে পুজোর ঘরে যাওয়ার আগে সুবাসিনী দেবী কাজের মাসীর সাথে সেই কথা শুরু করলেন। এমন সময় গেটের কাছে পিয়ন এস বলেন মাসীমা- আপনার চিঠি। সুবাসিনী দেবী তড়িঘড়ি ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিঠি হাতে নিয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে কাজের মাসী বুলাকে বলে - দেখো বুবাইএর চিঠি, নিশ্চয় আসার কথায় লিখেছে। তখনো তিনি খামটি খুলতে পারেননি। খাম খুলে চিঠি পড়ে সুবাসিনী দেবী মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেল। সূর্যকরোজ্জ্বল সকালটা যেন এক লহমায় কালবৈশাখী মেঘে আচ্ছন্ন করে দিল। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে বুলা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সুবাসিনী দেবী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ধরে আছে খামটি। বুবাই লিখেছে — মা আমি বিলেতের একটি হাসপাতালে চাকুরী নিয়েছি। ভালো বেতন। ভারতে যা ভাবাই যায় না। ভারতীয় টাকায় মাসে প্রায় এক লক্ষ টাকা। দশ বছরের চুক্তি। এমন সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটে না। আমি ভালো আছি। প্রণাম নিও।

সুবাসিনী দেবী আকাশ থেকে পড়লেন। ভাবলেন আমার বুবাই আর সেই বুবাই নেই। এখন বিলেতের নামী ডাক্তার তন্ময় ভট্টাচার্য্য। মা-র থেকে তার কাছে টাকার মূল্য অনেক বেশী। মাসে একলক্ষ টাকা ভাবা যায়। আগে মাঝে মাঝেই চিঠিপত্র পাঠাতো, এখন ছয় মাসে নয় মাসে চিঠি আসে। চিঠি পাওয়ার পর থেকে সুবাসিনী দেবীর মনই শুধু খারাপ নয় শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না। নিজের প্রতি যত্নও নেই। ভাবেন যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কার জন্য আর ভাবনা। যাদের জন্য ভাবনা - তারাই তো ভেবে নিচ্ছে। বুলা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম রান্না বান্না করে। সুবাসিনী দেবী রোজকার মতো বাগান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে স্বামীর ফটোতে ঝুলিয়ে টেবিলে রাখা বুবাইয়ের অন্নপ্রাশনের ছবিটা আঁচল দিয়ে মুছে টেবিলে রাখতে যাবেন এমন সময় একটি মারুতী ভ্যান গেটের কাছে এসে থামলো। গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক এবং দুজন মহিলা নামলেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন এটা কী সুবাসিনী দেবীর বাড়ী? সুবাসিনী দেবী উত্তরে বললেন - হ্যাঁ, আমি সুবাসিনী দেবী। কী ব্যাপার? ভদ্রলোক বললেন — ডাঃ তন্ময় ভট্টাচার্য তো আপনার ছেলে?

— হ্যাঁ - তো ?

— আমরা শান্তিবন বৃদ্ধাশ্রম থেকে এসেছি। আপনার ছেলে Internete এ online মাধ্যমে আপনার জন্য একটি sit বুক করেছেন। সমস্ত টাকা পয়সা উনি advance দিয়ে দিয়েছেন। আমরা আপনাকে আগামী ১৫ই মার্চ ১টার সময় আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাবো, আপনি সেইমতো প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। তাহলে আমরা এখন আসি মাসীমা। সুবাসিনী দেবী মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনছিলেন। দু'চোখের বাঁধ ভেঙে দুকুল প্লাবিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটা ঝাপসা হয়ে গেলো। সমস্ত শরীরটা পাথরের মতো ভারী হয়ে গেল, বহনের যেন আর ক্ষমতায় নেই। কোন রকমে ঘরে গিয়ে শরীরটা খাটে এলিয়ে দিলেন। চোখ বন্ধ করে জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো একটা একটা করে উল্টাতে লাগলেন। আক্ষেপের সুরে সুবাসিনী দেবী বলতে থাকে; ভগবান এই ছিলো কপালে আমার। স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন একবার দেখে যাও আমি কেমন আছি। তোমার বাড়ীতেও আমি থাকতে পারলাম না। তোমার মৃত্যুর সময় আমি তোমার পাশে থেকে একটু জল তুলে দিয়েছিলাম তোমার মুখে। আমার যে আর কেউ রইলো না। আমি কী এমনই হতভাগা। হাঁ ভগবান এমনই কর্মফল আমার। এই ছিল আমার কপাল লিখন। কী ভাবলাম - আর কী পেলাম।

দেখতে দেখতে ১৫ মার্চ এসে গেল। সাড়ে বারোটায় শান্তিবন বৃদ্ধাশ্রমের সেই গাড়ীটা গেটের সামনে থামলো। আগের দিনের সেই ভদ্রলোক এবং দুজন মহিলা গাড়ী থেকে নামলেন। ভদ্রলোক বললেন - মাসীমা আমরা এসে গেছি, আপনি রেডী তো? সুবাসিনী দেবী ওদেরকে বসতে দিয়ে সমস্ত বাড়ীটা একবার প্রদক্ষিণ করে এলেন। তারপর গেটের ডান পাশে যেখানে "মহাদেব স্মৃতি ভবন" পে-টটি লাগানো তার উপর মাথা রেখে প্রায় দুমিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চোখ মুছতে মুছতে গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। বাড়ীভর্তি প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন। তিনি একটি কথাও বললেন না। কারণ তিনি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না। গাড়ী দুঃখের সাগরের ঢেউএর দোলায় দুলতে দুলতে সুবাসিনী দেবীকে শান্তিবন বৃদ্ধাশ্রমের প্রান্তরে টেনে আনলো। তখন ঘড়িতে চারটে বাজে। তিনি গাড়ী থেকে নেমে দেখেন তার মতো হতভাগ্য নিঃসঙ্গ অনেক মহিলা তার চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সুবাসিনী দেবীকে অভিবাদন জানিয়ে আশ্রমের একতলার ৪ নং ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি আশ্বস্থ হলেন এই ভেবে যে, এই পৃথিবীতে অসহায় শুধু তিনি একা নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমের অন্যান্যদের সাথে ভালোই মানিয়ে নিলেন। দুঃখে সুখে এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপনজন। মাঝে মাঝে ছাই চাপা আগুন হু-হু করে জ্বলে ওঠে। পরস্পর যখন আলাপ করে তখন হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে আপনজনদের কথা। রক্তের সম্পর্ক। তখন শ্বেত বসনাদের আঁচল ভিজে যায় চোখের জলে। মাঝে মাঝে কেউ বলেন এখানে ভালোই আছি। এখানে বৌমাদের মুখ ঝামটি নেই, শুনতে হয় না - 'বুড়িটা মরেও না', নাতি নাতনিদের শব্দবাণ। যখন বিছানায় শুয়ে পড়ে তখন অতীতের স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়। মনে পড়ে পাড়া প্রতিবেশীদের কথা। একসাথে রাত জেগে ঢেঁকিতে ধান, চাল কুটা, ডাল ভেঙ্গে বড়ি দেওয়ার কথা। মনে পড়ে কালো গাইটার কথা। লেবুগাছ, লিচুগাছটার কথা। নদীতে একসাথে কলসী ভরে জল আনার কথা। সুবাসিনী দেবী পাকিস্তান ছেড়ে আসার সেই রাতের আতঙ্কের কথা ভুলতে পারেন না। কীভাবে বুবাইকে আঁচল চাপা দিয়ে নিয়ে এসেছিল। ভাবলে এখনো শিউড়ে ওঠে। সেদিন শুক্রবার

আবাসিকরা সবে মাত্র চান সেরে কাপড় পালটে খাবার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় আশ্রমের এক কর্মী এসে সুবাসিনী দেবীকে বললেন - মাসীমা, একটু অফিসে আসুন, আপনাকে ম্যানেজারবাবু ডাকছেন। সুবাসিনী দেবীকে ম্যানেজারবাবু বললেন মাসীমা ওরা ব্যাঙ্ক থেকে এসেছেন আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। ব্যাঙ্কের অফিসার বললেন মাসীমা ডাঃ তন্ময় ভট্টাচার্য তো আপনার ছেলে? উনি ব্যাঙ্কের সাথে দশ বছরের একটা চুক্তি করেছেন। এই আশ্রমে আপনার যে খরচ ব্যাঙ্ক তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেবে পরিবর্তে ব্যাঙ্ক আপনার বাড়ীর দশ বছরের জন্য দখল নেবে। বাড়ী যেহেতু আপনার নামে চুক্তিনামায় তো আপনাকে সহি করতে হবে। দশ বছর পর ব্যাঙ্ক আপনার বাড়ী আপনাকে ফেরৎ দেবে। সুবাসিনী দেবী কোন কথা না বলে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে নিজের ঘরে চলে এলেন।

আবাসিকদের কেউ জানেন না সুবাসিনীর ছেলে বিলেতের বড় ডাক্তার। মুখ ফুটে নিজে কখনো প্রকাশও করে না। তিনি জানেন বলে খালি খালি মনের ব্যথা বাড়বে। পাঁচজন আহা - উহু করবে। কোন লাভ আছে। সুবাসিনী দেবীর বয়স এখন ৭৩ বছর। রোগে শোকে দুঃখে বয়সের তুলনায় যেন বেশী বুড়ি হয়ে গেছেন। দেখলে মনে হয় আশির উপর বয়স। কানেও ভালো শুনতে পান না। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। চোখের নজরও কমে গেছে। ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস। গত বছর শান্তিবন বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম এক সাংবাদিক বন্ধুর সাথে। কেমন আছেন প্রবীণ নাগরিকরা তা জানবার জন্য প্রথমে তিন নম্বর ঘরের হৈমবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করি, দিদিমা কেমন আছেন ?

..... বড্ড ভালো আছি বাবা, বড্ড ভালো আছি। বৌমার মুখঝামটা নেই। ছেলের চোখরাঙানী নেই। ফেমিলি পেনশনের যা টাকা কটা তাতেই আশ্রমের খরচ চলে। বড্ড ভালো আছি - এখানে কেউ বলে না - এ-ই বুড়ি চুপ কর। বলতে বলতে দিদিমার গলাটা ধরে আসে। শ্রাবণের মেঘ থেকে যেন অকাল বর্ষণ শুরু হয়।

..... কিছুক্ষন থেমে আবার জিজ্ঞাসা করি দিদিমা ছেলে-বৌমা কেউ কি খোঁজখবর নেয়?

..... তাদের সময় কোথায় বাবা? আমার খোঁজ নেওয়ার মতো সময় নষ্ট করবার সময় তাদের নেই বাবা। প্রায় আটবছর হতে চললো ... বলতে বলতে দুচোখ আবার ঝাপসা হয়ে গেল। ধরা গলায় বললো - মরলে এরাই পুড়িয়ে দেবে। আমরা কথা না বাড়িয়ে একতলার চার নম্বর ঘরে সুবাসিনী দেবীর কাছে গেলাম।

.... দিদিমা কেমন আছেন? কোন উত্তর না দিয়ে সুবাসিনী দেবী বালিশের তলা থেকে একটি বাঁধানো ফটো বের করে আঁচলে মুছতে থাকেন। বলেন আমার ছেলে বুবাই। বিলেতে থাকে মস্ত বড় ডাক্তার। মাসে একলক্ষ টাকা বেতন। আমি ভালো আছি। আমার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ থাকবে কেন। কত বড় ডাক্তারের মা আমি। ও বিদেশে থাকে তাই বড় ভয় হয়। যদি কিছু হয়। মুখটা মনে পড়লে বুকটা হু-হু করে ওঠে। বড় কষ্ট হয়। কত দিন দেখিনি। ঈশ্বরের কাছে সব সময় প্রার্থনা করি ঠাকুর ওকে ভালো রেখো। আমার দিন ফুরিয়ে এলো। হয়তো শেষের দিনেও ওর মুখটা দেখতে পাবো না। বলেই একবুক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুবাসিনী দেবী খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের দুপাশ বেয়ে জলধারা সাদা থানের উপর টপ টপ করে পড়তে থাকে। আমাদের চোখ এড়ায় না। আর কোন প্রশ্ন না করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে আসি। আজ অনেকদিন হয়ে গেল সুবাসিনী দেবী কেমন আছে, জানতে বড্ড ইচ্ছা করে।

জগদ্দল : অতীত ও বর্তমান সম্পর্কের কিছু ইতিহাস

- নীতেন মন্ডল ও অনিরুদ্ধ সাহা

ভূমিকা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার 'রাজপুর' আর 'সোনারপুর' - নাম দুটি সাধারণত একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বড়জোর লেখার সময় শব্দ দুটির মাঝখানে একটি ছোট্ট 'হাইফেন' দিই আমরা। কিন্তু ইতিহাস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সোনারপুর আর রাজপুরের মধ্যে অনেক তারতম্য প্রথমটি প্রাথমিক ভাবে একটি প্রাচীন গ্রাম হলেও বর্তমানে রেলষ্টেশানকেন্দ্রিক জনবহুল শহর আর দ্বিতীয়টি আদিগঙ্গার তীরবর্তী একটি প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন বহনকারী অঞ্চল। রাজপুর, কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগর আর জগদ্দলকে একসূত্রে বেঁধেছে এই আদি গঙ্গা। জগদ্দল এই আদিগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা এক প্রাচীন গ্রাম। প্রশ্ন হল কত প্রাচীন ? এর কোন সঠিক উত্তর নাই। যতদূর জানা যায় জগদ্দল আর রাজপুরের জমিদার ছিলেন বিদ্যোৎসাহী গোলক চন্দ্র ঘোষ যিনি 'রাজপুর অ্যাংলো ভার্নকুলার স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিদ্যালয় থেকে এই অঞ্চলের মধ্যে যে দুজন ছাত্র ১৮৬২ সালে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাইচরণ ঘোষ, ইনি প্রাথমিকভাবে জগদ্দলের বাসিন্দা ছিলেন, সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই প্রকল্পে আমি জগদ্দল অঞ্চলের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার রাজপুর - সোনারপুর এর মধ্যে অন্তর্গত) সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ও এর পাশাপাশি এই অঞ্চলের প্রাচীন 'রাসবাড়ির' (লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী - যে কোন প্রকল্প বা কাজের পিছনে কিছু উদ্দেশ্য কাজ করে। ইতিহাস বিষয়ের অন্তর্গত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা প্রকল্পটিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার রাজপুর - সোনারপুর পৌরসভার অন্তর্গত। আদিগঙ্গার তীরবর্তী এই প্রাচীন জনপদে আবির্ভূত বিদগ্দ মানুষদের মধ্যে উলে-খযোগ্য হলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ, শ্রী নীলমণি চক্রবর্তী ও বিপ-বী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, অপরদিকে 'জগদ্দল' - এলাচি - রামচন্দ্রপুরের জমিদার কৈলাশচন্দ্র দে মহাশয় প্রতিষ্ঠিত রাসবাড়ি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক আশ্চর্য মাইলফলক 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৈচিত্রপূর্ণ জগদ্দল অঞ্চলটির কতগুলি দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

প্রথমত : - রাজপুর - সোনারপুর অঞ্চল কিভাবে 'দক্ষিণের নবদ্বীপ'-এ রূপান্তরিত হল।

দ্বিতীয়ত : - রাজপুর সোনারপুর অঞ্চল এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বিষয়। তার সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আঞ্চলিক স্তর থেকে সংগ্রহ করে এক বৃহত্তর রূপ দেওয়া।

তৃতীয়ত: - ঐতিহ্যবহনকারী জমিদার কৈলাশচন্দ্র দে মহাশয় প্রতিষ্ঠিত রাসবাড়ির ঐতিহ্য ও তার সাথে সমস্ত রাজপুর - সোনারপুর মানুষের সম্পর্কের নতুন দিক অনুসন্ধান। এছাড়া এই মন্দিরটির গড়ে ওঠার পথ ও আজকের রূপান্তর নিয়ে কিছু তথ্য সহকারে (Local

History) এর কাঠামোকে দাঁড় করানোর চেষ্টা।

প্রকল্পের গুরুত্ব -

১) শ্রীরামকৃষ্ণের ..... শিষ্য তথা বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই যুক্ত অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ, বিপ-বী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এর জন্ম এই রাজপুর - সোনারপুর অঞ্চলে। তাদের নিজস্ব আলোকজ্যোতি এই অঞ্চলকে কিভাবে আলোকিত করেছে তা আমাদের জানার আগ্রহের বিষয়।

২) ঐতিহ্য বহনকারী জমিদার কৈলাশচন্দ্র দে মহাশয় প্রতিষ্ঠিত রাসবাড়ি স্থানীয় জনমানুষ কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

৩) রাজপুর - সোনারপুর অঞ্চল কিভাবে প্রাচীনকাল থেকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলো তা বৃহত্তর ইতিহাসের সাথে স্থানীয় ইতিহাসের সংযোগ রেখাটি তুলে ধরা আমার মূল লক্ষ্য।

SOURCE :- স্থানীয় ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা তথ্য, সমসাময়িক ইতিহাস বক্তা আর পন্ডিতরা মনে করেন তথ্য প্রমাণ সংবলিত Archaival History ই ইতিহাসের একমাত্র রূপ নয় কারণ সর্বকালেই 'বড় ইতিহাসের ' পাশাপাশি 'ছোট ইতিহাস' ও থাকে যার গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নয় এক্ষেত্রে আমি রাসবাড়ির সদস্য সৌভিক দে ও শান্তি কুমার দে মহাশয়ের থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেয়েছি। এর পাশাপাশি 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি' ও স্থানীয় ভিত্তিক কিছু লিপিবদ্ধ তথ্য পেয়েছি। একই সাথে ঐতিহাসিক জীবন মুখোপাধ্যায়ের বই থেকেও কিছু সাহায্য নিয়েছি।

গবেষণার সীমায়িতকরণ: - রাজপুর - সোনারপুর অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সঠিকভাবে বিশে-ষণ করতে হলে যে সময়ের প্রয়োজন তা এই গবেষণার ক্ষেত্রে মূল সমস্যার বিষয়। বিশেষ করে রাসবাড়ি, জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি এর বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা ও তার নতুন তথ্য খুঁজে বের করা এবং সমসাময়িক বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা এই সীমিত সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত স্থানীয় ইতিহাসে যথেষ্ট তথ্যের অপ্রতুলতা আরেকটি অন্যতম সমস্যা।

Analysis and Interpretation :- আদি গঙ্গা তীরবর্তী এই প্রাচীন জনপদে আবির্ভুত মনীষীদের মধ্যে সময়ের দিক থেকে প্রথম যার নাম উলে-খ করতে হয় তিনি হলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ বা বুড়ো গোপাল, প্রথম জীবনে স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ ছিলেন সংসারী, পরবর্তীকালে তিনি সুদৃঢ় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সন্ধান পেলেন এবং তিনি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য হওয়ার ফলে রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই সরাসরি যুক্ত ছিলেন আমাদের জগদ্দলের এই ক্ষণজন্মা মনীষী। বেলুড় মঠ স্থাপনের আগে তিনি নিজের হাতে সেখানকার জমি সমান করেন, জমিতে শাক-সব্জির চাষ করেন। বর্তমানে দক্ষিণ জগদ্দলের ঘোষপাড়ার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রী অসীম কুমার ঘোষের বাড়িতে আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আশ্রম, প্রতি বছর মহারাজের জন্মদিনে এখানে ঘটা করে উৎসব পালন করা হয়।

এবার আমরা নীলমণি চক্রবর্তী প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করি। জগদ্দলে কাত্যায়নী তলায় চক্রবর্তী পাড়ায় এর বাড়ি আর জরাজীর্ণ ঠাকুরদালানে আজও দৃশ্যমান,

রাজপুর - সোনারপুর অঞ্চলকে 'দক্ষিণের নবদ্বীপ' বলা হয়। বেননা পান্ডিত্যের মহিমায় এই অঞ্চল এক সময় অপূর্ব গরিমার অংশীদার হয়ে উঠেছিল। শ্রী নীলমণি চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এই পন্ডিত মানুষটির লেখা পালি ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ছিল। এর পাশাপাশি জগদ্দল অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি সাধনে নীলমণি চক্রবর্তী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আজ যেখানে 'শ্রীমতী কনক বসু বালিকা বিদ্যাপীঠ' সেখানে এক সময় 'জগদ্দল কাত্যায়নী স্কুল' ছিল। স্থানীয় মানুষের মুখে বর্তমান বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে জানা গেল যে শ্রী নীলমণি চক্রবর্তীর অনুরোধে ও উদ্যোগে তার প্রখ্যাত ছাত্র আটর্নি জেনারেল এস.এম বসু এই স্কুল বাড়িটি নির্শাণ করেন এবং তার স্ত্রীর নাম অনুসারে বর্তমান বিদ্যালয়টির নাম হয়। উলে-খ্য এই গুণী মানুষটির অনন্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, অশোকনাথ শাস্ত্রী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ, একই সঙ্গে জানা যায় যে নীলমণি চক্রবর্তীর কাকা দেবপ্রসাদ বাবু বহুদিন আগে 'অভিযান' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন, এতে নীলমণি চক্রবর্তীর ধারাবাহিক : 'জগদ্দলের ইতিহাস' লিখেছেন, দূর্ভাগ্য আমাদের সে লেখা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই জগদ্দল অঞ্চলে গুণি মানুষদের আবির্ভাব লক্ষণীয়। তারা কিভাবে তাদের প্রতিভায় এই গ্রামকে সমৃদ্ধশালী গ্রামে রূপান্তরিত করেছে। এবার আমরা জগদ্দলের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বিষয়, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রপথিকদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। জগদ্দলের অগ্নিযুগের বিপ-বী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম, ১৯১১ সালে তাঁর জন্ম, কালীতলা থেকে ঢুকে 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি' এর মাঠকে ডানহাতে রেখে কয়েকটি বাড়ির পরেই মুখার্জী পাড়া, সেই বাড়ির সন্তান। তিনি প্রথমে অহিংস আন্দোলনে যোগদান করে ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন, অসমসাহসী এই বিপ-বী পিস্তল চালানোর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে গুলি চালানোর ঘটনায় বিপ-বী দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ গ্রেপ্তার হন এবং তাকে সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৬ সালে যে সব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় জগদানন্দ তার মধ্যে ছিলেন অন্যতম, সুদূর আন্দামান থেকে নিজের গ্রাম জগদ্দলে ফিরে আসার উৎসবমুখর দিনটি আজও এলাকার প্রবীণ মানুষেরা ভুলতে পারেনি। 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি'র সভ্যরা ব্যান্ড বাজিয়ে এই সাহসী বিপ-বীকে নিজের গ্রামে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এই বিপ-বী সাহসী ব্যক্তিটির ১৯৭৩ সালে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

জগদ্দল গ্রামে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের নিরবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের আশ্চর্য মাইল ফলক 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি'। সমিতির ইতিহাস যতটুকু পাওয়া যায়, তা নিয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয়ে যায়। এইপ্রবন্ধে সে ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ নেই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় গড়ে ওঠা 'অনুশীলন সমিতি' র কথা

আমরা মোটামুটি জানি, সেই সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি'র জন্ম। নাম থেকেই বোঝা যায় ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরচর্চার আদর্শের প্রচার, আর তার সূত্রে সৌহার্দের পরিবেশ গঠন করাই এই সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য, ১৯৩২ সালের ৪ঠা মার্চ ১৫ জন উৎসাহী যুবক রথতলায় Jagaddal Friends Union Exercise Club প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সমিতির আদিরূপের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুপদ দাঁ, মানকিলাল দত্ত, বনমালী দত্ত, ফণীচন্দ্র নাথ মন্ডল, ললিত মোহন নস্কর, বিমল কুমার চক্রবর্তী, অজিত কুমার বসু, অনিল কুমার দাস, গোপাল মুখোপাধ্যায়, ননী গোপাল চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি চক্রবর্তী, বিভূত হালদার ও ফণী মৈত্র এদের মধ্যে প্রথম জন - বিষ্ণুপদ দাঁ-র অশেষ উদ্যম, অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতির প্রসার ও বিকাশ হয়। রথতলা থেকে কিছুকাল পর যখন সমিতির শ্রী উপেন্দ্রনাথ দাঁ মহাশয়ের সহায়তায় তাঁর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, তখন নতুন নামকরণ হল 'জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি'। ব্যায়ামচর্চা, খেলাধূলা, সমাজসেবা, ক্রীড়া, জিমনাস্টিক সবই পুরোদমে চলতে থাকে। ত্রিশের দশকের শেষদিকে কবিরাজ সত্যনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁর বাড়ির সামনে সংঘটির স্থানান্তর ঘটে, তৎকালীন বিখ্যাত আয়রনম্যান নীলমণি দাস, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের মতো প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ বিনা পারিশ্রমিকে এখানে এসে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। পরে উমাচরণ দে মহাশয়ের বংশরগণ সমিতির প্রসারের জন্য বর্তমানের বিরাট ময়দানটি দান করে গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। উমাচরণ দে-র নামানুসারে ময়দানের নামকরণ হয় 'উমাচরণ পার্ক'। উমাচরণ দে জগদ্দলের বাসিন্দা নন, কলেজস্ট্রিটের কাছাকাছি বর্তমানের সূর্য সেন স্ট্রিটে এদের বাসস্থান। তবে জগদ্দলে এখন যেখানে উমাচরণ প্রাইমারী স্কুল সেটা আসলে এদের ঠাকুর বাড়ি ছিল। এই পরিবারের বদান্যতায় এই প্রাইমারী স্কুল আর জগদ্দল উমাচরণ হাইস্কুল স্থাপিত হয় (১৯১৩), উমাচরণ দে-র পেশা কি ছিল বা জগদ্দলের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি কী ছিল, এ নিয়ে সন্ধান করে খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি। জগদ্দল ক্লাবের কথায় ছিলাম , প্রতিষ্ঠা কাল থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সমিতির সদস্য - সদস্যরা বাৎসরিক উৎসবে জিমন্যাস্টিক আর ব্রতচারী প্রদর্শন করে সমিতির সুনাম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তপোবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ না করলে সমিতির ইতিহাসের প্রতি অবিচার হবে। এর উদ্যোগে এই সমিতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়, শুরু হয় 'নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব'।

জগদ্দল ক্লাব ও মাঠের প্রসঙ্গে চলে আসে জগদ্দলের প্রখ্যাত রাসোৎসব - এর কথা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে স্মরণে রেখে প্রচলিত রাসোৎসব এবং যে উপলক্ষ্যে মেলা জগদ্দলের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। জগদ্দলের চড়ক তলার চড়ক এক সময়ে খুব বিখ্যাত ছিল, কিন্তু রাসমেলার বৈভব ও খ্যাতি আজও বিদ্যমান। সর্বপ্রথম রাস শুরু হয় আদিগঙ্গার ধারে প্রাচীন রাস বাড়িতে। রাসবাড়িটি বাংলার ১২৯৮ সালে জগদ্দল - এলাচি রামচন্দ্রপুরের জমিদার শ্রী কৈলাশচন্দ্র দে-র উত্তরসূরীগণের সহৃদয় উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ সাধারণ মানুষের জন্য মুক্ত, প্রতিদিন এখানে পূজো, কীর্ত্তন হয়, যে কেউ উপাশনায় যোগদান করতে পারেন। রাসবাড়ির নাম - "লক্ষ্মী - জনার্দন মন্দির", এখানে লক্ষ্মী জনার্দন ছাড়াও ভৈরবেশ্বর এবং কৈলাশেশ্বর শিবের অধিষ্ঠাগণ, এই ঐতিহ্যমন্ডিত রাসবাড়িতেই সর্বপ্রথম রাসমেলা ও রাসোৎসব হত। প্রতিবছর রথের দিন রথ বেরত, বাড়ির মাঝে বিস্তীর্ণ

উঠানে যাত্রার আয়োজন হত। সেই উপলক্ষ্যে হ্যাজাক লন্ঠন ঝোলানোর ব্যবস্থা আজও দৃশ্যমান। পরে এই রথ রাসোৎসব জগদ্দল থেকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর হয়।

'লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির'-টিতে লক্ষ্মী - জনার্দন,ভৈরবেশ্বর ও কৈলাশেশ্বর (শিব)দেব - দেবীর পূজা হয়ে থাকে। শোনা যায় মন্দিরটি তৈরী করতে উড়িষ্যা থেকে কর্মচারী এসেছিল। মন্দিরটির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে যেমন মাঝখানে একটি বড় উঠান ও হ্যাজাক লন্ঠন ঝোলানোর সুব্যবস্থা আছে তেমনি সানাই বাজানোর জন্য উঁচু কুঠুরি আছে। যা আজও দৃশ্যমান। একসময়ে রথযাত্রা, যাত্রা, সানাইয়ের আসর বসত। এ সম্পর্কে মন্দিরের অফিস ঘর থেকে কিছু ছবি ও নথিপত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এই মন্দিরটি নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের মনে মন্দির সম্পর্কে একটা পবিত্রতার বন্ধন লক্ষনীয়। কিছু বৎসর আগে নতুন করে রথ তৈরী করা হয় যা ঐতিহাসিক জীবন মুখোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণমিশনের মহারাজরা এসে উদ্বোধন করে যান। এই মন্দিরটি জমিদার কৈলাশচন্দ্র দে মহাশয় প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর ভাইপো হরিদাস দে মহাশয়কে মন্দিরের দায়িত্ব দিয়ে যান। যদিও পরবর্তীকালে কৈলাশচন্দ্র দের পুত্র সন্তান হয় ও তাঁর পরবর্তী বংশধররা হরিদাস দে মহাশয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেস করেন বর্তমানের মন্দির পরিচালনার জন্য হাইকোর্টের নজরদারিতে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে, যারা মন্দিরের যাবতীয় খরচ পরিচালনা করেন।

জগদ্দল গ্রামের বিস্তৃতি অনেক। বিভাজনও অনেক। দক্ষিণ জগদ্দল, চক জগদ্দল ইত্যাদি। স্বল্প পরিসরে সব কিছু উলে-খ হয় না। বাদ যায় তথ্য, অনুলিখিত থাকে গুণীজনের নাম। তবুও জগদ্দল গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বোধহয় সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়। দ্রুত পরিবর্তনের যুগে, বিশ্বায়নের যুগে ফ্ল্যাটের ভিড়ে চাপা পড়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য , হারাচ্ছে স্থানীয় ইতিহাস। তবুও যেটুকু রয়ে যায় সেটুকুই খাঁটি। সেইদিকে তাকিয়ে পুরানো ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখা, পুরানো ছবি ধুলো ঝেড়ে হাতে নেওয়া আর ইতিহাসকে ফিরে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরোয় না কখনো।

প্রকল্পের গুরুত্ব - Local History বা স্থানীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। খুজে পেতে তথ্য যদিওবা পাওয়া যায়, যোগসূত্র মেলে না। এলাকার মানুষের স্মৃতির উপর ভিত্তি করে ঘটনা পরম্পরার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তার সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধোঁয়াশা ভরা ইতিহাসে বাহ্যিক কাঠামো হয়তো বোঝা যায়, তবুও তার মধ্যে কতটা ঘটনা আর কতটা কল্পনা তা বিচার করা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসবিদ আর পন্ডিতরা মনে করেন তথ্য প্রমাণ সংবলিত Archaival History -ই ইতিহাসের একমাত্র রূপ নয় কারণ সর্বকালেই 'বড় ইতিহাসের ' পাশাপাশি 'ছোট ইতিহাস' ও থাকে যার গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নয়। এই সব ছোট ইতিহাসের ভিত্তি হল মানুষের স্মৃতি, গল্পকথা আর মিথ এর মধ্যে বাস্তব আর কল্পনার আশ্চর্য মিশেল ঘটে। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করে এই স্বল্পমাত্রিক গবেষণার মাধ্যমে আমরা রাজপুর- সোনারপুর অঞ্চলের সামগ্রিক বৈচিত্রের আভাশ পাই।

গ্রন্থপঞ্জী -

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সৌমিক, জগদ্দল : অতীতের ছবি।

নবদ্বীপের টোল-শিক্ষা-শিবনাথ চতুষ্পাঠী একটি অনুসন্ধান

- অনিরুদ্ধ সাহা ও শিহরণ চক্রবর্তী

" নানা দেশ হইতে লোকে নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে গেলে লোকে বিদ্যারস পায়।"

চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস

ভূমিকা - টোল শব্দটি এসেছে টোলা থেকে। টোলা হচ্ছে জনপদের একটি অংশ, যেমন দক্ষিণ টোলা, উত্তর টোলা ইত্যাদি। এখন যে অর্থে আমরা পাড়া বলি সেইটিকেই বলা হত টোলা। টোলা মানে মিলনের স্থান। মিথিলায় এমন একটি শব্দ রয়েছে পাহিটোল-যা একটা স্থানের নাম, কলকাতায় রয়েছে কলুটোলা। টোল শব্দটি দু-জায়গা থেকে আসা সম্ভব- মিথিলা এবং কাশী। আমাদের লেখাপড়ার আদি স্থান হল নবদ্বীপ। নবদ্বীপের এই ঐতিহ্য এসেছে মিথিলা থেকে। কাশী এবং মিথিলার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী - এই গবেষণা মূলক নিবন্ধের উদ্দেশ্যগুলি হল —

১) ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত প্রাচ্য বিদ্যার কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উন্মোচিত করা।

২) ভারতের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির উত্তরসুরী হিসাবে নবদ্বীপের টোল শিক্ষা ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ণের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে চিহ্নিত করা।

৩) অতীত ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে টোলগুলির বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কারণ নির্ণয় করা।

৪) টোল শিক্ষার পাঠক্রমের ও পরীক্ষা ব্যবস্থার স্থিতিশীল / স্থবিরতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা।

৫) টোল শিক্ষাব্যবস্থা আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে আজকে কতটা প্রাসঙ্গিক তার মূল্যায়ণ করা।

উপাত্ত সংগ্রহের সূত্র -

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক। প্রাথমিক হিসাবে এই শিবনাথ চতুষ্পাঠীর গোড়ার কথা যা শিবনাথ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের দ্বারা লিখিত যা ঐ চতুষ্পাঠী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। মাধ্যমিক হিসাবে শিবনাথ চতুষ্পাঠীর বর্তমান অধ্যক্ষ বর্তমান নবদ্বীপের প্রবীণ সর্বজন শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ।

Delimitation :-

১) টোল কেন্দ্রিক প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা।

২) নবদ্বীপের টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃত শিক্ষা।

৩) সুপ্রাচীন টোল হিসাবে শিবনাথ চতুষ্পাঠীর সেকাল ও একাল।

Analysis and Interpretation :- শিবনাথ চতুষ্পাঠী নির্মাণের সূচনা প্রাচীন গৌরবপূর্ণ ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সমুজ্জ্বল ভাবে বিধৃত হয়ে বর্তমান সময়ে বহুধা বিস্তারিত হয়েছে। এই চতুষ্পাঠীর প্রাচীন মূল পুরুষ রাঘব রাম পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় মিতরাগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত পন্ডিত বাড়ী গ্রামে দ্বিজদেব ভট্টাচার্যের নিকট বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং পরে দ্বিজদেবের কন্যা অর্ধকালীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ঐশ্বরিক বিভূতিমন্ডিত মাতা অর্ধকালীর নামানুসারে এই বংশ অর্ধকালী বংশ নামে সর্ভত্র পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাতা অর্ধকালীর ঐশ্বরিক বিভূতি সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতিলাভ করেছিল। রাঘব রাম মিতরায় চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে অধ্যাপনা করতেন। রাঘবরামের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণসুবর্ণের রাজা কীর্তিধরের রাজসভায় সভাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। রাঘবের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামশঙ্করকে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের জমিদার খোদানওয়াজ খাঁ একশত বিঘা জমি দান করেন চতুষ্পাঠী ও বসতবাড়ী নির্মাণ করার জন্য। রামশঙ্করের পুত্র নারায়ণ সেই পৈর্তৃক ভূমিতে চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে অধ্যাপনা করতেন। নারায়ণ থেকে শিবনাথ পর্যন্ত চার পুরুষ ঐস্থানে অধ্যাপনা করতেন। শিবনাথ পরিণত বয়সে কাশীধামে কয়েক বৎসর বাস করার পর সপরিবারে নবদ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর চারপুত্র কেদারনাথ, উপেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ পিতার অনমনীয় নির্দেশে সংস্কৃত অধ্যয়ণে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর চারজন পুত্রই সংস্কৃত শিক্ষা ও জীবন সাধনায় অসাধারণতা অর্জন করেন। তাঁদের অসাধারণ অধ্যাপনা নৈপূণ্যের গুণে বহুশত ছাত্র সংস্কৃত ভাষায় ও ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে অনন্যতা অর্জন করেছে। তারা সকলেই টোলের নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপকের কাছে অন্তবাসী শিষ্যরূপে থেকে বিদ্যা অর্জন করেছেন। সুদূর অতীতের সেই সংস্কৃত চর্চার নির্দশন বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় হলেও কিছু নিদর্শন আজও অক্ষুন্ন আছে। যোগেন্দ্রনাথ অধ্যাপক কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট রংপুর ব্রাহ্মণ বাড়িয়া গ্রামে অবস্থান করে ব্যাকরণ তীর্থ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পরীক্ষার্থীর্ণতার প্রমাণপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বাক্ষর রয়েছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুরাণের মধ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণতার প্রমাণ পত্রেও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার উত্তীর্ণতায়ও তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। ১৯০৩, ১৯০৫ সালে অন্যান্য পরীক্ষার উত্তীর্ণতার প্রমাণপত্রেও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। এই প্রমাণপত্রগুলি ঐতিহাসিক দলিল রূপে আমাদের চতুষ্পাঠীতে সংরক্ষিত আছে।

শিবনাথের পৌত্রগণও টোলের নিয়মে বাড়িতে সংস্কৃত অধ্যয়ণ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কেহই স্কুলে অধ্যয়ণ করেননি। প্র-পৌত্রগণও এই পরিবারের চিরন্ত ন নিয়ম অনুসরণ করে স্কুলে না গিয়ে টোলে অধ্যয়ণ করেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

শিবনাথের পৌত্রগণের কর্মজীবনে প্রবেশের সময়ে বাড়ির সংস্কৃত শিক্ষায় নতুন গতি আনয়নের জন্য শিবনাথের নামে শিবনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। এই চতুষ্পাঠীটি নবদ্বীপ তমালতলায় অবস্থিত একটি রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই

চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কেদারনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র হেরম্বনাথ বেদান্ততীর্থ ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য বেদান্তদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করতেন। অনুমান খন্ড, শব্দখন্ড সম্বলিত নব্যন্যায় শাস্ত্র ও প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বীরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ নামক আর একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আনুমানিক দুই বৎসর পরে হরম্বনাথ যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ধর্মাধ্যপকের পদে যোগদান করেন এবং বীরেন্দ্রনাথও মন্দারহিল নামক স্থানে (বিহারে) অধ্যাপনায় যোগদান করেন। তখন কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ ও উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ উভয়ে শিবনাথ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধীনে থেকে গভঃ নির্ধারিত বৃত্তি ও ডি.এ. এই চতুষ্পাঠীকে দেওয়া হত। প্রতি বৎসর টোল পরিদর্শক এই টোলে পরিদর্শনের জন্য আসতেন। লক্ষ্মীকান্ত তর্কতীর্থ, নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, নলিনীকান্ত তর্কতীর্থ এরা আসতেন পরিদর্শনে। শৈশব এবং কৈশোর বয়সে বিদ্যমান অধিকাংশ পারিবারিক বালকগণই টোলের ছাত্রছাত্রী রূপে পরিদর্শকের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার সম্মুখীন হত। এটি শিশু ও কিশোর বৃন্দের সংস্কৃত ভাষায় সাবলীল বাচনভঙ্গীতে পরীক্ষক বিস্মিত হতেন। তাঁরা পরিদর্শন বিবরণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিপিবদ্ধ করতেন। তাতে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ণে প্রভূতভাবে উৎসাহিত হত। প্রতিবৎসর পরিদর্শনের দিনটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে উৎসবের দিন বলে গণ্য হত।

ছাত্র ছাত্রীদের অধ্যয়ণেও সংস্কৃত আবৃত্তি ও বক্তৃতায় পটুতা প্রদানের জন্য চতুষ্পাঠীর অন্তর্গত জ্ঞানবিকাশিনী সভা নামে পাারিবারিক সাহিত্য সভার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানকে কেদারনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তার ফলে প্রতি সপ্তাহে সংস্কৃত ও বাংলায় বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও সংস্কৃত বক্তৃতায় তারা সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সভায় বিভিন্ন সময়ে বহু খ্যাতনামা পন্ডিতবৃন্দ শুভাগমন করেছেন। সংস্কৃত কলেজের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অন্যতম। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্র কিশোরের কন্যা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হেমন্তবালাদেবী। এছাড়াও নিয়মিত আসতেন বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পূজনীয় অশোক নাথ মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্য অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ পৌরসভার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান সদানন্দ ভট্টাচার্য্য।

উপরিলিখিত অধ্যাপকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও সংস্কৃত ভাষার প্রতি এদের সকলেরই সমান অনুরাগ ছিল। তাই এদের উৎসাহদানের বাড়ির সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যিতব্য বিষয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা প্রাপ্ত হত।

শিবনাথ চতুষ্পাঠীর শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য আশৈশব ব্যাকরণের নিয়মসমূহ নিখুঁতভাবে অধ্যাপকভাবে ছাত্রের বোধের মধ্যে বিন্যস্ত করে দেওয়ার ফলে ছাত্রের সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দক্ষতা এসে যায়। উপরোন্ত ব্যাকরণ বিষয়ক বিচার পদ্ধতির অনুশীলন ছাত্রকে বিষয়ান্তরেও বিচার চতুর করে তোলে। এরপর কাব্যশাস্ত্রের এবং অলংকার শাস্ত্রের অনুশীলনে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ছাত্রের মোটামুটি দক্ষতা এসে যায়। সে তখন তার সমবয়সী অথবা অধিক বয়সের বিদ্যার্থীর মধ্যেও উপরিউক্ত বিষয়সমূহে বোধের ও ধারণাশক্তির তুলনায় শূণ্যতা লক্ষ্য করে নিজে অধিকতর আত্মপ্রত্যয় অনুভব করে। টোলের

শিক্ষায় ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়ণ পাঠার্থীর পটুতাকে শৈশবেই পরিপুষ্ট করে তোলে। তারফলে সে সমকুলের অধ্যয়ণরত ছাত্রের সঙ্গে তুলনায় অনেক অল্প সময়ে অনেক বেশী প্রাধান্য অর্জন করতে পারে। স্কুলে বহু বিষয়ে যুগপৎ অধ্যয়ণে পল-বগ্রাহিতায় ছাত্র অভ্যস্ত হয়। কোন বিষয়ে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হওয়ার মানসিকতা তৈরী হতে পারে না। কিন্তু টোলের নিয়মে শিক্ষিত ছাত্র ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে গভীর অধ্যয়ণের ফলে অধিকতর ধৈর্য্য সংযম প্রভৃতি মানসিক গুণের অধিকারী হতে পারে - যে গুণগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকতর কঠিন স্তর গুলিতে আরোহণ করতে স্বচ্ছন্দ চারিতা প্রদান করে।

টোলের শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা -

টোলের শিক্ষায় গভীরতা থাকলেও বিষয় বিস্তার কম থাকে। সমাজ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং ইংরাজী ভাষা প্রভৃতিতে অনভিজ্ঞ থাকায় টোলে শিক্ষিত ছাত্র প্রাকটিক্যাল জমতে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু বোধশক্তিকে বিষয়ান্তরে দ্রুত সঞ্চালিত করার কৌশল আয়ত্ত করে সেই অচিরেই তার অপূর্ণতাগুলিকে অপূরণ করে নিতে সচেষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইংরাজি ভাষাটিকে - আয়ত্ত করা তার পক্ষে ঐ অবস্থায় সংহত সাধনার প্রয়োগে সুসম্ভব হয়। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ইংরাজি শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাবগুলি প্রবিষ্ট করতে সচেষ্ট হলে অন্যদের অপেক্ষা অনেক দ্রুত ইংরাজি ভাষায় টোলের ছাত্র প্রাধান্য অর্জন করতে পারে। স্কুলের নিয়মে শিক্ষিত ছাত্রের কিন্তু ঐরূপ ভাষান্তরের মধ্যে ভাবের সঞ্চারণের কৌশল অনায়ত্তই থাকে।

টোল চতুষ্পাঠীতে পরীক্ষা পদ্ধতি -

স্কুলের নিয়মে অভ্যস্ত ছাত্র নিয়তই নানা লিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাই তার লেখার অভ্যাস বেশী হয়। টোলের ছাত্রকে অধ্যাপক নিয়মিত লেখার জন্য প্রেরণা দিয়ে তার এই ন্যুনতাকে নিবারিত করেন। অনেকেরই অধ্যয়ণ বিচারাদিতে প্রাধান্য থাকলেও লেখার বিষয়ে একটা অনীহা থাকে। এই অনীহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণাঙ্গ হতে দেয় না। এজন্য প্রতিদিন অধ্যাপকের কাছ থেকে গৃহীত পাঠ দীর্ঘ মননের দ্বার আত্মস্থ করার পর সেটি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে গৃহীত বিদ্যাকে লেখার মধ্য দিয়ে নিজের করে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ এক যুগব্যাপী পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ আছে। পরীক্ষা এতদিন বন্ধ থাকলে কখনই ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণে সচলতা থাকতে পারে না। টোলের অধ্যাপকদের দেয় বৃত্তিও অনিয়মিত রূপে প্রদত্ত হচ্ছে। সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে সরকারের ভাবটি এইরকম বলে মনে হয় যে আদ্য মধ্য উপধি পরীক্ষা গুলি অনাবশ্যক উপদ্রব মাত্র। এগুলি বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষাধিকারিগণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কুঠারাঘাত করেছেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে এইভাবে স্তব্ধ করে দেওয়ার ফলে বাঙ্গালী জাতিকে আজ বাংলাভাষা বলতে ও লিখতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়েছে। বাঙ্গালীজাতিকে যদি জাতীয় গৌরব ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে অবিলম্বে স্কুলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করতে হবে। টোলের পরীক্ষাগুলির পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। নচেৎ

বাঙ্গালী বাংলাভাষা বলতে ও লিখতে সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম হয়ে পড়বে। মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞতা তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। ভাষাজ্ঞানই ব্যক্তিও জাতিকে সমৃদ্ধ করে। বাঙ্গালীজাতি সেই সমৃদ্ধির থেকে বহুদূরে সরে যাবে।

আমাদের চতুষ্পাঠীতে স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে। কারণ আধুনিক যুগে পূর্বের ন্যায় শুধু টোলে পাঠরত ছাত্র পাওয়া যায়না। আধুনিক শিশুর জননীরা বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসেছে। তার টোলের ব্যবস্থায় - শিশু কত সহজে দ্রুত বিদ্যাশিক্ষায় এগিয়ে যেতে পারে তা জানেনা। এজন্য শিশুকে এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে টোলের পড়ার নিয়ম ও বিষয়বস্তু স্বল্প বিস্তর সংযোজিত করে শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করার সচেতন প্রয়াস অধ্যাপক নিপূণ ভাবে করে শিশুকে বিকশিত করতে পারেন।

শিবনাথ চতুষ্পাঠীতে চরিত্র শিক্ষার উপাদান -

আমাদের চতুষ্পাঠীতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও অনুধাবনে সহগামি রূপে অনুশীলিত হয়। মনুর নির্দেশ হল - বিভিন্ন তপস্যাও শাস্ত্র বিধিনির্দিষ্ট ব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সরহস্য বেদশাস্ত্র ব্রাজনকে অবশ্য অধ্যয়ণ করতে হবে। তপস্যা ও ব্রতপালন বিরহিত ভাবে শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ণ প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে টোলের শিক্ষার এখানেই বিরাট পার্থক্য। নিত্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিকতা বর্জিত সংস্কার বিহীন মৌখিক বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা চরিত্র শিক্ষার সহায়তা হয় না। অথবা জীবনে লেখাপড়া কম শিখলেও তত ক্ষতি নেই, কিন্তু চরিত্র শিক্ষার অভাব থাকলে মানবতাহীন আচরণে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন কলুষিত হয়। যে পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে আধুনিক ভারতীয় স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রতিপালন হয়। সেই দেশের বিভিন্ন মনীষীগণও ধর্ম ও নীতি বাহিত বৌদ্ধিক শিক্ষা বিদগ্ধিত ও বিষবৎ তাজ বলে দেন। এবিষয়ে পাশ্চাত্য মনীষী হার্ভাট স্পেনসারের শিক্ষাবিষয়ক গভীর ভাবে অনুধাবনযোগ্য উদ্ধত উচ্ছত হল —

Education has for is object the formation of character. To curb restive propensities to awaken dormant sentiments, to strengthen the perceptions and cultivate the taste to encourage this feeling and repress that, so as finally to develope the child into a man of well proportioned and harmonious nature this is the aim of parent and maltase.

মুখস্থ বিদ্যায় বৃদ্ধিকে শমিত করার চেয়ে শিশুর ভাবাবেগের সুনিয়ন্ত্রণ অনেক বিশী উপযোগী বলে তিনি অভিহিত করে দেন — What ever moral benefit can be effected, must be effectual by an education which is emotional ratter than intellectual ... if in short you produce state of mind to which proper behavior is natural spontaneous, instinctive, you do some good.

হার্ভাট স্পেনসারের বক্তব্যের প্রতিফলন টোলের শিক্ষাব্যবস্থায় হতে পারে এবং হয়ে থাকে। আধুনিক স্কুল কলেজে শিশুর ভাবাবেগের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ সর্বদা অবরুদ্ধ। তিনি নৈতিক শিক্ষা বিহীন বৌদ্ধিক শিক্ষা প্রদান নিরর্থক ও ক্ষতিকারক বলেছেন। It is contented that intellectual training should not be given without the provision of a basis of character; that it is the worst sort of folly to place a young man is the melee (এলোমেলো লড়াই) of the a young man is the melee of the battle of life with its many temptations and pitfalls, without instructing him thoroughly in the mature of life and developing the moral powers which can alone enable him to srand the strain of the comflict without character, intellectual training is throught to be worse than useless.

Principle of education Herbert Spencer, The education of intelle divorced from the perfection of moral and emotional nature is injurious to human progress.

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নান্ বলেছেন শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর গভীর ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই কাজটি যদি শিক্ষক মনস্তাত্ত্বিক তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন তবে অধ্যেতব্য বিষয়ের কঠিন্য ভেদকরেও শিক্ষার্থী তত্ত্বের গভীর প্রবেশে উৎনাহিত বোধকরবে। টোলের শিক্ষায় শিশুর মনে বিষয়ের প্রতি সুপ্ত ভালবাসার প্রবনতাটিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই সতত প্রযত্ন পরায়ন অধ্যাপক শিশুকে শিক্ষার মধ্যে আলোক ও আনন্দের হর্ষ শিহরণ সঞ্চারী সন্ধন প্রদান করেন। নান্ বলেছেন - The first step in teaching any subject should be to lay firm foundation of a love, by so presenting it as to tempt the pencil to a joyous pursuit if this step be well liken and wisely followed up, there is no need to eliminate the drudgery inseparable from any subject worth serious study.

ভারতীয় প্রজ্ঞাপ্রদীত্ত ঋষিমুনি গনের হাজার হাজার বছরের গভীর গবেষানায় বৈদিক সম্পূনাঙ্গ জীবনচর্য্যার সনিয়ন্ত্রিত স্তরে বিভক্ত করে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই প্রাচীন ভারথীয় শিক্ষাব্যবস্থাই টোল চতুষ্পাঠীতে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকেন্দ্র হচ্ছোন অধ্যাপক। অধ্যাপকের আদর্শই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সঞ্চারিত ও বিস্তরিত হয়ে থাকে। ছাত্রের চরিত্র নির্মানও বিদ্যাবত্তয় পারদর্শিতা প্রাপ্তিই শিক্ষকের জীবনের একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য। তিনি ছাত্রকে আশৈশব নিজগৃহে খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতির দ্বারা ভরণ পোষণের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব সানন্দে ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে জীবনপুষ্পকে বিকশিত করার গুরুতর দায়িত্ব বহন করেন। প্রদীপ থেকে যেমন প্রদীপান্তর প্রজ্বলিত হয়

সেইরূপ শিক্ষকের গুণালোক শিশুর নিষ্পাপ অন্তঃকরণকে প্রদীপ্ত করে তোলে। এই জ্ঞান বিতরণ ও আদর্শ জীবন নির্মাণ হচ্ছে অধ্যাপকের বেদ নির্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য। অধ্যাপক তার অধ্যাপকের কাজ থেকে অনুরূপ ভাবে বিদ্যালাভ করেছেন। সেই বিদ্যা পরবর্তী শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলেই তাঁর ঋণমুক্তি হবে। যজন-যাজন অধ্যয়ণ, অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্কর্ম শালিত্বই ব্রাহ্মণেত্বর লক্ষণ। মনু বলেছেন - বিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বললেন - আমি তোমার শেবধি মূল্যবান সম্পদ। তুমি আমাকে রক্ষাকর। শুধু আম্মস্থি করলে হবে না। সেই বিদ্যা সঞ্চারিত করতে হবে উপযুক্ত পাত্রে। বিদ্যাদানের এবং বিদ্যা গ্রহণের উপযুক্ততা হল অসূযা রাহিত্য। অসূয়া হচ্ছে অন্যের গুণকে দোষ বলে মনে করা (অসূয়াতু দোষারোপা গুণেষপি - অমর কোষ) ঈর্ষা হল অপরের ভাল সহ্য করতে না পারা। এর পরবর্তী মানসিক নীচতাপ্রদ সখলন হল অসূয়া। এইরূপ অসূয়াপ্রবণ ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করতে নিষেধ করেছেন মনু। বিদ্যা অনেকেই অর্জন করতে পারে। কিন্তু অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তির বিদ্যা ধার্য্যবতী হতে পারে না। সেটি নিধীর্য্য এবং নিষ্কল হয়। বিশুদ্ধ চরিত্রের দ্বারা অধিগত বিদ্যাই ধার্য্যবতী হয়।

আজ স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করতে হয় প্রচুর অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের ফলে ধনীদেশসমূহ অন্যান্য দেশে বিদ্যাবিক্রয়ের দ্বারাই সর্বাপেক্ষা অধিকতম লাভ জনক বাণিজ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে। এইভাবে অর্জিত বিদ্যা ভারতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এইরূপে শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক বিদ্বেষ বিদূষিত। শিক্ষক নিজের কেরিয়ার গঠনে ব্যস্ত। ছাত্রের নৈকট্য তিনি অনাবশ্যক উৎপাত বলেই মনে করেন এবং যথাসম্ভব ছাত্রের নৈকট্যকে এড়িয়ে চলেন। ছাত্র শিক্ষকের নিকট প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বস্তাপচা নোট গ্রহণ করেন। সেগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করে। এইরূপ বিদ্যাদানও গ্রহণের মধ্যে শ্রদ্ধার কোন প্রবেশাধিকার নেই। গীতা বলছেন এইরূপ শ্রদ্ধাহীন (আম্বিকাবুদ্ধি শূন্য) যজ্ঞ, দান বা তপস্যা প্রভৃতি অসৎ। এইসব যজ্ঞাদি পরলোকে ও ইহলোকে নিষ্কল হয় (গীতা ১৭/২৮)

উপনিষদের নির্দেশ অনুসারে টোল চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার দান ও গ্রহণ সশ্রদ্ধভাবে বিহিত হয়। টোলের ছাত্ররা আজও অবৈতনিক ভাবে অধ্যাপকের কাছে বিদ্যা গ্রহণ করে। ছাত্রের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে বিদ্যাদানের কোন ব্যবস্থা ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কোন স্তরেই ছিল না এবং নেই। তার ফলে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বেদবাক্যে অস্তি ক্যবুদ্ধিই এইরূপ অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনার প্রাণশক্তি।

শিবনাথ চতুষ্পাঠী তথা অন্যান্য চতুষ্পাঠীতে অনুসৃত Syllabus -

চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট শিশুকে প্রথম থেকেই গণমালা, ব্যাকরণের সূত্রাবলী ও অভিধান (প্রধানতঃ অমরকোষ) এই তিনটি বিষয়ে মুখস্থ করানো হয়। বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে - 'গণ সূত্র অভিধান তিনটেনে মুখে আন'। এরপর যখন পাণিনি ব্যাকরণ মহাভাষ্যসহ এবং ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা শাস্ত্র, বেদান্ত শাস্ত্রাদি বিদ্যার্থী অধিগত করার জন্যে সচেষ্ট হবে, তখন তার অধ্যয়ণ হবে অনেক বেশী অধ্যাসয়ার সাপেক্ষ। অধ্যেতব্য পুস্তক ২/৩ খানির বেশী প্রথম অবস্থায় প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সেই বইগুলির প্রতিপংক্তি অধ্যয়নের

অধ্যাপকের অধ্যাপনায় অখন্ড মনোনিবেশ আবশ্যক হবে। স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সিলেবাসের ক্ষেত্রেও টোল চতুষ্পাঠীর লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক সমুদয় প্রধানতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচিত হয়। প্রতিবৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তিত হয়। দাদার ব্যবহৃত এই পরবর্তী সময়ে ভাই আর ব্যবহার করতে পারে না। কারণ স্কুলের সিলেবাস প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় একই বই পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হতে থাকে। পূর্বে ছাত্রগণ নিজের অধ্যেতব্য গ্রন্থ নিজেই নিজ হস্তাক্ষরে লিখে শিক্ষকের কাছে সেটি অধ্যয়ন করতেন। এখনও সীমিতভাবে টোলে ঐ প্রথা অনুসৃত হয়ে থাকে। নিজে বইখানির প্রতিলিপি রচনা করলে ধৈর্য্য, সহনশীলতা, মননশীলতা চিত্তবৃত্তির একতানতা প্রভৃতি গুণগুলি চারিত্রিক চিরস্থায়ী গুণরূপে বিকশিত হয়।

যাজ্ঞ বল্ক্য শিক্ষানামক গ্রন্থে বলা হয়েছে অধ্যেতব্য গ্রন্থ আয়ত্ত করার জন্যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে হবে। শতবার আবৃত্তি করতে হবে। তাতেও না হলে হাজার বার আবৃত্তি দ্বারা আত্মস্থ করতে হবে। বলা হয়েছে — গুণিতা শতশো বিদ্যা সহস্রাবত্তিতাপুনঃ। আগমিষ্যতি জিহ্বাগ্রে স্থলাম্ নিম্নমিবোদকম। মিবোদকম। অর্থাৎ জল যেমন নীচ প্রদেশের প্রতি শীঘ্র ধাবিত হয়। সেইরূপ শতবার বা প্রয়োজনে অমিত ধৈর্য্য অবলম্বনে সহস্রবার পর্যন্ত আবৃত্তি করলে বিদ্যা অবশ্যই জিহ্বাগ্রে সমাগত হবে। (যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা বর্ণপ্রকরণে অধ্যেত ধর্মা ঃ ১০৩ শে-াক) অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নেই। (১০৫ শে-াক) পিপীলিকার পাং সুসঞ্চয়ে উদ্যমই একমাত্র কারণ বল জনি সামর্থ্য কারণ নয়। (১০৬ শে-াক) বিদ্যার্জনেও উদ্যমই কারণ। অঞ্জনের ক্ষয় ও বল্মীকের সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করে প্রতি দিনকে দান এবং অধ্যয়ন কর্ম দ্বারা সফল করে তুলতে হবে। (শে-াক ১০৭) যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাগ্রন্থে উপদিষ্ট এইরূপ বিদ্যোৎসপ্রদ নির্দেশ বিদ্যার্থীগণকে সংস্কৃত শিক্ষায় কঠিন ও কঠোর অধ্যাবসায়ে প্রবৃত্ত করে।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পদ ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করতে পারবেন টোলে স্বীকৃত বিদ্যাশিক্ষার অপরাজেয় অনন্যসাধারণ মহিমা আছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অপরিহার্য্যতার কথা ব্যক্ত করার জন্য "শিক্ষা নামক সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ণ করে দেন। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত পন্ডিতগণের মধ্যে গোঁড়ামি ও অনমনীয়ভাবে শাস্ত্রীয় সংস্কারে সমূহের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী বলে বহুনিদিত বহু চর্চিত বিষয়। কিন্তু সর্বতোমুখী দৃষ্টির দ্বারা অবকেলিত হলে অবধারিত ভাবে অনুভব গোচর হবে এই টোল চতুষ্পাঠীতে স্বীকৃত বিদ্যায় এমন কিছু উপাদান আছে যার প্রভাবে সামাজিক যুগান্তকারী সুপরিবর্তনের পুরোধারূপে পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দই এগিয়ে এসে সমাজে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তদীয় সহপাঠী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার ব্রহ্মবন্দিব উপাধ্যায় প্রভৃতি টোল চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দই সমাজকে সংস্কৃতানুগ সমৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন করার জন্য আজীবন প্রাণপন প্রয়াস করে গিয়েছেন। টোল চতুষ্পাঠীতে গৃহীত সংস্কৃত শিক্ষায় যে অনবদ্য উপাদান মানুষকে গতানুগতিকভাবে অতিক্রম করে যুক্তিবাদী ও

ন্যায়নিষ্ঠ করে তোলে সেরূপ কিছু উক্তি এখানে উদ্ধৃত হল। যথা - "যুক্তিযুক্ত; বচোগ্রাহ্যং ন গ্রাহং গুরু গৌরবাৎ"। যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা (১১৫) যোগবশিষ্ট রামায়ণে যুক্তি বিচারে ভূয়সীপ্রশংসা গীত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি শে-াক "যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ পদ্ম জন্মনা"।

টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষার সঙ্গে স্কুল কলেজে প্রদত্ত শিক্ষার বৈশাদৃশ্য এইটি যে স্কুল কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা প্রধানত ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক কেরানী সৃষ্টির জন্য রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরেও বৃটিশের অনুসৃত পদ্ধতিই অন্ধভাবে অনুসৃত হচ্ছে। তাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে শিক্ষাধিকারী বিশেষজ্ঞগণও বিশেষ রূপে অজ্ঞ। তাঁদের অন্ত র্দৃষ্টির সম্মুখে শিক্ষা বিষয়ক কোন উজ্জ্বল আদর্শ নেই। তাদের দৃষ্টিতে কেরানী রচনা অথবা অন্য কোন প্রকার জীবিকার প্রস্তুতিপর্ব - রূপেই মাত্র শিক্ষার লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। টোলে শিক্ষা কিন্তু জীবনের আগামী লক্ষ সম্বন্ধে মোটেই অন্ধ নয়। টোলের প্রতিটি অধ্যাপক এবং অধ্যেতব্য অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সমুজ্জ্বল আদর্শ অভ্রান্তভাবে পথ নির্দেশ করছে। তাঁর এককথায় জানেন এবং অনুভূতি দ্বারা অনুক্ষণ অনুধাবন করেন। যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ। সেই ঈশ্বরলাভের সহায় তা সাধক রূপে প্রথমত মানবতার বিকাশ সাধন অপরিহার্য্য। কারণ পশুপাখি জন্মের দ্বারা পশুত্ব ও পাক্ষিত্ব অর্জন করলেও মানুষ জন্মের দ্বারা মানবতা অর্জন করতে পারে না। মানবতা অর্জনের জন্য তার সুদীর্ঘ ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত নানাবিধ অনুশীলন প্রযোজ্য। সেইসব অনুশীলনই হল টোল চতুষ্পাঠীতে প্রদত্ত শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব টোলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী যে বিবিধ তপস্যা ও ব্রতপালনের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিদ্যাগ্রহণের জন্য অনন্ত প্রয়াস পরম্পরায় নিরঙ্কর স্পন্দিত হন। সেইসব অনন্ত স্পন্দন নিরন্তর এক সর্বব্যাপী নিস্পান্দ চৈতন্যে সমর্পিত হয়ে থাকে। তাই টোলের কোন কর্মই অন্তিম আদর্শের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি কর্মই সেখানে পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে ব্যক্তি জীবনকে সমষ্টি জীবন ধারার সঙ্গে আলিঙ্গিত করে অবস্থান অবস্থান করছে। সেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী নানাবিধ জটিল শাস্ত্র বচনের বিশে-ষণে ব্যাপৃত থাকলেও সে সকল কর্ম পরম্পরার একটি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ও অন্য একটি অন্তিম উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবানের প্রদত্ত উপদেশ অনুযায়ী তাঁর জানেন যে কর্ম সম্পাদনের প্রাথমিক লক্ষ্যের সঙ্গে চরম লক্ষ্যকে সর্বদা সংগৃহীত করে জীবন দেবতার শ্রীচরণে সমর্পণ করতে হবে।

ভগবান গীতায় বলেছেন —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুশ্ব মদর্পনম ॥ গীতা ৯/২৭

টোলের শিক্ষায় জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গ সুদৃঢ় প্রত্যয় ধীরে ধীরে সুসংহত হওয়ার ফলে হতাশাজনিত বিড়ম্বনায় ব্যাকুলিত বিষন্নতা কখনই তাকে গ্রাস করতে পারে না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ভবিষ্যদৃষ্টিতে বলেছে যে, আগামীতে হতাশাজনিত আত্মহননে মহামারী রূপে সমাজকে সংহার করবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সম্ভাবিত এই উদ্বেগদায়ক আগামী প্রবণতাকে প্রতিহত করতে হলে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। শৈশবে

এবং কৈশোর বয়সেই বিদ্যার্থীর মানসিক চিন্তাধারাকে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করে গড়ে তুলতে হবে। শুধু জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন কতগুলি নীরস জীবিকলাভের উপযোগী অধ্যয়ন প্রতিটি উদীয়মান বালকের জীবন বিকাশকে আনন্দময় আদর্শে পথে গতিদান করতে পারবে না। তার প্রচন্ড পরাবেড়কে অনুধাবন করতে হবে এবং তার ওষ্ঠ প্রসারণ ও উত্তরণকে নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য অপরিহার্যভাবে আবশ্যক হবে শিক্ষার্থীর নৈতিক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আকুতির পরিপূরণের জন্য সহানুভূতি পূর্ণ প্রয়াস পরম্পরা।

স্কুল কলেজের বহু ব্যস্ত কর্মধারার মধ্যে এইরূপ সহানুভূতি পূর্ণ সহযোগিতার পরিবেশ রচনা কখনই সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষাকে স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করা। এরূপ ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজের শিক্ষার অবিরোধে অবসর সময়ে টোল চতুষ্পাঠীতেও প্রবিষ্ট হয়ে সুবিশাল অন্তর্জগতের অনুসন্ধিৎসার আনন্দ শিহরণ সঞ্চারী স্পন্দনে নিজ অন্তসত্ত্বাকে গভীর আনন্দের আলোড়নে আলোকিত ও পুলকিত হতে পারে। এইভাবে তার ভাবাবেগের যথাযথ বিন্যাস ও সুস্থিতি স্বীকৃতি লাভ করবে। ছাত্র বয়ঃ সন্ধিক্ষণে নিজেকে অসহায় মনে করবে না। নৈরাশ্যের স্থলে উৎসাহ, নেতিবাদের স্থলে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তার জীবনের গতিকে প্রচন্ড বেগে আগামী উন্নতির দিকে প্রবর্তিত করতে পারবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলি উঠে এলো সেগুলি হল —

১) চতুষ্পাঠী (টোল) কেন্দ্রিক ধ্রুপদী শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন।

২) ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন স্বরূপ টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃত শিক্ষার গৌরবেই নবদ্বীপ হয়ে উঠেছিল 'OXFORD OF BENGAL'।

৩) বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রঘুনাথ শিরোমনির সময় থেকে মধুসূদন ন্যায়াচার্যের (কোলকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন) আমল পর্যন্ত অনেক প্রকৃত যশা অধ্যাপক নবদ্বীপের টোলগুলিতে সংস্কৃত পাঠে আগ্রহী শিক্ষার্থীগণকে নিষ্ঠাসহ বিদ্যাদান করে নবদ্বীপকে মহিমান্বিত করেছিলেন।

৪) মধুসূদন ন্যায়াচার্যের পর ভারতী দেবীর রাজধানী এই নবদ্বীপে উত্তর সাধকগণের অভাবে ক্ষিতির প্রদীপের দীপশিখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নির্বাপিত হওয়ার আশঙ্কায় কালক্ষেপন করছে।

৫) আবাসিক বিদ্যায়তন হিসাবে নবদ্বীপের টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃত শিক্ষা ভারতের সনাতন শিক্ষার গুরুকুল পদ্ধতির ঐতিহ্যকে সযত্নে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করলেও রাজশক্তির উদাসীনতায় তা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উপনীত।

৬) নবদ্বীপের টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃত শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা পড়েছে Integrated Curriculum যেখানে আচার্য (শিক্ষক) নিজেই হয়ে উঠেছেন একটি Curriculum বা পাঠক্রম।

৭) আর্থিক দৈন্যতা ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে নবদ্বীপের বেশিরভাগ টোলগুলির পঠন পাঠন দুর্বল (Poor condition) হলেও কয়েকটি টোল চরম প্রতিকুলতার মধ্যেও অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সংকল্পবদ্ধ।

৮) শিবনাথ চতুষ্পাঠী সেই গুটিকয়েক প্রমিথিউসদের মধ্যে অন্যতম। সুপ্রাচীন সাংখ্যদর্শনের চর্চা একমাত্র এই চতুষ্পাঠীতেই লক্ষ্য করা যায়।

৯) শিবনাথ চতুষ্পাঠী পূর্বতন আচার্যগণ থেকে উত্তর আচার্যগণের পারিবারিক জীবনে সংস্কৃত চর্চার ধারাবাহিকতা এই ভাষা চর্চার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ণের (Sustainable development) সহায়ক। দেবভাষা সংস্কৃত তাদের কাছে সাক্ষাৎ জননী স্বরূপা। এই ভাষার দ্বারা তারা পালিত, এ বিষয়ে এই চতুষ্পাঠী অধ্যাপকগণ সদা সচেতন।

১০) শিবনাথ চতুষ্পাঠী অধ্যক্ষ ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য্য; সহাধ্যক্ষ্য ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য এবং সহাধ্যক্ষ্য ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য্য দেবনাগরী ভাষায় সুপন্ডিত, বাগ্মী বা চিক সংস্কৃত ভাষায় (Spoken Sanskrit) অত্যন্ত সাবলীল।

১১) প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি যা গবেষণা কার্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিবেচিত হয় সেগুলির সযত্ন সংরক্ষণে শিবনাথ চতুষ্পাঠীর নিরলস প্রয়াস নবদ্বীপের টোলকেন্দ্রিক ধ্রুপদী শিক্ষার ঐতিহ্য সংরক্ষণের সহায়ক।

১২) যে কোন শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা বিভাগ তার উৎকর্ষ ও গুণমানের পরিচয় বহন করে। শিবনাথ চতুষ্পাঠীর বহুমুখী প্রকাশনা প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে সবিশেষ অনুপ্রেরণা দায়ী।

Major Findings -

১) নবদ্বীপের টোল কেন্দ্রিক শিক্ষা ভারতের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিকে তথা প্রাচ্য বিদ্যাচর্চাকে সজীব (Living)করে রেখেছে।

২) অধিকাংশ টোলগুলির শিক্ষাগত পরিকাঠামো ক্ষয়িষ্ণু হলেও শিবনাথ চতুষ্পাঠী একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষালয় যা প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ।

৩) জীবিকার ক্ষেত্রে টোলের শিক্ষার সরকারী মান্যতা এবং সামাজিক স্বীকৃতি আজও প্রয়োজন বলে মনে করেন শিবনাথ চতুষ্পাঠীর বর্তমান অধ্যক্ষ।

৪) সরকারী উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা বর্তমান টোলকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থবিরতার মুখ্য কারণ।

৫) Indian pedagogy র একটা Classical example হিসাবে শিবনাথ চতুষ্পাঠী প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে স্বীকৃতি পাবার দাবী রাখে।

৬) নবদ্বীপে অন্যান্য প্রায় সকল চতুষ্পাঠী (টোল)গুলির Curriculum; Syllabus এবং Text book এর বিষয়ে অসহিষ্ণু মনোভাব লক্ষ্য করা গেলেও শিবনাথ চতুষ্পাঠী মনোভাব অনমনীয় নয়। পাঠক্রমের কাঠিন্য সম্পর্কে তাদের বক্তব্য নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক গঠন মূলক।

৭) নবদ্বীপের সারস্তত সাধনার ধারাকে বজায় রাখার জন্য তারা সাপ্তাহিক বা চিক সংস্কৃত ভাষা চর্চার ক্লাস করতে আগ্রহী এবং সুপ্রাচীন বঙ্গ বিবুধ জননী সভার পুনরুজ্জীবনে তৎপর ও সক্রিয়।

৮) " Education without burden" এর যুগে টোলের পাঠক্রমের ব্যাপ্তি ও জটিলতায় শিক্ষার্থীরা ভারাক্রান্ত। প্রয়োজন Revised syllabus and new selection of texts.

৯) Summative evalution should be changed অনিয়মিত পরীক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করেছে।
১০) ১৯৬১ সালে গঠিত National Integration Commission যে ত্রিভাষা নীতির কথা বলেছিলেন তার প্রায়োগিক দিক হিসাবে টোলের সংস্কৃত ভাষা চর্চা মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাবার কথা।
কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

প্রকল্পের গুরুত্ব -

১) ভারতে সনাতন শিক্ষা ধারার দুটি দিক পরা ও অপর। পরাবিদ্যা চর্চার অন্যতম বাহন হিসাবে টোল কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন আশু প্রয়োজন।
২) ভারতীয় সংস্কৃতির আদি ভান্ডার হিসাবে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্যের অবদান ইতিহাস কর্তৃক স্বীকৃত।
৩) ইতিহাসে স্বীকৃত এবং অতীতের গৌরব মন্ডিত এই বিদ্যার পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।
৪) নবদ্বীপের টোলগুলিতে যে সকল পুঁথি সংগ্রহশালা আছে তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণের প্রয়োজন।
৫) সর্বোবিদ্যায় বিকাশ স্থল নবদ্বীপকে বিদেশীয় পন্ডিতগণ যে Oxford of bengal বলতেন তা যে মূলত এই টোল কেন্দ্রিক শিক্ষার গৌরবময় ভূমিকার জন্যই তা সুবিদিত। কিন্তু সারস্বত সাধনার পীঠস্থান নবদ্বীপের গৌরবময় অতীত মহিমাকে উদ্ভাসিত করা।

Bibliography -

১) ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য্য (২০০৭) সামাজিক সমুন্নয়নে চতুষ্পাঠী সমূহের গৌরবপূর্ণ ভূমিকা; 'প্রেক্ষাপট পত্রিকা' বিশেষ সংস্কৃত সংখ্যা; বইমেলা; ২০০৭
২) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি; (১২৯১ বঙ্গাব্দ); নবদ্বীপ মহিমা; যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সম্পাদিত; নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ; নবদ্বীপ।
৩) অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (১৯৭৭); নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস; নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার রজত জয়ন্তী স্মরনিকা; দশম ভাগ; জানুয়ারী; ১৯৭৭।

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক ছবি

- পাপিয়া দাস

ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। আরম্ভ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৪৪ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত । এই বিভাগ অবশ্য আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। তবে এই দুটি অংশের মধ্যে যে বিরাট ছেদ ঘটেছে বা কোনো যোগসূত্র নেই একথা ভাবলে ভুল হবে।

তবে প্রায় একশত বছর ধরে ইংল্যান্ডের বিচ্ছিন্ন ও অসংহত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও সর্বজনীনরূপ দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা ইংল্যান্ড সরকার ও জনগণের মধ্যে কাজ করে এসেছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। এই শিক্ষা আইনেই শিক্ষার বিস্তার ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তিত আছে তার জন্মদাতা হল এই আইনটি।

পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন অন্যান্য জাতির শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোয়। ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাও সেইভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহু বৎসর ধরে এগিয়েছে মন্থর পদক্ষেপে। সরকারের সাহায্য দূরে থাক কোনরূপ সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থাও সেখানে উনবিংশ শতাব্দীতে সেখানে গড়ে ওঠেনি। সরকারের প্রথম সাহায্য এল ১৮৩৩ সালে। যে কারণগুলি ইংল্যান্ডের শিক্ষার অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইংল্যান্ডের মানুষের রক্ষণশীলতা। সেখানকার মানুষের ঐতিহ্য ও প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির প্রতি অনুরাগ অসীম। হঠাৎ কোন নতুন পরিবর্তনকে তারা অসন্দিগ্ধ মনে গ্রহণ করতে চায়না। যা প্রাচীন এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতিযুক্ত সেগুলিকে তারা সহজে বদলাতে রাজি হয় না। সেজন্য বহুদিন ধরে প্রচলিত শিক্ষার আয়োজনে সহজে কোন পরিবর্তনকে তারা প্রবেশ করতে দেয়নি। দ্বিতীয় কারণ হল ইংল্যান্ডের মানুষের অসীম স্বাধীনতা প্রীতি। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও হস্ত ক্ষেপকে চিরকালই তারা ভয় পায় এবং সেইজন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সব সময়েই তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তৃতীয় কারণ, নানা রাজনৈতিক কারণে সরকারের কর্মক্ষমতার উপর তাদের আস্থা খুব বেশি ছিল না। রাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা সরকারের মনোভাব সব সময়ই জনস্বার্থবিরোধী ছিল। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা কোনরূপ হস্তক্ষেপও উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত সহ্য করা হয়নি। এই সকল কারণের জন্যই ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন ছিল ধীর ও মন্থর।

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রথম শুরু হয় ১৮৩৩ সালে। যখন বাৎসরিক ২০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ করা হল দেশের শিক্ষার বিস্তারের জন্য। সেই থেকে আস্তে আস্তে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সার্বজনীন সচেতনতা দেখা দিতে শুরু করল। একের পর

এক আইন পাশ হতে লাগল দেশের বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল রূপ দিতে। ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বলে দুটি পৃথক শিক্ষাস্তর ছিল না। প্রাথমিক স্কুলেও মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হত আবার মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষা সংযুক্ত ছিল। পাঠ্যক্রমও দেশের সময়োচিত প্রয়োজনের অনুরূপ ছিল না। গ্রামার স্কুল নামক স্কুলগুলিতে কেবল ল্যাটিন, রোমান, হিব্রু ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দান করা হত। প্রাইভেট স্কুলগুলিতে গণিত, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি কিছু কিছু বিষয় শিক্ষা দান করা হলেও তেমন সন্তোষজনক ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা প্রথাও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। স্কুলের অবস্থাও খারাপ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাও বিপর্যস্ত ছিল। অতএব সেই সময় যেমন প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় সাহায্যের তেমনই প্রয়োজন ছিল শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের। এর ফলে প্রথম শিক্ষার আইন পাশ হল ১৮৭০ সালে। এই আইনের বলে সরকার যে সকল স্থানে ছেলেমেয়েদের পড়ার স্কুল নেই সেই সকল স্থানে স্কুলবোর্ড গড়লেন এবং তাদের হাতে ভার দিলেন ওই স্থানে স্কুল তৈরি করার। স্কুল বোর্ডের চেষ্টায় দেশে স্কুলের অভাব দূর হল। সব অঞ্চলেরই ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা হল। কিন্তু, শিক্ষাব্যবস্থার তেমন কোন সুসংহত রূপ এর ফলে আত্মপ্রকাশ করল না। পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি তেমনই অনগ্রসর রইল। তাছাড়া প্রাইভেট স্কুলগুলি যেমন স্বাধীন ছিল তেমনই রইল। তাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হল না।

এরপরের শিক্ষা আইন পাশ হল ১৯০২ সালে। এই আইনের দ্বারা ইতস্তত স্থাপিত ও পরিকল্পনাহীন স্কুলবোর্ডগুলিকে তুলে দিয়ে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হল। এর ফলে কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল দেখা দিল স্কুলবোর্ডের জায়গায় এবং সেগুলিই স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local education authority) বা সংক্ষেপে এল.ই.এ. (L.E.A) বলে পরিচিত হল। এই আইনের বলে সরকারী,বেসরকারী সমস্ত স্কুলই এল.ই.এ-র কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল। ১৯০২ সালের আইনে নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট সংস্কার করা হলেও প্রচলিত পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে আর একটি শিক্ষা আইন পাশ হল। এই আইনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হল। ১৯২৬ সালে হ্যাডো রিপোর্ট নামে ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এতে মাধ্যমিক শিক্ষার নানান দিক সংস্কার সাধনের প্রস্তাব থাকে। ১৯৩৬ সালের আর একটি শিক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে তেমন কোন বিশেষ সংস্কার সাধন করা হয় না। স্বাধীন শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ যাতে বেসরকারী স্কুলগুলিকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে এই আইনের দ্বারা কেবল সেই ক্ষমতাই তাদের দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে স্পেনস্ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বিভিন্নধর্মী মাধ্যমিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হয় এই রিপোর্টে। এরপরের শিক্ষা আইনটি পাশ হয় ১৯৪৪ সালে। এই আইনটি ইংল্যান্ডের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উলে-খযোগ্য পদক্ষেপ। এতদিন যেসব ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে ব্যর্থ করে আসছিল সেসব দূর করে ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুসংহত

ও সুশৃঙ্খলরূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই আইনটিতে। এই আইনের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি হল এই ঃ শিক্ষাবোর্ড তুলে দিয়ে দেশে শিক্ষার বিস্তার ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি মন্ত্রীদপ্তর খোলা হল। ইংল্যান্ডে এই প্রথম শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তর সৃষ্টি হল।

ব্যবস্থা হল যে, শিক্ষামন্ত্রী দুটি মন্ত্রণা পরিষদ (Advissory Council) এবং একজন সেক্রেটারি ও অন্যান্য অধীনস্থ কর্মচারীর সহায়তায় দেশে শিক্ষার সুষ্ঠূ প্রসার ও সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করে যাবেন। শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক নির্বাচিত পরিদর্শক গোষ্ঠীরা তাকে তাঁর কাজে সাহায্য করবেন।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হলেন কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিল। এদের সংক্ষেপে নাম দেওয়া হল লোকাল এডুকেশন অথরিটি বা এল.ই. এ.। শিক্ষাঘটিত স্থানীয় কাজকর্ম সবকিছুরই ভার রইল এল.ই.এ -ই একটি করে শিক্ষা কমিটি গঠন করবেন এবং সমস্ত শিক্ষা মূলক কাজ করার সময় তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। প্রত্যেক এল.ই.এ উপযুক্ত লোক দেখে একজন করে প্রধান শিক্ষা কর্মচারী নিযুক্ত করবেন।

এই আইনেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ শিক্ষাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা হল। যেমন - প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অধিকতর। প্রত্যেক স্তরের জন্য বয়সের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক করা হল, যেমন প্রাথমিক ৬ থেকে ১২ অনধিক, মাধ্যমিক ১২ থেকে ১৬ এবং অধিকতর ১৬-র উপরে। এল.ই.এ-র তৈরি স্কুলগুলির নূতন নামকরণ হল কাউন্টি স্কুল এবং যেগুলি এল.ই.এ-র তৈরি নয় সেগুলির নাম দেওয়া হল ভলান্টারি স্কুল। ভলান্টারি স্কুলগুলি অর্থাৎ যে স্কুলগুলি কোন ধর্মমূলক বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত, সেগুলিকে আবার তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় - সাহায্যপ্রাপ্ত, বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন এবং নিয়ন্ত্রিত। এল.ই.এ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে স্কুলবাড়ির পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন বাবদ মোট ব্যয়ের অর্ধেক পরিমাণ সাহায্য করবে। বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন স্কুলগুলির স্কুলভাগের পরিবর্তনের জন্য যা টাকা লাগবে তার তিন চতুর্থাংশ দেবে এল.ই.এ। এভাবে কাউন্টি স্কুলগুলি সম্পূর্ণ এল.ই.এ -র কর্তৃত্বাধীন হল এবং সেগুলির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব হল এল.ই.এ-র। এল.ই.এর পরিচালিত কোন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হবে না। এই আইনের দ্বারাই ইংল্যান্ডের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হল। ৫-১৫ বছর বয়স থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর করারও অধিকার দেওয়া হল শিক্ষাদপ্তরকে। অধিকতর শিক্ষা বলতে বোঝায় বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের বয়স পার হয়ে যাবার পর কিছু সময়ের জন্য যা পুরো সময়ের জন্য কোনরূপ শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা। তাছাড়া কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবসর যাপনের আয়োজনও এই ব্যবস্থার অন্তর্গত হল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, অধিকতর শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষামূলক শিক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ ক্লাব বা সাংস্কৃতিক সংস্থার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাও এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই অধিকতর শিক্ষাব্যবস্থারই অঙ্গরূপে কাউন্টি কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনাটিও এই আইনের অন্তর্গত করা হয়েছে। যদিও সেটিকে এখানে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪৪ সালের আইনটি ইংল্যান্ডের প্রচলিত শিক্ষাধারার একরকম আমূল সংস্কার সাধন করেছে। পূর্বের আইনগুলি দ্বারা শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু দূর করা হলেও সেগুলির

রক্ষণশীলতা ও অনিশ্চয়তার ফলে একটি সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪৪ সালের আইনটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর নীতিগত দৃঢ়তা ও সুনিশ্চয়তা। এই আইনের ফলে ইংল্যান্ডে আজ সমগ্র দেশে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

১৯৪৪ সালের আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা অনুভূত হয়েছিল এবং সেগুলি দূর করার জন্যই ১৯৪৬ সালে, ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫৩ সালে আরও তিনটি আইন পাশ করা হয়। অবশ্য ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার যে মূল কাঠামোটি নির্ধারিত হয়েছিল এই আইনগুলির দ্বারা তার বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন ঃ —

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংল্যান্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিতান্তই দৈন্যময় ছিল। তবে একেবারে জনসাধারণের শিক্ষাগ্রহণের কোন মাধ্যম ছিল না, একথা ভাবলে ভুল হবে। বহু জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণের জন্য ছোটো ছোটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ব্যাপক সচেতনতা দেখা যায়। এবং কতগুলি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ঐ সময় গঠিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করে। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার উলে-খযোগ্য বিস্তার ঘটে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই Society for promoting christan knowledge এর নাম করতে হয়।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা যায় যে ইংল্যান্ডে বহু বিভিন্ন শ্রেণির প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রচলিত হয়েছে। এগুলি সরকারের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য পেত না বা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। প্রধানত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকেই এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ধর্মযাজকগণেরই তত্ত্বাবধানে এই স্কুলগুলি পরিচালনা হত।

ডেমস্কুল ঃ —

প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এক শ্রেণির স্কুলের নাম ছিল ডেমস্কুল (Dame school)। ডেম কথাটির অর্থ মহিলা। সাধারণত একজন করে বয়স্কা মহিলা এই ধরণের স্কুল পরিচালনা করতেন বলে এগুলির এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এই ডেম স্কুলগুলিকে শিশু বিদ্যালয় (Infant school) বলে বর্ণনা করা যায়। এইসব ডেমস্কুলের সাপ্তাহিক বেতন সামান্য কয়েক পেনস্ মাত্র ছিল। সে সময়কার বিভিন্ন ইংরাজি সাহিত্যিকের লেখায় এই ডেম স্কুলের নানারকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

কমন ডে স্কুল বা প্রাইভেট স্কুল ঃ—

আরেক ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ছিল কমন ডে স্কুল বা প্রাইভেট স্কুল (Common Day School or Private school)। এগুলিতে একটু বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে যেত। এগুলিতে জুনিয়র স্কুল বলা যেতে পারে। এগুলিতেও একজন করে শিক্ষক থাকতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পুরুষই হতেন। এই শিক্ষকগণ অত্যন্ত অজ্ঞ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির হতেন। তবে কোন কোন কমন ডে

স্কুলে যে ভাল শিক্ষা দেওয়া হত না এমন নয়।

চ্যারিটি স্কুল ঃ—

ডেম স্কুল এবং কমন ডে স্কুল উভয় ধরণের বিদ্যালয়েই নিতান্ত প্রাথমিক ধরণের শিক্ষা দেওয়া হত এবং উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত। কিন্তু যারা নিতান্ত দরিদ্র তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একধরণের বিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল। দরিদ্র জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রথম প্রথম নিছক ধর্মমূলক বা উদারতার পরিচায়ক বলে মনে করা হত। ইংল্যান্ডের শাসকগণ ক্রমশঃ বুঝলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে অন্যায়, অধর্ম এবং অনিষ্টকর প্রবণতা দূর করতে হলে তাদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই ধরণের মনোভাব থেকে চ্যারিটি স্কুল নামে এক নূতন ধরণের স্কুলের উদ্ভব হয়েছিল। চ্যারিটি স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মীয় উপদেশ এবং পঠন। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখন ও গণিতও এর সঙ্গে যুক্ত থাকত। কিন্তু ধর্মশিক্ষার উপরই বেশি জোর দেওয়া হত। সুতোকাটা, সেলাই করা, বাগান তৈরি প্রভৃতি শিল্পঘটিত বৃত্তিগুলিও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুল থেকে বেরিয়ে যাতে শিক্ষার্থী কোন একটি বিশেষ কাজে ঢুকতে এবং নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কোন একটি শিল্পে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চ্যারিটি স্কুলগুলি ইংল্যান্ডে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে এই স্কুলগুলির কার্যকারিতা কমে আসতে লাগল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চ্যারিটি স্কুলের পদ্ধতিকে সকলে যান্ত্রিক এবং বিশৃঙ্খল বলে সমালোচনা করতে লাগলো। চ্যারিটি স্কুলে পড়ানোর নিয়ম কানুন নিয়ে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করতে শুরু করলেন।

পরে এই চ্যারিটি স্কুল থেকেই আরেক ধরণের স্কুলের সৃষ্টি হল। সেই স্কুলগুলির নাম মনিটোরিয়াল স্কুল (Monitorial school) বা সর্দার পড়ো স্কুল।

শিল্পমূলক স্কুল ঃ —

তৃতীয় এক ধরণের স্কুলের নাম হল স্কুল অব ইনডাস্ট্রি বা শিল্পমূলক স্কুল। এগুলি অত্যন্ত দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি হয়েছিল এবং এগুলিতে কোনরূপ বেতন নেওয়া হত না। এই ধরণের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডে শিল্পমূলক বিপ-বের আগে শ্রমিকদের জন্য এই ধরণের স্কুল সৃষ্টি হয়নি। ছেলেমেয়েদের তৈরি জিনিস বাজারে বিক্রয় করে সেই অর্থে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত টাকা শ্রমের মূল্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হত। ধর্মমূলক শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে মনে করা হত এবং স্কুলগুলিতে ধর্মমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এছাড়া কোন জ্ঞানমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

সান - ডে স্কুল ঃ—

আরেক শ্রেণির প্রাথমিক স্কুলের নাম ছিল রবিবারের স্কুল বা সান-ডে স্কুল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কারখানায় কাজ করত এবং এই ধরণের শিশু শ্রমিকদের বেশ চাহিদা ছিল। ফলে শিল্পমূলক বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করতে অনেক ছেলেমেয়েদেরই অসুবিধে হত। পিতামাতারাও অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের

স্কুলে না পাঠিয়ে কারখানায় পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সমস্ত কারখানা রবিবারে বন্ধ থাকত। ফলে এই ধরণের ছেলেমেয়েদের রবিবারে শিক্ষাদানের জন্য একটি আন্দোলন দেখা দিল। রবার্ট রেকস্ নামে এক ব্যক্তি প্রথম গলস্টারে অশিক্ষিত শ্রমিক ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুললেন। ক্রমশ এই পরিকল্পনাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠর এবং ১৮৭৫ সালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কাউন্টিতে সান-ডে স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সমিতি গঠিত হল। সান-ডে স্কুলগুলির লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েদের ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক শিক্ষা দেওয়া জ্ঞানমূলক শিক্ষা দেওয়া নয়।

সার্কুলেটিং স্কুল ঃ —

গ্রেটব্রিটেনের ওয়েলস্ নামক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য এক বিশেষ ধরণের স্কুল তৈরি করা হয়েছিল। এগুলির নাম সার্কুলেটিং স্কুল। গ্রিফিত জন নামক একজন ধর্মযাজক দেখলেন যে, ওয়েলসের বিদ্যালয়গুলি ওয়েলসবাসীদের পক্ষে সংখ্যায় নিতান্তই অপ্রতুল। সেইজন্য তিনি দরিদ্রদের জন্য কতগুলি স্কুল স্থাপন করলেন। এই স্কুলের শিক্ষকরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। এবং এক একটি জায়গায় তিন বা দুমাস থেকে সেখানে শিক্ষাদান করে অন্য আর একটি জায়গায় চলে যেতেন। সাধারণত মাতৃভাষায় বাইবেল পড়ানো এবং অন্যান্য ধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বাদি শেখানোই এই শিক্ষকদের কাজ ছিল।

মনিটোরিয়াল স্কুল বা সর্দার পড়ো স্কুল ঃ —

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ইংল্যান্ডের শাসকদের মধ্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে দেখা দিল। দরিদ্র জনসাধারণের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে তাদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হচ্ছে তা যে কেবল মানবতার দিক দিয়েই নিন্দনীয় তাই নয় দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়েও বিপজ্জনক, এই সত্যটুকু সকলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন। অথচ অল্পব্যয়ে কি করে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেটাও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

এই সমস্যার সমাধানরূপে দেখা দিল মনিটোরিয়াল বা সর্দার পড়ো শিক্ষা প্রথা। এই প্রথায় কয়েকজন নির্বাচিত শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। পদ্ধতি হিসাবে এই প্রথা বহুদিনের পুরাতন এবং সব দেশেই অনুসৃত হয়ে এসেছে। ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতির প্রচারক রূপে দুজনের নাম করা যায় ঃ এ্যান্ড্রুবেল এবং জোসেফ ল্যাংকাল্টার।

প্রথম সরকারী সাহায্য ঃ —

১৮৩৩ সালে সরকার ২০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ করলেন স্কুলের বাড়ি তৈরির জন্য। এই হল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম সরকারী সাহায্য। ১৮৩৩ সাল থেকে প্রতি বৎসরই এই সাহায্য দেওয়া হয়ে আসছে এবং প্রতি বৎসরেই এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের সরকার ছিলেন একেবারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য থাকতে পারে তাও মনে করতেন না। কিন্তু ১৮৩৩ সাল থেকে ক্রমশ সরকারের মনোভাব বদলাতে শুরু করল। দেশের শিক্ষিত জনসমাজও শিক্ষাবিস্তারের কাজে অগ্রণী হলেন এবং রাষ্ট্রের দ্বারা

পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা যাতে গড়ে ওঠে সেজন্য ব্যাপক আন্দোলন ক্রমশ দেখা দিল। ১৮৩৬ সালে শিক্ষার কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হল জনশিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু শিক্ষার দায়িত্ব ধর্মযাজকদের হাতে থাকবে, না ধর্মনিরপেক্ষ কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। এই দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য ১৮৩৯ সালে তৈরি হল প্রিভিকাউন্সিলের একটি কমিটি। এর কাজ হল জনশিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং সরকার বরাদ্দ টাকা বন্টনের তদারক করা। ১৮৩৯ সালে শিক্ষার খাতে সরকারী বরাদ্দ হল ৩০,০০০ পাউন্ড।

নিউক্যাসল কমিশন ঃ—

জাতীয় শিক্ষার জটিল সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৮৫৮ সালে ডিউক অফ নিউক্যাসলের নেতৃত্বে একটি রাজকীয় পরিদর্শকমন্ডলী(Royal Commission) নিযুক্ত হয়। নিউক্যাসল কমিশন নামে পরিচিত এই কমিশনটি ১৮৬১ সালে নির্ভরযোগ্য ও স্বল্পব্যয়সম্পন্ন শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে সুপারিশ করেন। তাছাড়া কমিশন দেখিয়ে দেন যে সরকারী অর্থ সাহায্য সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। শিক্ষণের মান খুব নীচু। পাঠ্যক্রম অসম্পূর্ণ ও অবিজ্ঞান ভিত্তিক। বহু ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যোগদানের সময়ের পরিমাণও খবই কম। ১৮৫৮ সালে শতকরা ৩৮৮১ ছাত্র-ছাত্রী মোট ১ বছরেরও কম সময় স্কুলে যোগ দিয়েছিল। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য ১৮৬২ সালে শিক্ষার নিয়মকানুনগুলির সংস্কার করা হয় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের সময় ও পরীক্ষার ফলের উপর অর্থ সাহায্য দেবার প্রথা প্রচলিত হয়। ফলাফলের বিচারক অর্থ সাহায্য দেবার প্রথা ইংল্যান্ডের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রথাটি আমদানি করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের নূতন স্কুল বোর্ড গঠনের সময় এই প্রথাটি বিলুপ্ত করা হয়।

ই. ফস্টার ১৮৭০ সালে শিক্ষার উপর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী গ-্যাডস্টোনের সহায়তায় বিলটি পাশ হয় এবং ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনটি প্রবর্তিত হয়। ইংল্যান্ডে এটি হল প্রথম শিক্ষা সংশি-ষ্ট আইন।

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম ঃ —

নার্সারি স্কুল ঃ — ১৯১১ সালে র‍্যাচেল ম্যাকমিলান ও মার্গারেট ম্যাকমিলান নামে দুজন ডেপটফোর্ডে প্রথম নার্সারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে শিক্ষাবোর্ড ৫ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুলের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তবে এ বয়সে স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে তাঁরা ছিলেন না। ১৯১৮ সালে শিক্ষা আইনের দ্বারা দুই থেকে পাঁচ বছরের অন্তবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা করা বা নার্সারি স্কুলকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা এল.ই.এ. কে দেওয়া হয়েছিল। এই আইনটি পাশ হওয়ার মূলে ছিল ম্যাকমিলান ভগিনীদ্বয়ের নার্সারি স্কুল আন্দোলন।

স্বাধীন নার্সারি স্কুলগুলিকে শিক্ষাবোর্ড প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। কর্মরতা মেয়েদের পক্ষে এই ধরণের স্কুলগুলি পরম সহায়ক। বর্তমানে অধিকাংশ নার্সারি স্কুলই মুক্ত প্রাক্তন প্রকৃতির। সেগুলিতে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং দৈহিক বিকাশের বিবরণ রাখার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্কুলে শিশুর বুদ্ধি, দক্ষতা এবং মানসিক বিকাশেরও

বিবরণ রাখা হয়। স্নান, পোশাক পড়া, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে ভালো অভ্যাস গঠনের উপরই নার্সারি স্কুলগুলিতে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়। খেলার পেছনেও প্রচুর সময় দেওয়া হয়। এবং ইন্দ্রিয় ও বাচন সম্বন্ধে সু-অভ্যাস গঠনও নার্সারি স্কুলের শিক্ষার অন্তর্গত।

শিশু স্কুল ও কিশোর স্কুল ঃ—

ইংল্যান্ডের প্রথম শিশু স্কুল স্থাপন করেন রবার্ট আওয়েন ১৮১৬ সালে। দুই থেকে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। এবং পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত ছিল এমন সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যা ছেলেমেয়েরা সহজে বুঝতে পারে। তার সঙ্গে ছিল নাচ, গান ও খেলা। আওয়েনের এই স্কুল সে খুব প্রগতিশীল এবং পরবর্তী যুগে ইংল্যান্ডের শিশু শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্যামুয়েল উইলার স্পিন নামে আরো এক ব্যক্তি শিশু শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল। এরপর আস্তে আস্তে শিশু শিক্ষার প্রসার হতে থাকে এবং ব্রিটিশ ফরেন সোসাইটি এবং ন্যাশনাল সোসাইটির প্রযোজনায় অনেকগুলি মনিটোরিয়াল প্রকৃতির স্কুল স্থাপিত হয়। এগুলিতে ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হত এবং তার সঙ্গে লিখন, পঠন ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান দানেরও ব্যবস্থা ছিল।

১৮৬২ সালের কিশোর স্কুলগুলিকে পরীক্ষার ফলাফলের উপর সাহায্যদানের প্রথা প্রচলিত হল। এরফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটি যান্ত্রিকতায় পরিণত হল। শিশু স্কুলগুলিতে অর্থাৎ দুবছরের নীচের ছেলে মেয়েদের স্কুলে এই প্রথা প্রবর্তিত না হওয়ায় সেখানে নিজস্ব মৌলিকতা ও অভিনবত্ব বজায় রাখার অবকাশ ছিল। ১৮৯৭ সালে এই ক্ষতিকর প্রথাটি একেবারে উঠে যায়।

১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনে শিশু শিক্ষা ও কিশোর শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডে বহু শিশু স্কুল আছে যেখানে কেবলমাত্র শিশুরা পড়ে। কেবল শিশু বিদ্যালয়ের সংখ্যাই উপস্থিত শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৫৩ সালে শিশু কিশোর স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল ৯,৩৩৬। তারমধ্যে কেবল শিশু স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫,৪৭৫। শিশু স্কুল বা কিশোর স্কুল কিংবা শিশু ও কিশোর স্কুল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানে থাকেন একজন করে শিক্ষণ সম্পন্ন এবং একজন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ —

১৯০২ সালের আইনের দ্বারা দু-ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল - প্রোভাইডেড ও নন প্রোভাইডেড। এই দু-ধরণের বিদ্যালয়ই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিশাসনের অধীন।

বেসরকারী স্কুল ঃ —

রাষ্ট্র পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ইংল্যান্ডে বহু বেসরকারী স্কুল আছে। এই স্কুলগুলির মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঠিক জানা যায় না। তবে এটা জানা গেছে যে ৬-১৪ বছর বয়সের প্রায় ৪ লক্ষের কাছাকাছি ছেলেমেয়ে হয় বাড়িতে, নয় বেসরকারী স্কুলে পড়ে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন ঃ —

অষ্টাদশ শতব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে দু-ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল - দান নির্ভর এবং প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত। দান নির্ভর স্কুলগুলিকে গ্রামার স্কুলও বলা হত। এগুলি বয়সে প্রাচীন এবং এগুলিতে রোমান, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শেখান হত বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল গ্রামার স্কুল। গ্রামার স্কুলগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ইটন এবং উইনচেস্টারও এই ধরণের দুটি গ্রামার স্কুল। এই স্কুলগুলি সাধারণ স্কুলগুলির তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ও স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ায় এগুলি Public School নামে খ্যাত। এই স্কুলগুলি সাধারণত আবাসিক প্রকৃতির এবং পড়াশোনা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সবদিক দিয়ে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় সেগুলির একটি স্বতন্ত্র মান থাকে। এই ধরণের আরও কয়েকটি স্কুলের নাম করা যায়, যেমন - ওয়েস্টমিনিস্টার, রাগবি, ক্যান্টারবারি ইত্যাদি।

এই স্কুলগুলির অধিকাংশই দরিদ্র সাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল এবং প্রথম প্রথম কোনরূপ বেতন নেওয়া হত না বা নিলেও অতি অল্প বেতন নেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে বহিরাগত সাহায্যের পরিমাণ এত বেড়ে উঠল যে এগুলি আস্তে আস্তে এক একটি বিরাট এবং ব্যয়বহুল আবাসিক স্কুলে পরিণত হল। এবং চিত্তবান পিতামাতা ছাড়া এগুলিতে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ক্ষমতা সাধারণ পিতামাতার রইল না। বলা যায় যে, বর্তমানে এই স্কুলগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে বহুদূর সরে এসেছে।

গ্রামার স্কুলের শিক্ষকদের স্থানীয় বিশপের কাছ থেকে শিক্ষকতার জন্য একটি অনুমতি পত্র নিতে হত। এই প্রথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ১৮৬৯ সালে দান নির্ভর স্কুলের আইনের দ্বারা এই প্রথাটি বিলুপ্ত করা হয়।

প্রাইভেট স্কুল ঃ —

এই দান - নির্ভর পাবলিক এবং গ্রামার স্কুল ছাড়াও আর এক শ্রেণির মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। সেগুলিকে প্রাইভেট স্কুল বলা হত। এই স্কুলগুলি ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই স্কুলগুলি ভালয়-মন্দয় মেশানো ছিল। পাবলিক স্কুলগুলির চেয়ে এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের আরও তত্ত্বাবধান করা হত। এখানে প্রাচীন ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল। প্রাইভেট স্কুলগুলিতে শিক্ষার নূতন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করবার অবকাশও অধিক ছিল এবং তার ফলে সেই সময়কার কতগুলি প্রাইভেট স্কুলগুলিকে বেশ প্রগতিশীল বিদ্যালয় বলে গণ্য করা যায়। দান নির্ভর পাবলিক এবং গ্রামার স্কুলগুলি প্রধানত ছেলেদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। মেয়েদের পড়তে হত প্রাইভেট স্কুলে।

ক্লায়েনডন কমিশন - ১৮৬৪ ঃ —

পাবলিক স্কুলগুলির আদর্শ পদ্ধতি, রীতি নীতি প্রভৃতির সংস্কার সাধন হলেও প্রচলিত পাঠ্যক্রমের গলদ দূর হল না। ১৮৬১ সালে লর্ড পামারস্টোনের সরকার প্রধান প্রধান পাবলিক স্কুলগুলির আয়, পরিচালনা, পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ক্লায়েনডন কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন পাবলিক স্কুলের

ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রশংসা করলেও সেগুলির প্রচলিত পাঠ্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন। পাবলিক স্কুলগুলির পরিচালকমন্ডলীর সংস্কার সাধন করবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এই কমিশন দিলেন। এই নির্দেশগুলির ফলে ১৮৬৮ সালে পাবলিক স্কুল আইন পাশ হল।

এনডাউড্ স্কুল আইন - ১৮৬৯ ঃ —

১৮৬৯ সালে সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন এনডাউড্ স্কুল আইনটি পাশ করেন। এই আইনে সরকারী সাহায্য দানের নিয়মকানুনগুলির সংস্কার সাধন করা হয়। সরকারের তরফ থেকে অর্থসাহায্য যাতে যথাযথভাবে দেওয়া হয় তার জন্য তিনজন বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত হলেন। মেয়েরাও যাতে অর্থসাহায্যের অংশ পায় তার জন্যও এই আইনের ব্যবস্থা করা হল। পাবলিক স্কুল ও প্রাথমিক স্কুলগুলি এই আইনের আওতায় পড়ল না।

ব্রাইস্ কমিশন - ১৮৯৫ ঃ —

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য ১৮৯৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়। জেমস্ ব্রাইস্ এর সভাপতি ছিলেন বলে এটি ব্রাইস্ কমিশন নামে খ্যাত।

১৮৯৫ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ডে একটি সুসংগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার পন্থা নির্ণয় করাই ছিল এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। এই কমিশন বহু আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের পর মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ছিল। কমিশন সুপারিশ করেন যে এগুলির সমন্বয় করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার। রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রতিটি কাউন্টি এবং কাউন্টি বারোতে সকল প্রকার মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে এমন একটি করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্কুলের পর্যায়ে ফেলা হবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করবেন যদিও সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব তাঁদের থাকবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ কমিশন দিয়েছিলেন। কমিশনের এই নির্দেশগুলি যে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রগতিমূলক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হ্যাডো রিপোর্ট - ১৯২৬ ঃ —

মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষাবোর্ডের উপদেষ্টা কমিটিকে পরিকল্পনা দাখিল করতে বলা হয়। ১৯২৬ সালে উপদেষ্টা কমিটি প্রাপ্ত যৌবনদের শিক্ষার বিবরণী নামে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। কমিটির চেয়ারম্যান স্যার হ্যাডোর নাম অনুসারে রিপোর্টটিকে হ্যাডো রিপোর্ট বলা হয়ে থাকে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, ইতিপূর্বে ছাত্রছাত্রীদের মাত্র শতকরা দশজন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগলাভ করত। হ্যাডো রিপোর্টের পরিকল্পনা অনুসারে ১১ বছর থেকে ১৪ বছর (পরে ১৫) বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েই এবার থেকে স্বাভাবিক নিয়মে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সুনির্দিষ্ট একটি বিভাজন রেখা থাকবে

এবং শিক্ষার্থীর ১১+ বয়সে এই ছেদটি ঘটবে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, এখন থেকে ছেলেমেয়েরা ১১+ বয়সে মাধ্যমিক স্কুল ছাড়বে এবং তারপর নিজেদের প্রয়োজনমতো মাধ্যমিক স্কুলে যোগ দেবে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ নূতনভাবে সংগঠিত হবে এবং নূতন ধরণের পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষা দেবে। এই রিপোর্টে ৩ ধরণের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত মডার্ন স্কুল বা সিনিয়ার বিভাগ থেকে যারা সফল হবে তাদের জন্য নূতন একটি স্কুল পরিত্যাগ পরীক্ষা প্রবর্তন করার প্রস্তাবও কমিটি করলেন। এইসব প্রস্তাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, হ্যাডো কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার একটি নূতন ও পরিবর্তিত সংব্যাখ্যান দিলেন। তাছাড়া কমিটি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, গ্রামার, মডার্ন, সিনিয়ার বিভাগ বা জুনিয়র টেকনিক্যাল ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরগুলি সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে পরিগণিত হবে। কোন স্কুলই অন্য স্কুলগুলির চেয়ে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রিধারা ঃ —

১৯২৬ সালে হ্যাডো কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিন শ্রেণির বিদ্যালয় প্রবর্তন করার প্রস্তাব করেন। প্রথম, গ্রামার, প্রচলিত মাধ্যমিক স্কুলগুলির অনুরূপ। দ্বিতীয়, মডার্ণ, সম্প্রতী প্রতিষ্ঠিত নূতন ধরণের স্কুলগুলি এবং তৃতীয়, ১৩ - ১৫ বছর বয়সের কিছু কিছু ছেলেমেয়েদের জন্য জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। স্পেনস্ কমিটি এই পরিকল্পনাটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রামার ও মডার্নের সঙ্গে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলের জায়গায় টেকনিক্যাল হাইস্কুল নামে আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। ১৯৪৩ সালে নরউড কমিটি এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন জানালেন এবং ১৯৪৪ সালের আইনে যদিও এই ত্রিবিধ স্কুলের কোথাও স্পষ্ট উলে-খ নেই তবু এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে মাধ্যমিক স্কুলের এই ত্রিধারা বিভাগটি এই আইনের দ্বারাও সমর্থিত।

শিক্ষা আইন - ১৯৪৪ ঃ —

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনটি ৫টি অংশে বিভক্ত। যথা - কেন্দ্রীয় পরিশাসন, স্থানীয় পরিশাসন, স্থানীয় বিদ্যালয় সাধারণ নিয়মাবলী, আইনটিকে কার্যকরীকরণ ও ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের সংজ্ঞা।

কেন্দ্রীয় পরিশাসন ঃ — শিক্ষা ব্যবস্থার শীর্ষে থাকবেন ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণী। পুরানো শিক্ষাবোর্ডটিকে তুলে দিয়ে তার স্থানে শিক্ষার মন্ত্রীদপ্তর গঠন করা হল। শিক্ষামন্ত্রীর কাজ হল ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জনগণের শিক্ষার উন্নতি সাধন করা এবং নিজের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে স্থানীয় শিক্ষার কর্তৃপক্ষরা যাতে জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার সঠিক সম্পাদন করেন, তা দেখা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন পার্লামেন্টারী কর্মসচিব এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর আর একটি কাজ হল শিক্ষা পরিদর্শক নির্বাচন করা।

স্থানীয় পরিশাসন ঃ — স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝায় কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বারো কাউন্সিলগুলিকে। প্রত্যেকটি এল.ই.এ (স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ) একটি করে শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করবেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য। অবশ্য কমিটি নিযুক্ত করার

সময় শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে এবং কতগুলি শর্ত পালন করতে হবে। এল.ই.এ গুলি তাদের শিক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করবেন এবং প্রয়োজন হলে কমিটির উপর কোন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

সুষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট পরিচালনার জন্য এল.ই.এ গুলিকে তাদের অধীনস্থ স্থানকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। এই আঞ্চলিক বিভাজনের তত্ত্বাবধান করবে আঞ্চলিক কার্যনির্বাহক সংস্থা নামে একটি স্থানীয় সংগঠন। এই কার্যনির্বাহক সংস্থাটির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুমোদন থাকা চাই। এই সংস্থাগুলির কাজ হল শিক্ষাকমিটির অধীনে থেকে এল.ই.এ গুলি যাতে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে তার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি স্তর ঃ — এই আইনে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর পর তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে যথা - প্রাথমিক, মাধ্যমিক, অধিকতর। এল.ই.এ-র কাজ হল তার অধীনস্থ অঞ্চলের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এই ৩ স্তরের জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং সেইভাবে জনসমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক বিকাশে সাহায্য করা।

স্কুলের বিভাগ ঃ — স্কুলগুলিকে ভাগ করা হল প্রচলিত দুভাগে - কাউন্টি স্কুল, যেগুলি হল এল.ই.এ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা ভলান্টারি স্কুল, যেগুলি ধর্মসম্প্রদায় বা অন্যান্য স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি হয়েছিল। এই স্বতঃসৃষ্ট স্কুলগুলিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায় - সাহায্যপ্রাপ্ত, বিশেষ চুক্তি সম্পন্ন, নিয়ন্ত্রিত।

শিক্ষণ ও শিক্ষক ঃ — সমস্ত কাউন্টি স্কুল এবং কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি ছাড়া সমস্ত ভলান্টারি স্কুলের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়া সকল প্রকার শিক্ষাঘটিত ব্যাপারই এল.ই.এ-র অধীনে থাকবে। কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করেন স্কুলের নিজস্ব পরিচালকগণ। কাউন্টি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এল.ই.এ-র হাতে। কিন্তু ভলান্টারি স্কুলগুলিতে এল.ই.এ-র ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ।

বাধ্যতামূলক যোগদান ঃ — ১৯৪৪ এর আইন অনুসারে ৫বছর বয়সের শুরু থেকে ১৫ বছর বয়সে পা দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে স্কুলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। সেই আইনে আরও বলা হল যে, শিক্ষামন্ত্রীর কর্তব্য হবে যত সত্বর সম্ভব বয়সের এই উর্দ্ধসীমাকে ১৬ বছরে তোলা। এই আইনে আরও বলা হয় যে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাগৃহেও দেওয়া যায় যদি অবশ্য সে শিক্ষা কার্যকরী ও পূর্ণকালীন হয়।

কাউন্টি কলেজ ঃ — ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে কাউন্টি কলেজ নামে এক নূতন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইনটিতে স্পষ্ট বলা হয় যে এই আইন পাশের তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে তার অঞ্চলের জন্য কাউন্টি কলেজ স্থাপন করতে হবে। কাউন্টি কলেজের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের "বিভিন্ন কুশলতা ও সামর্থ্যের পূর্ণবিকাশ করা।" এবং "নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রস্তুত করা।"

এছাড়াও এই আইনে আনুসঙ্গিক বিধানাদির ব্যবস্থার কথা বলা হয় যেমন -

স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা, পোশাক, চিত্ত বিনোদন, সামাজিক ও শারীরশিক্ষা, শিশু ও কিশোরদের শ্রমে নিয়োগ এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাদি, ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য সাহায্য, শিক্ষক - শিক্ষণ, শিক্ষক - কল্যাণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

ইংল্যান্ডে শিক্ষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ —

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন, নানাবিধ কল্যাণকর আয়োজন, ছাত্রবৃত্তি এবং অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরও নানা আইন পাশ করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের আইনে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, আহার ও দুধের ব্যবস্থা। বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা ঃ — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্কুল মেডিকেল সার্ভিসের বা বিদ্যালয় চিকিৎসার আয়োজন প্রথম শুরু হয়। ১৯০৪ সালে দেশের যুবকদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ নির্ণয় করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শনের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন কোন স্কুলে চিকিৎসক নিযুক্ত করা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইনে এল.ই.এর হাতে স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়।

১৯২১ সালের আইনে সরকারী প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এবং যেসব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোন দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সেগুলির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের দায়িত্ব এল.ই.এ দের দেওয়া হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী এল.ই.এ পিতামাতার কাছ থেকে চিকিৎসার জন্য ব্যয় আদায় করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইন পাশ হবার পর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

আহার ও দুধের ব্যবস্থা ঃ — ১৯০৪ সালে স্বাস্থ্য অবনতির কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল সেই কমিটি ছেলেমেয়েদের জন্য দিবা আহারের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করেছিল। ১৯০৬ সালে যে শিক্ষা আইনটি পাশ হয় সে আইনে এল.ই.এ-কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আহারের ব্যবস্থা করার জন্য অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম স্কুলে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা একাধিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছিল। ১৯৪৩ সাল থেকে এল.ই.এ এদিকে মনোযোগ দেন।

ছাত্র বৃত্তি ও অন্যান্য অর্থ সাহায্য ঃ —

যখন ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না। তখন যাতে দরিদ্র পিতামাতার প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতে পারে তার জন্য সরকার থেকে নানারূপ ছাত্রবৃত্তি ও অর্থসাহায্যদানের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক স্কুলেই কিছু সংখ্যক আসন অবৈতনিক রাখাও বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনে সমস্ত স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষাকেই অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা অর্থ সাহায্যের কোন প্রশ্নই থাকে না।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন পাশের পর ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি দানের ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৬ সালে যেসব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে কোন পুরস্কার বা বৃত্তি পায় তাদের অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দেবার প্রথা প্রবর্তিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ঃ —

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। যদিও সেই সময় থেকেই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চলে এসেছে তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমানে সমগ্র ইংল্যান্ডে মোট ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭টি কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলির প্রত্যেকটি স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করে থাকে। নিজের নিজের কর্মচারী নির্বাচনে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বাধীন। ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারেও সম্পূর্ণ নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যাতে প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লেখাপড়া শিখে উপকৃত হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সকল প্রকার বহিরারোপিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। এগুলি নিজেরাই নিজেদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে, গবেষণা বিষয় ঠিক করে, পরীক্ষা গ্রহণ করে, সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত বার্ষিক অর্থ সাহায্য নিজেদের মত ব্যয় করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় —

কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয় (Collegiate Universities) ঃ —

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুটি তৈরি হয়েছিল মধ্যযুগে। অক্সফোর্ডের অধীনে আছে ৩২টি কলেজ ও স্নাকত্তোতর বিভাগ। কেম্ব্রিজের অধীনে আছে ২৬টি কলেজ এবং কলেজীয় সমিতি। ডারহাম - এর অন্তর্গত হল ১০টি কলেজ। ইয়র্ক - এর অধীনে আছে ২টি কলেজ এবং আরো দুটি নূতন কলেজের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ক্যান্টারবেরী - এটি দুটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ এবং দুটি নূতন পরিকল্পনাধীন কলেজ নিয়ে গঠিত। ল্যাঙ্কেষ্টার এর অধীনে আছে ৩টি কলেজ এবং কিছু সংখ্যক নূতন পরিকল্পনাধীন কলেজ। এই সমস্ত কলেজের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। অর্থাৎ এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।

স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (Scottish Universities) ঃ —

প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেন্ট এ্যান্ড্রুসে ১৪১০ সালে। সেন্ট এ্যান্ড্রুস, গ-াসগো, এবারডীন এবং এডিনবরা এই ৪টি হল প্রাচীন স্কটিশ কলেজ। বর্তমানে আরও ৪টি নূতন স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথা - স্ট্রাথক্লাইভ (১৭৯৬) — এটি বিজ্ঞান এবং প্রয়োগমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, গ-াসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত রয়্যাল টেকনিক্যাল কলেজ (১৯১৩), হেরিট ওয়াট — এটি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েলসের বিশ্ববিদ্যালয় ঃ —

এই তিনটি হল সংঘবদ্ধ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়। এই

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথাক্রমে ৩৯,২ এবং ৫টি বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৬ সালে এবং বর্তমানে এটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এর অধীনে এখন বহু কলেজ এবং স্কুল রয়েছে।

নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (Civic Universities) ঃ —

যথা ম্যানচেস্টার, বার্সিংহোম, লিভারপুল, লিডস, শেফিল্ড, বেলফাস্ট, নটিংহাম, রিজিংহাল, লিস্টার ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে প্রথম ৪টি বৃহৎ নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেষোক্ত ৫টি ছোট নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আবার মডার্ন ও রেডব্রিক নামেও অভিহিত করা হয়।

ম্যানচেস্টার কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং গ-াসগোর রয়েল কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ঃ —

এই কলেজ দুটির শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে ম্যানচেস্টার এবং গ-াসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে।

বহির্বিশ্ববিদ্যালয়মূলক কর্মসূচি ঃ —

ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানাধরণের বহির্বিশ্ববিদ্যালয়মূলক কর্মসূচি অনুসরণ করে আসছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক প্রভৃতি নানাবিধ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার আয়োজন করা হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই স্বল্পস্থায়ী প্রকৃতির, কিন্তু কোথাও কোথাও ত্রিবর্ষব্যাপী আয়োজন আছে। কতগুলি আবার স্বল্পকালীন আবাসিক প্রকৃতির।

১৯৪৪ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজের পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করছে। বর্তমানে কলেজের শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বর্ষে যাতে বি.এড ডিগ্রি লাভ করতে পারে তার আয়োজনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি করেছে।

আধুনিক যুগের শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছাত্র সংস্থা গঠন করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশাসন এবং বিভিন্ন নিয়ম কানুন প্রবর্তনের কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। কয়েকটি নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সার্ভিস জয়েন্ট কমিটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাটা প্রতিযোগিতামূলক। কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে শিক্ষার কোন নির্দিষ্টমান পর্যন্ত পৌঁছলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনের সংখ্যা বেশ কম। ফলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই বহুসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী বেছে নিতে পারে। এই জন্য স্কুলে যেসব ১১-১৮ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য তৈরি করা হচ্ছে তাদের আগেই প্রশ্ন করা হয় যে, ভবিষ্যতে তারা বিজ্ঞানমূলক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে চায় কিনা এবং যারা তা চায় তাদের তখন থেকেই বিজ্ঞানমূলক বিশেষভাবে তৈরি করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সময় খুবই কম। এর আয়ুষ্কাল মাত্র ৩ বছর। এত অল্প সময়ের জন্য শিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত থাকার কারণ হল যে ইংল্যান্ডের

স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের অতি উচ্চ মানের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী ৩ বছরে ছাত্র ছাত্রীদের আরও বিশেষজ্ঞ করে তোলার জন্য চেষ্টা করা হয়।

ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিভাগগুলিতে গবেষণামূলক কাজ করার ইচ্ছা বেশ প্রবল। বিজ্ঞান জগতে যাদের মহৎ অবদান রয়েছে এবং যাদের পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতের ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে যেতে পারবে এমন সব ব্যক্তিরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগগুলি পরিচালনা করে থাকে। যে সমস্ত ছাত্র প্রথম ডিগ্রি লাভ করে তাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগে গবেষণা করার জন্য থেকে যায় এবং তিন বা তিনের অধিক বৎসর শেখানো কাজ করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি পায়। অনেকে আবার আরও দীর্ঘদিন গবেষণা করে থাকেন। শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা দেশের আশু প্রয়োজন মেটাতে পারবে এমন সব লোকেদের যন্ত্রবিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাধারণত এদের শিক্ষকতার কাজ করে থাকেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানীক মূলতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নূতন শিল্পতত্ত্ব সেখানে দ্রুত প্রসার লাভ করেছে সেখানে এইসব শিল্প জগতের বৈজ্ঞানীক অধিনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৭০ এবং ১৯৮০ দশকে ইংল্যান্ডে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ৭০ -এর দশকে স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলির ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই সময় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা ও পরিশাসন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য একটি স্বাধীন অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১) Adaval,S, Teacher Education in u.k, Garg Bros, Allahabael.

২) Chambe, S.P, chambe A, Comparative Education.

৩) মুখোপাধ্যায়, দেবী, তুলনামূলক শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৪) চট্টরাজ, শ্যামাপ্রসাদ, শিক্ষা ঃ দেশে ও বিদেশে।

৫) ঘোষ, অরুণ, ইংল্যান্ডে শিক্ষা ইতিহাস, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স।

অতুলনীয় ম্যাক্সিম গোর্কি

- গোপাল দে

আজকের সফল ও সভ্য মানুষ বহু বছরের শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের ক্রমগুলিকে বিশে-ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের স্বাতন্ত্র্যতা। জীবজগতে মানুষ স্বতন্ত্র্য, কারণ পৃথিবীর বুকে অন্যান্য জীবের ন্যায় শুধু বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করা মানুষের লক্ষ্য নয়। তার জৈবিক জীবনের সাথে যুক্ত হয় তার মানস জীবন, তার বৌদ্ধিক জীবন, তার সৃষ্টিশীল ও যুক্তিনির্ভর জীবন। এই জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ হল তার নানা বিষয় শেখা, অর্থাৎ শিক্ষা। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিসম্পন্ন। তার পরিবেশ শুধু জৈব নয়, তার পরিবেশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিত্য পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্র পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তার সাথে বিশ্বায়নের বাতাবরণ মানুষের সামনে নিত্য-নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বার খুলে দিচ্ছে।

শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যা লাভ করা যায় — সেটিই শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ধরা যায়। একথা আমরা জানি যে, প্রতিটি কর্মপ্রক্রিয়া ও জীবনধারার একটি লক্ষ্য থাকে। এই রকমই একজনের কথা এখন বলব যে তার শৈশবেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। তিনি হলেন আলেক্সেই পেশকভ। তার জন্ম হয়১৮৬৮ খ্রীঃ ২৮ শে মার্চ। পিতৃপ্রদত্ত এ নাম মুছে দিয়ে গোর্কি নামেই উত্তরকালে জগৎ বিখ্যাত হন। বাবা মারা যাবার পর মায়ের সাথে এসে আশ্রয় নিলেন মামার বাড়ি নিজনি নভগরোদ শহরে। সে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ। দাদামশাই ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অত্যাচারী। তাঁর হাতে মার খেয়ে এক একদিন অজ্ঞান হয়ে যেতেন। দাদার শত অত্যাচার মুছে দিতেন দিদিমা। স্থানীয় স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এ সময় মা আরেকজনকে বিয়ে করেন। দশ বছর বয়সেই জীবনকে দেখেছেন নানারূপে, নানান অভিজ্ঞতায়।

গোর্কি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার ছোটবেলাটাকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ মৌচাকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধু আহরণ করেছে নানান সাধারণ ও সাধাসিধে মানুষ। আমার চরিত্রের গঠন ও বিকাশে এদের দান তুচ্ছ নয়।" হঠাৎ একদিন মা মারা গেলেন। দাদা তখন গোর্কির দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। দাদা একদিন বললেন, "তোমাকে মেডেলের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখব, তাতো চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে বেরুবার সময় হয়েছে।"

গোর্কির নতুন জীবন শুরু হল। শহরের সদর রাস্তার উপর এক সৌখিন জুতোর দোকানের বয়। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। ভোরবেলায় উঠে রান্নার জল গরম করতে হত। সব কটা চুলোর জন্য কাঠ আনতে হত, খাওয়ার পর মনিবের বাড়ির সকলের বাসন মাজা, তাদের দোকানের সকলের জামাকাপড় পরিষ্কার করা, জুতো সাফ করা। এরসাথে দোকান পরিষ্কার করা, চা তৈরী, খদ্দেরদের বাড়িতে প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া। জীবনের স্থূল রূঢ়তায় যন্ত্রণাবিদ্ধ শিশুর মন যখন অস্থির হয়ে উঠত,ঘর ছেড়ে সকলের অগোচরে বেড়িয়ে পড়তেন। ঘুরে বেড়াতেন শহরের প্রান্তে, বনে বাদাড়ে। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন

- যেদিন রাত শান্ত থাকত শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করত। এপথ ওপথ করে খুঁজে বেড়াতাম নির্জন কোনাকানচি। হাঁটতাম খুব জোরে, যেন পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলেছি; আকাশের চাঁদের মত সঙ্গীহীন একাকী।

এরপর পাখি ধরার কাজ শুরু করলেন। অনেক দূর অবধি চলে যেতেন। কখনো বনের দিকে কখনো বা ভলগার তীর ধরে। রাতভোর ঘুরে বেড়াতেন। পিঠে অয়েল ক্লথের থলের ভিতর থাকত পাখি ধরা ফাঁদ, খাঁচা আর কিছু টোপ। ফাঁদ পেতে ধরে আনা পাখি দিদিমা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। গোর্কি লিখেছেন, "পাখি ধরতে কষ্ট হত। খাঁচায় পুরে বন্দী করে রাখা আরো লজ্জাকর। শুধুমাত্র ওদের চোখে দেখেই আনন্দে আমার মন প্রাণ ভরে উঠত। কিন্তু শিকারীর উৎসাহ আর পয়সা রোজগারের আশার তলায় চাপা পড়ে যেত আমার করুণা।" জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে একপেশা থেকে আরেক পেশায় ঘুরতে ঘুরতে বড় হয়ে ওঠে গোর্কি। সবকিছুর মধ্যেও বইপড়ার নেশা থেকে যায়। বইয়ের কোন বাদ বিচার ছিল না তাঁর কাছে। সর্বভূকের মত যা পেতেন তাই পড়তেন। একদিন হাতে এল মহারুশকবি পুশকিনের একটি কবিতার বই। গোর্কির নিত্য সঙ্গী ছিল তাঁর দারিদ্রতা। কিছুদিন পর একটি রুটি কারখানায় কাজ পেলেন। সন্ধ্যে থেকে পরদিন দুপুর অবধি একটানা কাজ করতে হত। তারই ফাঁকে যেটুক সময় পেতেন বই পড়তেন। তাঁর এ সময়কার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন বিখ্যাত গল্প "চব্বিশজন লোক আর একটি মেয়ে।"রুটির কারখানায় কাজ করার সময় পুলিশের সন্দেহ পড়েছিল তাঁর উপর। কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন গোর্কি। বই পড়ার সাথে সাথে ছোট ছোট কবিতা লিখতেন। তাঁর এ রচনার কথা সচরাচর প্রকাশ করতেন না। কিন্তু বন্ধুদের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

১৯০০ সালে প্রকাশিত হল গোর্কির প্রথম সার্থক উপন্যাস " ফোমা গর্দেয়ভ"। ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হল টলস্টয়ের উপন্যাস 'রেজারেকসন'। দুটি উপন্যাসই রাশিয়ার মানুষের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু গোর্কির লেখায় রুশশাসকরা ক্ষেপে গিয়েছিল। ফলে গোর্কিকে বন্দী করা হল। তবে গোর্কিকে তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ১৯০১ খ্রীঃ গোর্কি ছিলেন সেন্ট পিটসবার্গ শহরে। সে সময়ে এখানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে। পুলিশ তাদের উপর গুলি চালালে গোর্কির মনে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তিনি প্রতিবাদমূলক কবিতা লিখে ফেলেন, যার নাম "ঝোড়ো পাখির গান।"

'... উদবেলিত ঝড়ের পাখি যেন এক
মসীমাখা বিদ্যুতের ভয়ার্ত ঝলক।
ভীষণ গর্জনে ডাকে উদ্বেল ঝড়ের পাখি
যেন মেঘেরাও শোনে তার চঞ্চল আনন্দের ভাষা।
... ঝড় আসছে ! এখন উঠবে ভীষণ ঝড়
তবু সেই ঝড়ের পাখি একা অরণ্য ভেদ করে
উড়ে যায় সাগরের বুকে।
দিকে দিকে ধ্বনিত হয় তার অহঙ্কারী কণ্ঠ।
আগামী চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চিত বাণী

ঝড় উঠুক, ভয়ানক ঝড় নেমে আসুক।
ঝড়ের গান যেন ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ল দিক - বিদিক।'

গোর্কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। টলস্টয়ও দেশের বুদ্ধিজীবিদের সম্মিলিত চেষ্টায় গোর্কিকে পাঠানো হল ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেখানেই গোর্কি চেখভকে একটি চিঠিতে লিখলেন, — "আমার বাড়ির চারধারে সুন্দর বাগান, শান্ত সুন্দর পরিবেশ। দূরের বাগানে ঘুরে বেড়ায় বুলবুলি পাখিরা। আর আমার বাগানে ঘুরে বেড়ায় গুপ্তচর।

১৯০৫ খ্রীঃ দেশজুড়ে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার মানুষের ক্ষুধার্ত মুখ, তারপর জারের দেহরক্ষীরা নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করল। এদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন গোর্কি। ক্ষুব্ধ জারের আদেশে তাকে বন্দী করে রাখা হল কারাদূর্গে। গোর্কি লিখলেন, 'সর্বহারাদের পরাজয় ঘটেনি, ক্ষতি হয়েছে মাত্র।' আবার গোর্কিকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করা হল। পরে গোর্কি জার্মানী ও ফ্রান্স হয়ে আমেরিকায় অবস্থান নিলেন। এখানে তিনি লিখলেন তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মা'। এছাড়া তার আত্মজীবনীমূলক তিনটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় রূপ নিয়েছে। সেগুলো হল 'আমার ছেলেবেলা'(১৯১৩), পৃথিবীর পথে (১৯১৫), পৃথিবীর পাঠশালায় (১৯২৩)।

ইউরোপের বুকে একদিকে সাম্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, অন্যদিকে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব - নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে গোর্কি অনুভব করেছিলেন এর আসন্ন বিপদ, শয্যাশায়ী অবস্থানেও তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে (১৮ই জুন,১৯৩৬) তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে — "যুদ্ধ আসছে ..... তোমরা তৈরী থেকো।"

তথ্যসূত্র ঃ

১) সুশীল রায় — শিক্ষাবিজ্ঞান
২) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষি - মাইকেল এইচ হার্ট।

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

অধ্যাপক - কাজল কুমার বাগ

বিভাগীয় প্রধান,শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবি করে। এর অনেক কারণ আছে, মানুষের সৃজনী ক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাপ নেওয়ার ক্ষমতা যেমন আছে তেমনি ভয়, ভীতি, হতাশা, আত্মসম্মান, আনন্দ উপভোগ, সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতি আছে। যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। মানুষ প্রকৃতির দান। এই সমাজ প্রকৃতির মধ্য দিয়েই মানুষের বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়বস্তুর শিখন। দার্শনিক রুশো ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত নেতিবাচক শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন। এর পূর্বে কোন দার্শনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেননি। রুশো এই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তাঁর শিক্ষা দর্শনকে নানাভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষার দ্বারা পরিমার্জন ও পরিলক্ষিত করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সময় নানা পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে। মাদাম মারিয়া মন্তেশ্বরী খেলার ছলে ও ছড়ার সাহায্যে শিক্ষাদান, ফ্রয়েবেলের বৃত্তি ও পুরষ্কার পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষাদান যা শিক্ষার্থীকে চাপমুক্ত হয়ে শিখতে সাহায্য করে।

প্রত্যেক বাবা মা চান তাঁদের সন্তান যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে আদর্শ এক নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনেক সময় আমরা সন্তানের বিষয়বস্তু ধারণ করার ক্ষমতা না চিন্তা ভাবনা করে বিভিন্ন বিষয় যেমন পড়াশুনো তো আছেই এছাড়া ছবিআঁকা, কবিতা, আবৃত্তি, ক্রিকেট খেলা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি জোর করে চাপিয়ে দিই। আমরা শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে এবং ভালো লাগা বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করি। এর ফলে শিশুরা খুবই চাপে পড়ে যায়। ফলে ক্রমশ যতনা সে সফল হবে ততই তার মধ্যে অসঙ্গতির আচরণ পরিস্ফুট হবে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেবে।

শুধু শিশু নয় আমরা সকলেই নানাভাবে মানসিক চাপে আক্রান্ত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় Stress বা মানসিক চাপ কথাটি ব্যবহার করি। আমরা অনেক সময় বলি কাজের ভীষণ চাপ আছে। উপর থেকে চাপ আছে। বেশি চাপ নিস না, বেশ চাপে আছি, ওকে অত চাপ দিসনা, সে চাপে পড়ে যাবে, একটু চাপে রাখা ভাল, একটু চাপ কম ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনের সর্বস্তরেই বিভিন্ন বিষয়বস্তু দ্বারা চাপের সম্মুখীন হয়। এই চাপের সীমা কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনা। অত্যন্ত চাপের ফলে ব্যক্তি তার কার্য সঠিকভাবে সমাধান করতে পারে। ইহার ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক নতুন সচেতনতা বোধ জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে সক্রিয় করে তোলে। আমরা অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এই চাপ আমাদের সমাজ জীবনে বাঁচতে এবং পূর্ণসঙ্গতি বিধান করতে, বিভিন্ন কর্ম ক্ষেত্রে এবং গন্তব্যস্থলে কেমন করে পৌঁছাব (সূত্র) তাও এই চাপ নানাভাবে সাহায্য করে। বয়ঃ সন্ধিকাল এই

সময়কালটি ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে যেমন আমাদের দৈহিক পরিবর্থন ঘটে তেমনি বিভিন্ন জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা ও সামাজিক চাহিদাগুলি ব্যাকুলভাবে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করি। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয় এবং নতুন নতুন বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে আসে নানা কল্পনার রাজ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। অলীক স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট ও নায়কোচিত ভাবভঙ্গী অনুকরণ করে। পড়াশুনার ওপর এ সকল ঘটনাগুলি বিশেষ প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল সৃজনধর্মী গুণগুলি থাকে সেগুলি নানা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। শিক্ষার্থীরা বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে কেহ কেহ নানা স্বপ্ন দেখে। সমাজব্যবস্থা পরিবারের ঐতিহ্যের কথা না ভেবে ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যত দিন যায় উভয়ের মধ্যে নানা দিক থেকে চাপ আসে। উপযুক্ত চাকরি না পাওয়ার চাপ, পরিবার অর্থাৎ বাবামার থেকে চাপ, সমাজব্যবস্থার দিক থেকে নানা চাপ। তখন উভয়ের জীবন দূর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই ধরণের মানসিক অবস্থার ছেলেমেয়েরা বিভিন্নভাবে সমাধানের পথ খোঁজে। উপযুক্ত বন্ধুর সাহচর্য প্রয়োজন হয়। বাবা মা পারেন এই ধরণের সমস্যার সমাধান করতে। উভয়ের বাবা মা যদি কঠোর হন তাহলে পলায়নপর মনোভাব তৈরী হয়। হতাশাগ্রস্থ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তখনই এই ছেলে মেয়েরা জীবনের অর্থ কী, এই জীবন রেখেই লাভ কী,এভাবে নানা প্রশ্ন তাদের মধ্যে ভিড় করে আসে। কেহ কেহ তখন নিজেকে ঠিক করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এ কিন্তু সমস্যার সমাধান নয়। এই সময় সে এমন এক মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তার কাছে ঐ সময় কোন কিছুর মূল্য থাকে না।

আত্মহনন এক মারাত্মক মানসিক সামাজিক ব্যাধি। যৌবনকালে নানা ধরণের অক্ষমতা - অসক্ততা - আশাহীনতা অবসাদের কারণে, লজ্জা - শরম থেকে বাঁচতে, আর্থিক দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে এবং আরো নানা কারণে আত্মহত্যা ঘটিয়ে থাকে। ১৮ থেকে ২০ বৎসর ছেলেমেয়েদের দেহ মনের চাপ এতে বেশি বলে বোধ করে যে তা থেকে বেড়িয়ে আসার পথ না পেয়ে পালানোর পথ বেছে নেয়। এই চাপগুলির মধ্যে আছে পড়াশুনার চাপ, সামাজিক - পারিবারিক চাপ, নেশাগ্রস্ততা ইত্যাদি। এই বয়সের ছেলে মেয়েদের বাস্ত ববোধহীনতা, অগ্রপশ্চাৎ বিচার অক্ষমতা, বয়ঃধর্মে অতি উত্তেজনা, অতিপ্রতিক্রিয়া প্রবণতা অধিকমাত্রায় আত্মহননের মূলে কাজ করে। এছাড়া সুখ শান্তির অভাব, পারিবারিক অশান্তি , দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ক্লান্তি, লক্ষ্য উদ্দেশ্যপূরণে অক্ষমতা ইত্যাদিজনিত ভয়, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা থেকে জাত হতাশা নিরাশা বিষাদগ্রস্ততার কথা বলে। মা বাবার মধ্যে অ-বনিবনা, সন্তানের সঙ্গে সংঘাত, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদিও এদের মনে অবিন্যস্ততার কারণ হয় এবং প্রান্তিয় প্রতিক্রিয়ায় ঠেলে দেয়। আক্রমনাত্মক, নেশাগ্রস্ত হয়ে পারিবারিক পরিবেশ নষ্ট করা, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি, এসবই এক ধরণের অপ্রকৃতিস্থ বিকৃত বিফল মনের জন্ম দেয়। আবার মারাত্মকভাবে চাপ সংকট যখন ঘটে তখন লজ্জা আত্মসম্মানবোধের তীব্রতা বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকেই নষ্ট করে দিতে পারে। বাস্তব কোন ঘটনা হতে পারে, আবার কাল্পনিকও হতে পারে। মূল কথা ব্যক্তি বিষয় ঘটনা অবস্থাকে কিভাবে দেখাচ্ছে

তার ওপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে অকৃতকার্য হওয়া, কোন কাজে ধিকৃত হওয়া, সম্পর্কে বিষাক্ত বোধ, অপরাধী বলে ঘোষিত / অ্যারেস্টেড হওয়া, নারী ঘটিত ব্যভিচারে অভিযুক্ত হওয়া, প্রেমিকাদ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, দেহ মনে যৌন/সামাজিক আক্রমণ ঘটা, নিঃস্ব, রিক্তবোধ ইত্যাদি ব্যক্তিকে অন্তিম অবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। পালানোর কোন পথ না পেয়ে চূড়ান্ত পলায়নের পথ নিয়ে ফেলে।

এই ধরণের মানসিক অবস্থাতো ছাত্রাবস্থাতে আসবেই। তাহলে এ থেকে মুক্তির উপায় কী, শিক্ষার্থীদেরকে মানসিক দিক থেকে কঠোর হতে হবে, সামনে যে কোন চাপ আসুক না কেন সেগুলি মোকাবিলা করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। নিজেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বাবা মা অভিভাবক শিক্ষক প্রমুখকে সহনশীল হতে হবে। উপযুক্ত নির্দেশনা পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথ দেখাতে সহায়তা করতে হবে। এই চাপের ফলেই নতুন নতুন সৃষ্টিমূলক কাজে আগ্রহী হবে, চাপ আবার শিক্ষার্থীদের কার্য সমাধা করতে সাহায্য করে। এর ফলে এক নতুন সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে মনের ওপর জোর আসে, অর্থাৎ চাপ মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা অর্জন করে।

এখনকার দিনে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকেই বেশি মাত্রায় কাজ করে থাকে। অনেক ব্যক্তিই পেশাগত কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত কাজ করেন, যেমন - বাড়ীর শিশুদের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কাজ দেখা, কর দেওয়া, নানা বিল মেটানো, ব্যাঙ্কের হিসাব দেখা, বাজার করা, বাড়ী-ঘরের মেরামত করা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে খোঁজ রাখা, দৈনিক খবরের কাগজ ও পত্র পত্রিকাসহ সাময়িক পুস্তিকা পাঠ করা, ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়া, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও টেলিফোনে কথা বলা, ফেস বুক আপডেটেড করা ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও গতি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ঐ সঙ্গে প্রত্যেকটি ব্যবহারিক দ্রব্য পুরাতন হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। ফলে আমরা বাধ্য হচ্ছি ঐ পুরাতন জিনিষগুলিকে নতুন সংস্করণ দিয়ে স্থানান্তরিত করতে। এসব আমাদেরকে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে বাধ্য করছে। এই কাজগুলির বেশিরভাগ আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে প্রয়োজনের দিক থেকে নিত্য কর্তব্যের মধ্যে আসেনি। অনেকে ভাবতেন প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষকে বেশি সময় ধরে কাজ করতে হবে না এবং সে অধিক সময় ধরে বিশ্রাম করতে পারবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরও বিশ্রামের সময় বাড়েনি। অথচ অবিশ্রান্তভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চাহিদা মেটানোর তাগিদ এবং দায়-দায়িত্বের বোঝা হ্রাস করার প্রয়োজনে আমরা সদাব্যস্ত , এর ফলে ক্রমাগত আমাদের মানসিক চাপ বাড়ছে কারণ পর্বতপ্রমাণ কাজের বোঝায় আমরা বিপর্যস্ত।

বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন দীর্ঘকালীন সময় স্বল্পতায় ভুগছে। দিনে দিনে শুধু যে কাজের পরিমাণ বাড়ছে তাই নয়, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যাশা অনেকগুণ বেড়েছে। কিন্তু একটা দিন চব্বিশ ঘন্টায় সীমাবদ্ধ, এটা একটুও বাড়েনি। স্বাভাবিকভাবে সময় সম্পর্কিত মানসিক চাপ শীর্ষে উঠেছে। বেশিরভাগ মানসিক চাপ তৈরী হচ্ছে দেরীতে কাজ শেষ করা বা যথাসময়ে কাজ সম্পূর্ণ না করতে পারার ভীতি থেকে। অর্থাৎ কাজের সময়সীমা অতিক্রম করার অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে। আমরা এই মানসিক চাপমুক্ত উৎকণ্ঠিত মুখগুলোকে দেখতে পাই। অপেক্ষামান অবস্থায় রাস্তার মোড়ে, যানযটের মধ্যে, সাধারণ বাস ধরার জন্য

বাসস্ট্যান্ডে কিংবা ট্রেন দেরী করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালে।

প্রতিদিন নতুন নতুন বিলাস দ্রব্য বাজারে আসছে এবং কিছুদিন পরেই সেগুলি পুরাতন হয়ে অনাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভারের তালিকায় চলে যাচ্ছে। জীবন ধারণের মান যেমন আমাদের বাড়তে থাকে তেমনি নতুন নতুন দ্রব্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। যেমন আমরা চাই নতুন মডেলের ফ্রিজ, নতুন ধরণের টি.ভি., অত্যাধুনিক গাড়ি, বিলাসবহুল সুসজ্জিত থাকার জায়গা, দশ রকমের ঘড়ি, বিভিন্ন ধরণের পোষাক, সঞ্চিত অর্থ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, নামকরা ব্র্যান্ডের বিশেষ জুতো, অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ভ্রমণ, বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ও অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতা। এইসব দ্রব্যের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয় মন হরণকারী বিজ্ঞাপন। এসব দ্রব্যগুলি পেতে হলে আরও বেশি টাকা আয় করতে হবে, আরো কঠোর কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ বেশি সময় ধরে করতে হবে। আরো বেশি কাজ শিখতে হবে, জানতে হবে। এই স্বয়ংক্রিয় বিপজ্জনক চক্র কাজ শুরু করে দেয় প্রত্যেক মানুষের অন্তর জগতে, ফলে মানসিক চাপের স্তর ক্রমে বাড়তে থাকে।

আধুনিক সমাজে দৈনন্দিন জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান বাড়তি চাহিদার বোঝা প্রত্যেকের দেহ মনকে দুর্বল করে তোলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, সদাব্যস্ত জীবনধারণ প্রণালী, কায়িক শ্রমের অভাব ইত্যাদি যেকোন ব্যক্তিকে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত করে তোলে এবং উত্তরোত্তর মানসিক চাপ আরো বৃদ্ধি করে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও চাহিদাক্লিষ্ট জীবনধারণ প্রণালীর কতগুলি দৃষ্টান্তমূলক কুফল প্রকাশ পায়, যেমন - দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, দৈহিক স্থূলতা, মাথাধরা, মধুমেহ রোগ, উচ্চরক্তচাপ, গেঁটেবাত ইত্যাদি। এইসব অসুখগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দৈহিক অসুস্থতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে হৃদরোগ, হৃদ অবরোধ এবং পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে।

মানসিক চাপকে কখনো শূন্যতে আনা যাবে না এবং তা কখনো উচিতও নয়। নতুন নতুন সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এবং মানসিক চাপের ভূমিকা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য। কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি আমাদেরকে মূল কাজ ও কর্মস্রোত থেকে আনন্দদায়কভাবে বিচ্ছিন্ন করে এবং এই কাজগুলো আমরা যথেষ্ট আকর্ষণ ও মনোযোগ সহকারে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করি। এই কাজগুলিকে বলা হয় 'শখ'। এগুলো অদ্ভুত সুন্দরভাবে মানসিক চাপ হ্রাস করতে সাহায্য করে। যেহেতু এগুলো আমাদেরকে অপ্রীতিকর ও মানসিক চাপমুক্ত চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এগুলি শান্তি আ আত্মসম্বরণ পুনরুদ্ধারের এবং পূর্ণনবীকরণের সুযোগ দেয় ও চাপমুক্ত করতে সাহায্য করে। গাড়ীতে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করা, গান-বাজনা শোনা, পুরানো দিনের ফটো দেখা, পোষা প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণ করা, বাগান পরিচর্যা করা, পাখি পোষা, অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ পোষা, দেশ বিদেশের পরানো মুদ্রা স্ট্যাম্প, ম্যাপ ও ছবি সংগ্রহ করা, ব্যক্তিগত আকর্ষণে কোন লেখা বা স্থানের সম্বন্ধে গবেষণা করা, শিশুদের সঙ্গে খেলা করা, ছবি আঁকা, নিকট আত্মীয় বা পুরানো বন্ধুর বাড়ী যাওয়া, এছাড়া সাঁতারকাটা, নাচ, দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটা, টেবিল টেনিস খেলা, ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশ, জগিং, সাইকেল চালানো। এইগুলি চাপ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া চিৎকার করে কাঁদা, অনুভূতি নির্গমনের জন্য চিৎকার করা, পরিচিতদের একত্রে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করা, ছুটির দিনের পরিবেশ

তৈরী করা, কোন গীর্জায় বা মন্দিরে যাওয়া, ভক্তিগীতি শোনা এবং গাওয়া, কিছু সময়ের জন্য ঘুমানো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। এগুলি আমাদের চাপমুক্ত করতে নানা ভাবে সহায়তা করে।

আমরা কতটা মানসিক চাপগ্রস্থ, এ ব্যাপারে প্রধান উপায় হচ্ছে নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নতালিকার মধ্যে নিয়মিত থাকা এবং নিজের দিক থেকে মানসিক চাপ প্রবণতাকে পরিমাপ করা —

উত্তর - 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' —

১. আমি নিজের মধ্যে শান্তিতে আছি।
২. আমি সহজে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিনা।
৩. আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট।
৪. আমার বেশীর ভাগ সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করি।
৫. অন্যের সঙ্গে আমার সাধারণত অহং সমস্যা নেই।
৬. আমার পারিবারিক সম্পর্ক খুবই ভাল।
৭. আমার বন্ধুরা উপকারী এবং আমাকে ভালোবাসে।
৮. আমার বর্তমান কাজের চাপ আমার কাছে আরামদায়ক।
৯. আমি আমার কাজ উপভোগ করি এবং ফলাফলে সন্তুষ্ট।
১০. আমি আমার সময় ঠিকভাবে ব্যবহার করি এবং দিনে যথেষ্ট কাজ করি।
১১. আমি সাধারণত সুখনিদ্রা উপভোগ করি।
১২. সারাদিন ভাল থাকার একটা নিয়ম তালিকা অনুসরণ করি।
১৩. আমি পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করি।
১৪. আমি নিয়মিত ধূমপান ও মদ্যপান করি না।
১৫. বেশীর ভাগ দিনই আমি নিজেকে সুস্থ সবল হিসাবে অনুভব করি।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলিতে যার যত 'না' উত্তরটি বেশি থাকেব সে তত মানসিক চাপের মধ্যে পড়বে। চাপমুক্ত হও এবং সব সময় উৎফুল- থাকো।

স্বাধীনোত্তরকালীন ভারতবর্ষের মন্ত্রী - আমলা সম্পর্কের বাস্তব রূপরেখা

- মৌমিতা দত্ত

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

ভারতবর্ষে স্থিত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় মন্ত্রী অর্থাৎ আইনসভার প্রধান এবং তার কর্তৃত্বাধীন স্থায়ী পেশাগত উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা আমলাগণ অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান বা সচিবের মাধ্যমে। এই শাসনব্যবস্থা একদিকে রাজনীতিবিদ এবং অপরদিকে রাজনীতি নিরপেক্ষ স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই দুইয়ের ভিত্তিতে গঠিত।

ঐতিহাসিকভাবে ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড প্রশাসনিক সংস্থার আইনে মন্ত্রী বিষয়ক ধারণাটির প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথমবারই সেক্রেটারী বা সচিবকে Law Minister বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই মন্ত্রী ও সচিবদের মধ্যে সম্পর্কের গতি - প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা সর্বদাই বিরোধের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ১৯২৪ সালে Reform Enquiry Committee -র কাছে সেকারণেই অনেক মন্ত্রীরা সচিবদের বিরুদ্ধে অসহযোগীতার অভিযোগ এনেছিল। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে সচিব ও মন্ত্রীদের সম্পর্ককে একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রচিত এই আনি সচিবদের কার্য ও মর্যাদার ওপর প্রভাব ফেলে। ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত Makwell Committee মন্ত্রী ও সচিবদের সম্পর্ককে পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন যে মন্ত্রীদের অধিকার আছে তারা যে যে দপ্তরের প্রশাসনিক অধিকর্তা সেই সেই দপ্তরের উপর অভিজ্ঞতামূলক মানসিকতা নিয়ে উপদেশ প্রদান করা আর সচিবরা সেই দপ্তরের এক একজন সুশিক্ষিত অফিসার দ্বারা সেই উপদেশকে বাস্তবায়ন করবে। অপরদিকে আবার সচিবরা নিজ নিজ দপ্তরের উপর দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে যে শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভ করে সেখান থেকে তারাও উপদেশ দিতে পারে যা গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার মন্ত্রীদের আছে। এককথায় মন্ত্রীরা সেরকম অবস্থায় থাকে না যেখান থেকে তারা প্রতিদিনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারে।

Makwell Committee -র মতে, সচিবদের তাদের প্রতিদিনের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে সাম্য ও স্বাধীনতা থাকা উচিত। সচিবরা প্রশাসনের আত্মাস্বরূপ। তারা দপ্তরের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠান করে প্রশাসনের ভিত গঠন করে। তারা মন্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। তার সিদ্ধান্তকে রূপায়ণ করে এবং প্রয়োজনে রূপায়িত সিদ্ধান্তের পুনঃসমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় উপদেশ মন্ত্রীদের প্রদান করে। এই Committee -র মতে, যে কোন কৌশলগত বা প্রশাসনিক বিষয়ে যেকোন বিশেষজ্ঞ বা যেকোন প্রশাসনিক দপ্তরের অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করার স্বাধীনতা মন্ত্রীর আছে। একইভাবে সেই আলোচনায় সচিবদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অভিজ্ঞতাসুলভ বক্তব্য প্রদানের অধিকার না দিয়ে

আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বাস্তবে সরকারী শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী আমলা সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই সাংগঠনিক কর্তৃত্বের মধ্যে কার দৃঢ় বাঁধন ব্যতিরেকে শাসনব্যবস্থার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। মন্ত্রী হলেন একজন পেশাগত রাজনীতিবিদ্, যিনি সরকারের কাছে জনগণের দাবী দাওয়া ও জনগণের বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে কার্যালয়ে ক্ষমতা লাভ করেন। নির্দিষ্ট পদে তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে দলীয় প্রাধান্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর। এইভাবে তিনি আইনগত দক্ষতা ও কিছু সরকারী দক্ষতার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেন। অপর প্রান্তে সচিব অর্থাৎ স্থায়ী উচ্চপদস্থ আমলাগণ বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিযুক্ত হন। যদি এদের মধ্যে কেউ নিজ কার্য সঠিকভাবে সম্পাদন না করেন, দ্বন্দ্বসূচক মনোভাব পোষণ করেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একমত না হন তবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গতিরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মন্ত্রী ও আমলাদের ভূমিকা ঃ

সুষম ও দক্ষতার সাথে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী এবং সচিবদের মধ্যে যথাযথ সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। মন্ত্রী পরিষদের কাজকর্মের বিচক্ষণতা ও সাফল্য নির্ভর করে মন্ত্রী আমলা সম্পর্কের ওপর। একজন মন্ত্রী তার অধীনস্থ আমলার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থাশীল থাকা প্রয়োজন। আমলাগণের কর্তব্য কোনরূপ ভয় ও পক্ষপাতিত্ব না করে মন্ত্রীগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করা। আমলাগণের সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য যে মন্ত্রী হলেন পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সে অর্থাৎ তার অধীনস্থ আমলা তার একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্ত্রীগণের দায়িত্বসমূহ ঃ

১) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন নীতিগুলিকে সূত্রবদ্ধ করা।

২) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩) নীতিসমূহ রূপায়ণের ক্ষেত্রে তদারকি করা।

৪) বৃহত্তর প্রশাসনিক সমস্যা বা বিতর্কের মীমাংসা করা।

৫) সরকারী উচ্চপদগুলিতে কর্মী নিয়োগ করা।

৬) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে আইনসম্মত উপায়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করা।

আমলাগণের দায়িত্বসমূহ ঃ

১) রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পাদন করা।

২) নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য, বাস্তবতা ও জাতিগত সিদ্ধান্ত বা রায় সরবরাহ করা।

৩) দ্ব্যর্থহীনভাবে বিভিন্ন সহযোগিতাপূর্ণ কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা।

৪) প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

মন্ত্রী - আমলা সম্পর্ক পরিচালনার নীতিসমূহ ঃ

নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণের প্রধান কর্তব্য হল ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা কের সমকালীন পরিস্থিতি ও বাস্তবিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। এই বিস্তারিত পরিসরে আমলাগণ মন্ত্রীগণকে মানসিক দৃঢ়তা প্রদানে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকেন। Herbert

Morrison - এর মতে,"if the minister incharge knows what he wants and is intelligent in going about if, he can command the understanding, co-operation and support of civil servants."

অর্থাৎ মন্ত্রী আমলার মধ্যে সুসম্পর্ক দেশের উন্নতি ও সরকারী ব্যবস্থার স্থায়িত্বের একমাত্র সহায়ক। এক্ষেত্রে মন্ত্রী আমলা সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ হল ঃ

১) শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের সময় উভয়কেই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা ও আইনসভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন মেনে চলা উচিত।

২) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের চূড়ান্ত অধিকার আছে।

৩) একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সর্বদা মন্ত্রীদের দ্বারা গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত গুলিকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা উচিত যদিও তারা সেই সকল গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী হোক না কেন।

৪) মন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় আমলাদের নির্ভীকতার সাথে সবরকম বাঁধনমুক্ত হয়ে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা জরুরী। অর্থাৎ মন্ত্রীর অধীনস্থ আমলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

৫) নীতি প্রণয়নের বিষয়ে আমলাগণের তিনটি বিষয় মেনে চলা উচিত, যথাঃ Neutrality অর্থাৎ নিরপেক্ষ হতে হবে, Impartiality অর্থাৎ রাজনীতিশূন্য হয়ে ন্যায়পরায়ণ পথে কাজ করতে হবে এবং Anonyinity অর্থাৎ কোনো কূল -প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে অপ্রকাশিতভাবে নিঃশব্দে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

বাস্তবে মন্ত্রী - আমলরা সম্পর্ক ঃ

স্বাধীনতার পর পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালের আগে পর্যন্ত মন্ত্রী-আমলার সম্পর্কে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ছিল না। এর পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিদ্যমান ছিল —

১) মন্ত্রীগণের বৈধ সাংবিধানিক কর্তৃত্ব।

২) তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্যাটেলের শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমিকা ও সকল সচিবদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক।

৩) প্রশাসকগণের নেতৃত্বের গুণাগুণের প্রতি আকর্ষণের কারণে তারা প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণ বা দক্ষতাকেই প্রাধান্য দেয়।

১৯৭০ - এর দশকের মধ্যবর্তীকালীন জরুরী অবস্থা প্রশাসনসহ জীবনের সমস্ত দিককেই প্রভাবিত করেছিল। মনে করা হয়েছিল যে, সরকারী ব্যবস্থা সরকার পরিচালনার গুণগত পরিবর্তনের ভিত্তিতে জনপ্রশাসন তার পূর্বতন শক্তি ফিরে পাবে এবং প্রতিযোগিতামুখী হতে পারবে।

জরুরী অবস্থার সময় মনে করা হয়েছিল যে, আমলাতন্ত্র ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগীতা করেছিল, যদিও ১৯৭৭ - র নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন এবং এর পশ্চাতে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়।

দিলি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই সময় এই বিষয়ে অভিহিত ছিল যে, যুব সম্প্রদায়

ক্রমশই স্থিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছিল এবং আমলাতন্ত্রের উপর প্রতিনিয়ত এই চাপ দেওয়া হচ্ছিল যে প্রত্যেকের সাথে সহযোগীতা করতে হবে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল এই যে আমলাতন্ত্র অসাংবিধানিক, অবৈধ কর্মকান্ডগুলির সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে ফেলতে চাইছিল না।

এইসময় একধরণের ভীতিকর আবহাওয়া সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনকে আক্রান্ত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে একধরণের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, প্রশাসনে কেউই নির্দিষ্ট ভূমিকা বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল না এবং পুলিশ প্রশাসন শেষ পর্যন্ত নিজেই একধরণের আইনব্যবস্থায় পরিণত হয়ে যায়।

যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। অতএব শুধুমাত্র উন্নয়ণমূলক কাজকর্মের সংবাদই গুরুত্ব পেতে থাকে। যেখানে পরিসংখ্যানই মুখ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়, কিন্তু সেই পরিসংখ্যানের পশ্চাৎগত অবস্থা অব্যাখ্যায়িত হতে থাকে। অতএব প্রশাসন তার নিরাপত্তার স্বার্থে 'ধীরে চল নীতি' গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয় এবং আমলাতন্ত্র নিজেও এই অবস্থাটি সম্বন্ধে সচেতন ছিল।

১৯৫৭ সালের পরবর্তী সময় থেকে এই সকল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাস্তবে মন্ত্রী - আমলা সম্পর্ক দ্বন্দ্ব, বিবাদ, অস্বস্তিকর ও সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারি —

ক) Mundhra Deal ঃ মন্ত্রী - আমলার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রথম প্রস্ফূটিত হয় স্বাধীনোত্তরকালীন সময়ে ১৯৫৭ সালে Mundhra Deal - এর মাধ্যমে। এখানে দেখা যায় জাতীয় জীবন বীমা পরিষদ ১.২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে একটি বেসরকারী সংস্থার কাছ থেকে নিজ হিস্যা বা অংশ লাভ করতে সক্ষম হয়। যখন বিষয়টি জনসমক্ষে উঠে আসে তখন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী T.T. Krishnanachari এবং তৎকালীন মুখ্য অর্থসচিব M.C. Chagla - এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ১৯৫৮ সালে Mundhra Deal - এর সত্যতা ও যথাযথতা তদন্ত ও পরীক্ষা করে দেখেন। Chagla Commission তার প্রতিবেদনে পেশ করলেন যে, "Constitutionally the minister is responsible for the action taken by his secretary ... he cannot take shelter behind then nor can be disown their actions." এইভাবে Chagla Commission সরকারী আধিকারিকদের দায়বদ্ধতার বৈশিষ্ট্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অপ্রকাশিত পন্থা অনুসরণ করে কাজকর্মের নমুনা তুলে ধরলে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন।

খ) ১৯৬৬ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Gulzari Lal Nanda প্রধানমন্ত্রীর কাছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব L.P.Singh - এর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ পেশ করলেন এবং স্থানান্তরিতকরণের আবেদন জানালেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার আবেদনে সাড়া না দিলে ফলস্বরূপ তিনি পদত্যাগ করলেন। অপরদিকে সচিব স্বপদে বহাল থাকলেন।

গ) মন্ত্রী আমলা সম্পর্কের অপর অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে, যখন তৎকালীন রেলমন্ত্রী K. Hanumgnthaiya খুবই নিন্দনীয় আচরণ করলেন তৎকালীন রেলপর্ষদের সভাপতি B.C.Ganguli -র সাথে। তাদের মধ্যে অনেক বিষয় নিয়েই

মতবিরোধ থাকলেও প্রধানত রেল প্রশাসনের অর্থ সংক্রান্ত দিক নিয়েই তাদের বিরোধ চরমে উঠেছিল। এক্ষেত্রে B.C.Ganguli - কে মানবিকতার দোহাই দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ঘ) ১৯৮৭ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন কৃষিসচিব C.S.Sastry, তৎকালীন গ্রামোন্নয়ন সচিব D. Bandhopadhaya ও তৎকালীন বিদেশ সচিব A.P.Venkateshran- এর প্রতি।

ঙ) ১৯৯৩ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজকর্মের ধরণের সাথে বৈষম্য তথা বোঝাপড়ার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব পদত্যাগ করলেন।

বস্তুত ভারতবর্ষে উদারনৈতিকতার নীতি গৃহীত হলেও আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিলুপ্ত হয়নি। বরং এই চাপ ক্রমবর্ধমান। জনপ্রশাসন এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে না যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা থেকে তা 'Human Relations Approach ' - এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Kamala Prasad; 'Indian Administration : Politics, policies and prospects'; published by: Dorling Kindersley (India) pvt. Ltd; 2nd Impression : 2006

2. Laxmikanth M; 'Public Administration for the UPSC civil service preliminary examination'; publication : New Delhi Mc Graw - Hill ; 3rd Edition : 2006

3. S. N. Mishra Sweta Mishra; 'Theory & practice of public Administration' ; published by : New Delhi, Inanada Prakashan (P & D); 1st Edition : 1999.

4. S.R Maheshwari ; `A history of Indian Administration'; published by : New Delhi 110002, Orient Longman Limited; 2nd Edition : 2001.

বর্ধমান জেলার হিন্দু - মুসলমান সমন্বয়ে, সুফি ও পীর দরগার অবদান

-শচীন্দ্র ঘোষ
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তথা বাংলাদেশে হিন্দু - মুসলমান সংঘাত ও সমন্বয় দুই বাস্তব ঘটনা। বর্ধমান জেলা তার বাইরে ছিল না। কিন্তু গোটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান জেলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের চেয়ে সমন্বয়টা বেশি চোখে পড়ে। আর এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করছে সুফি ও পীরের দরগা ও মাজরা।

মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর বিশেষ করে পারস্যদেশে সুফিবাদ একটাপপরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে। সুফীবাদের অর্থই হচ্ছে প্রেম, আর এই প্রেম পরম স্রষ্টার প্রতি প্রেম। ভারত উপমহাদেশে সুফিবাদের আগমন হয়েছে মূলত খাইবার গিরিপথ দিয়ে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ভারত উপমহাদেশে মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমানদের সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য, সমরখন্দ প্রভৃতি এলাকা থেকে সুফিবাদের বাণী নিয়ে এদেশে বহু পীর, ফকির, দরবেশ ও আউলিয়ার আগমন হয়েছে।

ডঃ মুহম্মদ আমূল হকের মতে, ভারতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যে সুফিবাদের প্রবর্তন ঘটে, তা অষ্টম ও নবম শতাব্দীর আরব দেশের সুফিবাদ নয়। এই সুফিবাদ হচ্ছে পারস্য, বোখরা আর সমরখন্দে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সুফিবাদ। ১১৫০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কালকে উপমহাদেশে সুফি প্রচারের গোড়াপত্তন ও বিকাশের যুগ বলা চলে। সুফি মনীষীরা উপমহাদেশের সংস্কৃতি, ভাষা ও লোকাচারকে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, আলোচ্য সময়ে ভারত উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুফি মনীষীদের অসংখ্য খানকা শরীফ গড়ে উঠেছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাগত জানিয়েছে।

সুফি মতবাদটি হল ইসলামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ। সুফি মতবাদটি ইরান ও ইরাকে সৃষ্টি হলেও ভারতবর্ষে তার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সুফি সন্তসহ বহু আধুনিক চিন্তাবিদগণ মনে করেন, সুফি ধ্যানধারণার জন্ম কোরাণ থেকেই। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে হিন্দু যোগী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের, আত্মার সঙ্গে জড়বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধে ধ্যানধারণার মধ্যে। সুফিদের মধ্যে বেশ কিছু সম্প্রদায় যেমন চিস্তি ও ফিরদৌসী যাদের ধ্যান ধারণা ও আচার পদ্ধতিগুলি হিন্দুধর্মের আচার পদ্ধতির অনেকটাই একইরকম। সুফিদের আশ্রম জীবন ও উপবাস ও প্রাণায়মগুলির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগ সাধনার প্রভাব দেখা যায়।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে সুফিসন্তদের প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। যদুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যেতে পারে, "হিন্দু মুসলমান দুই সমাজের মুর্খ সাধারণ

লোক, সংসার বিরাগী সাধক, সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতির মধ্যে এইসব মহাপুরুষদের প্রভাব জয়লাভ করিল। আর শিক্ষিত ভদ্রলোক, বিশেষত কর্মচারী শ্রেণীর মধ্যে সুফিমতের বহুল বিস্তৃতি হইল।"

ষোড়শ শতকে গোড়া শিয়াধর্ম সাফারি ইরানে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বহু সুফি সাধক নিরাপদ ভারতে লোকায়ত ইসলাম দরগা ও পীর দরগার রূপ নেয়।

মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের আর একটি দিক হল পীর দরগা। পীর কথার অর্থ প্রাচীন। পীরেরা প্রত্যেকেই সুফি ছিলেন কিন্তু প্রত্যেকে সুফি কিন্তু পীর ছিলেন না। মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক জর্জরিত এই পীররা অনেকেই বৈদিক ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। হিন্দুরা এই পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। বাংলাদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ এই পীরদের মধ্যে তান্ত্রিক গুরুর মিল পেতেন। মুসলমান সন্তগণ ইচ্ছা করিয়া হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে দরগা ও খানকা নির্মাণ করতেন। এবং এই পীরের মাজরাগুলো ক্রমে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বন্দনার স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মমঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলে পীরের দরগাগুলি স্থান পেয়েছে।

ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণ ও নদীয়া জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতক হতে মুসলমান পীর ও ফকিরের দল বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। প্রথম তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৌড়ের সুলতান সসৈন্যে ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করত তারও বহু নজির পাওয়া যায়।

যাইহোক এই পীর সুফিগণ ধর্মপ্রচারের নামে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তারও এ মানের অভাব নাই। ষোড়শ শতকে এরূপ এক ধর্মপ্রাণ পীরের জীবন কাহিনী সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং দুখানি শিলালিপিতে খোদিত আছে। আজীবন মশক বহনকারী এই মহাপুরুষ 'হজরত পীর বহরাম সক্কা' নামে পরিচিত ছিলেন। সক্কা শব্দের অর্থ জলদানকারী। বর্ধমান শহরে প্রাপ্ত দুটি শিলালিপি হতে এই ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।

বর্ধমান শহরে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে বহরাম সক্কা ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর পীর বহরাম সক্কারউরস মোবারক উৎসব উপলক্ষ্যে নানা স্থানের বহু ভক্তগন এখানে সমবেত হন।

বর্ধমান জেলার বহু পীর ও সুফির সম বিগ্রহ ও দরগা নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য হল বর্ধমানের বহরাম সক্কার সমবিগ্রহ, খাজা আনোয়ারের সমবিগ্রহ, খোককর সাহেবের মাজার, মঙ্গলকোটের পীর পাঞ্জাতন, রাহী পীর, বোহারে গদাই ফকির, রাইগ্রামে গোরাচাঁদ পীর, সারগাদিতে রঙ্গিলা ফকির, কাটোয়ায় আলম খান, সুয়াতায় পীর বহমন, দাঁইহাটে বদর সাহেবের সমাধি, শিলাম হয়ে রাবাখাঁ, বড়র গ্রামে পীর গিয়াসউদ্দিন, উচাননে মকদুমপীর ও কালনার মজলিস শহরে মাজার। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সাধকদের সমাধি ও সমাধিগৃহগুলি পীর ও সুফিদের স্মৃতিচিহ্নকে আজও ধরে রেখেছে।

এখানে উলে-খযোগ্য বিষয় হল যে, বর্ণ হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মকে প্রীতির চোখে না দেখলেও পীর ও সুফিরা সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে কিন্তু শ্রদ্ধা হারানো নাই। আজও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা পীর বহরাম, পীর ....., পীর গদাই সাহেব,খককর সাহেব, মজলিস শাহ বদরপীর,বহমন শাহ প্রভৃতি সাধুসন্তদের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য

নিবেদন করে থাকেন। আবার পীরতলা হতে জলপড়া নিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বিধাবোধ করে না। বর্ধমানে অনেক জায়গায় কোন বৃক্ষতল পীরতলা নামে পরিচিত, এই সমস্ত জায়গায় মানদ করতে এক হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়গণ একইসঙ্গে সমবেত হন এমন উদাহরণ বর্তমান। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন পীরের দরগাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে, পীরের গান হয় এবং ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। এই সমস্ত স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়। এবং তারা ধান, চাল, মুরগী, পাকা শিরনী ইত্যাদি পূজার উপকরণ প্রদান করেন। মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তরা মানদ করতে থাকে।

বাংলা তথা বর্ধমান জেলায় সত্যপীরও সত্যনারায়ণ হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত ধর্মজীবনের ঐক্য সূত্রের ধারক হয়ে বাংলার লোকবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হতেন।

ধর্মমঙ্গলের একটি অংশ এই প্রসঙ্গে উলে-খযোগ্য —

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে গাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খোন্দকাদুর
ধর্ম হল যবনরূপী শিরে পরে লাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান
ব্রহ্মা হইল মোহম্মদ বিষ্ণু হইল শেতাম্বর
মহেশ হইল আদম।
গণেশ হইল গাজী কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল মুনিগণ।

এমনিভাবে হিন্দুদের সত্যনারায়ণ মুসলমানদের সত্যপীরে পরিণত হলেন। উভয়েই উভয়ের দর্জা পেতে লাগলেন। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির ঘটলো এক অভূতপূর্ব সমন্বয়।

তুর্কী বিজয়ের পর যখন হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটতে থাকে তখনই মুসলমানদের মধ্যে সত্যনারায়ণে আপত্তি থাকায় তখন সত্যকে ঠিক রেখে মুসলমানগণ নারায়ণকে পীরে রূপান্তরিত করেন। এইভাবে লৌকিক দেবদেবীর সারণীতে আর একটি লৌকিক দেবতার সংযোজন ঘটনা সত্যনীয়।

পরিশেষে বলা যায় সুফি ও পীরদের দরগা ও মাজরাগুলির উৎসব, মেলা ও তাদের আচার পদ্ধতি ও তাদের অতীয়ন্ত্রতাবাদ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে যা ধর্মীয় সমন্বয়বাদকে উৎসাহিত করে।

গ্রন্থপঞ্জিকা / সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) ডঃ পঞ্চানন সাহা, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, নতুন ভাবনা, বিশ্বশিক্ষা, কলকাতা ৭৩।
২) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান, ফার্মাকেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১৯৯৮।
৩) এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খন্ড, র‍্যাডিক্যাল,কলকাতা - ২০০১।
৪) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় খন্ড), পুস্তক বিপনী, কলকাতা - ০৯।
৫) ঘনরাম চক্রবর্তী, সম্পাদনা : পীযূষ চক্রবর্তী, শ্রী ধর্মমঙ্গল।

বিবর্তনের পথে সুন্দরবন - কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

-শান্তনু বেরা

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

বর্তমানে শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রছাত্রী এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন নিয়ে বিশেষ আগ্রহী। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুললেই সুন্দরবন নিয়ে প্রচ্ছদ চোখে পড়েই, যেমন সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলোর মধ্যে "পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের বেশ কিছু ব-দ্বীপ জলের তলায় তলিয়ে যাবে", সুন্দরবনে বাঘ ও মানুষের সংঘর্ষ, সুন্দরবনে চোরাশিকারীদের হামলা, সুন্দরবনের Biosphere Reserve সংরক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঠনমূলক পদক্ষেপ, পৌষ সংক্রান্তি ও গঙ্গাসাগর মেলা, দশ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের সঙ্গে জনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলিকে পরস্পরের সংযুক্ত করার পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ আনয়ন, সুন্দরবনের বাঘের আশ্রয়স্থল আলিপুর চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। তাছাড়া কেউ কেউ বলেন সুন্দরবনের এই সভ্যতা তিনশো থেকে চারশো বছরের, তার আগে সুন্দরবনে ছিল গভীর ম্যানগ্রোভ অরণ্য যেখানে ছিল হিংস্র জীবজন্তুর বাস। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েই গেছে।

তবে প্রাচীন ইতিহাস, ওমালীর গেজেটিয়ার, The Imperial Gazetter of India, The Discovery of India, The Sunderban of India এবং বিভিন্ন পুস্তক যেমন সুধীন সেনগুপ্তর 'সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল', রবীন্দ্রনাথ দে'র 'সুন্দরবন', ডঃ গৌতম কুমার দাসের 'ভারতীয় সুন্দরবন', ডঃ আশীষ কুমার পালের 'Coastal Geomorphology', ডঃ সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় "Changes in coast-line of WB during the 20th century..... " তাছাড়া তুষার কাঞ্জিলাল, অতনু রাহা ও প্রফেসর সুভাষ রঞ্জন বসুর বিভিন্ন প্রচ্ছদ এবং বক্তৃতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুন্দরবনের বিবর্তন ও তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিছু কিছু নিম্নে একত্র করলাম।

রাজমহলের দক্ষিণে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপটি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য আরও কয়েকটি নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী। এই ব-দ্বীপের নীচের অংশে সাগর উপকূলে সুন্দরবন অরণ্যের অবস্থান। সাগরদ্বীপ সুন্দরবনের একটি সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং বড় দ্বীপ, যা অতীতে মূল ভূ-খন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় গঙ্গারিদি নামে একটি জাতি বা রাজ্যের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যদিও ভারতীয় কোন শাস্ত্রে গঙ্গারিদির উলে-খ পাওয়া যায় না তবুও গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা', ইতালীর মহাকবি ভার্জিলের 'জার্জিস', গ্রিক ভৌগোলিক টলেমি, গ্রিক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস, অজ্ঞাতনামা গ্রিক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লিস তেস ইরিথ্রাল থালাসেসেস (ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথ নির্দেশিকা) থেকে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব চার শতক থেকে খ্রীষ্টিয় দুই/তিন শতক পর্যন্ত গঙ্গানদীর অংশ ও তার সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গারিদ নামে একটি জাতি রাজত্ব করত এবং রাজ্যটির নাম ছিল গঙ্গারিদি। যদিও এই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে, টলেমি গঙ্গারিদির পশ্চিম অংশের দক্ষিণ সীমায় ভাগীরথী নদীর মূল ধারার

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখের মধ্যে সাগর উপকূলে এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গানগরের অবস্থান দেখিয়েছেন যা বর্তমান সাগরদ্বীপ।

সুন্দরবন অরণ্য সৃষ্টির যথার্থ ঠিকুজি পাওয়া যায়নি। যদিও পৃথিবীর অস্তিত্বের নিরিখে সুন্দরবন বয়সে অনেক নবীন তবুও সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

১। গত পাঁচ দশক ধরে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ থেকে এমন অনেক প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে যাদের অনেককেই আজ আর সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান সুন্দরবন থেকে বহু দূরে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ, বর্তমানে বিলুপ্ত প্রাণীর অবশিষ্ট, অধুনালুপ্ত প্রাণীর জীবাশ্মও পাওয়া গেছে।

২। দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুরে পাওয়া পাথরের প্রত্নবস্তু, সুন্দরবনে প্রস্তর যুগের মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আবার মাটির ১৫০-২০০ মি. নীচের থেকে পাওয়া প্রাণীর দেহের অংশ, ম্যানগ্রোভ গাছের অংশের বয়স ৫০০০ - ৬০০০ বছরের মধ্যে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

৩। প্রাচীন ভারতবর্ষে তেরোটি মহাবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যার মধ্যে আঙ্গেরীয় বন অন্যতম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আঙ্গেরীয় বন তথ্যে সুন্দরবনের উলে-খ আছে যা থেকে বলা যায় এই অরণ্যের অস্তিত্ব তার আগেও ছিল।

৪। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রকেতুগড়ে আবিস্কৃত প্রত্নসামগ্রী খ্রীষ্টপূর্ব তিন থেকে পাঁচ শতক সময়ের মধ্যে বলে মনে করেন। সুন্দরবন অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ব গবেষক কালীদাস দত্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত পাল, সেন আমলের নানা ধরণের মন্দির, গৃহের ধ্বংসাবশেষ, ইটের স্তূপ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। কঙ্কন দিঘির কাছে 'জটার দেউল' (উচ্চতা ১০০ মিঃ, প্রস্থ ৩০ মিঃ) নামে শিবের একটি মন্দির অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মাটির পাত্র, চাল, ঘোড়ার ব্যবসা করতে সুন্দরবনে আসত।

৬। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগমন ঘটেছিল সম্ভবত দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে। জ্ঞানপালে রাক্ষসখালি (সুন্দরবন) তাম্রশাসনে (১১৯৬-৯৭) এক শক্তিশালী শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়। আবার বাগের হাটের (বাংলাদেশ) এক মসজিদ লেখ থেকে জানা যায় ১৪৫৯ সালে খান জাহান সুন্দরবন অঞ্চলে সুলতানি শাসন প্রবর্তন করেন।

৭। অনেকের মতে সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমান মানব গোষ্ঠীর পদার্পণ ঘটে প্রায় চারশো বছর আগে। সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন ছোট নাগপুর ও রাঁচি থেকে মুন্ডা, বেদিয়া, মাহালি, তুরী, ওঁরাও, গন্ধভূমিজ ও সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ে মানুষকে আনা হয়। তাছাড়া উড়িষ্যা, বাংলাদেশ থেকে পৌন্ড্র, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, ঋষি, মেদিনীপুর থেকে মাহিষ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা সুন্দরবন-এ জনপদ সৃষ্টি করে। বর্তমানে সুন্দরবনে আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার এবং মোট ৪০ লক্ষ মানুষের বাস।

৮। সুন্দরবনের প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করার স্বপক্ষে আরও কিছু প্রমাণ একত্র করলে দেখা যায় কলকাতা থেকে প্রায় ২০ কিমি দক্ষিণে বোড়াল গ্রামের (22 20`54`` N, 88

35`20``E) 'সেনদিঘি' নামে পুকুরের তলদেশ থেকে আবিস্কৃত হয়েছে - জলাভূমির হরিণ, বন্য মহিষ, ছোট এক শিং গন্ডার ইত্যাদি। মেট্রোর রেলের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় কোলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল থেকে একটি কুমিরের কঙ্কাল ও সুন্দরী গাছের অংশ পাওয়া গেছে।

৯। এছাড়া পূর্ব সুন্দরবনে গন্ডারখালি নামে একটি জঙ্গল আছে। আচার্য প্রফুল-চন্দ্র রায়ের ভাই নলিনী ভূষণ রায় ১৮৮৫ সালে এখানে গন্ডার দেখেছিলেন যার পর সুন্দরবনে গন্ডারের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় নি।

১০। শোনা যায় যে ঢাকার তদানীন্তন নবাব লর্ড ক্লাইভের জন্য সুন্দরবনে বন্য মহিষ শিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন বন্য মহিষের প্রচলিত নাম ছিল 'বয়ার' আর গন্ডারকে বলা হত 'গাড়া'। দক্ষিণ ২৪ পরগণার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে 'বয়ার শিং' এবং প্রতাপনগর পঞ্চায়েত 'গাড়াল' নামে একটি গ্রাম রয়েছে যা ঐ দুটি প্রাণীর অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় দূর করে।

১১। প্রিন্সেস সাহেব ১৮২২ থেকে ১৮২৩ সালে বাংলাদেশের যমুনা নদী থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত বনাঞ্চল জরীপ করে মরিশনের ম্যাপের সাহায্যে বনাঞ্চলকে বিভিন্ন ব-কে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে একটি সংখ্যা দিয়েছিলেন। এইভাবে সুন্দরবনে লট - এর (Lot) প্রবর্তন হয়েছিল।

১২। প্রিন্সেস লাইন ই প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের প্রামাণ্য উত্তর সীমারেখা। যদিও ১৮৭৫ সালের পরে Dampire-Hodges Line কেই সুন্দরবনের উত্তরসীমা রেখা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৩। সুন্দরবনের অনেক ব-দ্বীপ যা আগে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পরস্পরের সঙ্গেও যুক্ত ছিল যেমন - সাগরদ্বীপ, সাগর লোহাচূরা - ঘোড়ামারা দ্বীপ, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপগুলি পরস্পর এবং মূলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং অনেক নতুন দ্বীপের সৃষ্টিও হয়েছে।

১৪। ১৮২৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার সমাহর্তা Mr. Traver সাগর দ্বীপকে আবাদে পরিণত করার জন্য Sagar island Society নামে একটি সংস্থা তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা এবং গঙ্গাসাগর এলাকায় পুকুর কাটতে গিয়ে অনেক মূল্যবান ধাতু, আসবাবপত্র, ব্রোঞ্জ এবং তামার মূর্তি পাওয়া গেছে যা দেখে ঐতিহাসিকরা বলছেন সুন্দরবনে বৌদ্ধ এবং তাম্রযুগের অস্তিত্ব ছিল।

১৫। নেতিধোপানীতে একটি মন্দির ও একসারি বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। বেশ কয়েকটি বিদেশী বকুল গাছ দেখা যায়। বলা হয় বকুল গাছগুলি অতীতে রাস্তার শোভা বাড়াতো। স্থানটি ছিল বণিক চাঁদ সদাগরের সাগরদ্বীপে যাওয়ার পথে বিশ্রামের স্থান।

১৬। ওমালীর Gazetter-এ গঙ্গাসাগর মেলার পবিত্রতার বর্ণনা রয়েছে। অনেকে বলেন রামের ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ অযোধ্যার রাজা সগর - এর নামানুসারে সাগরদ্বীপ নামকরণ হয়েছে।

১৭। চীন, মাঞ্চুরিয়া ও সাইবেরিয়া থেকে প্রায় ৭০০০ - ৮০০০ বছর আগে বাঘ ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ও মায়ানমার থেকে কালক্রমে কিছু বাঘ বাংলায় প্রবেশ করে সুন্দরবনে উপস্থিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সর্বোদয় সমাজ

- তুফান আলি সেখ

অতিথি অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

সত্য এবং অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন মানব সত্তা হল এক এবং অদ্বিতীয়। তাই তিনি বলতেন, প্রতিটি মানুষের সার্বিক উন্নয়ণ আ সার্বিক হিত সাধন সম্ভব হলে তবেই সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ণ বা কল্যাণ সম্ভব। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের মন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন জন রাস্কিনের লেখা 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। জন রাস্কিন খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল - এর সেন্ট ম্যাথুজের ২০ নং অধ্যায়ে বর্ণিত নীতি ধর্মমূলক একটি ছোট গল্প অবলম্বনে 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল — প্রত্যেকের কাছ থেকে ততটুকুই (শ্রম) গ্রহণ করা যায় যতটা সে দিতে পারে এবং প্রত্যেককে ততটুকুই (সামগ্রী) দিতে হয় যতটা তার প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী রাস্কিন রচিত গ্রন্থটি পাঠ করে খুবই অভিজ্ঞত হল এবং গ্রন্থটিতে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মকে দেশবাসীর কাছে প্রচারের জন্য গ্রন্থটিকে তিনি গুজরাট ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তার নাম দেন সর্বোদয়। গান্ধীজির 'সর্বোদয় তত্ত্ব' হল একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি।

মূল শব্দ (Key words) ঃ —

সর্বোদয়, রাম রাজ্য, নৈরাষ্ট্রবাদ, লোকনীতি, অনাসক্তি যোগ।

ভূমিকা (Introduction) ঃ —

'জাতির জনক' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 'গান্ধীজি' নামেই সর্বজনবিদিত। শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত একজন অহিংস সত্যাগ্রহী আদর্শের উদ্ভাবক হিসাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সত্য এবং অহিংস অসহযোগ নীতি শাণিত যে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন গোটা বিশ্বের কাছে তা ছিল অভূতপূর্ব। গান্ধীজি নিজেকে দেশের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। দেশের গন্ডি পেরিয়ে তিনি তার নীতি এবং আদর্শকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গান্ধীজির ভাবনা, মতাদর্শ আজকের দিনেও উলে-খের দাবি রাখে। বর্তমান সময়েও গান্ধীজি হলেন মানুষের কাছে একজন সত্যদ্রষ্টা, অনুপ্রেরণা, পথ প্রদর্শক এবং দার্শনিক।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ—

১. গান্ধীজির 'সর্বোদয়' ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান।

২. 'সর্বোদয়' ধারণাটির সামাজিক তাৎপর্য নির্ণয়।

সর্বোদয় ধারণা ঃ - 'সর্বোদয়' হল একটি সংস্কৃত শব্দ। এই 'সর্বোদয়' শব্দটি 'সর্ব' এবং 'উদয়' - এই শব্দদুটি নিয়ে গঠিত। 'সর্ব' শব্দের অর্থ 'সকল' বা 'প্রত্যেকের' এবং 'উদয়' শব্দটির অর্থ হল 'উন্নয়ণ' বা 'উন্নতি' বা 'কল্যাণ'। সুতরাং 'সর্বোদয়' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'সকলের উন্নতি' বা 'সকলের কল্যাণ সাধন' বা 'সকলের হিতসাধন'।

মানব প্রেমের পূজারী, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা গান্ধী মনে করেন মানব সত্তা হল এক। তিনি মানুষে মানুষে কোন ভেদ স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করেছেন একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে। দারিদ্রতা দূরীকরণ, মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ, শিক্ষার উন্নয়ণ, অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ণ প্রভৃতি মহতী কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সত্য এবং অহিংস নীতির একজন সাধক। এই সত্য এক অহিংস নীতির উপর ভিত্তি করেই তিনি মানুষের কল্যাণ সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন তখনই সম্ভব যখন সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ঘটবে। অর্থাৎ তিনি বিম।বাস করতেন, প্রথমে সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ বা হিত সাধিত হলে তবেই মানব জাতির কল্যাণ সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধী মানব সমাজের উন্নতি বা কল্যাণ সাধনের ধারণাটি পেয়েছিলেন জন রাস্কিনের লেখা 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। ইংরেজ লেখক জন রাস্কিন খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' এর (সেন্ট ম্যাথুজ, অধ্যায় ২০) একটি ছোট নীতিধর্মমূলক গল্পকে অবলম্বন করে 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাইবেল - এ বর্ণিত নীতিধর্মমূলক ছোট গল্পটি হল —

"জনৈক ব্যক্তি প্রত্যুষে কয়েকজন শ্রমিককে 'একপেনি মজুরি
চুক্তিতে' তার আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করার জন্য নিডুক্ত করেন।
পরে দ্বিপ্রহরে , অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যাকালে আরও কিছু শ্রমিককে
ঐ একই চুক্তিতে নিয়োগ করেন। রাত্রিকালে ঐ ব্যক্তি
তাঁর কর্মচারীর মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিককে এক পেনি করে
মজুরি দেন। মজুরীর এই প্রকার সব বন্টন ব্যবস্থায় কিছু
শ্রমিক, বিশেষত প্রত্যুষের ও মধ্যাহ্নে নিযুক্ত কিছু শ্রমিক
অসন্তোষ প্রকাশ করায় ক্ষেতের মালিক বলেন - " চুক্তি
অনুসারে প্রথম নিযুক্ত শ্রমিককে যেমন তাঁর প্রাপ্য দিয়েছি,
সর্বশেষ নিযুক্ত শ্রমিককেও সেই একই প্রাপ্য দিয়েছি -
ন্যায়নীতি কোন ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়নি।"

বাইবেল - এ বর্ণিত উক্ত নীতিধর্ম মূলক ছোট গল্পকে অনুসরণ করে রাস্কিন 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রাস্কিন রচিত উক্ত গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল - প্রত্যেকের কাছ থেকে ততটুকুই (শ্রম) গ্রহণ করা যায় যতটা সে দিতে সমর্থ এবং প্রত্যেককে ততটুকুই (সামগ্রী) দিতে হয় যতটা তার প্রয়োজন এবং এটিই হল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাম্যের নীতি।

জন রাস্কিন রচিত 'Unto This Last' বা 'সর্বশেষ আগত ব্যক্তি' নামক গ্রন্থটি পাঠ করে গান্ধীজি খুবই অভিভূত হন এবং তিনি বলেন - That book marked a turning point in my life. উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত নীতি এবং আদর্শকে দেশবাসীর কাছে প্রচারের জন্য গুজরাটি ভাষায় গান্ধীজি গ্রন্থটিকে অনুবাদ করেন এবং তিনি গ্রন্থটির নাম দেন 'সর্বোদয়' - যার অর্থ হল 'সকলের উন্নয়ণ' বা 'সকলের কল্যাণ' বা 'সকলের

হিতসাধন'।

অহিংসা মন্ত্রের জন্মভূমি হল ভারতবর্ষ। তাই গান্ধীজি মানব জাতির কল্যাণ সাধনে সত্য এবং অহিংসা নীতির উপর ভিত্তি করেই 'সর্বোদয়' আদর্শ গড়ে তুলেছেন। গান্ধীজি সর্বোদয় আদর্শকে সমাজ সংস্কারের মূল নীতি রূপে গ্রহণ করেছেন। সর্বোদয় আদর্শ অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা এমন হবে যেখানে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হবে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক চাহিদা সকল মানুষেরই সমান। এমন নয় যে, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, ধনবান ব্যক্তির ক্ষুধা তৃষ্ণা বেশি এবং দুর্বল, নির্বোধ ব্যক্তির ক্ষুধা তৃষ্ণা কম। গান্ধীজির মতে, আদর্শ কল্যাণ জনক সমাজ ব্যবস্থা এমন হবে যেখানে স্পৃশ্য - অস্পৃশ্য, ইতর - ভদ্র, ধনী - নির্ধন, জ্ঞানী - অজ্ঞানী প্রত্যেকটি সমান দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে। এই রূপ সমাজ ব্যবস্থাকে গান্ধীজি 'রামরাজ্য' বলে উলে-খ করেছেন। যদিও রামরাজ্য বলতে কোন ধর্মীয় রাজ্যকে বোঝাননি।

সর্বোদয় সমাজ প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন - সমগ্র জগৎ যেহেতু একই আত্মার বহিঃপ্রকাশ, তাই মানুষে মানুষে প্রকৃত কোন বৈষম্য নেই। সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে সমাজ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতের মুনি -ঋষিরাও বলেছেন — 'সর্বে সুখিনঃ সন্ত'। অর্থাৎ 'সবাই সুখী হোক'। এইরূপ অহিংস সমাজ ব্যবস্থাকেই গান্ধীজি বলেছেন সর্বোদয় সমাজ। সকল মানুষকে সাম্যদৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের প্রতেকের হিতসাধন বা কল্যাণ সাধনই হল গান্ধীজি সম্মত সর্বোদয়ের সারকথা।

গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয় সমাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিতবাদী মতবাদ স্বীকার করেন। হিতবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী সমাজের এবং সমাজস্থ মানুষের পরমকাম্য বা নীতি হল - "সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ (হিত) লাভ।" অর্থাৎ কোন একটি কর্ম বা নীতি যদি সমাজের সর্বাধিক লোকের সুখলাভের সহায়ক হয়, তবে সেই কর্ম বা নীতি-ই মানুষের পরমকাম্য। এই অভিমত অনুসারে, কোন কর্ম বা কর্মনীতি দ্বারা "সর্বাধিক বা সর্বোচ্চ বেশি সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধনে অল্প সংখ্যক মানুষের অহিত হয়, তা হলেও সেই কর্ম বা কর্মনীতি সমাজকল্যাণসাধক রূপে গৃহীত হয়। জেরোমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ হলেন এই মতবাদের প্রবক্তা। কিন্তু গান্ধীজি সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থায় হিতবাদীদের "সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধন" — এই নীতিকে গ্রহণ করেননি। গান্ধীজির মতে সর্বোদয় আদর্শ হল — "সকল মানুষের সমান হিতসাধন, সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধন নয়।" ভগবদগীতার ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে এবং সাম্যদৃষ্টি গ্রহণ করে গান্ধীজি বলেছেন — যে কল্যাণ মূলক কর্ম বা কর্মনীতিতে সমাজের একজন ব্যক্তিরও অহিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সমাজ কল্যাণমূলক নয়। গীতোক্ত কর্মযোগী যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্ম করেন এবং কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন, তেমনি সর্বোদয় সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্মসাধন করবেন এবং কর্মফল নিজে ভোগ না করে সমাজকে উৎসর্গ করবেন। একেই গান্ধীজি বলেছেন 'অনাসক্তিযোগ'।

গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনী " My Experiments with the Truth" - এ ১৯০৪ সালে 'সর্বোদয়' - এর তিনটি আদর্শের কথা বলেছেন্ যথা -

১. সকলের মঙ্গলের মধ্যেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত।

২. বৌদ্ধিক শ্রম এবং কায়িক শ্রমের মূল্য সমান। একজন নাপিতের কাজের সঙ্গে একজন আইনজীবির কাজের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

৩. শ্রম ভিত্তিক ঝীবনই আদর্শ জীবন। অর্থাৎ, চাষি বা হস্তশিল্পীর জীবনই কাঙ্খিত জীবন।

স্বাধীনতা লাভের পর গান্ধীজি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন অহিংস সমাজ অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮ দশ কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

গান্ধীজির 'সর্বোদয়' আদর্শের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অভিমত পরিস্ফূট হয়েছে। াতান রাজনীতিতে বিচার করেছেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর মতে রাজনীতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট না হলে তা বাস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। গান্ধীজির মতে, সার্বিক সমাজ কল্যাণ সম্ভব করতে হলে অসংযত ভোগতৃষ্ণাকে সংযত করতে হবে এবং তার জন্য অন্তরশুদ্ধি, সেবা ও ভালবাসা প্রয়োজন। উলে-খ্য, গান্ধীজি এইরূপ মত পোষণ করলেও মানুষকে তিনি বিষয়ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলেননি। তিনি বলেছেন মানুষ কর্মফল ভোগী হবে না, হবে কর্মযোগী। মহাত্মা গান্ধী 'রাজনীতি' শব্দটির পরিবর্তে 'লোকনীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা লোকনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে, রাজনীতির দ্বারা নয়। রাজনীতির মাধ্যমে রাজার অথবা শাসক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নীতি প্রতিফলিত হয়। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শক্তি, স্বার্থ, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, দমন পীড়ন ইত্যাদি। কিন্তু লোকনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অহিংস পথে সমাজ সেবা। লোকনীতিতে সমাজের শাসনভার ন্যস্ত থাকবে অহিংসা ব্রতী সত্যাগ্রহী সমাজ সেবকের উপর, যেখানে কোন দলীয় স্বার্থ থাকবে না, সমগ্র সমাজের স্বার্থ চিন্তা করে কর্ম পরিকল্পনা সম্পাদন করা হয়।

গান্ধীজির মতে, সমাজের কল্যাণসাধন করতে হলে প্রথমে গ্রাম কেন্দ্রিক সমাজের উন্নয়ণ ঘটাতে হবে। কারণ ভারতবর্ষ হল মূলত কৃষি নির্ভর গ্রাম প্রধান দেশ। কাজেই গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত না হলে মানুষকে গ্রাম্য জীবনের অভিমূখী করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন গ্রামের দারিদ্রতা, অজ্ঞতা ও অচিকিৎসা দূরীকরণ। প্রত্যেকটি গ্রাম শিক্ষায়, শাসনে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। গ্রাম সমাজের উন্নতি ঘটাতে হলে ভারতবাসীর প্রয়োজন সর্বোদয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমদান, ভূ-দান, সম্পত্তি দান ও গ্রাম দান। প্রত্যেকটি গ্রামসেবককে গ্রাম সমাজের জন্য শ্রমদান করতে হবে, ভূমিহীনকে ভূমিদান করতে হবে এবং বৃত্তবানকে তার উপার্জনের ছয় ভাগের একভাগ গ্রাম সমাজের উন্নতির জন্য দান করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামের স্থায়ত্বশাসনের অধিকার থাকবে, গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ সমাজের পরিচালন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এমনকি প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের অধিকার পঞ্চায়েত অথবা পৌরসভার থাকবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ - সর্বোদয়ের এই আদর্শ অনুসরণ করে সত্যাগ্রহীকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত হতে হবে, তবেই প্রতিষ্ঠা পাবে গান্ধীজি সম্মত 'সর্বোদয় সমাজ' বা রামরাজ্য। গান্ধীজির সর্বোদয় আদর্শ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিরোধী। ভারতের সর্বোদয় আদর্শে গঠিত গ্রামীণ জীবন মানুষকে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

সমালোচনা ঃ —

গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ তত্ত্ব বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যথা —

১. গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি হল - সর্বোদয় আদর্শ হল এক অধরা কবি কল্পনা মাত্র যাকে সমাজে কোনদিনই হয়তো বা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া গান্ধীজি নিজেও এমন কোন পথ নির্দেশ করতে পারেননি যাতে সর্বোদয় সহজপ্রাপ্য হতে পারে। গান্ধীজির 'সর্বোদয় সমাজ'কে তাই অনেকেই 'ইউটোপীয়' বা 'কাল্পনিক সমাজবাদ' বলে বক্রোক্তি করেছেন।

২. গান্ধীজি তাঁর 'লোকনীতি'র তত্ত্বে দলহীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উলে-খ করেছেন। কিন্তু, বর্তমান যুগে তা গ্রহণ যোগ্য নয়। বর্তমানের দূষিত রাজনীতির পরিবেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থাদি বেশি কাম্য। বর্তমানে কলুষিত সমাজে, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের ব্যক্তিবর্গ ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, ভোটের মাধ্যমে, সেই দলকে অপসারিত করে অন্য কোন দলকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার অবকাশ থাকে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় যা সম্ভব হয় না।

৩. সর্বোদয়ের আদর্শ আঞ্চলিকতাকে কল্পনায় রঙিন করে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বোদয় তত্ত্বে পঞ্চায়েত - এর মতে আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত বড়ো করে দেখানো হয়েছে। এই তত্ত্বে পঞ্চায়েত বা ওই ধরণের সংস্থা যেন সকল কলুষতা থেকে মুক্ত এক স্বর্গীয় ব্যাপার। মনে করা হয়েছে ক্ষমতা এদের কলুষিত করে না। কিন্তু তা বাস্তবে সত্য নয়। এই ধরণের সংস্থাগুলিও বিভিন্ন ধরণের দূর্নীতি থাকে।

৪. অনেকের মতে, সর্বোদয়ের ধারণা প্রগতিবিরোধী। বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধীতা করা এবং সীমিত চাহিদার অর্থনীতির কথা বলা মানেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের নতুন নতুন বিজয়কে অস্বীকার করা। যন্ত্র প্রযুক্তি উন্নতির সহায়ক। যন্ত্রের ব্যবহারের যে কুফল, তার জন্য দায়ী স্বয়ং সমাজ। কাজেই কীভাবে যন্ত্রের সদব্যবহার হতে পারে তা না দেখে যন্ত্রকে পরিত্যজ্য বলে বিবেচনা করার অর্থ হল প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এটা প্রগতির পরিপন্থী।

৫. বৈষম্যমূলক এবং অনুন্নত সমাজে সর্বোদয়ের আদর্শ প্রকারান্তরে বৈষম্য বাড়াতেই সাহায্য করে, কেননা এর ফলে ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা তাদের নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার সুযোগ পায়। গান্ধীজি বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেননি।

৬. অনেকের মতে, সর্বোদয়ের আদর্শ ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং সময়ের ধর্মকে কোন মূল্য দেয় না। এই কারণেই আধুনিক যুগে এই সর্বোদয় আদর্শ অপ্রাসঙ্গিক।

৭. গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয় সমাজে সকল মানুষকে সমান বলে উলে-খ করেছেন। কিন্তু এমন ভাবনা মনুষ্যত্বের পক্ষে মর্যাদাকর হলেও একটি সমাজে নানা শ্রেণীর বা বর্গের মানুষ বসবাস করে। কাজেই শ্রেণীভেদ সব সমাজেই বর্তমান। গান্ধীজি এক্ষেত্রে শ্রেণী সমন্বয়, শ্রেণী সংহতি বা শ্রেণী সমঝোতার কথা বলেছেন। কিন্তু মার্কসবাদ অনুযায়ী সব সমাজেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। সুতরাং শ্রেণী সংঘাত অনিবার্য। এক্ষেত্রে গান্ধীজি পৃথিবীর ইতিহাস যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস তা উপেক্ষা করেছেন।

৮. গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি হল সত্য, অহিংসা ও প্রেম। কিন্তু সমাজস্থ মানুষের

মধ্যে যখন শাসক - শাসিতের সম্পর্ক তখন সেখানে অহিংসার স্থান কোথায়? অন্তত আধুনিক পৃথিবীতে তেমন সাধ্য নেই।

উপসংহার ঃ —

গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হলেও সর্বোদয় সমাজকে একেবারে গুরুত্বহীন বা অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। তাই মানুষ মাত্রই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম নিজেকে এবং অপরাপর ব্যক্তিকে নিজ জীবনকে এবং অপরাপর ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে। এর ফলে কোন মানুষ পরিণত হলে সেই সমাজের অপরাপর মানুষও পরিণত ও উন্নত হয় এবং বিপরীত ক্রমে, কোন মানুষের অধঃপতন বা অধোগমন হলে সমাজের অপরাপর মানুষেরও অধোগমন হয়। তাই গান্ধীজি বলেছেন, কোন মানুষ যদি অপরকে পদানত করে, অপমানিত করে তাহলে সেই সঙ্গে সে নিজেকে পদানত ও অপমানিত করে, কেননা সর্ব মানুষ আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

" যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তাছাড়া, গান্ধীজি যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না - তা পুরোপুরি অসত্য নয়। কেননা, সর্বদলীয় সমর্থন না পাওয়ার জন্য সমাজকল্যাণমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না অথবা পরিকল্পনাকে সত্বর কার্যকর করা যায় না। বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোন দল তার পূর্বসুরীর পরিকল্পনাকে হয় বাতিল করে অথবা দলীয় স্বার্থ অনুসারে পরিবর্তিত করে, যার ফলে কোন ক্ষেত্রেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই এই সকল ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজির 'সর্বোদয় সমাজ' ভাবনা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র ঃ -

১. ভট্টাচার্য, সুজিত কুমার (২০১১), মহাত্মা গান্ধী, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক।

২. ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র (২০১৩), সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন, কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিখিলেশ (২০০৫), বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, শ্রী বলরাম প্রকাশনী।

৪. নন্দী, নবকুমার (২০১২), সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের ভূমিকা, কলকাতা, নবভারতী প্রকাশনী।

৫. Joshi, Sunita (2006), Great Indian Educational Thinkers, Delhi, Authors Press.

ভগিনী সুধীরা ঃ রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের একটি অন্যতম চরিত্র

- দোয়েল দে

রিসার্চ স্কলার ইতিহাস বিভাগ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের অন্যতম এক অক্লান্ত কর্মী হলেন ভগিনী সুধীরা। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান ভগিনী সুধীরাকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আত্মোৎসর্গের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। মাত্র তেত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত তাঁর জীবন কর্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সমৃদ্ধ। স্বামী সারদানন্দের বলিষ্ঠ ভাষায় — 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ আজীবন ব্রতধারিনী সুধীরার বয়ঃক্রম ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল কিন্তু অদ্ভুত কর্মকুশলতা ও অচল অটল ধৈর্য্যসম্পদের অধিকারিনী হইয়া তিনি ঐ স্বল্পকালে যে কার্যসকল করিয়া গিয়াছেন, অশীতিপর বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবনেও তাহা সম্ভবপর নহে।" (১) বস্তুতঃ ভগিনী সুধীরা দেশ ও দশের নারী জাতির উন্নতিকল্পে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়াছিলেন - হয়ে উঠেছিলেন বহু মানুষের প্রেরণাদাত্রী।

ভগিনী সুধীরার জন্ম এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন সমাজের নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, লাঞ্ছনা - গঞ্জনা মেয়েদের চেতনাহীন জড়পদার্থে পরিণত করেছিল। মেয়েদের এই দুর্দশা স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। আসলে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাই নারী জাতির উন্নতিকল্পে স্বামীজি স্ত্রীমঠ স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। তবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে সময় লেগেছিল তাঁর মহাপ্রয়াণের পরও প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে সারদাদেবীর জন্মশতবর্ষে গঙ্গার পূর্বতটে "শ্রী সারদা মঠ" প্রতিষ্ঠিত হল। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, সারদামঠ প্রতিষ্ঠার বহু আগেই ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর এই মঠের বীজটি বপন করেছিলেন স্বয়ং সারদাদেবী - নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে। কিন্তু ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, সামাজিক প্রতিকূলতায় ঐ বীজটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে মহীরূহে পরিণত হতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। আর নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সাথে শ্রী সারদা মঠের যোগসূত্রটি ধরে রাখতে সেই যুগে ভগিনী সুধীরার অবদান প্রকৃত অর্থেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির আজন্মলালিত নারী মঠের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য নিবেদিতার প্রয়াসটি যে আত্মত্যাগের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল সেই পরিবেশেই সুধীরা তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করে ঐ ধারাটিকেই সযত্নে অব্যাহত রেখেছিল।

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে হুগলী জেলার হরিপালের আশুতোষ বসু ও এলোকেশী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যারূপে ১৮৮৯ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর কলকাতা মহানগরীতে সুধীরা জন্মগ্রহণ করেন। সুধীরার বড়দাদা ছিলেন স্বনামধন্য বিপ-বী দেবব্রত বসু, যিনি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণান্দোলনে যুক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হন। শৈশবেই পিতৃহারা সুধীরার জীবনে এই বড় দাদার প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। দাদার অনুপ্রেরণাতেই সুধীরার মনে গতানুগতিক জীবনের পরিবর্তে এক স্বাতন্ত্র্য জীবন যাপনের ইচ্ছা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। বিশেষতঃ ১৯০৩ সালে পনেরো বছর বয়সে মাকে

হারানোর পর তাঁর সংসারের প্রতি চরম ঔদাসীন্য এবং ঈশ্বরের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ দিন দিন বাড়তেই থাকল। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার পরিবর্তে সন্ন্যাসিনীর অবাধ মুক্ত জীবন ছিল তাঁর কাছে পরম কাঙ্খিত। এমতাবস্থায় আর পাঁচজন মেয়ের মতো ঘর সংসার নিয়ে জীবন কাটানো সুধীরার পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। এই তেজস্বিনী কন্যার জন্ম যে কোন মতেই সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্য হয়নি। একথা দাদা দেবব্রতও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেবব্রত বোনের জীবনের সুরকে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন উচ্চতর আদর্শে। আর সে কারণেই ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর এই বোনটিকে। নিয়ে এলেন ভারতের নারী শিক্ষার অন্যতম সূতিকাগৃহ ভগিনী নিবেদিতার স্বপ্নের বিদ্যালয়ে।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে সুধীরার প্রথম আগমন ১৯০৬ খ্রীঃ। সরলাবালা সরকারের কথায় "সুধীরা যখন প্রথম নিবেদিতা শিক্ষালয়ে আসেন তখন নিবেদিতা ছিলেন না। সুধীরা আসা মাত্র ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে নিলেন। সুধীরা পেলেন স্নেহের অতলস্পর্শী গভীরতা, আর ক্রিস্টিন পেলেন যেন তাঁর নিজের ছোট বোনকে"। (২) প্রথম প্রথম সুধীরা বিদ্যালয়ের গাড়ীতেই যাতায়াত করতেন এবং প্রতিষ্ঠানের পুরস্ত্রী বিভাগে নিয়মিত বাংলা সাহিত্য পড়াতেন। এছাড়া সপ্তাহে দুদিন ছাত্রীদের বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক পড়ে শোনাতেন এবং তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশ ও দশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই সুধীরা পড়ানোর বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। বরং ভগিনী নিবেদিতা এবং ভগিনী ক্রিস্টিনের জীবনাদর্শ সুধীরাকে আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমেই জীবনের গভীর তাৎপর্য যেন তাঁর সামনে প্রকাশিত হতে লাগল, ফলে অনিবার্য ভাবেই নিবেদিতা ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর সুধীরাকে পেলেন এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মোৎসর্গীকৃত সহযোগী হিসাবে। খুব সহজেই সুধীরা নিবেদিতারও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন এবং নিবেদিতার স্কুলের সাথে চিরতরে বাঁধা পড়লেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, সুধীরার স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং কড়া মেজাজের ফলে প্রথম প্রথম দৃঢ়চেতা নিবেদিতার সাথে মানিয়ে কাজ করতে একটু অসুবিধাই হত। প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলিও নিবেদিতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি সবসময় নজর রাখতেন যাতে ছাত্রীরা সামান্যতম জিনিসও অপচয় না করে। প্রথম প্রথম সুধীরা সহজাত বৈরাগ্যবশতঃ এই কড়াকড়িকে নিছকই নীচতা বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে ক্রিষ্টিনকে তিনি বলেছিলেন — "আমরা তো সন্ন্যাসিনী, এত ছোট ছোট বিষয়ে আসক্তি থাকা কি ভাল ?"(৩) ক্রিষ্টিনের কাছ থেকে একথা শুনে নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন, "এ রকম মনোভাবের কখনও প্রশ্রয় দিবে না, সুধীরা, কখনও এরূপ কথা বলিবে না।"(৪) বস্তুতঃ নিবেদিতার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণেই প্রথম প্রথম সুধীরার সঙ্গে তাঁর একটা মানসিক দূরত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমশই সুধীরা বুঝতে পারেন যে, নিবেদিতার আপাত কাঠিন্যের অন্তরালে ছিল সুগভীর ভালবাসা। যা বোঝা যায় ধীরে ধীরে তাঁর সংস্পর্শে এসে। সুধীরার নিজের কথায়, "সিস্টারের স্বভাবটি যেন অতি মিষ্টি ঝুনো নারকেলের মতো। ওর কাছে কিছুদন না থাকলে ওর ভিতরটা যে কত মিষ্টি তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ওপরের কাঠিন্য দেখে ভয় পেয়ে যেতে হয়।"(৫) তাছাড়া স্কুলের বাইরে নিবেদিতা কাজের পরিধি এতটাই ব্যাপক ছিল যে স্কুলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নিবেদিতাকে ক্রিষ্টিন ও সুধীরার উপর নির্ভর করতে হত। সুধীরাও নিবেদিতা আর ক্রিষ্টিনের সাহচর্যে আড়ষ্টতা

কাটিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছিলেন।

নিবেদিতা ১৯০৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বম্বে হয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। এড়েনে পৌঁছে ক্রিষ্টিনের চিঠি থেকে তিনি জানতে পারেন যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুধীরা ইত্যাদিরা নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। নিবেদিতা বিদেশে বসেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বস্তুতঃ, সুধীরার চরিত্রে উন্নত মানসিকতা, বাস্তবতাবোধ, কর্মতৎপরতা, স্নেহপরায়ণতা প্রমুখ গুণের অসাধারণ সমন্বয় তাঁকে ছাত্রীমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অভূতপূর্ব। ছাত্রীরা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং তাঁর আদেশ পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। বিশেষতঃ বয়স্কা ছাত্রীগণ তাঁর নেতৃত্ব আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিল। তারা সুধীরার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট ছিল যে, তাঁর আদেশে তারা যে কোন অসাধ্য সাধন করতেই প্রস্তুত ছিল। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, "সুধীরাদি যেন জাদু জানতেন। যে একবার ওর সংস্পর্শে এসেছে, সেই তাঁকে ভাল না বেসে পারেনি। তাঁর ভালবাসার আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত। আমাদের মনে হত, তাঁর কথায় আমরা বাঘের মুখে যেতে পারতুম। তাঁর ত্যাগের আদর্শ, ভালবাসা, উৎসাহ ও দরদ আমাদের জীবন পাল্টে দিল"।(৬) এক কথায় তিনি ছিলেন মেয়েদের সুখ দুঃখের সমান অংশীদার। তাই তিনি নিবেদিতার স্কুলে যোগদানের পর থেকে স্কুলের সমস্ত কাজে সর্বস্ব পণ করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, বিদ্যালয়ের পরস্ত্রী বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা কুড়ি থেকে বেড়ে ষাট হয়েছে। বিদ্যালয়ের এই উন্নতির পেছনে সুধীরার অবদান অনস্বীকার্য।

নিবেদিতা স্কুলে যাতায়াত করতে করতেই সুধীরা একদিন সারদাদেবীর সাহচর্যে আসেন। সেই সময়টি ছিল সুধীরার জীবনের এক দুর্বিসহ সময় যখন সুধীরার পিতৃসম অগ্রজ বিপ-বী দেবব্রত বসু ১৯০৯ সালে গৃহত্যাগী হয়ে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন এবং একই সময় সুধীরার প্রাণের প্রিয় পিসতুতো বোনটিরও মৃত্যু হয়। সেই সময়, সুধীরার কথায়, "একদিন মেম বলিলেন, সুধীরা মাতাদেবী এসেছেন, দেখিতে যাইবে ? আমি জানিতাম না যে মাতাদেবী কে, তবুও তিন-চারটি মেয়ে লইয়া মেমের সহিত সেই দিনই মাকে প্রথম দেখি। ..... সেইখানেই জানিলাম যে উনি পরমহংসদেবের স্ত্রী।"(৭) প্রথম দর্শনেই সারদা দেবী সুধীরার কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন এবং সুধীরাও সারদা দেবীর কাছে নিয়মিত রূপে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। সারদা দেবীকে সুধীরা যে কি চোখে দেখতেন তা সুধীরার লেখা চিঠি থেকেই বোঝা যায়, "মা যে কি তাহার আর কি জানাইব।"(৮) তিনি আরো লিখেছিলেন, "আমরা কি ভাগ্যবতী যে ..... আমরা তাঁহার চরণে বা কোলে স্থান পাইয়াছি। তাঁহার মেয়ে নামে অভিহিত হইতেছি .....। (৯) সারদাদেবীও আন্তরিক স্নেহে এই তেজস্বিনী, অশেষ গুণের অধিকারীনী, সংসার বিমুখ মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন।

১৯১০ সালের শেষাশেষি নিবেদিতা অসুস্থ সারা বুলকে দেখতে আমেরিকায় যান এবং ১৯১১ সালে কলকাতায় ফেরেন। এরপর কর্মক্লান্ত ক্রিষ্টিন কিছুদিনের জন্য, মায়াবতী চলে যান। ফলে সুধীরার দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বিভিন্ন সময়ে সুধীরার সাথে নিবেদিতার মতানৈক্য হওয়ায় সুধীরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিবেদিতা পূজার ছুটিতে দার্জিলিং - এ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় যেতে মনস্থ করেন। শ্রীলক্ষ্মী সিংহের কথায়, "দার্জিলিং যাইবার প্রাক্কালে সুধীরার বাড়ীতে আসিয়া ভগিনী তাঁহার হাত ধরিয়া বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। হিমালয়ের শৈলক্রোড় হইতে নিবেদিতা আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না। মর্মাহতা সুধীরা দ্বিগুণ উৎসাহের

সহিত নিবেদিতার সাধনার ধন বিদ্যালয়ের কার্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন।"(১০) ভগিনী ক্রিষ্টিনও ফিরে এসে শক্ত হাতে বিদ্যালয়ের হাল ধরেন। ক্রিষ্টিন ও সুধীরার যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড আগের মতই সুশৃঙ্খলভাবে, সুসংহত ভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

সুধীরা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের হাতের কাজ, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। নিবেদিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছাত্রীদের তিনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক স্থানে ভ্রমণ করাতে নিয়ে যেতেন। বস্তুতঃ তিনি বাইরের কঠিন কঠোর বাস্তবের সাথে ছাত্রীদের পরিচিত করে তাদের জীবনের পথে স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন। সুধীরার অনুপ্রেরণাতেই তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষকতা করার একটা প্রবণতা দেখা দিতে লাগল - রক্ষণশীল পারিবারিক ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হতে শুরু করল। প্রসঙ্গতঃ স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণীতে (১৯০৫ - ১৯১২) লিখেছিলেন ঃ "The work made steady progress ever since the day of its opening and a school for real purdah - nashin ladies become thus a fail accompli. The amount of work done by this little institutions in silence and without the least show during the past eight years goes beyond all expectation. Many a poor widow was helped to earn her livelihood by knitting and sewing and by becoming a teacher either in the school itself or elsewhere. A few have become school mistress of exceptional ability earning Rs. 40 to Rs. 50 per month. Others become so filled with enthusiasm by the noble example of sacrifice offered by the Sisters that they devoted their lives entirely to the work ! - And in this connection we cannot help mention the name of Srimati Sudhira recognizing her invaluable services to the work." (১১)

সুধীরার উদ্যোগে ১৯১২ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সহায়তায় কলকাতার হাতিবাগন ও গঙ্গার তীরের বালিতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দুটি শাখা খোলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখিকা সরলাবালা সরকার লিখেছেন ঃ "এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সুধীরা দেবীর অনেক আশা ও অনেক কল্পনা ছিল। তিনি আশা করতেন, দেশের প্রতি গ্রামে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শাখা বিস্তৃত হইবে। এই বিদ্যালয়ের বঙ্গরমনীরা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবে, কর্মনিপুণতা শিখিবে শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা শিখিবে। রোগীর শুশ্রূষা শিখিবে এবং সর্বোপরি নিঃস্বার্থ ভালবাসার আনন্দময় পথে চলিবার শিক্ষালাভ করিবে। এই বিদ্যালয়ে সকলের সাহায্য গৃহীত হইবে এবং ইহা সকলকেই সাহায্য দান করিবে। সংসার তাপপীড়িতরা এখানে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করিয়া মনের শক্তি ও আনন্দ সঞ্চয় করিয়া লইবেন। শুশ্রূষার অভাবগ্রস্তা এখানে শুশ্রূষা পাইবেন। এই বিদ্যালয় সমস্ত বঙ্গরমনীরা মিলনক্ষেত্র হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল কল্পনা কার্যে পরিণত করা আমাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়, যদি আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সেইরূপ পরিণতি প্রার্থনা করি।"(১২) এই সময় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্রিষ্টিনের স্বাস্থ্য ভগ্ন হলে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্য এবং গুরুতর পারিবারিক কারণে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ক্রিষ্টিন আমেরিকা যাত্রা করে। কিন্তু এরপরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ক্রিষ্টিনের পক্ষে যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত ভারতে ফিরে

আসা অসম্ভব ছিল। যুদ্ধ থামার পরেও ক্রিষ্টিনের পাসপোর্ট পাওয়া সহজ ছিল না, ফলে তাঁর পক্ষে ১৯২৪ সালের আগে ভারতে আসা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ক্রিষ্টিন বুঝেছিলেন যে, তিনি কাগজে কলমে প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়ে থাকলে তাঁর এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সুধীরার পক্ষে স্কুলের কাজ চালিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক হবে। তাই তিনি বিদেশ থেকে সুধীরাকে একটি পত্র লেখেন। তার কিছু অংশ - " I want you to consider yourself the permanent head of school with full and independent authority, ... Do not feel that you are bound in any way to carry out my ideas. This is your work and you are free. I mean every word of spiritual power who will combine best and noblest of the east and west without the faults of either ... with a few such women we can safely leave the future. Untill we have produced them neither you nor I can die .... you will find that you have sources of strength and power that you never dreamed of" (১৩)

বস্তুতঃ এই সময় থেকেই সুধীরার কঠিন কঠোর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ক্রিষ্টিন আমেরিকায় চলে যাবার সাথে সাথে তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, জনসংযোগের ক্ষমতা এবং সহজাত পরিচালন ক্ষমতার দ্বারা তিনি শক্ত হাতে বিদ্যালয়ের হাল ধরলেন। এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২০ সালে সুধীরার দেহত্যাগের মধ্য দিয়ে। এই ছয় বছরের ইতিহাস হল নিবেদিতা বিদ্যালয়ের এক গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৯৫ সালের বিদ্যালয়ের কার্য বিবরণীতে উলে-খ আছে, " The work .... was and is till being, carried on in the absence of her (sister christine) inspiring presence since April 1914 - and it reflects no little credit indeed, to her capacities as a teacher and an organiser that Miss Sudhira Bose and the other teachers who she entrusted with the charge could conduct it successfully all this time." (১৪) এই রিপোর্টে আরো বলা আছে, " The head of the establishment, also pays her own expenses of Rs. 10/- per month." (১৫)

একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি সুধীরার কিছু সুগভীর, সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক চিন্তা ভাবনা ছিল। সুধীরার মূল লক্ষ্য ছিল, এই বিদ্যালয় এবং এর শাখাগুলিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাবেশ ঘটিয়ে এক অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা দানের মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলে তাদের কর্মতৎপর করে তোলা ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগের প্রেরণা দিয়ে আদর্শ জীবন গড়ে তোলা। সুধীরার এই উদ্দেশ্য বহুলাংশেই সফল হয়েছিল কারণ এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভের পর কিছু ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে এবং কিছু ছাত্রী "সীবন বিদ্যা" দ্বারাও উপার্জনে সক্ষম হয়েছিল। এই সকল মেয়েদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিলেন ভগিনী সুধীরা। আর সুধীরার অন্যতম প্রেরণাশক্তি ছিলেন শ্রীমা সারদা দেবী। স্কুলের নানা কাজ, নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সুধীরা সারদাদেবীর কাছে নিয়মিত যেতেন। কখনও কখনও ছাত্রীদেরও নিয়ে যেতেন। সরলাবালা সরকারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় - "নিবেদিতা বিদ্যালয় যেন এক প্রেমের সংসার .....। মেয়েরা সুধীরাকে বোধহয় নিজের মা কি দিদিদের চেয়েও আপনজন মনে করে। সুধীরা মেয়েদের সুখ দুঃখে সমভাগিনী। মেয়েদের কত যে আদর, আবদার তাঁর কাছে তার সীমা পরিসীমা

নেই। তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে খেলা করছেন। তাদের সঙ্গে 'মায়ের বাড়ি' যাচ্ছেন, আর মা - এই বালিকাবাহিনীর পরিচালিকা হয়ে সুধীরা যখন তাঁর ঘরে এসে ঢুকত স্নেহে আর আনন্দে তার চোখের তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত।"(১৬) সারদাদেবী এই সংসার বিরাগী, তেজস্বিনী কন্যাটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সারদা দেবীর কথায়, "ঐ এক মেয়ে। বে করলে না, কেমন নিজের জোরের ওপর রয়েছে, গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে।"(১৭) তিনি আরো বলতেন, "যখন খরচ আর চলে না, বড়লোকের মেয়েদের গান বাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০/৫০ টাকা আনে। স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে সেলাই করা, জামা তৈরী করা। সে বছর তিনশ টাকা লাভ হয়েছিল। ঐ টাকায় ওরা হেথা সেথা যায় - পূজোর সময়।"(১৮) বস্তুতঃ সারদাদেবীর সান্নিধ্যটুকু ছিল সুধীরার শক্তির উৎস। সারদা দেবীর কাছ থেকে সুধীরা যেমন শক্তি ও উৎসাহ পেতেন তেমনই পেতেন ভালবাসা, যে ভালবাসায় তিনি পূর্ণ করে নিয়েছিলেন তাঁর জীবনের পাত্রটি।

স্বামীজির স্বপ্ন প্রথম থেকেই সুধীরাকে অনুপ্রাণিত করত, উদ্বুদ্ধ করত মেয়েদের জন্য মঠ স্থাপনে। তিনি লিখেছিলেন, "স্বামীজির মত যে শিক্ষার ভার সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উপর দেওয়া উচিত। তবে আমাদের সেই সনাতন ধর্ম আবার জাগিবে। এখন স্ত্রীলোকের ভার স্ত্রীলোকের হাতে আসা উচিত। আর এখন একটি স্ত্রীমহামন্ডলী গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষে শিক্ষা দেওয়া হইবে। .... এমন কয়েকটি সন্ন্যাসিনী চাই যাহারা এই কার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। জীবন না দিলে, সর্বস্ব সমর্পণ না করিলে কোন কার্য হইবে না।(১৯) নিবেদিতার জীবদ্দশায় ক্রিষ্টিন ও নিবেদিতার কাছে তিনি সাগ্রহে স্বামীজি পরিকল্পিত এই আশ্রমের প্রস্তাব উত্থাপন করলেও, সমসাময়িক পরিস্থিতি বিচার করে দুজনের কেউই এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। ফলে অন্তরের তীব্র ইচ্ছাকে সাময়িকভাবে সুধীরার নিবৃত্ত করেই রাখতে হয়েছিল। সুযোগ এসেছিল নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার সর্বতোভাবে গ্রহণ করার পর। নিদারুণ অর্থাভাব সত্ত্বেও সুধীরার উৎসাহেই ১৯১৩ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ ৩.৫" X ৬.৫" আকারের আট পাতার ছোট্ট একটি পুস্তিকা রিপোর্ট বার করেন, যাতে স্বামী সারদানন্দ আন্তরিকভাবে স্বামীজি পরিকল্পিত ত্যাগী সেবাব্রতী মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানান এবং ক্রিষ্টিনের আমেরিকা গমনের অব্যবহিত পরেই ভগিনী সুধীরা মাতৃমন্দির নাম দিয়ে তাঁর পরম কাঙ্খিত আশ্রম বিভাগটি খুলে দিলেন। আশ্রমের অন্তর্গত একটি ছাত্রী বিভাগও খোলা হল। এ ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ সুধীরাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে অনুপ্রানিত করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯১৪-১৫ সালের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় ৬৮/২ বি, রামকান্ত বোস স্ট্রীটের বাড়ীতে মাতৃমন্দির উদ্বোধন করা হল। পরবর্তীকালে স্থান সংকুলানের জন্য ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে আশ্রম মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় ৫০/১ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ওঠে আসে।

১৯১৮ সালের রিপোর্ট থেকে মাতৃমন্দিরের ত্রিমুখী উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারা যায় —

" (1) A home for Hindu girls consecrating their lives to the ideal of renunciation and service and to the cause of female education.

(2) A home for poor purdha women desiring to support themselves by their personal earnings by means of sewing, needle-

work , as also by private tution in Hindu families and to live the higher religious life.
(3) A home for girl students living at a distance but desiring to avail themselves of the opportunity of studying in the school." (২০)

এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করার জন্য সুধীরা এবং তার সহকর্মীগণ সূচীশিল্পের সাহায্যে এবং ভদ্র পরিবারে গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতেন। ঐ প্রসঙ্গে বলা যায়, "ভগিনী নিবেদিতার উইল অনুযায়ী তাঁর সংগৃহীত এবং ওলি বুল প্রদত্ত অর্থ ও নিবেদিতার স্বরচিত পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণের নামে ছিল এই শর্তে যে তা ভারতের নারীদের জাতীয়ভাবে শিক্ষাকার্যে ব্যয় হবে ভগিনী ক্রিষ্টিনের পরামর্শ অনুসারে। ঐ সময় থেকেই উক্ত অর্থ ও পুস্তক বিক্রয়ের আয় একত্রে চিরস্থায়ী ফান্ড রূপে গণ্য হয়ে আসছে এবং বিদ্যালয়ের পরিচালিকাগণ ঐ শর্ত অনুসারে কেবলমাত্র সুদ গ্রহণ করেন। ... এছাড়াও শ্রী অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী মৃণালিনী ঘোষের নামে "মৃণালিনী স্মৃতি ফান্ড"(২০০০ টাকা) এবং শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রদত্ত (২০০০ টাকা) কোম্পানীর কাগজও মাতৃমন্দিরের নামে ছিল।"(২১)

সুধীরা প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দিরই পরবর্তীকালে ভাবী সারদামঠের আবাসিক ত্যাগব্রতীদের বাসস্থান ছিল। সুধীরার এই প্রয়াসে শ্রীমা সারদাদেবী আন্তরিক প্রীতি লাভ করেন। তিনি মাতৃমন্দিরে এসে স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করেন। কিন্তু ভাড়া বাড়িতে স্থানের অপ্রাচুর্য দেখে বেদনার্তভাবে বলেছিলেন, "আমার মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের একটা বসবার জায়গা হলে ভাল হয়।" (২২) এ যেন বহুকাল আগের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য সারদাদেবীর পরম আকুতিরই পুনরাবৃত্তি। শেষপর্যন্ত সারদা দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ হল। ১৯২০ সালে বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবনের নির্মাণ শুরু হল। এই নতুন বাড়িতে সুধীরা প্রতিষ্ঠিত 'মাতৃমন্দির' যা সারদাদেবীর মৃত্যুর পর 'সারদামন্দির' নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল, ১৯২৩ সালে স্থানান্তরিত হয়, যদিও সেই সময় তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তবুও তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই যে কতখানি সুগভীর চিন্তাপ্রসূত, সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯১৮ সালে সুধীরার কর্মকান্ডের একটি অংশ অর্থাৎ নিবেদিতা বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত ও একটি শাখা রূপে পরিগণিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'। ১৯১৬-১৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র্য বিভাগগুলি নির্দিষ্ট নামে অভিহিত হয়, যথা - নিবেদিতা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী শিক্ষা বিভাগ ও মাতৃমন্দির। এই রিপোর্ট থেকেই জানা যায় যে, তখনও পর্যন্ত সাতশোরও বেশী বালিকা ও প্রায় তিনশো অন্তঃপুরচারিনী মহিলা ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রায় দুশো মহিলা সেলাই ইত্যাদি হাতের কাজ শিখে জীবিকা অর্জনে সমর্থ হন। আর এই যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল প্রেরণাশক্তি ছিলেন ভগিনী সুধীরা। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং অনুপ্রেরণাতে বাংলার বহু নারী যথার্থ শিক্ষা লাভ করে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ১৯১৭ সালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল -" It reflects no little credit indeed, to her capacities as a teacher and organizer that Miss Sudhira Bose and the other teachers whom she entrusted with the charge could conduct it successfully all

this time ."(২৩) এই পত্রিকায় আরো লেখা হয়েছিল - " The daily work of the school is being carried on by 13 of these 17 ladies under the direction of Miss Sudhira Bose." (২৪)

ভগিনী সুধীরার এই সুবিশাল কর্মকান্ড তাঁর আশা ও স্বপ্নানুসারে কলকাতা শহর ছেড়ে বাংলার অন্যান্য স্থানে এমনকি বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করল। প্রসঙ্গতঃ, "ভগিনী সুধীরার পরিচালনা কালেই ১৯১৭ সালে কাশীধামে লাক্ষা পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তার তত্ত্বাবধানের ভার মাতৃমন্দিরের পরিচালিকাগণের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আরেকটি শাখা সুধীরার উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সালের মধ্যে ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সহায়তায় কলকাতার হাতিবাগানে ও গঙ্গাতীরে বালিতে দুটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শীঘ্রই অর্থাভাবে বিদ্যালয় দুটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বালির বিদ্যালয়টি পুনরায় খোলা হয় এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সেটি চলে।"(২৫)

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়ে যে সুবিশাল কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন, সকলেরই আশা ছিল নিবেদিতার আকস্মিক মৃত্যু ও ক্রিষ্টিনের ইউরোপ চলে যাবার পর সুধীরার নেতৃত্বে তা প্রকাশিত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ বিপরীত এক ঘটনা ঘটল। সুধীরার যাবতীয় কর্মের মূল প্রেরণাদাত্রী শ্রীমা সারদাদেবী ১৯২০ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। সারদাদেবীর এই চলে যাওয়ায় সুধীরা অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে পড়ল। ঐ বছরই পূজাবকাশে কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে কাশী যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ২৩শে নভেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুতরভাবে আহত হন এবং তার পরদিন মাত্র ৩১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, "সুধীরার অকালমৃত্যুতে সমগ্রভাবে বিদ্যালয়ের কার্যের যে ক্ষতি হয়, তাহা অপূরণীয় এবং নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে স্বামীজির পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপ পরিগ্রহ বহু বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে।"(২৬)

তবে একথাও অনস্বীকার্য যেন সারদামন্ত্রে দীক্ষিত ভগিনী সুধীরার অকাল প্রয়াণে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলেও তা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পরে সারদাদেবীর জন্ম শতবর্ষে স্বামীজি পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ - 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে এক নবতম সংযোজন - স্বামীজির আজন্মলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এই সারদামঠের প্রথম অধ্যক্ষা হলেন সুধীরারই মানসকন্যা সরলা - পরিব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। ফলে নিবেদিতা - ক্রিষ্টিন - সুধীরার ধারাটি অব্যাহতই রইল, সুধীরা প্রতিষ্ঠিত সারদামন্দিরটি যেন এক সূতিকাগার আর সরলা হলেন নিবেদিতা - ক্রিষ্টিন - সুধীরার সাথে সারদামঠের যোগসূত্র।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ১৮২।
২) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "অনন্যা সুধীরা" - রামকৃষ্ণ সারদামিশন, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৪৩।
৩) সিংহ লক্ষ্মী, "ভগিনী সুধীরা", নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা,

কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৪
৪) তদেব
৫) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ১৮২।
৬) নির্ভয়প্রাণা প্রব্রাজিকা, (সম্পাদিত), "ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা", শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৪।
৭) তদেব, পৃঃ ১৮২
৮) তদেব
৯) তদেব
১০) সিংহ লক্ষ্মী, "ভগিনী সুধীরা", নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৪
১১) Sister Nivedita Girls School, Platinum Jubilee Souvenir, Kolkata, 1977, P. - 18
১২) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ১৮৮।
১৩) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "অনন্যা সুধীরা" - রামকৃষ্ণ সারদামিশন, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৫২।
১৪) তদেব পৃঃ ৫৩
১৫) তদেব পৃঃ ৫৩
১৬) তদেব পৃঃ ৬১
১৭) তদেব পৃঃ ৬১
১৮) শীল জহর, "ভগিনী সুধীরা ও শ্রীমা সারদাদেবী", উদ্বোধক পত্রিকা ৭৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা কলকাতা, পৃঃ ৬৬২।
১৯) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ১৮৪।
২০) Nivedita School, Golden Jubilee Souvenir, Kolkata, 1948, P. - 28
২১) অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ২২৭।
২২) তদেব, পৃঃ ১৮৮
২৩) "Prabuddha Bharata", February - March,Mayawati, 1917, P. - 54.
২৪) তদেব
২৫) মুক্তিপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "স্বামীজির পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের ধারাবাহিক ইতিহাস", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ২৭২।
২৬) মুক্তিপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী নিবেদিতা", তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃঃ ৪০৬ / অশেষপ্রাণা প্রব্রাজিকা, "ভগিনী সুধীরা - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী", নিবোধত, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৌষ সংখ্যা ১৯৯০-৯১, পৃঃ ১৯০।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি মুসলিম মানস ও মহসীন দান তহবিল (Mohsin Endowment Fund), ১৮৯৬ - ১৯১১

- মুহাম্মদ জিন্নাতুল-া শেখ
গবেষক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক মুজফফর আহমেদ মহাবিদ্যালয় মুর্শিদাবাদ

১৮৯৮ খ্রীঃ ৩০ শে ডিসেম্বর জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৮-১৯২৫) ভারতের বড়লাট হিসাবে এদেশের মাটিতে পা দিয়েই ঐ উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আরো শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর ব্রত পালনে উদ্যোগী হন। তাঁর অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নই তাঁকে সবচেয়ে বিখ্যাত করে তোলে। এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ মন্ত্রণাদাতা ও সহায়ক হয়ে ওঠেন বাংলার তৎকালীন ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ.এইচ. রিজলে। এদের সক্রিয় সহযোগিতায় কার্জন প্রথমে বাংলা থেকে বন্দরসহ চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু বিহার, ছোটনাগপুর ও ওড়িশা বাংলার মধ্যে রেখে দেন। ১৯০৩ এর ৩রা ডিসেম্বর রিজলে-র চিঠির মাধ্যমে যখন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সমগ্র বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে সনাতন নরমপন্থী উপায়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ইংরেজ পরিকল্পনা প্রথম জানাজানি হতেই হিন্দুদের মত সকল মুসলমানের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের প্রায় সকলেই পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁরাও অসময় পরিকল্পনাটিকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা জনসভা করে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখে এবং সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এমনকি পরবর্তীকালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের দৃঢ় সমর্থক ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রধান খাজা সলিমুল-াহ এ পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের সরকারি পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজকে এই ব্যাপারে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ যোগাতে বাধ্য করেছিল **'মহসীন দান তহবিল'** বা **Mohsin Endowment Fund**।

বিশেষ মুসলমান শিক্ষানীতির অংশ হিসাবে ১৩ই জুন, ১৮৭৩ - এ বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মহসীন ফান্ডের টাকা হুগলী কলেজ চালানোর কাজে না লাগিয়ে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও উৎসাহ দানের ব্যাপারে বয় করা হবে। মহসীন ফান্ড থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে তিনটি নতুন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহসীন ফান্ড বাবদ বার্ষিক ৯৩ হাজার টাকা মুসলমানদের জন্য ব্যয় করা

সম্ভব হয়েছিল এবং স্কুল ও কলেজে সর্বমোট ৪২টি বৃত্তি বরাদ্দ করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে মহসীন ফান্ড এর বৃত্তির দৌলতে বহু ছাত্র বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে পড়াশুনার সুযোগ লাভ করেছিল। বাংলাদেশের এমন অনেক স্কুল ছিল যেখানে ফারসি বিষয়ের শিক্ষকদের বেতন সম্পূর্ণভাবে মহসীন ফান্ড হতে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে মহসীন দান তহবিলের অর্থানুকূল্যে মুসলমানদের শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করেছিল। সরকারের তেমন কোন অবদান ছিল না। কেননা সরকার ২৯১৮ নং নির্দেশে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে কোন বিভাগেই সরকার বিশেষ কোন অর্থ বরাদ্দ করবে না। তাছাড়া উত্তর পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সেসব জায়গায় ইংরেজি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁরা তাঁদের জমিদারীতে স্কুল কলেজ স্থাপন না করে কলকাতা বা নিকটবর্তী অঞ্চলে স্কুল কলেজ স্থাপন করতেন। বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধেও একথা সত্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও পূর্ববঙ্গের মানুষের শিক্ষার প্রসারে সরকারি ভাবে উলে-খযোগ্য ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে তেমন ভূমিকা পালন করেনি। মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে দায়িত্ব পালন করে আসছিল। এই পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষার প্রসারে মহসীন দান তহবিল এবং কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল প্রধান ভরসা। এমতাবস্থায় বঙ্গ বিভাজন মুসলমানদেরকে চরম হতাশ, উদ্বিগ্ন ও প্রতিবাদীমুখর করে তোলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'হিতসাধনী সভা'র সভাপতি হিসাবে খাঁন বাহাদুর মৌলবী সিরাজুল ইসলামও সরকারকে লিখিতভাবে এক পত্রে চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ করেন। ভারত সরকারকে প্রেরিত টেলিগ্রামে বলা হয়, " Chittagong Division much alarmed at its proposed transfer to Assam, prays for suspending final decision, Memorials follows।" বাংলা সরকারের কাছে সিরাজুল ইসলাম প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারী, ১৮৯৬ তারিখে এক স্মারকলিপিতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগের মানুষ ভাষা, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের বিবেচনায় আসাম থেকে ভিন্ন, এই বিভাগের ভূমি সংক্রান্ত আইন সমূহ আসামের মত নয়। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার সিরাজুল ইসলামের মতামত সমূহের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করে বাংলা সরকারের উদ্দেশ্যে লেখেন, " The great muhammadan community are absolutely apathetic about it except as far as their participation in the Mohsin Fund and their retention of the special inspection system for Muhammadan education are concerned।"

পূর্ব বাংলার মফস্বল অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের লক্ষ্যে অসংখ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল জনসভার অনেকগুলোতেই স্থানীয় খ্যাতিমান মুসলমান ব্যক্তিবর্গ সভাপতিত্ব করেন। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্ল ১৯০২ সালে এ বিষয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণসমূ রিপোর্ট করতে গিয়ে বলেন ঃ " That inspecting staff do not take sufficient interest in Muhammmadan education. The case still

remains as it was when the Government of India wrote their resolution of 1885, Muhammadan education is backward, and for sometime to come will require very careful supervision."১৯০৩ সালে যখন প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, তাতে মুসলমানদের পক্ষ থেকেও বিরোধিতার প্রকাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে যে সকল স্মারকলিপি দেন, তাতে এর সাক্ষ্য রয়েছে। শিক্ষিত মুসলমানদের প্রতিনিধিদের দাবিদার 'The Muslim Chronicle' এর সম্পাদকীয় মন্তব্য এখানে উলে-খ করা যায় : " We do not recollect that there has been, in the discussion of public questions, ever before so much unanimity of voice as that which raising the shouts of protest against the proposed partition of Bengal।" বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য ২০ পৌষ, ১৩৯৭ (১৯০৩) - এ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাঁকল্যান্ড বাঁধের উপর আয়োজন করা হয় এক বিরাট জনসভার। সভার সভাপতিত্ব করেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদার মৌলবী খলিলুর রহমান আবু জাইগম সাবির। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মূল সমালোচনা ছিল এই যে, বাংলার উন্নত অঞ্চলকে প্রধান কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা ঠিক হবে না। ' The Muslim Chronicle ' - সরকারের এই বিভাজন নীতির সমালোচনা করে বলা যায় যে, এটা এমন এক সরকার যারা ' Coming to the consideration of Bengal (an enlightened and advanced province Muslim Chronicle,(9th January,1904) ।' বাংলা সরকারের উদ্দেশ্য সম্পাদক, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ - এ কথাও উলে-খ করা হয় যে, ' best colleges and best Madrasas ' কোলকাতায় অবস্থিত এবং যে সমস্ত অঞ্চলকে বাংলা থেকে আসামে হস্তান্তর করা হবে সেখানকার মানুষও স্বভাবতই তাদের ' Inspiration and guidance' এর জন্য কোলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফলে কোলকাতার সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রয়েছে এবং এর সঙ্গে পৃথক হলে তাদের আবেগে আঘাত দেওয়া হবে। উলে-খ্য ১৮৭৩ খ্রীঃ ওবাইদুল-াহ আল ওবাইদি এক প্রবন্ধে উলে-খ করেন, " বর্তমানে কোলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গ থেকে আসত। আবার তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের এবং সুধারামের ছাত্র সংখ্যায় ছিল বেশি ..."। উইলিয়াম হান্টার বলেন, কলকাতার মুসলমান কলেজের (মাদ্রাসা-ই আলীয়া, কলকাতা) শতকরা আশিজন ছাত্র আসত পূর্ব বাংলার ধর্মান্ধ জেলাগুলি (চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও শাহবাজপুর) থেকে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিমরাও বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালি সংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন বলে মনে করে। একই সংবাদপত্রে (মুসলিম ক্রনিকল) কার্জনের ' downright disregard of the wishhes and feelings of a people' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকায় আরেকজন প্রভাবশালী নাগরিক বলিয়াদির জমিদার কাসেমউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর বাসায় 'মহম্মদীয়ান ফ্রেন্ডস এ্যাসোসিয়েশনস'র এক সভা আহ্বান করা হয়েছিল ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারী। উক্ত সভায় কাসেমউদ্দীন সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল। পরের দিন নর্থব্রুক হলে একটি সভায় মফস্বলবাসী জমিদার'রা বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। 'The Muslim Chronicle'এর কাছে ১৯০৪ সালের ২৫-এ জানুয়ারী পাঠানো টেলিগ্রামে জমিদার কাসেমউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী জানান, "Muhammadan friend's union association in public meetting record firm but respectful protest against the proposal of partitioning Bengal as prejudicial to interest of Dacca Muhammadan community and as seriously hampering spread of Muhammadan education, depriving them of many advantages, for example Mohsin Fund. Over 300 attended delegates for district representation meetting elected." অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী এবং মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কারণ বঙ্গদেশ বিভক্ত হলে এ প্রদেশ মহসীন ফান্ডের টাকা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

কলকাতার সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনও ১৯০৪ এর ফেব্রুয়ারীতে একটি সভা অনুষ্ঠিত করে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে। মৌলবি দেলওয়ার হোসাইন ১৯০৪ এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'The Muslim Chronicle' কে লিখিত এক চিঠিতে বলেন যে, স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির উপর রাজনৈতিক কারণগুলিকে কর্তৃত্ব ফলাতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। তিনি যুক্তি দেখান - "আমার মত হল বাঙালিদের মতো এক প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ জনগণকে বিভক্ত করা চরমভাবে অন্যায়...।" এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মৌলবি শামসুল হোদা এবং খাঁন বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম তাঁদের শ্রোতাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, অ্যাসোসিয়েশন বঙ্গভঙ্গ চায় না। ১৯০৫ এর জুলাই - এ পূর্ব বাংলা থেকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রায় ৭০,০০০ আপামর জনসাধারণের স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকলিপি ভারত সচিবের নিকট পাঠানো হয়। সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত তাঁরা প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করেছিলেন। এমন কি মুসলিম কৃষক শ্রেণিও এর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। সমসাময়িক লেখক মৌলবি একিনউদ্দীন আহমদ, বি এল তাঁর 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, বাংলা বিভক্ত হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কলকাতার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সুযোগ হারাবে। তিনি বলেন, "গভর্নমেন্টের এতদ্দেশবাসী মুসলমান ও হিন্দুগণের উচ্চশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানগণ গরীব। ....

কিন্তু অচিরেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় নেতাদের প্রকাশ্য প্রচার রুখতে 'বিভেদের মাধ্যমে শাসন' - এর সনাতনী ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম জনসাধারণের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তিনি তাদের সামনে নতুন ব্যবস্থাধীনে উন্নততর ভবিষ্যতের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার এবং চাকুরী সৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনাকে কার্জন মুসলমানদের সামনে সাফল্যের সাথে উপস্থাপন করেন। ব্রিটিশ শাসন আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ বিপন্ন হতে থাকে। শিক্ষায়,

চাকুরিতে সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তীর্ণ ১২০ জনের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ২০-৩৮ জন। ১৮৭১ সালে বঙ্গদেশে ২১১১ গেজেটেড পদে কর্মরতদের মধ্যে মাত্র ৯২ জন ছিলেন মুসলমান। এই পদগুলোতে ৬৮১ জন ছিলেন হিন্দু, বাকিরা ইউরোপীয়। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৯০৪ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার আহসান মঞ্জিলের এক সভায় প্রদত্ত তাঁর প্রখ্যাত বক্তৃতায় লর্ড কার্জন উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীর সামনে ঘোষণা করেন, "Dacca was only a shadow of its former self and assured them that the government partition envisaged the creation of a centre of Muslim power in Dacca, which would invest Mohamedans in eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussalman viceroys and kings।" অর্থাৎ কার্জন বলেন, এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে যেটি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐক্যে ভূষিত করবে যা তাঁরা প্রাচীন মুসলিম রাজপ্রতিনিধি ও রাজাদের আমলের পর থেকে আর উপভোগ করেন নি।

বড়লাট কার্জনের এই প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত অংশের অধিকাংশই বুঝতে পারেন, বঙ্গভঙ্গ অচিরেই তাদের কাছে আশীর্বাদ হিসাবে প্রতিপন্ন হবে, কলকাতার 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি', এমন কি 'The Muslim Chronicle' পর্যন্ত রাতারাতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলে। 'Mahomedan provincial union'এর কাছে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 'বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত করে'। ধীরে ধীরে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গের একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সার্বিক সমর্থনের পেছনে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব খুব সামান্যই ছিল। এ টি এম আতিকুর রহমান খুব যথার্থই বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রথম পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বিরোধী জনমত গঠনে যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন- তাঁদের সেই তৎপরতা বা প্রয়াসের কোনো সরল রাজনৈতিক বোধ সৃষ্টিজাত ছিল না। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার বিষয়টি আদর্শগত আ রাজনৈতিক ছিল না।

১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশের পর এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তার পেছনে বাঙালি জাতিগত প্রশ্ন কিংবা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার বিষয়ে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব খুব সামান্যই ছিল। বাংলা বিভক্ত হলে 'মহসীন ফান্ড' এর উপকারিতা থেকে পূর্ববাংলার মুসলমানরা বঞ্চিত হবে - এমন মানসে তাড়িত হয়ে অনেকে ইংরেজ পরিকল্পনা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে ছিলেন। তবে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে পূর্ববাংলার বেশিরভাগ মুসলমান লর্ড কার্জন তথা সরকারি নীতির সমর্থকে পরিণত হলেও পশ্চিমবাংলায় অনুরূপ চিত্র লক্ষ্য করা যায় নি। কেননা কার্জনের যে সাম্প্রদায়িক

ভেদবুদ্ধি পূর্ববাংলার মুসলমানদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল পশ্চিমবাংলার মানুষের ক্ষেত্রে তা ছিল অকার্যকর। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই বরং বঙ্গভঙ্গ এ অঞ্চলের মুসলমানদের ক্ষতির কারণ ছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক মওলানা আক্রম খাঁ পরবর্তী সময়ের এক রচনায় সম্প্রদায়গত ভাবে বঙ্গভঙ্গের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অধিকতর ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরেন। এর অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। সেখানে প্রশাসনের প্রায় তিনটি শাখাতে এক নতুন প্রাণশক্তি উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতিই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছিল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরেই প্রাদেশিক সরকার সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এবং এর উন্নয়ন সাধন করে। গৃহীত হয় বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি। প্রদেশে যে সব দেশীয় বিদ্যালয় ছিল সেগুলির দায়িত্ব বোর্ড গ্রহণ করে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেয়। ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে মাধ্যমিক মাদ্রাসাসমূহ অত্যন্ত সফল হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায়ও প্রদেশের মুসলমানদের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করা হয়। ঢাকা বিভাগে স্থাপন করা মাধ্যমিক মাদ্রাসা। এগুলি ছিল “bilateral schools ”, যাতে একদিকে মাধ্যমিক ইংরেজী বিভাগ ছিল - এতে আবার উর্দু ও ফারসি শিক্ষা দেওয়া যেত। অন্যদিকে ছিল আরবি বিভাগ, যেখানে ইংরেজি, ভূগোল ও আধুনিক ইতিহাস পড়ানো হত। তাছাড়া মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি বৃত্তির বন্দোবস্ত এবং সরকারি শিক্ষাবিভাগে প্রয়োজনীয় অনুপাতে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করাও হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই বাংলা সরকার মুসলমানদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার দেখতে পায় যে, এ সকল বৃত্তির অর্থ যথেষ্ট নয় এবং এর সংখ্যাও কম। ফলে বৃত্তির নিয়মকানুন বদল করা হয় এবং “ number of reserved scholarships was largely increased।” এছাড়া বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুসলমান ছাত্রের ক্ষেত্রে বিনা বেতনে লেখাপড়ার নিয়ম কানুনও সুবিধাজনক করা হয়। অবিভক্ত বাংলায় কোন সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মোট মুসলমান ছাত্রের সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়তে পারত। পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকার এই সীমা ১৩ শতাংশে উন্নীত করে এবং মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রের মধ্যে বৃত্তির অনুপাত নির্ধারণ করে ৮:৩। এছাড়াও মহসীন দান তহবিলের অর্থ দিয়ে বেশ কিছু হাফ ফ্রি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয় স্কুল ও কলেজে। একই সঙ্গে প্রতিটি কলেজে ও প্রায় প্রতিটি হাইস্কুলে একটি মুসলিম ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়।

এইভাবে মহসীন এডুকেশনাল এনডাওমেন্ট ফান্ড প্রথম পর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভেদবুদ্ধিপ্রসূত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে আন্দোলনে সামিল করে। কুশলী লর্ড কার্জন স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিজ পক্ষে নিয়ে আসার দায়ে সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বিশেষত শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রেও পরোক্ষে মহসীন এনডাওমেন্ট ফান্ড বা মহসীন দান সম্পত্তি পূর্ববঙ্গের মুসলিম শিক্ষাবিস্তারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম শিক্ষার এই অগ্রগতির বিষয়টি আবদুল রসুল পর্যন্ত স্বীকার করেন, যিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন।

তথ্যসূত্র ও সংক্ষিপ্ত টীকা —

১। দেবব্রত ঘোষ, বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতা, শতবর্ষের আলোয় বঙ্গভঙ্গ, সম্পাদনা - দেবব্রত ঘোষ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর - ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৭০ - ১৭১।

২। Rafiuddin Ahmed, The Bengal Muslims, 1871 - 1906: A quest for identity, New Delhi, 1988, p-180,মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ, সমাজ নিরীক্ষণকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮১,পৃষ্ঠা - ৬।

৩। হুগলীর হাজি মহম্মদ মহসীন ১৮০৬ সালে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জনকল্যাণে ওয়াকফ করেন। গঠিত হয় ‘মহসীন এনডাওমেন্ট ফান্ড’। এই ফান্ড থেকে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৬ সালে এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত পরিচালিত হত মহসীন ফান্ড থেকেই।

৪। সুফিয়া আহমেদ, বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪ - ১৯১২, অনুবাদ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০২, পৃষ্ঠা - ৯, collection of the papers relating to the Hooghly Imambarah, 1815 - 1910, Bengal Secretariat Book Depot, calcutta, p - 758.

৫। সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ২৭।

৬। আব্দুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, অনুবাদ - মোস্তফা হারুণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১২৬।

৭। নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক , মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ১৪৩।

৮। ১৮৯৬ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রথম পরিকল্পনার সময়ে মৌলবি সিরাজুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামে হস্তান্তর করার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেন। সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮ - ১৯২৩) ঢাকা কলেজের প্রথম মুসলমান স্নাতক। তিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৯। The Muslim Chronicle,11 january, 1896, সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ১১৮।

১০। বাংলা সরকারের উদ্দেশ্যে কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভা, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬, অনুচ্ছেদ ২, public letters from India and General Letters from Bengal 1897.

১১। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ, সমাজ নিরীক্ষণকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮১,পৃষ্ঠা - ৭০।

১২। The Muslim Chronicle,january, 1904, সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ২২৬।

১৩। The Muslim Chronicle, 9 january, 1904.

১৪। সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ৯৩।

১৫। অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ; জুলাই ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১১৩। উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান

মুসলমান, আব্দুল মওদুদ অনুদীত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৩২।
১৬। সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ১২৭। The Muslim Chronicle, 5 August, 1905.
১৭। নীহার মজুমদার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী, পৃষ্ঠা - ৪৯-৫০।
১৮। সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ১২৭। The Muslim Chronicle, 30 january, 1904.
১৯। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য সমাজ; সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, সূচীপত্র, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬, পৃষ্ঠা - ৪৭।
২০। দেবব্রত ঘোষ, বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতা, শতবর্ষের আলোয় বঙ্গভঙ্গ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৭২।
২১। মৌলবি একিনউদ্দীন আহমদ, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, থির বিজুরি, মাঘ ১৪১১, সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ - ১৯১১, পৃষ্ঠা ৮১ - ৮৫।
২২। কে এম মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বঙ্গভঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫।
২৩। গোলাম মুস্তাফা, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল, ... , ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৪।
২৪। কাজী সুফিউর রহমান, মুসলিম মানস; সমাজ রাজনীতি আন্দোলন (১৯০৫ - ১৯৪৭), রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১১।
২৫। দেবব্রত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৭৩।
২৬। এ টি এম আতিকুর রহমান, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান, একটি পর্যালোচনা, ইতিহাস অনুসন্ধান - ১২ কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ৩১১।
২৭। সুন্নাত দাস, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ, বজ্রশিক্ষায় বাংলা, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৪৭।
২৮। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০৪, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৫ - ৬৮।
২৯। বার্ষিক মোহাম্মদী, ১৩৩৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৬২।
৩০। সুফিয়া আহমেদ, পূর্বোক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ১৪৮।
৩১। Quinquennial Review of Education in Eastern Bengal and Assam 1907 - 08 to 1911 - 12 vol. 1, p - 119.
৩২। সুফিয়া আহমেদ, পূর্বোক্ত ঃ, পৃষ্ঠা - ১৪৯ - ১৫০।

শিক্ষণ শিখনে কর্পোরাল পানিশমেন্ট ঃ সাহিত্যে ও বাস্তবে

- সোমা রায় চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা) গান্ধী সেন্টিনারী বিটি কলেজ হাবড়া

বিষয় নির্যাস ঃ

একবিংশ শতকেও কর্পোরাল পানিশমেন্ট একটি বহু চর্চিত বিষয়। সমাজে, পরিবারে, বিদ্যালয়ে বহুদিন ধরে কর্পোরাল পানিশমেন্ট চলে আসছে সঠিক শিক্ষা দেবার উপায় হিসাবে। বর্তমানে ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর নির্দেশে কর্পোরাল পানিশমেন্ট নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও পারিবারিকভাবে বা বিদ্যালয়গতভাবে যে এই শাস্তি প্রক্রিয়া যে সম্পূর্ণভাবে এখনও অবলুপ্ত হয়নি তা খবরের কাগজ বা বিভিন্ন সোশাল মিডিয়াতে উঠে আসা ঘটনাবলীতেই প্রমাণিত। কর্পোরাল পানিশমেন্ট এর সংজ্ঞা বর্তমানে শুধু দৈহিক ক্ষেত্রতেই শুধু সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, এটির ক্ষেত্র আরও প্রসারিত। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে এই নিপীড়নের চিত্র বদলেছে, উনিশ বা বিশ শতকের সাহিত্য ধারায় যার অজস্র নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে। এই প্রবন্ধটিতে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে কর্পোরাল পানিশমেন্ট এর নানা দিক তুলে ধরা হল।

মূল শব্দ ঃ কর্পোরাল পানিশমেন্ট, শিক্ষণ - শিখন, শিক্ষার্থী, সাহিত্য, বাস্তব।

ভূমিকা ঃ

কর্পোরাল পানিশমেন্ট (Corporal Punishment) কথাটি ল্যাটিন মব্দজাত, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল দৈহিক নিপীড়ন। শিশুকে পাঠদানে বা সহবত শেখানোর ক্ষেত্রে এই ধরণের শাস্তি প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাচীন ও মান্য পন্থা। সন্তান 'মানুষ' করার ক্ষেত্রে পরিবারের দায়িত্ব যেহেতু অনেকখানি, তাই 'ছেলে না পেটালে ছেলে মানুষ হয় না' - এই ধরণের ধারণা এখনও বহু পরিবারে বিদ্যমান। পরিবারের পরের স্থান বিদ্যালয়ের। শিশুর বিকাশে বিদ্যালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ নাগরিকে পরিণত করার দায় ও দায়িত্ব থেকে যেন তেন প্রকারেন শেখাবার প্রচেষ্টার অন্যতম উপায় হল ছাত্রপীড়ন। তাছাড়া ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে বেশিরভাগ সময়েই ছাত্র শিক্ষক অনুপাত সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। শিক্ষকদের পাঠদানের অতিরিক্ত বহু কাজের সাথে যুক্ত রাখা হয়। ফলে সহজেই তাদের ধৈর্য্যচুক্তি ঘটে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছাত্র পীড়নের মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া আমাদের দেশে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও Corporal Punishment সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায় যতটা গুরুত্ব থাকে, তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রটি ততটা গুরুত্ব পায় না। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই সাহিত্যের মধ্যে সমাজের নানা ঘটনা অনুরণিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদিন ধরে চলে আসা কর্পোরাল পানিশমেন্ট প্রক্রিয়াটির নানা টুকরো ছবি উঠে এসেছে সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

বিদ্যালয় শিক্ষায় কর্পোরাল পানিশমেন্ট কি ?

কর্পোরাল পানিশমেন্ট এর কোন বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা হয় না। শিক্ষার অধিকার আইন

২০০৯ (RTE, 2009) - তে কর্পোরাল পানিশমেন্টকে শুধুমাত্র দৈহিক পীড়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর পরিসরকে আরও বাড়ানো হয়েছে। সেখানে কর্পোরাল পানিশমেন্ট বলতে বোঝানো হয়েছে দৈহিক পীড়ন (Physical Punishment) মানসিক পীড়ন (Mental Punishment), বৈষম্যমূলক পীড়ন (Discrimination)।

দৈহিক পীড়ন (Physical Punishment) ঃ দৈহিক পীড়ন হল এমন কোন আচরণ বা ব্যবহার যারা দ্বারা শিশু যন্ত্রণা অনুভব করে, আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা সামান্যতম হলেও অস্বস্তি বোধ করে। যেমন -

. বেত বা কঞ্চি, লাঠি, জুতো, চক, ডাস্টার, বেল্ট, চাবুক, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মারা, লাথি মারা, আঁচড় কাটা, কামড়ে দেওয়া, চুল ধরে টানা, কান মুলে দেওয়া,থাপ্পড় মারা ইত্যাদি।

. অস্বস্তিদায়ক পরিস্থিতিতে ফেলা অর্থাৎ বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, চেয়ারের ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে রাখা, স্কুলব্যাগ মাথায় দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কান ধরানো, হাঁটু মুড়ে বসিয়ে রাখা।

. কোন অখাদ্য বস্তু (যেমন সাবান, মাটি, চক, লঙ্কা গুড়ো ইত্যাদি) খেতে বাধ্য করা।

মানসিক পীড়ন (Mental Punishment) ঃ এটি হয়তো সরাসরি দৈহিক পীড়ন নয়, কিন্তু এমন আচরণ যা শিশু মানসকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

. শিশুর পক্ষে মর্যাদাহানিকর এমন বিদ্রুপ করা।

. বকাবকি করার সময় অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা।

. ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ করা।

. তার পারিবারিক প্রেক্ষিত, তার সামাজিক অবস্থান, জাত, পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে অসম্মান জনক মন্তব্য।

. শিশুর নিজের অসুস্থতা বা পারিবারিক কোন রোগ (যেমন - যক্ষা, কুষ্ঠ বা HIV সংক্রমণ) নিয়ে কটু মন্তব্য।

. শিক্ষকের প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ হলে তিরস্কার।

. বিশেষধর্মী শিশুর পিছিয়ে পড়ার সঠিক কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেই শাস্তি প্রদান।

. যে সব শিশুরা বিকাশগত, শিখনগত বা কথনগত বৈকল্যের শিকার তাদের অবহেলা প্রদর্শন বা বিদ্রুপ করা।

বৈষম্যমূলক পীড়ন (Discrimination) ঃ কোন বিশেষ লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশা, অঞ্চল সম্পর্কে শিক্ষকের নিজের কুসংস্কারজনিত কারণে কোন শিক্ষার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণ।

. সময়মতো বিদ্যালয়ের মাইনে দিতে অসমর্থ হওয়া শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের কোন কাজে যোগদানে বিরত রাখা।

. সংরক্ষণ এর আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য।

. লিঙ্গ বা জাতভেদে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ (যেমন - বিশেষ সামাজিক

অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করানো)।

. বিশেষ বিশেষ জাত, পরিবারের শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরী বই, নির্ধারিত পোশাক খেলার সামগ্রী, মিড - ডে মিল দিতে অস্বীকার করা।

. প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর শিখন অসামর্থ্যতার জন্য পারিবারিক প্রেক্ষিত তুলে বিদ্রুপ।

কেন কর্পোরাল পানিশমেন্ট ?

সাধারণভাবে যে সব কারণে (এর বাইরে আরও কারণ আছে) বিদ্যালয়ে নিপীড়ন লক্ষ্য করা যায় তা হলো -

. বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি

. শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিতি বা দেরিতে আসা।

. বাড়ির কাজ না করে আসা বা দেরি করে আসা।

. সরব পাঠে অসমর্থ হওয়া।

. কোন বিষয়ে কোন ভুল করা।

. বই বা খাতা না নিয়ে আসা।

. কম নম্বর পাওয়া।

. ইউনিফর্ম না পরে আসা।

. ক্লাস চলাকালীন শ্রেণীকক্ষে বসে গল্প করা, প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারা।

. বিদ্যালয়ের মাইনে দিতে না পারা। ইত্যাদি।

সাহিত্যে কর্পোরাল পানিশমেন্ট কিভাবে প্রতিফলিত ?

সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান রসদ সঞ্চিত থাকে সমাজের অন্তরে। সামাজিক নানা ঘাত প্রতিঘাত কল্পনারসে জারিত হয়ে সাহিত্যে স্থান করে নেয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'ছাত্রপীড়ন' বিষয়টি ঘটনা ও চরিত্রের সাথে মিলে মিশে ছোট গল্পের মধ্যে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে দেখতে পাই ভোঁদা নামক এক ছাত্রকে পন্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করেন - ভূ -ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে কি হয় ? ভোঁদার উত্তর হল 'ভুক্ত'। পন্ডিতমশাই তাকে তিরস্কার করে জানান সঠিক উত্তর হবে 'ভূত'। তারপরেই ভোঁদার মোক্ষম প্রশ্ন , 'আজ্ঞে ভূ - ধাতুর উত্তর 'ক্ত' করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয় ? এমন প্রশ্ন শুনে পন্ডিতমশাই আর সহ্য করতে না পেরে বিরাশি সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করেন (পাঠশালার পন্ডিতমশাই, ১৮৮৪)। আইনের গেরো না থাকলে ছাত্রের এই বেয়াদপী কতজন একালেও সহ্য করতেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। বিশশতকের বিদ্যালয় কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'জেনারেল ন্যাপলা' (১৯৩৪) গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলার মাষ্টারমশাই বলাইবাবুর গাট্টা প্রসঙ্গ যার একটি বারের প্রয়োগে মাথার খুলি ছ্যাঁদা হয়ে যায় আর ন্যাপলা কিভাবে বুদ্ধির জোরে মাষ্টারমশাই - এর সেই অভ্যাস চিরতরে ঘুচিয়ে দেয়। ন্যাপলা 'নির্ভীকভাবে' 'অকুতোভয়' এর অর্থ 'যে কুকুরকে ভয় করে না' আর 'ইরম্মদ' এর অর্থ 'ইরান দেশের মদ' বলার পরে বলাইবাবুর গাট্টা যে অনিবার্য সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেই গাট্টার দুবার প্রয়োগে ন্যাপলা দাঁতকপাটি ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই ন্যাপলা তার আঙুলগুলো চেবাতে

শুরু করে। শেষে হেডস্যার এসে মাথায় যতক্ষণে ন্যাপলার জ্ঞান ফেরান ততক্ষণে বলাইবাবুর আঙুল 'সজনে ডাটার মত ছিবড়ে হয়ে গেছে।' গল্পটি পড়লে অনেকেরই ছোট বেলার কোন না কোন মাষ্টারমশাই এর শাস্তির বিশেষত্ব স্মরণে আসবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর গল্পে সেকেন্ড পন্ডিতের শাস্তি বিষয়ে ছাত্রদের উপলব্ধি - 'তাহার কাছে মার খাইতে হইলে অপরাধ যে করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই।' ... সে মার যে কী মার, তাহা যে না খাইয়াছে, তাহাকে বুঝানো শক্ত। উহাই তাহার জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই গল্পটিতে ছাত্রপীড়নের নানা রূপ লক্ষণীয়। শ্রেণীকক্ষে কাজ দিয়ে ঘুমিয়ে নেওয়া খুব একটা বিরল দৃশ্য ছিল না সে সময়ে। ঘুম ভেঙে উঠে অনেক সময়েই আগেই দেওয়া কাজটির কথা স্মরণে থাকত না। তিনি যে ভুলে গেছেন তা স্মরণ করাতে গেলে পাঁচুর পেঠে ছড়ির উপর ছড়ি চলে। আবার রাখালের হাতে সপাৎ শব্দে বেত পড়ে সেকেন্ড পন্ডিতকে এক হাঁড়ি গুড় দেবার কথা যদি বাবাকে বলতে যদি ভুলে যায় সেই ভেবে। অর্থাৎ শাস্তি যেন এখানে স্মরণ রাখার উদ্দীপক। আবার অনর্থক মার খাবার হাত থেকে রেহাই মেলে যদি তাঁকে অর্থকরী উপঢৌকন দেওয়া যায়। আবার এইভাবে সংগৃহীত তিনটি পয়সা একসাথে করে ছাত্রের হাতে দিয়ে দোকান থেকে একআনা (চার পয়সায় এক আনা) করে আনবার হুকুম হয়। এই বাড়তি এক আনাটি সংযোজনের দায়িত্ব যে সেই ছেলেটির তা তো বলাই বাহুল্য। যদি কোন সময় সে এই অর্থ যোগানে অসমর্থ হয়, তাহলে শিক্ষকের কাছে তাকে শুনতে হয় 'আজ তো স্যার ... কেন, আমার পাব্বনির কথাটাও মনে থাকে না শুয়ার? গুরুদক্ষিণে দিতে চাসনে, কিছু হবে না তোদের, গাধা কোথাকার ! তবে সে সময় অভিভাবকেরাও সন্তান মানুষের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলেই মনে করতেন (তা ভাগ্যিস ওই সেকেন্ড পন্ডিতমশাই আছেন তাই, নইলে ছেলেগুলো হয়তো উচ্ছন্নে যেত)। সময় বদলেছে। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় অভিভাবকরা এখন আর এভাবে ভাবতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো বৌদি জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা থেকে আমরা সেকালের গুরুমশাইদের প্রদেয় শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারি যা রীতিমতো ভীতিকর। যদি কোন ছেলে পড়ায় অমনোযোগী হোত তাহলে সে যত বড় হাঁ করতে পারে সেই হাঁ-য়ের মাপে একটা ছোট কঞ্চি কেটে তার নীচের ও উপরের দাঁতের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হত। একবিংশ শতকের শ্রেণীকক্ষে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার বা এরকম শাস্তির মানসিকতা দেখা গেলে তার চাকরী যাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ বইতে বেশ কয়েক রকম অভিনব শাস্তি র উলে-খ পাই। 'হাতছড়ি', 'নাড়ুগোপাল', 'ত্রিভঙ্গ', 'চ্যাংদোলা' - প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে একটি অপরটির চাইতে নির্মমতর। পাঠশালায় আসতে দেরীর অপরাধে 'হাতছড়ি' ব্যবহৃত হত। গুরুমশাইয়ের সামনে ডান হাত পেতে দাঁড়াতে হত আর তার উপর সপসপ করে পাঁচ বা দশ ঘা বেত পড়তো। ছোট ছোট ছেলেদের নরম হাতে তা যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক হতো তা সহজেই অনুমেয়। আবার এই 'হাতছড়ি', 'নাড়ুগোপাল' এর ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারত না। কোন ছেলেকে নাড়ুগোপাল সাজিয়ে তার এক হাতে একটা ইট বা সমতুল্য ওজনের কোন ভারী জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হত। জিনিষ বা ইটটি যদি সে ঠিক মতো ধরতে

না পারত বা ফেলে দিত, তাহলে ছেলেটির পশ্চাৎদেশে পন্ডিতমশাই নির্মমভাবে প্রহার করতেন। 'ত্রিভঙ্গ' নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে শিক্ষার্থীকে শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম ভঙ্গির আদলে এক পায়ে সোজাভাবে দাঁড়াতে বাধ্য করে হাতে কোন ভারি বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হত। যদি কোন কারণে সে সামান্য হেলে যেত বা পা সামান্যতম মাটিতে ঠেকত, তাহলে মাষ্টারমশাইয়ের মারের হাত থেকে আর রক্ষা ছিল না। 'চ্যাংদোলা' নামক শাস্তিটির কারণ মূলত মারের ভয়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি। এমন অবস্থায় পন্ডিত সেই ছাত্রের থেকে অপেক্ষাকৃত বলশালী কোন ছাত্রকে পাঠিয়ে চার হাত পা ঝুলিয়ে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসবার হুকুম দেন, এরপর তাকে নির্দয় প্রহারের সম্মুখীন হতে হয় যার ভয়াবহতা শিউড়ে ওঠার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা না বললে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি ইস্কুলের শারীরিক শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র সাজিয়ে হাতে বেত নিয়ে যে ভয়ঙ্কর মাস্টারি করতেন, তা যে স্কুলের মাষ্টারমশাইদের কাছ থেকে শেখা সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। ছাত্র পীড়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর গিন্নি(১৮৯১) নামক ছোটগল্পটিতে। এই গল্পের শিবনাথ পন্ডিতের হুল ও দাঁত দুইই একত্রে ছিল। এদিকে কিল চড় চাপড় চারা গাছের বাগানের ওপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্য জ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। তাহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তঃরাত্মা শুকাইয়া যাইত। কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁর নাম যম। এই বাক্যাংশগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের উপর দৈহিক নির্যাতনকারী শিক্ষকের অমানবিক পাশবিক চিত্র তুলে ধরেছেন। শুধু দৈহিক পীড়ন করেই ক্ষান্ত হন না এই পন্ডিতমশাই বালকদের পীড়ন করবার আরও একটি অস্ত্র ছিল, সেটি হল ছেলেদের নতুন নামকরণ। ছাত্র শশীশেখরের নাম 'ভেটকি' দেওয়াতে তা যে তাঁর চেহারার প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে তা অনুভব করে সে যৎপরোনাস্তি অসম্মানিত বোধ করে। ছোট্ট শিশু আশুর নাম গিন্নি দেওয়াতে সহপাঠীরা তাকে নিয়ে যে ঠাট্টা করলে তাদের থামানোর চাইতে তিনি আনন্দ উপভো করতেন বেশি।

শুধু বিদ্যালয় শিক্ষাতেই নয়, পারিবারিক শিক্ষাতেও শিক্ষার্থীরা দৈহিক নিপীড়নের শিকার হত। একবার বিদ্যাসাগরের পিতৃব্য কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নালিশ জানিয়েছিলেন 'ঈশ্বর সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছে, মিথ্যা কেবল হাত নাড়াদি কার্য করিয়া থাকে। পিতৃদেব তা শুনিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

অবশ্য একথা ভাবার কারণ নেই যে, সেকালে বিদ্যালয়ে শাস্তি শুধু ছেলেরাই পেত, মেয়েরা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নি সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখেছেন - তাঁর সেলাই স্কুলের দিদিমণি ' একদিন একটি ছোট মেয়েকে এমন জোর চড়িয়েছিলেন যে তার পাঁচ আঙুলের দাগ দুদিন ধরে তার গাল লাল করে বিরাজমান ছিল।

কর্পোরাল পানিশমেন্ট ও বাস্তব ঃ

পশ্চিমবঙ্গে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় ২০০৪ সালে কর্পোরাল পানিশমেন্ট নিষিদ্ধ ঘোষণার পর খবরের শিরোনামে আসা কিছু শাস্তিমূলক আচরণ —

. লা মার্তিনেয়ার স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রভনজিৎ রাওলা প্রধান শিক্ষকের

তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। (ফেব্রুয়ারী, ২০১০)

. বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে ওয়ার্ডেন পাঠভবনের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর বিছানা ভিজিয়ে ফেলার অপরাধে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করে। (জুলাই ২০১২)

. বাপি জোয়ারদার, বাসন্তীর একটি প্রাইমারী স্কুলে ক্লাস থ্রির ছাত্র, লাঠি দিয়ে প্রহার করার পর দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে মৃত্যু। মে, ২০১৩)

. বর্ধমানের কাটোয়াতে ন'বছরের শিশুকে গৃহশিক্ষক আছড়ে ফেলে দেয়, প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার কারণে লাঠি দিয়ে প্রহার করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে তার মৃত্যু হয়। (জুন, ২০১৪)

ভারতীয় সংবিধান ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার অধিকার তথা জীবন ও সম্মানের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কর্পোরাল পানিশমেন্ট জনিত কারণে যদি কোন শিশু স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত হয় বা মাঝপথে স্কুল পরিত্যাগ করেন, তাহলে তা সংবিধান বিরোধী বিষয় বলেই গণ্য হবে।

২১ (ক) ধারায় রাষ্ট্র দ্বারা ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের যে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার কথা আছে তা আইন দ্বারা সুরক্ষিত। এই মৌলিক অধিকারটি প্রায়োগিক রূপ পেয়েছে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা আইনের মধ্যে দিয়ে।

শিক্ষার অধিকার আইন ঃ

শিশুর বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার আইন (RTE, 2009) কার্যকরী ভূমিকায় রূপ পেয়েছে। এই আইনে ১৭(১) ধারায় দৈহিক পীড়ন (Physical Punishment) ও মানসিক পীড়নকে (Mental Punishment) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়েছে।

একবিংশ শতকের স্কুল শিক্ষায় সমস্যার দিকগুলো নির্ণয় ঃ

উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে আমরা শাস্তি দেবার যে যে ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি সেগুলির নিরিখে একবিংশ শতকের সমস্যার মূল আরও গভীরে নিহিত। বর্তমান প্রজন্ম ভীষণভাবেই প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় বিদ্যালয়ে তাদের সমস্যা তৈরির ধরণেও বদল এসেছে। ক্লাসে অমনোযোগীতা, বাড়ির কাজ করে না নিয়ে আসা, বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা, সহপাঠীদের সাথে মারামারি করা প্রভৃতির সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে মোবাইল বা ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যাবলী। বিদ্যালয়ে যা শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের মোবাইল নিয়ে প্রবেশ স্কুলের নিয়মকানুনের বিরোধী। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই নিয়ম না মানার প্রবণতাই বেশি। বর্তমান শতকে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি থাকায় ছাত্রছাত্রীদের খোলাখুলি মেলামেশার সুযোগ অনেক বেশি। সেই সংক্রান্ত আচরণের সমস্যাও শিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে বিব্রত করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিপীড়ন প্রতিরোধক আইনের সুযোগ নিয়ে ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে দুর্বিনীত আচরণ করলেও শিক্ষকের সেই মুহূর্তে তাকে থামানোর ক্ষেত্রে অসহায়তা কাজ করে। প্রধান শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষককে ঘেরাও করে রাখা, অসফল শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করার দাবি তোলা, নিজেদের পছন্দমতো

কোন সিদ্ধান্ত না হলে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ভাঙচুর চালানো ইত্যাদি ঘটনা কোন না কোনদিনের খবরের কাগজে শিরোনাম হিসাবে উঠে আসে।

সমস্যা মোকাবিলার কিছু সদর্থক দিকের ভাবনা ঃ

শাস্তি হল এমন একটা উপায় যার প্রয়োগ কোন কিছু চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে তবেই হওয়া উচিত। তার আগের পর্যায়গুলিতে সমস্যা মোকাবিলার জন্য কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেখা যেতে পারে। NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) এ ব্যাপারে বেশ কিছু দিক নির্দেশ করেছেন। যেমন -

শিক্ষকের দিক থেকে ঃ

. নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে শিক্ষককে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে।

. শিক্ষার্থীর মধ্যে ভালো কোন দিক দেখলে তাকে অন্তত মৌখিকভাবে প্রশংসা করা্

. খুব সমস্যাপরায়ণ শিক্ষার্থীরও কিছু ভাল দিক থাকে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা।

. সফল না হতে পারলেও কোন শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাটুকুকে মূল্য দেওয়া।

. সবসময় অন্য শিক্ষার্থীর সাথে তুলনা না করা।

. তার সামনে তার আগে করা কোন ভাল কাজকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা।

. নানাধরণের মূল্যবোধ যেমন সটিক দায়িত্ব পালন, সততার প্রকাশ, যত্নশীল মানসিকতার প্রকাশে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রাখা্

. শ্রেণীকক্ষে যারা খুব দ্রুত কাজ শেষ করতে সক্ষম হয় না, তাদের বাড়তি সময় দিয়ে সাহায্য করা।

. ছোটখাটো ঘটনা বা বিষয়কে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া।

কিছু আচরণ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা ঃ

. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কি ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করেন সে সম্পর্কে আগে থেকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

. ক্লাসে নির্দেশ দানের ভাষা স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন - 'শান্ত হয়ে থাকো' না বলে বলা দরকার 'ক্লাসে কেউ কথা বলবে না'। কোন কাজের ক্ষেত্রে 'এটা কোরোনা' না বলে বলা দরকার কি করতে হবে।

. কোন অন্যায় দেখলে রাগতভাবে না বলে বরং শান্ত ও দৃঢ়ভাবে বলতে হবে।

. একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীকে বুঝতে হলে জীবনশৈলী শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

. এটি বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী।

. সঠিকভাবে এটিকে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি আচরণে এর একটা প্রভাব পড়ে।

প্রশাসনের দিক থেকে ঃ

. শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক যাতে প্রত্যেক শিশুর অধিকার

সুনিশ্চিত হয়।

. শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা যাতে বিকশিত হতে পারে সেভাবেই যাতে তাদের সাথে আচরণ করা হয়, সে বিষয়টি প্রশাসন সুনিশ্চিত করবেন।

. কোনরকম শারীরিক, মানসিক পীড়ন বা কোন বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে শিশুর উপর না হয়, সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসনের।

. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর শিক্ষার্থী যাতে কোনরকম ভয়ভীতি, কোন সংস্কার বা বৈষম্যের শিকার না হয়, সে ব্যাপারটি প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে।

. প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শেষকথা ঃ

ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ২০০০ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরাল পানিশমেন্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ভারতের ২৯টি প্রদেশের মধ্যে ১৭টি প্রদেশ কর্পোরাল পানিশমেন্টকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে বলে দাবি করে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ সাল থেকে উচ্চ ন্যায়ালয় কর্পোরাল পানিশমেন্টের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে গেজেট প্রকাশিত হয়, সেখানে কর্পোরাল পানিশমেন্ট না দেওয়ার বিষয়ে স্কুল শিক্ষাদপ্তরের যে বিজ্ঞপ্তি তথা নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়, তাতে যে কোন রকম দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকতে বলা হয়েছে, অন্যথায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এই নির্দেশিকাতে কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজ কর্পোরাল পানিশমেন্ট এর আওতায় পড়বে না, সে বিষয়টিও উলে-খিত হয়েছে - ... if a teacher,administrator or a school authority takes such action to regulate,control and check the disciplinary activities of the disobedient child, namely :-

a) imposition of fines and penalties not contrary to the sprit of free education.

b) punitive requirment of extra academic work.

c) removing temporarily a child from a class in cases where his presence disrupting the functioning of the class.

d) prohibiting a child from participating him in sport and other co-curricular activities on disciplinary ground.

e) referring a disobedient child to the counsellor appointed by the school for counselling.

f) intemating the parents of any activity of the child and ensuring there involvement in adressing the child's disciplinary issues.

g) calling parents for attending guardians meetting conducted by the school with a view to enable them understand the emotional and academic need of the child.

বোঝা যাচ্ছে আইন যেমন থাকে, তেমনি আইনের ফাঁকও থাকে। তাই শুধু আইন

করে হবে না, চাই অন্তরের অনুভব। শিক্ষক প্রশিক্ষণে চাকুরিরত বা ভাবী শিক্ষকদের কর্পোরাল পানিশমেন্ট সম্পর্কে সেচতন করান, এবং সেই সঙ্গে শাস্তি না দিয়ে কিভাবে শিক্ষার্থীকে শেখানো যেতে পারে সেটির উপর জোর দেওয়া দরকার। তবেই শিক্ষার দিক থেকে একবিংশ শতক হয়ে উঠবে Zero Corporal Punishment এর শতক। আর বিভিন্ন সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা শাস্তিমূলক ঘটনাগুলি আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়েই থেকে যাবে।

তথ্য সহায়তা ঃ

১. দেবী জ্ঞানদানন্দিনী 'স্মৃতিকথা, গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ (সম্পাদিত)', জ্ঞানদানন্দিনী রচনা সংকলন, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২।

২. চৌধুরানী সরলাদেবী, জীবনের ঝরাপাতা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ও স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নবম খন্ড, ১৯৮৮।

৪. ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, ধর্ম আর রাজনীতি, বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়, অবভাস কলকাতা, ২০০৫।

৫. শাস্ত্রী শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ঘোষ বিশ্বজিৎ (সম্পাদিত), শতবার্ষিক সংস্করণ, নবযুগ প্রকাশন, বাংলা বাজার ঢাকা, অগস্ট ২০১২।

৬. সেন অশোক ও দাসমুন্সী শুভেন্দু সম্পাদিত, ইস্কুলের গল্প, কলকাতা শিশুসাহিত্য সংসদ ২০১১।

৭. Gartia Radhakanta, Corporal Punishment in Indian Schools : A Major Concern, ACAMEDIA, South Asian Academic Research Journal, Vol. 2, Issue. 7, July 2012.

ওয়েবসাইট ঃ

Unicef.in/story/197,All-You-Want-to-know-about-Corporal-Punishment accessed on 05.01.2016 at 11.50 am.

mirrorfeedback@indiatimes.com

www.endcorporalpunishment.org accessed on 05.01.2016 at 1.15 pm.

Harprathamik.gov.in/pdf/rte/corporal%20punishment%20ncpr.pdf

www.ncpr.gov.in/view file.php?fid=108 Guidelines for eliminating corporal punishment accessed on 05.01.2016 at 7.30 pm.

www.localhistories.org/corporal.htmi

https://en.wikipedia.org/wiki/school corporal punishment accessed on 06.01.2016 at 12.30 pm.

ওজ - এর যাদুকর : উনবিংশ শতাব্দীর এক ব্যর্থ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপক

- নন্দিনী দানিয়ারী

সহকারী অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা

সারাংশ

আমেরিকান সাহিত্যিক এল্.ফ্র্যাঙ্ক বাউম - রচিত "দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অফ ওজ" একটি বহুপঠিত বিশ্ববিখ্যাত শিশুসাহিত্যগ্রন্থ। কিন্তু এর ভিতরে লুকিয়ে আছে সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং ব্যক্তিদের নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ যা লেখকের উদ্ভাবনকুশলতা ও রসবোধের পরিচায়ক। আমরা অনেকেই শৈশবে আমেরিকান লেখক এল্.ফ্র্যাঙ্ক বাউম - রচিত "দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অফ ওজ" কাহিনীটি পড়েছি। এটি বিশ্বের সফলতম শিশুসাহিত্যসৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ সালের ১৭ই মে; প্রকাশক জর্জ এম হিল কোম্পানী। এরপর এই বইটি অসংখ্যবার নতুন করে মূদ্রিত হয়েছে। তবে অনেক সময় "দ্য উইজার্ড অফ ওজ" এই শিরোনামে। ঐ একই শিরোনামে ১৯০২ সালে একটি ব্রডওয়ে মিউজিক্যালও প্রদর্শিত হয়েছিল। বইটি প্রকাশের প্রায় চলি-শ বছর বাদে তার চলচ্চিত্রায়ন হয়। হলিউড নির্মিত "দ্য উইজার্ড অফ ওজ" প্রথম দিকে তেমন সাফল্য না পেলেও ক্রমশ তা দর্শকদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। ডরোথি চরিত্রে জুডি গার্ল্যান্ডের অসাধারণ অভিনয়, মজাদার চরিত্র মনে রাখার মত সঙ্গীত এবং চমকপ্রদ সম্পাদনা গত তিন চার প্রজন্মের আবালবৃদ্ধবনিতাকে আনন্দ দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে মূল বইটির পঞ্চাশেরও বেশি ভাষায় অনুবাদ ও ভাবানুবাদ হয়েছে। বাংলায় এর প্রথম ভাবানুবাদ সীতা দেবী রচিত "আজব দেশ" ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২০১-৩-১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। হলিউডের চলচ্চিত্রটিকে বর্তমানে একটি কালজয়ী চলচ্চিত্র রূপে গণ্য করা হয় যা মার্কিন জনপ্রিয় সংস্কৃতির একটি স্থায়ী অংশ হয়ে উঠেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল এই প্রশ্নটি : ওজের গল্পটি কি কেবলমাত্র শিশুদের জন্য রচিত একটি জনপ্রিয় গল্প, নাকি, এই শিশুসাহিত্যের অন্তরালে লুকানো আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ?

"দ্য উইজার্ড অফ ওজ" চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পঁচিশ বছর পরে প্রথম এই বিষয়ে আলোকপাত করেন হেনরী এম্ লিটলফিল্ড নামক এক স্কুল শিক্ষক, ১৯৬৪ সালে আমেরিকান কোয়াটারলি - তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। তাঁর মতে বাউমের শিশুপাঠ্য গল্পটির মধ্যে লুকানো আছে সেই সময়ের পপিউলিস্ট আন্দোলনের একটি বুদ্ধিদীপ্ত রূপক বর্ণনা। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে আমেরিকার দামস্তর ২৩ শতাংশ নেমে গিয়েছিল। এই মূদ্রাসংকোচের ফলে ঋণদাতাদের, যারা ছিল উত্তর পূর্ব আমেরিকার ধনী ব্যাঙ্কার, তাদের খুব মুনাফা হয়েছিল, কারণ টাকার দাম বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের, যাদের বেশীর ভাগই ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক, অবস্থা অত্যন্ত

খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্যার সমাধানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণমানকে দ্বিধাতুভিত্তিক মানে পরিবর্তন করার, যার ফলে সোনা ও রূপো দুই ধাতু দিয়েই মূদ্রা তৈরী করা যাবে। এবং বাজারে টাকার যোগান বাড়বে ও মূদ্রা সংকোচন থেমে যাবে। এই দ্বিধাতুভিত্তিক মান বা মূদ্রার ব্যবহারের বিষয়টি ছিল ১৮৯৬ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয়। রিপাবলিকান প্রার্থী উইলিয়াম ম্যাককিনলি স্বর্ণমানের পক্ষে ছিলেন ও সেইমতো প্রচার করেছিলেন। বিপক্ষে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান দ্বিধাতুভিত্তিক মানের পক্ষে ছিলেন।

এক বিখ্যাত বক্তৃতায় ব্রায়ান ঘোষণা করেছিলেন: "সাধারণ শ্রমিকের মাথায় এই কাঁটার মুকুট তুমি পরিয়ে দিতে পার না, মানবতাকে এক সোনার ক্রুশে বিদ্ধ করতে পারো না।"("You shall not press down up on the brow of labour this crown of thorns, you shall not crucify mankind up on a cross of gold.") স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে ম্যাককিনলি ছিলেন পূর্ব আমেরিকান রক্ষণশীলদের প্রার্থী, আর ব্রায়ান ছিলেন দক্ষিণ ও পূর্বের পপিউলিস্টদের পছন্দের প্রার্থী।

ওজের যাদুকর গল্প যে ছোটদের গল্পের আড়ালে এক রাজনৈতিক নীতিগর্ভ রূপক তার ধারণাটি বিদগ্ধ গবেষক মহলে সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণসহ উপস্থাপনা করেন হিউ রকঅফ, ১৯৯০ সালে জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি - তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে, যার শিরোনাম ছিল "দ্য উইজার্ড অফ ওজ অ্যাজ আ মানিট্যারি ফিনামেনান"। রকঅফ তাঁর প্রবন্ধে বাউমের রূপকল্পগুলির সঙ্গে সেই সময়ের অর্থনীতি - রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহের প্রতিতুলনামূলক বিশে-ষণ করেছেন। ওজের গল্পে আমরা দেখি ডরোথি হলুদ ইঁটের রাস্তায় (- যে ইঁটগুলিকে ধরে নেওয়া যায় সোনার ইট বলে -) রুপোর জুতো পরে যাচ্ছে, চলচ্চিত্রটিতে দেখানো রুবির জুতো নয়। সোনার পথে রুপোর জুতো পরে যাওয়ার রূপক কীসের সংকেত দেয়? পপিউলিস্টদের প্রধান দাবী ছিল "রুপোকে মুক্ত করো" (free silver) অর্থাৎ সোনার সাথে সাথে রুপোর ব্যবহার করে প্রচুর নতুন মূদ্রা তৈরী করা হোক যাতে সোনা ও রুপোর অনুপাত হবে ১:১৬। পপিউলিস্ট ও ফ্রি সিলভার আন্দোলনকারীদের এই নতুন রুপোর মূদ্রা বাজারে ছাড়ার প্রধান কারণ ছিল বাজারে টাকার যোগান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা। কেননা টাকার যোগান বৃদ্ধি পেলে চাষী ও ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে ঋণ পেতে ও শোধ করতে সুবিধা হবে। ১৮৯৬ এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যখন উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ঘোষণা করা হয় তখনই দলের মধ্যে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল, কেননা এর ফলে যে সমস্ত ডেমোক্র্যাটরা স্বর্ণমানের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা নিজেদেরকে নির্বাচনী প্রচার থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর পরে পপিউলিস্টরাও ব্রায়ানকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থী ম্যাককিনলীর কাছে ব্রায়ান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কেননা রিপাবলিকান দল পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলেও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। রকঅফের মতে, ১৮৯৬ সালের অর্থের রাজনীতি সমস্ত ভোটদাতাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল - (যে দুইট ভাগের তিনি নাম দিয়েছেন সিলভারাইটস্ (রূপাপন্থী) ও গোল্ডবাগস্ (স্বর্ণকীট) -) যা ছিল বাউমের রূপকধর্মী কাহিনীর প্রধান পটভূমি।

বাউমের কাহিনীটির প্রধান চরিত্র হল ডরোথি, ক্যানসাস রাজ্যের একটি ছোট্ট মেয়ে যাকে

ঘূর্ণিঝড় অনেক দূরের এক অজানা দেশে এনে ফেলেছে। ডরোথি চরিত্রটি এখানে সনাতন আমেরিকান মূল্যবোধের প্রতীক। ডরোথি এই অজানা দেশ (ওজ) থেকে বাড়ীতে ফিরতে চায়। তাই সে ওজের যাদুকরের সাহায্য নেবার জন্য ওজের রাজধানী পান্নানগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে তার সঙ্গে তিনজনের বন্ধুত্ব হয়। কাকতাড়ুয়া (চাষীর প্রতীক), টিনের তৈরী কাঠুরিয়া (শিল্প শ্রমিকের প্রতীক) এবং এক ভীষণ ভীতু সিংহ যার গর্জন তার প্রকৃত পরাক্রমের চেয়ে অনেক বেশী। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ব্রায়ান উত্তেজক, উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই চারজন হলুদ ইঁটের রাস্তা (স্বর্ণমান) দিয়ে অনেক বিপদসংকুল পথ পার হয়ে ওজের যাদুকরের কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়। পান্নানগরীতে (অর্থাৎ ওয়াশিংটন ডি.সি. তে) সব লোক সব কিছু সবুজ কাঁচের চশমা (সবুজ কাগজের টাকা ("greenbuck dollar") দিয়ে দ্যাখে। ওজের যাদুকর (উইলিয়াম ম্যাককিনলী, বিজয়ী রিপাবলিকান প্রার্থী ও রাষ্ট্রপতি) সবাইকে তাদের চাহিদা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে হল আসলে একজন প্রতারক। শেষ পর্যন্ত ডরোথি তার সমস্যার সমাধান নিজেই করে ফ্যালে, যখন সে জানতে পারে যে তার রুপোর জুতোতে যাদুক্ষমতা আছে।

বাস্তবে ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই যে যদিও রিপাবলিকানরা ১৮৯৬ সালে ভোটে জিতেছিল, তবু আমেরিকাতে স্বর্ণমান বজায় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রি-সিলভার আন্দোলনকারীদের আশাই পরিপূর্ণ হল, কারণ দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা গেল। এই সময়ে প্রায় একই সঙ্গে আলাস্কা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গেল, এছাড়াও সোনা শোধনকারীরা নতুন একটি পদ্ধতি (সায়ানাইড পদ্ধতি) উদ্ভাবন করে ফেলল, যাতে খনিজ সোনা পরিশোধন করা অনেক সহজ হয়ে গেল। ফলে বাজারে সোনার যোগান বেড়ে গেল ও সোনার দাম কমে যাওয়ার ফলে টাকার যোগান ও দামস্তর উভয়েই বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেখা যায় ১৮৯৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে আমেরিকায় দামস্তর ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

লেখক ও তাঁর চরিত্রেরা

বাউম ছিলেন দক্ষিণ ডাকোটার অ্যাবার্ডীন শহরের একটি ছোট সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি ১৮৮০-র দশকের শেষ ও ১৮৯০ এর দশকের শুরুর দিকের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে লেখালেখি করতেন। এই সময়েই পপিউলিস্ট দলের সূচনা হয়। লিটলফিল্ডের মতে, বাউম পপিউলিস্ট দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ও ১৮৯৬ সালের নির্বাচনে ব্রায়ানকে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করেছিলেন। বাউম ছিলেন একজন পরিশীলিত ব্যঙ্গরচয়িতা, যিনি জানতেন সবচেয়ে কার্যকরী ব্যঙ্গাত্মক রচনা হল সেই রচনা যা পাঠককে লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত রাখবে। সম্ভবত এই কারণেই কাহিনীটির প্রথমেই বাউম দাবী করেছিলেন যে এই কাহিনী কেবলমাত্র সমসাময়িক ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য লিখিত ("written solely to pleasure children of to-day)। এবং যেহেতু বেশীরভাগ সমকালীন ও পরবর্তী পাঠক এই ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি, তাই ব্যঙ্গরচনা হিসাবে কাহিনীটি ব্যক্তিগতভাবে বাউমকে আরো সফল করে তুলেছে।

এবার আমরা রূপকধর্মী এই কাহিনীর চরিত্রগুলিকে বিশে-ষণ করতে পারি ....

ক্যানসাসের মেয়ে আর কুকুরছানা

প্রথমেই আলোচনা করা যাক ক্যানসাসের মেয়ে ডরোথি ও তার কুকুরছানা টোটোকে নিয়ে। ডরোথি হল এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র, যে আসলে সনাতন আমেরিকান আদর্শ ও মূল্যবোধের ব্যক্তিপ্রতিভূ। সে কোমলহৃদয়, একই সঙ্গে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সরল কিন্তু ঠান্ডা মাথার এক মেয়ে যাকে অনায়াসেই পাশের বাড়ির মেয়ে হিসাবে ভাবা যায়। তার বাড়ি ক্যানসাস রাজ্য হল এমন এক দেশ যেখানে সবকিছুই বেরঙ, নীরস ও ধূসর যেমন বড় বড় ঘাসের বনে ভরা গাছবিহীন দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, তার রঙচটা বাড়ি, এমন কি তার হেনরি কাকা ও এম কাকীমাও দুই বর্ণহীন, সাধারণের চেয়েও সাধারণ মানুষ। এই বিবর্ণতার বর্ণনা হল তৎকালীন ক্যানসাসের পরিস্থিতির রূপক : ১৮৮০-র দশকের শেষ ও ১৮৯০ এর দশকের শুরুতে সেখানে ভয়ঙ্কর খরা, তীব্র শীতকাল ও শেষ পর্যন্ত পঙ্গপালের আক্রমণ ক্যানসাসের উর্বর কৃষিজমিকে প্রায় পতিত জমিতে পরিণত করেছিল, ফলে আমরা সেখানকার চাষীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। বেশিরভাগ লোকই এই পরিস্থিতিকে তাদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করত। চাষীদের এই পরিস্থিতির ফায়দা লুঠতো মধ্যবর্তী ফড়ের দল। রাজনীতিকদেরও এই পরিস্থিতি নিয়ে কোনও হেলদোল ছিল না। এমন পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে পপিউলিস্ট আন্দোলনের সূচনা হল। যদিও আমেরিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে পপিউলিস্ট আন্দোলন খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, ক্যানসাস সবসময়েই এই আন্দোলনের সমর্থকদের প্রথম সারিতে ছিল।

ডরোথির কুকুরছানা টোটোর মধ্যেও এক বুদ্ধিদীপ্ত শে-ষ (যাকে ইংরাজীতে বলে পান) লুকানো আছে। প্রহিবিশনিস্টরা ছিল পপিউলিস্টদের বিশ্বস্ত সাথী। যখন ডরোথি হলুদ ইঁটের রাস্তায় ওজের পথে রওনা দিল, টোটোও তার পিছন পিছন চলল, যেমন প্রহিবিশনিস্টরা পপিউলিস্টদের পিছনে চলেছিল।

দুষ্টু ডাইনী , ভালো ডাইনী

যখন ডরোথির বাড়িটা ঘূর্ণিঝড়ে উড়তে উড়তে ওজের দেশে এসে পড়ে, সেটা পড়েছিল পূর্ব দিকের দুষ্টু ডাইনীর মাথায় ও সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। ডরোথি যখন অবাক হয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তখন দেখল মাঞ্চকিনরা আনন্দ উৎসব করছে কারণ পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনী তাদের পরাধীন করে রেখেছিল। এখানে পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনী হল আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যারা স্বর্ণমানের সমর্থক ছিল। মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণের চাষীরা প্রায়শই তাদের দুরাবস্থার জন্য এদের দায়ী মনে করত। তারা মনে করত ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখে, ঠিক যেমন কিনা পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনী মাঞ্চকিনদের দাস শ্রমিকে পরিণত করে রেখেছিল।

সেইরকমই ডরোথি উত্তর দিকের ভালো ডাইনীর সাহায্যে পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনীর রুপোর জুতোজোড়া উদ্ধার করল। এখানে উত্তর দিকের ভালো ডাইনী হল মধ্য

পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিকের রাজ্যগুলির ভোটদাতারা, যারা পপিউলিস্টদের সমর্থন করত। পরে গল্পে আমরা দেখতে পাই ভালো ডাইনীদের সাদা রং (যেমন সাদা পোশাক ইত্যাদি) দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে। রুপোকে বলা হত সাদা ধাতু (white metal)। গল্পে যেমন দেখতে পাই মাঞ্চকিনরা রুপোর জুতোর যাদু সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু এটুকু জানে যে যাদু হল তাদের দুর্দশার কারণ; তারা পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনীর মৃত্যুর পর নিজেদের মুক্ত মনে করছে। বাস্তবে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণের চাষীরা টাকা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানত না। কিন্তু ওয়াল স্ট্রীটের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা রুপোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতো বলেই দলবদ্ধভাবে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ব্রায়ানের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

এরপর ডরোথি আর তার বন্ধুরা যখন পান্নানগরীতে গিয়ে পৌঁছালো, ওজের যাদুকর তাদের পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনীকে মেরে ফেলতে পাঠালো। পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনীও নিষ্ঠুর ও মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রাখে। এখানে মনে হয় পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনী হোল সেই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা যা চাষীদের জীবনে দুর্গতি ডেকে এনেছিল। এবং তার সঙ্গে ঐ অঞ্চলের ক্ষমতাশালী লোকেদের অত্যাচার। পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনী ডরোথিকে মারার জন্য হিংস্র নেকড়ে বাঘ, ভয়ঙ্কর কাকের দল ও বিষাক্ত মৌমাছিদের পাঠায়। যা প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলির প্রতীক। শেষকালে সর্বতোভাবে বিফল হয়ে দুষ্টু ডাইনী একটি সোনালী টুপির মাধ্যমেম উড়ন্ত বানরের দলকে ডেকে পাঠায়। ঐ সোনালী টুপির যাদুক্ষমতা, যা মাত্র তিনবার কাজ করে, প্রথ দুবার বানরদের দাসে পরিণত করতে ও যাদুকরকে নিজের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিতে দুষ্টু ডাইনী ব্যবহার করেছিল। তৃতীয়বার বানরদের ডাকার ফলে ঐ সোনালী টুপির যাদুক্ষমতা ফুরিয়ে যায় ও বানররা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। অর্থাৎ সোনার ক্ষমতা নির্দিষ্ট ও সীমিত। তাই এর সঙ্গে রুপোর প্রয়োজন (দ্বিধাতুভিত্তিক মান)।

চতুর্থ ডাইনী হল দক্ষিণদেশের গে-ন্ডা, একজন ভালো ডাইনী যে ডরোথিকে সাহায্য করেছিল এবং তার রুপোর জুতোর যাদুক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। বাস্তবে আমেরিকান কংগ্রেসে দক্ষিণের প্রতিনিধিরাই ব্রায়ানকে ও ফ্রি সিলভার আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন দিয়েছিলেন।

ডরোথির তিন বন্ধু

ডরোথি যখন ওজের যাদুকরের সাহায্যের আশায় হলুদ ইঁটের রাস্তা দিয়ে ওজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন পথে তিনজনের সঙ্গে তার দেখা হয়, যারাও তাদের আকাঙ্খিত জিনিস পাওয়ার জন্য ডরোথির যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল। ডরোথির সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল বুদ্ধিহীন কাকতাড়ুয়ার, যে কিছুই জানে না কারণ তার কোন বুদ্ধি নেই। কাকতাড়ুয়া হল মধ্য পশ্চিমের চাষীদের রূপক - যারা দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ, কষ্ট ও দমনপীড়ন সহ্য করতে করতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল, এবং নিজেদের নীচু ও ছোট ভাবত। কিন্তু গল্পে আমরা দেখতে পাই কাকাতাড়ুয়া মোটেই বোকা নয়। তার যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি আছে। তার বুদ্ধি জ্ঞান ও সাধু চরিত্রের পরিচয় ওজের যাত্রাপথে পাওয়া যায়। কাকতাড়ুয়া যেমন বোকা নয়, তেমনই চাষীরা বাস্তবে তাদের দুর্দশার কারণ বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে।

টিনের কাঠুরিয়া হল শিল্প শ্রমিকের রূপক, পূর্বদিকের দুষ্টু ডাইনী (বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা) তাকে যন্ত্রে পরিণত করেছে; তার মনে হয়েছে তার আর কোন হৃদয় নেই। টিনের কাঠুরিয়ার জং ধরা অবস্থা শিল্প শ্রমিকের সেই সময়ের অবস্থা বোঝাচ্ছে, কয়েক ফোঁটা তেল পেলেই সে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। ১৮৯০ -র অর্থনৈতিক মন্দার ফলে প্রচুর শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। কাঠুরিয়ার জং ধরা অবস্থা তারই প্রতীক। এরপর ডরোথি, কাকতাড়ুয়া ও কাঠুরিয়া এক ভীতু সিংহের মুখোমুখি হয়, যে খুব ভয়ঙ্কর গর্জন করতে পারলেও বাস্তবে আর কিছুই করতে পারে না। এই সিংহ আর কেউ নয়, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী উইলিয়াম জেনকিংস ব্রায়ান; যিনি তাঁর উত্তেজক ও জনমোহিনী বক্তৃতার জন্য খবরের কাগজে "সিংহ" বলে অভিহিত হতেন।

ইঁদুর আর বাঁদর

গল্পে এক জায়গায় আমরা এক বিশেষ রূপক পাই, যেখানে একটি বিশাল হলুদ বেড়াল ইঁদুরদের রাণীকে আক্রমণ করে ও টিনের কাঠুরিয়া তার কুঠারের এক কোপে হলুদ বেড়ালকে কেটি ফেলে। এখানে হলুদ বেড়াল সোনার ক্ষমতার প্রতীক আর ইঁদুরেরা হল সাধারণ মানুষ। তেমনই যে উড়ন্ত বাঁদরেরা পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনীর দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল, তারা হল সমতলে বসবাসকারী রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতীক। যখন বাঁদরদের নেতা বলে, তারা একসময়ে মুক্ত ও স্বাধীন ছিল, তারা ওজের যাদুকরের কঠোর নীতির ফলে দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনীর দাসে পরিণত হয়, তখন আমরা আমেরিকার আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের পরিস্থিতি অনুমান করতে পারি - সাদা চামড়ার লোকেদের অত্যাচার তাদের খারাপ ও নিষ্ঠুর করে তুলেছিল, যদিও আদতে তারা ভাল লোক ছিল। এটা বোঝা যায় যখন ডরোথির প্রভাবে বাঁদরেরা ভালো ও দয়ালু হয়ে ওঠে ও সকলকে সাহায্য করে।

চীনামাটির শহর ও হলুদ উইংকিরা

গে-ন্ডাকে খুঁজকে খুঁজেতে ডরোথিরা এক সাদা চীনামাটির উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে এক চীনামাটির শহরে উপস্থিত হয় - স্বাভাবিকভাবেই এতে আমাদের মনে চীনের প্রাচীর ও চীন দেশের কথা আসে। কিন্তু এই গল্পে চীন দেশের প্রসঙ্গ কেন? ঐ সময়ে তিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে (যার মধ্যে আমেরিকা অন্যতম) চীন দেশের এলাকা বিভাজনের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রসঙ্গত চীন ঐ সময়ে ছিল একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল। চীনামাটির শহরের রং তাই সাদা। এছাড়াও দুর্ঘটনাবশত সিংহের গর্জনে চীনামাটির গির্জা ভেঙে যাওয়া, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতাদখলের লিপ্সার ফলে চীনের বিভাজনে চীনে মিশনারীদের দীর্ঘদিনের ভালো কাজের বিফল হওয়াকে নির্দেশ করে। এছাড়াও চীনামাটির রাজকুমারীর তীব্রভাবে ক্যানসাসে আসার জন্য ডরোথির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি রূপকগুলি গল্পের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সুরটি স্পষ্ট করে ; ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ব্রায়ান ও পপিউলিস্টদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।

গল্পে আরও এক জায়গায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতার প্রসঙ্গ আসে। হলুদ উইংকিরা পশ্চিমের ডাইনীর কাছে দাসত্বে আবদ্ধ ছিল - ঐতিহাসিক ভাবে চীনা ও ফিলিপিনো অধিবাসীরা আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কম মজুরিতে শ্রমিকের কাজ করত; তাদের

পীত বর্ণ ও একসাথে দল বেঁধে থাকার বৈশিষ্ট্য হলুদ উইংকিদের রূপক সৃষ্টি করেছে।

ওজ পান্নানগরী ও যাদুকর

ওজের দেশ, তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও জনবৈচিত্র্য যেন আমেরিকার এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ এবং পান্নানগরী হল তার রাজধানী, সরকারী ক্ষমতার কেন্দ্র, ঠিক যেমন ওয়াশিংটন ডি.সি আমেরিকার রাজধানী। ডরোথি ও তার বন্ধুদের ইচ্ছাপূরণের জন্য পান্নানগরী যাত্রার তুলনা করা যায় পপিউলিস্টদের ক্ষমতা দখলের জন্য ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী যাত্রার।

পান্নানগরীর পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ রঙের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এখনকার মত তখনো ডলারের কাগজের নোটের রং ছিল সবুজ। পান্নানগরীর সব কিছুই সবুজ; এমনকি লোকজনও সবুজ পোশাক ও সবুজ কাচের চশমা পরে থাকে অর্থাৎ সেখানে সবাই সবকিছু ডলারের হিসাবে বিচার করে। এছাড়াও সাধারণভাবে অনেক জায়গায় সবুজ রঙের প্রসঙ্গ এসেছে যা থেকে মনে হয় কাগজের নোটকে এক সর্বরোগহর দাওয়াই বা সব সমস্যার সমাধান মনে করা হয়েছে।

এবার আসা যাক যাদুকরের প্রসঙ্গে।

আমাদের আলোচ্য কাহিনীটির এই প্রধান চরিত্র যার নামে উপন্যাসের নামকরণ যে ঠিক কার রূপক তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সকলেই এই বিষয়ে একমত যে যাদুকর হল সেই সময়ের কোনও এক রাজনীতিবিদের রূপক যার প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, সে যে খুবই ক্ষমতাশালী, সেই বিভ্রম তৈরী করার ক্ষমতা তার আছে। যখন ডরোথি আবিষ্কার করে যে যাদুকর প্রকৃতপক্ষে মোটেই মহান ও ক্ষমতাশালী নয়, যা সে দাবী করে, তখন যাদুকর তাকে চুপ করে থাকতে বলে, কারণ লোকে যদি সত্যিটা জেনে ফেলে তাহলে সমস্যা, কেননা যাদুকরকে মহান ও ক্ষমতাশালী হতে হবে।

জেকব ও ওয়াং-এর মতে যাদুকর হল রিপাবলিকান প্রার্থী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম মাককিনলী ও রিপাবলিকান নেতা হ্যানার মিলিত প্রতিরূপ। হ্যানা, ম্যাককিনলীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে ম্যাককিনলি যে কত বড় মহৎ এক নেতা তা নিয়ে উদ্দীপক, আকর্ষণীয় বক্তৃতা দিতেন। জেকব ও ওয়াং - এর মতে, হ্যানা ছিলেন নেতার বাস্তব সত্ত্বা। লিটলফিল্ডের মতে, ম্যাককিনলি থেকে গ্রান্ট যে কেউই যাদুকরের প্রকৃত রূপ হতে পারেন। এ বিষয়ে ড্রিয়ারের মতামত সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতে, " Thia was Barum's ultimate populist message. the powers that be, survive by deception; only people's ignorance allows the powerful to manipulate and control them।" ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি ছলচাতুরীর মাধ্যমে টিকে থাকে; কেবলমাত্র লোকেদের অজ্ঞানতা, লোকেদের নিজ উদ্দেশ্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে ক্ষমতাশালীদের সহায়তা করে।

গল্পের শেষে এসে আমরা দেখি যাদুকর কাকতাড়ুয়াকে পান্নানগরীর শাসক হিসাবে দায়িত্ব দেয়। কাঠুরিয়াকে পশ্চিমের ও সিংহকে বনের পশুদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করে; গে-ন্ডার সহায়তায় ডরোথি তার রুপোর যাদুজুতোর সাহায্যে ক্যানসাস ফিরে যায়।

কিন্তু এর মানে মোটেই পপিউলিজেমের বিজয় নয়, কারণ গল্পে দেখা যায় কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরিয়া বা ভীতু সিংহ, প্রত্যেকের কাছেই তাদের আকাঙ্খিত দ্রব্যগুলি

ছিল, যথাক্রমে বুদ্ধি, হৃদয় ও সাহস। ডরোথির কাছে প্রথম থেকেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল রুপোর জুতোর মাধ্যমে, কিন্তু তা তার জানা ছিল না। এছাড়াও যাদুকরের প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষমতা ছিল না, পুরোটাই ছিল অলীক ও বিভ্রম। গল্পের এইসব দিকগুলি কিন্তু এক পরস্পর বিরোধী ফলাফল নির্দেশ করে, তবে গল্পের শেষে পপিউলিজমের পরাজয় নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করে মরুভূমিতে ডরোথির রুপোর জুতো হারিয়ে ফেলার ঘটনা। কারণ ব্রায়ানের পরাজয়ের ফলে ১৮৯৬ এর পর ফ্রি - সিলভার আন্দোলনের দ্রুত পতন হয়। ম্যাককিনলির পুনর্নির্বাচন হয় এবং ১৯০০ সালে আইনগতভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমানগ্রহণ রাজনৈতিকভাবে পপিউলিস্ট আন্দোলনকে শেষ করে দেয়।

ওজের যাদুকরের গল্প অবশ্যই একটি রূপক কাহিনী, তবে তা পপিউলিস্টদের পক্ষে না বিপক্ষে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এটিকে একটি নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী রূপেও বিচার করা যায় না কারণ বাউমের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া নয়। ফলে ওজের গল্পকে বড়জোর আমরা সেই যুগের পপিউলিস্ট আন্দোলনের একটি প্রতীকী ও ব্যঙ্গাত্মক রূপায়ণে রূপে দেখতে পারি যা একই সঙ্গে এক অমর শিশু সাহিত্য। অর্থাৎ ওজের যাদুকরের গল্প একদিকে বিশুদ্ধ সাহিত্য অপরদিকে একটি রাজনৈতিক ও প্রতীকী কাহিনী। উভয় ক্ষেত্রেই তা চূড়ান্ত সফল - লেখকের উদ্ভাবন কুশলতা ও রসবোধের মাধ্যমে।

তথ্যপঞ্জী

1. Barum, L.Frank [1900] 1991. 'Thwe wonderful wizard of Oz', Edited by William Leach. Belmont. California, Wadsworth.
2. Dreier, P 2002, 'The Wizard of Oz' A Political Allegory of the Failed American Populist Movement, Third World Traveler, September 24.
www.thirdworldtraveler.com
3. Jacobs, D &Wang, G 1997 'The Wonderful Wizard of Oz' An Examination of Underlying Political Allegory.
http://www.people.cornell,edu/pages/dbj5/ozhtml
4. Littlefield, Henry. M. 1964, 'The Wizard of Oz parable of populism', American Quarterly 16:47 - 58
5. ..... 1992."Oz" Author kept Intentions to Himself.NewYork Times.February 7.
6. Rockoff,Hugh.1990. 'The "Wizard of Oz' as a monetary Allegory'. Journal of Political Economy 98:739-60.
7. Taylor, Quentin. P.2005, 'Money and Politics in the Land of Oz', Special Report, The Independent Review, issue 40.
http://www.independent.org/publication/tir/article.asp?
Issue ID=40&articleID=504

সন্ধ্যারাগ

- শুক্লা গুহ রায়

গোধূলির অরুণ রাগ সর্বাঙ্গে মেখে স্ফুটনোন্মুখ সন্ধ্যামণি, আকাশের লালিমা আত্মস্থ করে লজ্জারুণ সন্ধ্যামণির দৃষ্টি সুদূর নিবদ্ধ; দূর মনস্ক সে। অস্তায়মান রবির পীতাভ উত্তরীয় উড়ছে মহাগগণে। বিদায় নিচ্ছেন দিব্যজ্যোতি - তাঁর স্বর্ণরাগ দেহে মনে অনুভব করতে উদগ্রীব মাটির ধরার সন্ধ্যামালতি। প্রান্তপৌঢ় দিবাকর কবোষ্ণকর বিস্তার করলেন এই ভূমিসূতার দলমন্ডলে; প্রশ্ন করলেন, ' এত আগ্রহভরে, কোমল দৃষ্টিতে, অমোঘ আকর্ষণে কেন প্রতি গোধূলিতে তুমি আমায় আহ্বান কর? কী তোমার কাম্য, প্রিয়ে? তোমার লাজনম্র আননে আমি লক্ষ্য করেছি কোমল বাসনা। বিদায় নেওয়ার আগেও প্রতিটি দিনান্তে অসংখ্য কর্ম সম্পন্ন করতে হয় আমাকে। তাই এতদিন তোমাকে দেখেছি ক্ষণিকের জন্য, হাজার ব্যস্ততায় কুশল বিনিময় করতে অবকাশ পাইনি তোমার সঙ্গে। আজ এই শেষ অপরাহ্নে বর্ষণস্নাত বসুধার মাটিতে স্নিগ্ধতা সতেজতার মূর্তিময়ী প্রতিমা যেন তুমি। এই গোধূলি বেলায় আজ শুনতে চাই তোমার না বলা কথা। বলো কল্যাণী, তোলো আনত মুখ, উন্মীলন করো আঁখিপল-ব।

কিছু পূর্বেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। এখন অস্তায়মান সূর্যের শেষ দীপ্তিতে প্রদীপ্ত যেন বিশ্বচরাচর। সূর্যের এহেন সুপ্রিয় আলাপচারিতায় বিগলিত সন্ধ্যামণির ওষ্ঠকম্পিত, দেহ শিহরিত, অন্তর বিমোহিত। দখিনা পবন এসে হিলে-ল তোলে শাখায় পল-বে। বহু চেষ্টায় সংকোচ দ্বিধা কাটিয়ে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় প্রণতি জানায় সে অস্তাচলগামী জ্যোতির্ময়ের পদপ্রান্তে। অর্ধস্ফুট - প্রীতিপূর্ণ চিত্তবার্তা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয় - 'প্রভু, দীনা আমি। প্রতি নিশান্তে ম্রিয়মান হয়ে অবশেষে ঝরে যাই, বৃন্তচ্যুত দেহ আমার মাটিতে অহরহ মিশে যায়। সারাদিন ধরে দেব দিবাকরের উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে ধন্য সর্বচরাচর। উদিত দেবতাকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দূত হিসাবে বরণ করে বিশ্ববাসী। শুধু ভিখারিনী আমি, বঞ্চিতা সন্ধ্যামণি। সারাটা দিন সর্বশক্তি, প্রযত্ন, প্রয়াস নিয়োজিত করি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে। যদি অপরাহ্নের মধ্যেই আমার প্রতিটি দল সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরতে পারতাম তবে তোমার দর্শন পেতাম; কিছুটা সময় বেশি পেতাম সূর্যের সান্নিধ্যলাভে। কৃতার্থ হতো আমার পার্থিব জীবন। কিন্তু এমনই জীবনধর্ম, যখন তুমি কর্তব্যশেষে বিদায় নাও, তখনই আমাকে মেলতে হয় প্রতিটি দলমন্ডল। সম্পূর্ণ প্রস্ফূটিতা সন্ধ্যামালতী তোমার সাক্ষাৎ পায়, তবে দুদন্ডের জন্য। অতৃপ্ত নয়ন এবং তৃষ্ণার্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি আমি; কারণ এ যে জীবনেরই ধর্ম। গোধূলিতে বড় শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ তুমি। তোমার স্বর্ণালী বিভায় ওই সুদূর দিগন্তও উদ্ভাসিত মায়াময়। ধন্য আমি জীবিতেশ্বর, ধন্য আমার কুসুম জীবন এই অপার্থিব স্বর্ণরাগ রঞ্জিত তোমার অতুল ঐশ্বর্য দেখে। কিন্তু হে মহাস্বামী, বড় সাধ জাগে দীর্ঘক্ষণ তোমার সাহচর্য পেতে। দয়া পেয়েছি তোমার। নয়তো অস্তিত্বই তো সম্ভব হত না। তোমার অনুগ্রহে, সহায়তায় এ জীবনের স্থায়িত্ব। বহুদিন থেকে একটি দুর্মর বাসনা আমার অন্তরকে আকুল করেছে, প্রভু। স্পর্ধিত রমনীর প্রগল্‌ভতা নিজ গুণে মার্জনা করো

দেবাদিত্য। বিশ্ব জনমুখে তোমার অনির্বচনীয় তেজঃরাশি সম্পর্কে। বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য তথ্য শুনেছি, মহাত্মা। স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমারই ভাগ্যহীনতার দোষে। বড় ইচ্ছে করে দীননাথ, তোমার কৈশোর যৌবনের দ্যুতি সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে। সম্ভব নয় হয়তো এই হতভাগিনীর স্বপ্নপূরণ। কিন্তু তুমি তো অন্তর্যামি - তিমির মুক্ত করো যেমন এ বিশ্বের অন্দর কন্দর, তেমনই প্রবেশ করো মানুষের হৃদয়ের গহন গভীর প্রকোষ্ঠেও, আমার আকাঙ্খা সম্বন্ধে তুমি তো অবগত আছো, প্রভু কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দাও এক সুবর্ণ সুযোগ। দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হওয়ার সৌভাগ্য যাচে এই সন্ধ্যামণি।

বিদায়ক্ষণ প্রায় সমাগত। কৌতুক করবার ইচ্ছা দমন করতে পারলেন না বিদায়ী রবি; স্মিত হাসিতে সন্ধ্যামণির আগ্রহী দৃষ্টিতে বুলিয়ে দিলেন স্নেহস্পর্শ, বললেন, 'শুচিস্মিতা, দিবসে তুমি নিজের ঐশ্বর্য বিকশিত করলে নিশানাথ মনঃক্ষুন্ন হবেন যে। প্রমোদ কানন থেকে তার সখীকে হরণ করে নিয়ে যদি দিবসেই বর্ণ গন্ধের হাট বসিয়ে দিই, তবে শশাঙ্কের আনন্দের ভোজে ঘাটতি দেখা দেবে যে....'।

সন্ধ্যামণি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রবির চোখে; গভীর প্রত্যয়ে জানাল - 'কে নিশানাথ, প্রভু? সেও তো তুমিই। তোমার প্রতিভাস আর প্রতিচ্ছবি ওই স্নিগ্ধসোম। দীনা - হীনা কুসুম আমি, বর্ণে - গন্ধে অকুলীন; কিন্তু জাগতিক তত্ত্ব সামান্য হলেও জানে এই সায়নিকা। তাই পরিহাসে আমাকে ভোলাতে পারবে না, সর্বশক্তিমান। পূরাত্ত মানস আমার। তোমার সর্বরূপ স্বরূপ দর্শনে ব্যাকুল হৃদয়া এই সন্ধ্যামণি। ফুলেদের দলে অনভিজাত অখ্যাত আমি। বর্ণ গন্ধ চেহারায় নেই আমার কোনো মদিরতা। শুধু এক বিশিষ্টতা আছে, নাথ - সূর্য পূজারিনী আমি। দিনে দিনে অর্ঘ্য সঞ্চিত করেছি চিত্তডালিতে। অঞ্জলি অর্পণ করা সম্ভব হয়নি, দেবতা। শুধু কৃতাঞ্জলিবদ্ধ থেকেছে এই করপল-ব। সর্বসমর্পণের মুহূর্তে দেখেছি অদৃশ্য তুমি — চলে গেছো দূর নীলিমার অদৃষ্টলোকে। ফেলে গেছো তোমার পদচিহ্ন। পূজা সমাপন হয়নি আমার আজও - আজ পেয়েছি তোমার সম্ভাষণ। আমার প্রাণের দেবতা ডেকেছেন, এতদিনে দয়া করেছেন অভাগিনীকে। আদিত্য নিজের রক্তিম নয়ন কিঞ্চিত সংকুচিত করলেন; প্রসন্ন হাসিতে পূর্ণ হল তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়ব; বললেন — 'সূর্য পূজারিনী সন্ধ্যামণি নামেই কি শুধু পরিচিতি পেতে চাও, কন্যা? দিবাকরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন তো পৃথিবীর সকল জীবের প্রথম ধর্ম ও কর্ম। ব্যতিক্রমী নও তো তুমি, সন্ধ্যাকুসুম। আমার পদপ্রান্তে প্রণত হলেই কি তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে, সুতনুকা? আর কিছু চাও না? আরও অতিরিক্ত কিছু?

সন্ধ্যামণির বিহ্বল দৃষ্টিতে মনচ্ছায়া পতিত হল আসন্ন সন্ধ্যার, নাকি লজ্জার? সহসা সংকোচ আর প্রত্যাশায় সে নিজেকেই করে বসল একটি মৃদু প্রশ্ন — 'আরও অতিরিক্ত কিছু?' তারপর সূর্যের দিকে কোমল নেত্রপাতে ধীরে ধীরে প্রকাশ করল নিজেকে — 'আমি নগন্যা নারী। সর্বশক্তির উৎস তুমি, মহানুভব অরুণ। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ছাড়া কী আছে আমার? শুধু তোমার পদতলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারি, প্রভু। আরও অধিক কিছু প্রার্থনা যে অশোভন - বিসদৃশ ...'।

ওষ্ঠে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে শান্ত তপন প্রশ্ন করলেন — 'আমি প্রান্তপৌঢ় - তুমি তরুণী সন্ধ্যাপুষ্প, তাই কী বৈসাদৃশ্যের প্রসঙ্গ উঠেছে তোমার অন্তরে? তাই কি পারলেনা কুমারী, আমাকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে? শুধুই শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য সাজিয়েছো

ডালিতে? নেই কি হৃদয়ে তোমার প্রণয় সম্পদ? ঘোষণা করলে স্বমুখে, সূর্য পূজারিণী তুমি। পারলেনা স্বীকার করতে ' সূর্যপ্রিয়া আমি' — কেন এই ছলনা বালা? কেন সত্য গোপন? আমি যে দেখেছি তোমার রাগারুন মুখে চোখে দুর্নিবার প্রেমোচ্ছ্বাস। কেন বিদায়ের এই পরম ক্ষণেও আত্মপ্রকাশ করতে পারলেনা সন্ধ্যামণি? কেন বুঝলে না, শাখামূল বেষ্টিত বটের পরিধিতেও যে নিক্ষেপ করে দিব্যালোক, সেই বিশ্বজ্যোতি এক বালিকার হৃদয়গহ্বরও উদ্ভাসিত করতে পারে নিমেষেই। বলো প্রিয়ে, সংকোচ দ্বিধা লজ্জার অকারণ বাধা দূর করো — সত্যভাষণ শুনতে চায় আজ দিবাকর ভূমিকন্যা সন্ধ্যামণির মুখে।

সহসা সন্ধ্যামালতীর আঁখিপল-বে দেখা দিল অশ্রু মুক্তাবিন্দু। এক দুঃসহ আবেগে সে যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চাইছে বিদায়ী ভানুর চরণযুগলে। পুলকে রোমাঞ্চে কম্পিত কুসুমের সপ্রেম দৃষ্টির ভাষা নির্ভুলভাবে পাঠ করলেন প্রাজ্ঞ বহুদর্শী সূর্য। কিন্তু সময় আসছে ঘনিয়ে, আরও প্রান্তবর্তী হচ্ছেন তিনি, বিদায়ক্ষণ সমাগত। এক সুক্ষ্ম কারণে কিঞ্চিৎ বিচলিত বৃদ্ধ ভানু। কেন বেদনায় মমতায় আজ তাঁর পরিপূর্ণ হিয়া? কেন তার বলিষ্ঠ মনেও এই ব্যথা অনুভব? এরই নাম কি প্রেম? সংবেদনশীল দিবাকর জীবনে বহুবার তো লাভ করেছেন প্রেমসম্পদ। তবে আজ বিদায়বেলায় ওই প্রান্তবর্তিনী সন্ধ্যাকুসুমের জন্য এত কেন কষ্ট হচ্ছে তাঁর? অনাদি অতীত থেকে কী মহাকর্মযজ্ঞ পালন করে চলেছেন কর্তব্যনিষ্ঠ দিবানাথ। কত কুমারীর ব্রতের অর্ঘ্য গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে। সংখ্যাহীন মুনি - ঋষি - বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়মনিষ্ঠ ভক্তসাধক থেকে শুরু করে নবোঢ়া তরুণী অশীতিপর বৃদ্ধার সূর্য প্রণামের পূণ্যমন্ত্র প্রতিটি উষায় সাঁঝে আজও শ্রবণ করেন তিনি। বর্ণে - গন্ধে অতুলনীয়া সুন্দরী ফুলেদের যৌবনরাজ্যেও তাঁকে কর বিস্তার করতে হয় অহরহ। সদ্য বিকশিত অসাঘ্রাত কুসুমের প্রথম আঘ্রাণ তো তিনি আর সমীরণ যুগ্মভাবে লাভ করে থাকেন। নিজের ক্ষমতায় এবং ঐশ্বর্য্যে হৃদয়নিহিত প্রতিটি আকাঙ্খা বাসনা সাধ যে পরিতৃপ্ত। কোনো অভাববোধ তো নেই তাঁর অন্তরে। তবে কী হল আজ? করুণ ব্যথায় কেন ছেয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ ভানুর মন ? সন্ধ্যামণিকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি? পৃথিবীর প্রতিটি অণু পরমাণুকেই তো তিনি ভালোবাসেন — সর্বত্র ছড়িয়ে দেন জীবন উষ্ণতা। তবুও আজকের অনুভব যে অনেকটা স্বতন্ত্র। কেন আর পা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না সামনের পথে? কেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে - ওই রজনীরঞ্জার কোমল মধুর দৃষ্টিচ্ছায়ায় ? আহা ! বড় দুখিনী সন্ধ্যামণি। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন, আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত। কিন্তু নিবেদিত প্রাণা এক প্রেমময়ী কিশোরী। কী সরল স্বীকারোক্তি! কেন বাঁধা পড়তে ইচ্ছে করছে ওই সরলা কন্যার সলাজ প্রণয়পাশে ? তিনি কি আজকাল বড় ক্লান্তি অনুভব করেন? তাই কি শ্রান্ত দেহটাকে শিথিল করে দু'দন্ড বিশ্রাম পেতে ইচ্ছে করছে ওই অতি সাধারণ সন্ধ্যামণির শ্যামল কুটিরের শান্তিতে? এহেন সাধ যে তাঁকে মানায় না। তিনি যে চির অক্লান্ত কর্মবীর। আলো আর উত্তাপদানের গুরুদায়িত্ব যে স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন সৃষ্টির আদিলগ্নে।

সূর্যের শেষ বিভা এখন শুধু গগনে গগনে। ছায়া ঘনায়মান ধরায় শেষবারের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আদিত্য; দেখলেন সন্ধ্যামণির দু-চোখে করুণ মিনতি। দিবাকরের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসছে। বড় দরদে তিনি বললেন - 'এই বর্ষণ ক্ষান্ত শেষ গোধূলিতে আশীর্বাদ করি প্রিয়তমা, আনন্দে থাকো এমনই সারল্যে প্রীতিতে যথার্থতায়। রূপে আমায়

ভোলাতে না পারলেও ভালোবাসায় পেরেছো। সাধন করেছো দুঃসাধ্য কাজ। যাওয়ার আগে নিঃসঙ্কোচে একথা স্বীকার করছি আমি। দিবায় তুমি এসো না প্রিয়ে। প্রতি গোধূলির সাক্ষাৎ হবে আমাদের। প্রান্তপৌঢ় সূর্য আর কিশোরী সন্ধ্যামণির দৃষ্টি বিনিময়ে প্রীতিঘন থাকুক ধরণীর এক ক্ষুদ্র প্রান্ত। ক্ষণিকের মিলন হোক অক্ষয় অনন্ত। কেঁদো না এই পরম ক্ষণে, সন্ধ্যামালতী। আজ যে সম্পদ আমায় অর্পণ করলে তাই হবে মহাযাত্রিকের পরম পাথেয়। বিদায়লগ্নে যে অরুণ রাগ তোমায় দিলাম, সেই দীপ্তিতে তুমিও চিরকাল রবে সুবর্ণা - সুতন্বী। বিশ্ববাসী জানবে অস্তায়মান সূর্যের অন্তিম রক্তিম আভায় বর্ণময়ী বসুধা তনয়া সন্ধ্যামণি। ভানুর শেষরেখা আপন অঙ্গে ধারণ করেছো — নিষ্ক্রমণের প্রাকলগ্নে তপনের প্রেমে রঞ্জিতা সায়ন্তনী।

মনের মানুষ

- মুকুল সাহা

আমার রবীন্দ্রনাথ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর দেবতা নন। ঠাকুর দেবতারা ভুলচুক করেন না, সব ঠিকঠাক করেন। কারণ, তাঁরা মানুষ নন। আমার রবি নিখাদ মানুষ। দুঃখে কাঁদেন, গান বাঁধেন। আনন্দে - আবেগে ও গান বাঁধেন। মানুষ রবি দেশ ভাঙনে (১৯০৫) মাঠে নামেন। ভাঙন রোধে ভিন ধর্মী ভাই - এর হাতে রাখি বাঁধেন। শাসকের পশুত্ব (জালিয়ানওয়ালা বাগ) দেখে বেদনায় কঁকিয়ে ওঠেন। রাগে দুঃখে শাসকের দেওয়া উপাধি (নাইট) ফিরিয়ে দেন। খেতে বসা কারাবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর গুলি বর্ষণে গর্জে ওঠেন। (হিজলি - ১৯৩১) আবার স্বদেশীর নামে কাপড় পোড়ানোর নিন্দে করেন। টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয়ে (১৮ই জুন,১৯১৬) যুদ্ধ বিরোধী এমন বক্তৃতা দেন যা শুনে আর এক কালান্তরের পথিক, রঁমা রঁলা বলে ওঠেন, "ওটা জগতের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের বার্তা।" আমার রবি-ই প্রথম মানুষ যিনি বিশ্বের দরবারে ভারত তথা এশিয়ার জন্য একটু স্থান করে নিয়েছিলেন। তার আগে ভারত সম্পর্কে ইউরোপ ছিল অজ্ঞ। তার অবজ্ঞার ও অন্ত ছিল না। ভারতের ও ইউরোপ সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। সে মগ্ন ছিল তার আধ্যাত্মবাদ নিয়ে। বিশ্ব মানবের কাছে তার কিছু দেবারও ছিল না, নেবারও নয়। যুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সব দেশের বুদ্ধিজীবিদের ভ্রাতৃ বন্ধনে আনার জন্য রম্যাঁ রল্যাঁ যে মানবতার ঘোষণা (Declaration of independance of mind) প্রচার করেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্যতম স্বাক্ষরকারী (আগষ্ট-২৬,১৯১৯)। রম্যাঁ রল্যাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ এর সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২১ সালের ২১শে এপ্রিল। তাঁর সাথে আলোচনা চলছিল গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে। মানুষ রবি বললেন ভারত হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ করে না। রম্যাঁ এবং রবি দুজনাই ছিলেন যুক্তিবাদী। রম্যাঁর পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে একাত্ম হয়ে ভাববাদী দর্শনের মোহ কাটিয়ে বস্তুবাদী দর্শনকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী হয়েও ছিলেন ঔপনিষদিক আধ্যাত্মবাদী। রবি মুসোলিনী এবং ইতালী সরকারের অতিথি হয়ে ইতালি গেলেন ১৯২৬ সালের ৩০শে মে। মুসোলিনীর বীরচিত চেহারা আর ছলচাতুরীতে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "মুসোলিনীই বর্তমান যুগের নেপোলিয়ন"। ইতালি থেকে যখন ভিয়েনা এলেন তখন তিনি মুসোলিনীর ছলাকলায় সম্পূর্ণ অভিভুত। রঁল্যাকে বললেন, যদি এমন আশঙ্কা হয় যে নিরর্থক মারামারি করে একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে তবে সাময়িক ভাবে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়াতে মানুষই লাভবান হবে। রঁল্যা রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী রূপ, জাতি বিদ্বেষ, হিংসা যুদ্ধবাজ চরিত্র সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। ইতিমধ্যে মুসোলিনী রবি-র কথা রং চড়িয়ে স্বপক্ষে প্রচার করতে থাকেন। সারা বিশ্ব রবির নিন্দায় মুখরিত। তারা বলতে থাকে আপনারা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে পশু বলে নিন্দে করেন, আবার সেই পশুকেই ইতালীতে সমর্থন করেন। অবশেষে ভিয়েনা থেকে রঁল্যা কে লেখেন, পাপ করেছি ইতালী যেয়ে, এখন প্রায়শ্চিত্য করছি। ১৯৩৮ সালে কুখ্যাত মিউনিখ, চুক্তির ফলে চেকোস্লাভিয়ার সর্বনাশে ব্যথিত ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা "ওই দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা চলে গীর্জায় চাটুবাণী

দিয়ে ভুলাইতে, দেবতায় ....."। ইতালি যখন এ্যবিসিনিয়া আক্রমণ করলো মানুষ কবি লিখলেন, "উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে স্রষ্ঠা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বার বার করছিলেন বিধ্বস্ত"। আবার রাশিয়ার চিঠিতে কবি লিখলেন, (১৯৩৩) সালে জার্মান ভাইস কনসাল যে বক্তৃতা দিয়েছেন ন্যাতসি মতবাদের ওপর এবং তার ওপর মানুষ রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য রেখেছেন তা Calcutta Review কাগজে বেড়িয়েছে এবং তা ইউরোপের ইনটেলেকচুয়্যাল কেন্দ্রে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, তীব্র বিরুদ্ধতা জানিয়েছে। তারা বলছে একদিকে শেষ পর্যন্ত কবি ইতালির ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করলেন, আবার কদিন পরই জার্মান ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করলেন আবার কদিন পরই জার্মান ফ্যাসিবাদকে সমর্থন ও করলেন, কবিকে তারা 'Unprincipled opportunist' বলে গাল পাড়লেন। তারা বলছে - রবি-র Nationalism-কে সমর্থন করার অর্থ তাঁর internationalism কে পরিত্যাগ করার সামিল। ইহুদিদের ওপর নাৎসিরা যা করেছে বা করছে তা সমর্থন কের জার্মান কনসাল বক্তব্য রেখেছেন, রবি তাকে নিন্দা করে একটি কথা ও বলেননি। অর্থাৎ ধরে নিতে হবে তিনি racialism এর সমর্থক। ইউরোপের মানুষ জানে কী প্রচন্ড আয়োজন করছে নাৎসিরা যুদ্ধের জন্য। এর বিরুদ্ধতা না করার অর্থ রবি যুদ্ধের সমর্থক। সমস্ত প্রসিদ্ধ লেখকদের বই ছবি পুড়িয়ে বীভৎস cultural reaction নাৎসিরা জার্মানে এনেছে। জার্মান কনসালের বক্তব্যের বিরুদ্ধতা না করে রবি বই পোড়ানো সমর্থন করেছেন। এই দুঃখ জনক অবস্থা থেকেও রবীন্দ্রনাথ উঠে এলেন ১৯৩৭ সালে যখন ভারতে তৈরী হল এক সংস্থা যার নাম League against fascism and war। এর সভাপতি হলেন আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, স্বামী সহজানন্দ, এস. এ জাঙ্গে প্রমুখ ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ মানুষ ছিলেন, ঠাকুর দেবতা নন। মানুষ ছিলেন বলেই ভুলভ্রান্তি, ওঠা নামা। মানুষ হিসাবেই আমি দেখি ঠাকুর দেবতা হিসাবে নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর দেবতা নন, মনের মানুষ।

তথ্যসূত্র ঃ
১) চিঠিপত্র রঁল্যা - রবীন্দ্রনাথ
২) চিঠিপত্র সৌমেন্দ্রনাথ - রবীন্দ্রনাথ।

উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অতীত ও বর্তমান নিদর্শন ঃ একটি সমীক্ষা

-ডালিম শেখ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদ স্বরূপ যে প্রতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ ওঠে তার ফসল হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। দীর্ঘদিন ধরে একদল মানুষ সমাজে পুরোহিত তন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলো। বৈদিক যাগযজ্ঞের আড়ম্বরতায় সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থান সম্পর্কে ডঃ রাধাকৃষ্ণান যা বলেছিলেন তা হল এই রকম যে কোন স্বতন্ত্র ধর্মমত হিসাবে বৌদ্ধধর্ম শুরু হয়নি। মূলত এটা ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদের এক অবশ্যম্ভব ফল। 'কর্মফলবাদ' উপনিষদীয় এই তত্ত্বটিকে গৌতমবুদ্ধ নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন। এটা অনেকটা নতুন বোতলে পুরানো ঔষধের ন্যায় কাজ হল। তিনি প্রচার করলেন যাগযজ্ঞ,পশুবলি দিয়ে স্বর্গে যাওয়া যায় না। বর্তমান কর্মই মানুষের ভবিষ্যত জীবনের নিয়ামক। তিনি সুকৌশলে পরলোক, আত্মা, অমরতা এই দুরূহ বিষয়গুলি এড়িয়ে গেলেন। মানুষের দুঃখ কষ্ট এগুলিই বাস্তব সমস্যা। আর এগুলি থেকে মানুষকে মুক্ত করাই তিনি আশু কর্তব্য বলে মনে করেন। খুব অল্প সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই ধর্মের এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পিছনে তৎকালীন ভারতের এক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা পটভূমি হিসাবে কাজ করেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের জটিলতা, যজ্ঞের নামে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ ব্রাহ্মণরা তুকতাকের নামে হস্তগত করত। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যুনতম সম্মান ও মর্যাদা জুটত না। তাই সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। এই সময়ে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় লোহার ব্যবহার বাড়ায় কৃষিকার্যে গরুর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যজ্ঞে প্রচুর গো হত্যা হত। এই সমস্ত কারণে এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদের অবসান চাইছিল। ডঃ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সার্বিক হতাশা বোধ সমগ্র সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল আর গৌতম বুদ্ধ সেই হতাশা কাটিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এক দিশা হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধর্ম দর্শনের মূল বিষয়ই ছিল সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আর সেটি হবে অহিংস আচার আচরণের মাধ্যমে। তিনি জন্ম কৌলিন্যের পরিবর্তে কর্মদক্ষতার উপর জোর দেন। বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথার বাস্তবতা ও কার্যকারিতাকে একেবারে অস্বীকার করেনি। তবে তিনি বৈদিক প্রচলিত জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করেন। তিনি ঘোষণা করলেন সমাজের প্রত্যেকেরই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের সুযোগ আছে। উদ্দালক জাতকে বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শুদ্দ, চন্ডাল এবং পুক্কস সকলেই পূণ্যবান ও আত্মসংযমী হতে পারে। সকলেই নির্বান লাভের যোগ্য। জন্মের কারণে নয় বরং কর্মের দ্বারাই মানুষই নীচ বা ব্রাহ্মণ হয়' (সূত্রনিপাত)। আবার 'বাসেসট সূত্র' তে বলা হয়েছে যিনি আকিঞ্চিন এবং অনাসক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ' মাথায় জট রাখলেই কেউ ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হয় না। যাইহোক একটা বিষয় পরিষ্কার যে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব পটভূমি রচনা করে। আমরা উত্তরবঙ্গে

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতেও তার অবদান এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো। মহানন্দা নদীর পূর্বদিকে এক প্রাচীন সমভূমি যা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বরেন্দ্রভূমি বলে পরিচিত। 'রামচরিত' কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী বরেন্দ্রী দেশ হল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী এক দেশ। এই অঞ্চলটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে 'বরিন্দ্র এবং কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রকে পাল রাজাদের পিতৃভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই অঞ্চলের ভূমিরূপ ঢেউ খেলানো, উচুঁ নীচু, যার মৃত্তিকা ল্যাটেরাইট প্রকৃতির। আমরা যে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছি, সেই উত্তরবঙ্গের পূর্ব নাম ছিল 'পুন্ডবর্ধন'। এইরূপ নামকরণের পশ্চাদে বেশ কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একদা এই অঞ্চলে পান্ডুরোগের খুব প্রবণতা ছিল। যার থেকে এই পুন্ড্রবর্ধন নামকরণ। অন্য এক মতে 'পুন্ড্র' হল আখের এক প্রজাতি, যা এই অঞ্চলে অধিক ফলন হত। আবার আত্রেরীয় আরণ্যক 'পুন্ড্র' হল এক শ্রেণীর অনার্য গোষ্ঠী, যারা এই অঞ্চলে বসবাস করত। আর সেই থেকেই পুন্ড্রাবর্ধন। প্রাচীনকাল থেকেই উত্তরবঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বাস। আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করছি তখন বাংলাদেশ চারটি কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। পুন্ডর্বধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত। এই চারটি কেন্দ্রে হিন্দু অধ্যুষিত হলেও দেশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ ও সংঘের অস্তিত্ব ছিল। যুয়াং চোয়াঙের এক বিবরণ থেকে জানা যায় তখন পুন্ড্রদেশে (বরেন্দ্রভূমি) কুড়িটি সংঘরাম এবং সেগুলিতে ছয় হাজার বৌদ্ধ শ্রমনদের বাস ছিল।

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক আকর্ষনীয়তা ও স্থানগত বৈশিষ্ট্যের দরুণ এখানে বহু জনজাতির বাস। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমল থেকে পাল রাজত্ব পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধমঠ ও বিহারের অস্তিত্ব বজায় ছিল। বিম্বিসারের পুত্র অশোক প্রিয়দর্শী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। মহাবংশ থেকে জানা যায় সিংহাসন দখলের জন্য অশোক এক রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃযুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন শিবের উপাসক। কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতার পর তিনি অহিংস পথ অবলম্বন করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন, তাঁরই আমলে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি সভার আয়োজন করা হয়। অশোকের আমলেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে সিংহল, মিশর, ব্রহ্মদেশ, গ্রীস এবং আফ্রিকার সিরিন প্রদেশে প্রচারিত হয়। তিনি এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মমহমাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যের ফলে এই বরেন্দ্রভূমির করতোয়া নদীর পূর্বতীরে পুন্ড্রবর্ধন নগরীতে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ স্মারকের সন্ধান মেলে। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াঙ চোয়াঙের বিবরণীতেও বরেন্দ্র অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের নানান ইতিহাস পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের আমলের পূর্ব থেকেই বরেন্দ্রভূমিতে বৌদ্ধ জনজাতির বসবাস ছিল। জনশ্রুতি আছে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আগে ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে পুন্ড্রনবাসী পাঁচ হাজার বৌদ্ধ শ্রমনদের প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন। অশোকের পরবর্তী যুগের কুশান সম্রাটগণ বরেন্দ্র অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন। কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। তিনি বহু পুরানো বৌদ্ধমঠ, বিহার ও চৈত্য সংস্কার করেন। কিছু নতুন মঠ ও চৈত্য নির্মাণও করেন। এই মঠগুলি প্রথম দিকে অস্থায়ীভাবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধ্যান ও তত্ত্বালোচনার কাজে ব্যবহৃত হত। অর্থাভাবে সেগুলি বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরী হত। কিন্তু পরের দিকে মঠগুলি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী করা হল। রাজাদের অর্থানুকূল্যে সেগুলি এক একটা প্রাসাদাকার প্রাপ্ত

হল। মঠগুলি সাধারণত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আকৃতি প্রাপ্ত হত। পরবর্তীকালে এই মঠগুলিই তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় মঠ ও বিহারগুলিতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র হতে বহু বিদ্যানুরাগী ও অধ্যাত্ম - জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ ভিড় করতেন। সম্রাট কনিষ্ক জলন্ধরে এক বৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বান করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কনিষ্ক মহাযান অনুরাগী ছিলেন। তারই উদ্যোগে বৌদ্ধধর্ম চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া ও ম্যধ এশিয়ার নানান দেশে প্রসার লাভ করে। ফা-হিয়েন এই প্রসঙ্গে বলেছেন - তখন বরেন্দ্রভূমির প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বৌদ্ধমঠ, মন্দির ও স্তূপ দেখো যেত।

পাল বংশের রাজাদের আমলেই গৌড় বরেন্দ্রতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। পাল বংশীয় রাজারা যে বৌদ্ধ ছিলেন সে বিষয়ে বৌদ্ধ শিলালিপি, বিহার ও সংঘরামগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারটি ছিল বরেন্দ্রর সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধকীর্তি। এটি ছিল সমস্ত বরেন্দ্র বাসীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থান। এই বিহারে দুশো কক্ষে এক হাজার শ্রমনদের বাস ছিল।

বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর দীর্ঘদিন এই বিহারে অধ্যায়ন করেন। এছাড়াও পাল রাজাদের নির্মিত দিনাজপুর জগদ্দল মহাবিহার, চীনামঠ, দেবী কোট, সিতাকোট বিহার ছিল বিশেষ উলে-খযোগ্য। পাহাড়পুর বিহার যার স্বর্ণযুগ চারশো বছর ধরে স্থায়ী ছিল। এই বিহারটিও সমস্ত শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। পাহাড়পুরের মতো সুবৃহৎ সুসমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের এই উপমহাদেশের কোথাও ছিল না। বরেন্দ্র মাটিতে পাল রাজা দ্বারা আরো অনেক বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া যায়। ডঃ নীহার রঞ্জন এর মতে সোনাপুরির পরই বাংলায় প্রসিদ্ধ বিহার ছিল জগদ্দল। যেটি অবিভক্ত দিনাজপুরের ধামুইড থানায় অবস্থিত। এটির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। বিহারটি দ্বাদশ শতকের গোড়ায় রাম পালের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। তিব্বত, চীন, নেপাল, বার্মা থেকে বহু তীর্থযাত্রী ও জ্ঞান তৃষ্ণা ব্যক্তির আসা - যাওয়া ছিল এই বোদ্ধবিহারে।

দিনাজপুর জেলার অপর এক অন্যতম বৌদ্ধবিহার ছিল সীতাকোট বিহার, যার প্রাচীনত্বে বিস্ময় জাগে। এই বিহারটির শিল্প নৈপূণ্য এক অনন্য প্রকৃতির। আকারে এটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট, যার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২১৩ ফুট এবং বিহারটির সর্বমোট আয়তন ৪৫,৩৬৯ বর্গ ফুট।

পাল রাজত্বে টেরিকোটা, দেবী কোটা বৌদ্ধবিহার বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। সাম্প্রতিককালে Archological Survey of India & University of Burdwan (1971-72 to 74-75) -র তত্ত্বাবধানে মনোরামপুরে (পানাগড় বাজার সংলগ্ন) একটি বৌদ্ধস্তূপের আবিষ্কার করেন। এছাড়া খুব সাম্প্রতিককালে মালদার জগজীবনপুরে বেশ কিছু বৌদ্ধবিহারের সন্ধান মেলে, যেগুলি নবম শতাব্দীর Nandadirghika Udranga Mahavira নামে পরিচিত।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হল রূপান্তরের ইতিহাস। আদি বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হয় হনিযান - মহাযানে। বাংলায় সেন রাজত্বের পর বৌদ্ধদের অস্তিত্বের সংকট দেখা গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদের থেকে মুক্তি পেতে নিজেদের প্রকারান্তর করতে শুরু করল। তারা কিন্তু সহজে কুলীন ধর্ম বা সাম্যবাদী ইসলাম ধর্ম কোনটিতেই নিজেদেরকে বাঁধেনি। ফলত

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্করণ ঘটে যেমন - নাথ, সহজিয়া, সদ্ধর্মী ইত্যাদি। নাথ মতের মৌলিক জীবন দর্শনই ছিল মানুষের যত দুঃখ ও সুখ তার কারণ নিহিত ছিল এই অপক্ক দেহতে। তাঁরা মনে করত 'যা নেই দেহ ভান্ডারে তা নেই এই ব্রহ্মান্ডে'। নাথ পন্থীদের এই মতবাদ সমগ্র বরেন্দ্রবাসীর ভাবান্তর ঘটিয়েছিল যার প্রভাব আজও লক্ষ্য করা যায়। একথা বিশ্বাস করা যায় যে বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষদের অহিংস জীবন যাপন তা নাকি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব। বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই ধারা ক্রমশ বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির চাপে পড়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ লোকসংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য আচারিদের মধ্যে যে সদ্ভাবমূলক পরিচয় মেলে তা এই সব পূর্বোক্ত পরিবর্তনেরই ফলস্বরূপ।

এইসব নানান পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বৌদ্ধধর্ম একটা সময় নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলতে স্থানীয় দেবদেবীর সঙ্গে আপোষ করে। ফলে বৌদ্ধধর্মে ব্রজযান, সহজযান, কালচক্রযান মতো বিভিন্ন তন্ত্রকেন্দ্রিক শাখা প্রশাখার আবির্ভাব হয়। যেমন সহজযান যার উদ্ভব হয় পাল যুগে। এই সহজযানী আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্র মন্ডল প্রভৃতিই বর্জন করে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সত্যোপলব্ধি অন্তদর্শন প্রাপ্ত হওয়া, কৃত্রিম পন্থায় সম্ভব নয়, এরজন্য সহজ পন্থা অবলম্বন জরুরি এবং সেটা হল বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির অনুবর্তী হওয়া। কৌলিন্য প্রথার চাপে অত্যাচারিত বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত নাথপন্থী নয়ত সহজিয়া মতে রূপান্তরিত হয়। কেউ বা আবার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দত্ত,পালিত,ধর, প্রামাণিক, দাস এসব উপাধি যুক্ত নামগুলি সবই বৌদ্ধ স্মৃতি বহনকারী, এদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ 'দিব্যাবধান' অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে পৌন্ড্রবর্ধনে প্রথমে জৈন ও পরে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দিব্যাবধানে উলে-খিত আছে যে, অশোকের আমলে পৌন্ড্রবর্ধনের কয়েকজন জৈন চিত্রশিল্পী মহাবীরের পদতলে পতিত অবস্থায় বুদ্ধের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। সেই কারণে সম্রাট অশোক বিশাল এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ঐ শিল্পীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এবং উক্ত ঘটনার পর পৌন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পাল যুগে এমন কিছু বৌদ্ধ মূর্তির সন্ধান মেলে যার থেকে অনুমান করা যায় যে জলপাইগুড়িতেও বৌদ্ধ ধর্শের প্রভাব ছিল। জলপাইগুড়িতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা আজও নেহাত কম নয়। এদের মধ্যে আছেন তিব্বতীয় ও বার্মীয় ভাষাভাষী ভুটিয়া, সিক্কিমীয় ভুটিয়া, নেপাল ও ভুটান থেকে আগত শেরপাগণ প্রভৃতি। হীনযান, মহাযান, ব্রজযান, কালচক্রযান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাও আছেন - এঁরা প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্ম সম্মত ক্রিয়াকলাপ করেন এবং বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবদেবতায় বিশ্বাস করেন। আবার একটা বিষয় লক্ষণীয় "এই অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরই পানগোড়ার ধাঁচে তৈরী। তার কারণ হল এ অঞ্চলের মন্দির কারিগরদের অবচেতন মনে বৌদ্ধ পানগোড়ার প্রভাব রয়েছে বলে ডঃ বিশ্বাস মনে করেন"। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় সেন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেনরাজ বল-াল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। এবং কৌলিন্য প্রথা বিরোধী হিন্দু ও বৌদ্ধদের নির্যাতন শুরু করেন। চর্যাপদে সেনযুগের অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই সময়ে অনেক যোগী ও বৌদ্ধ নেপালে পালিয়ে যান।

মানবতার পূজারী সাম্যের প্রচারক এবং অহিংসায় মূর্ত প্রতীক গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে শত চেষ্টায় মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। উত্তর বাংলার বিভিন্ন

জনজাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা গেঁথে বসে আছে। উত্তর বাংলার দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও তরাই এর বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ জনজাতির বাস দেখা যায়। তাদের মননে ও জীবন যাপনে গৌতম বুদ্ধই হলেন তথাগত। সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৌদ্ধমঠ ও গুম্ফায় গৌতম বুদ্ধের ২,৫৫৮ -তম জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হল, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন NGO - ECO - TOURISM-র মেলবন্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে গৌতমবুদ্ধ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। ধর্ম্মপদ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধকে লালন পালন করেছেন। এমনকি তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন বিশ্বভারতীর মডেল ও পঠন পাঠন ব্যবস্থাপনায় তৎকালীন নালন্দা - তক্ষশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমরা আজও উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এলে বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফা আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে ওঠে, যেগুলিতে প্রবেশ করলে মন শান্ত হয়ে যায়, শরীরে এক প্রশান্তির হাওয়া বয়। গুম্ফার নির্জনতা ও নীরবতা এক গভীর অরণ্যের গভীরতাকেও হার মানায়। এইসব গুম্ফায় নেই কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বরের মতো ধর্মীয় চ্যালাদের অত্যাচার। এইসব গুম্ফায় কান পাতলে শোনা যায় —

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি (ধম্মপদ)

'শরণ' শব্দটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধদেবকে 'ভিষক' বলা হত। 'ভিষক' যেমন ভেষজ বিধানের দ্বারা রোগীর সমস্যার সমাধান করেন, তেমনি বুদ্ধ এই সংসারে দুঃখ কষ্টে কাতর মানুষদের তাঁর উপদেশ দিয়ে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করেন। এই সংসার হল সাগর আর নির্বান এত দ্বীপ, যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বুদ্ধদেবকে 'মহাত্রাণ' বলেছেন। আবার কোথাও 'শরণ'ও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে বুদ্ধের অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধকে তাঁর সমস্ত শরীর ও মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাইতো অতি কাতরভাবে তথাগতের কাছে শরণ প্রার্থনা করেছেন —

করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিময় করহ হরণ
দাও দুঃখ বন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়
(গীতবিতান)

কালের নিয়মে এই ধরাতলে বহু মনীষীর আগমন ঘটেছে। গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম এই কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশ কালের গন্ডী অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাতে পেরেছে। তাই তো বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে চীন, জাপান, সিংহল, মায়ানমার, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র ঃ —

১) কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি, জেলা সংকলন, পৃঃ ৪৭৮ - ৭৯

গ্রন্থতালিকা ঃ —

১) পালিভাষা - সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, ডঃ রাধারমন জানা, প্রস্তুক বিপনী, কোল - ৯
২) ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস ঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবঃ ২০০০, কোল - ১৩
৩) বৌদ্ধদর্শন ঃ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, চিরায়িত প্রকাশন কোল ঃ ৭৩
৪) বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব) ঃ নীহার রঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশার্স
৫) ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ ঃ ইছামুদ্দিন সরকার, এন.এল. পাবলিশার্স, আসাম।
৬) কিরাতভূমি জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন ঃ সম্পাদনা - অরবিন্দ কর
৭) গীতবিতান ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮) বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ঃ স্বামী বিদ্যারণ্য
৯) Essaay on Cultural History of North Bengal : Sailen Debnath, N.L. Pub. Siliguri, W.B.

ইতিহাসে কর্ণগড়

- প্রসূন ধর

পশ্চিম মেদিনীপুরের গোদাপিয়াশালের নিকটবর্তী একটি ছোট গ্রাম কর্ণগড়। গ্রামটি ছোট হলেও এর ঐতিহাসিক পটভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ বিরোধী ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহে কর্ণগড় এবং কর্ণগড়ের রাজমহিষী রানী শিরোমণি এক বিশিষ্ট স্থান অধিগ্রহণ করে আছেন। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত কর্ণগড়ে সিংহ রাজবংশ রাজত্ব করত। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণগড়ের রাজপদে বসেন রানা রাম সিংহের পুত্র যশবন্ত সিংহ। তাঁর ৩৬ বছরের রাজত্বকালের অমর কীর্তি হল দেবী মহামায়া ও ভয়া এবং শিব দন্ডেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা। সুদুর উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্বেতপাথর এনে উৎকলীয় স্থাপত্য কলায় নির্মাণ করান এই দেবী মহামায়া ও শিব দন্ডেশ্বরের মন্দির। সাধক কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে রচনা করেছিলেন শিবায়ন কাব্য।

যশবন্ত সিংহ ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-এর নিকট থেকে তিনি রাজকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সরফরাজ খাঁ যে সময়ে ঢাকার নায়েব ছিলেন সে সময় এই যশবন্ত সিংহ ছিলেন তাঁর দেওয়ান। ১৭৪৮ সালে যশবন্তের জীবনাবসান হলে তাঁর পুত্র অজিত সিংহ কর্ণগড়ের রাজা হন। তিনি প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে জঙ্গলমহলের সকল রাজাদের তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ইনিই কর্ণগড়ের শেষ রাজা। ১৭৫৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই রানী ছিলেন রাণী ভবানী ও রানী শিরোমণি। রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দুই রানী ভবানী ও শিরোমণি জমিদারীর অধিকারিনী হন। ঐ সময় জমিদারীর দেখাশোনা করেন নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খাঁন। ১৭৬০ খ্রীঃ রানী ভবানী দেহত্যাগ করেন। একই বছর নবাব মীরকাশিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী পাওয়ার জন্য ইংরেজদের কাছে চুক্তি করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে বর্ধমান, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ছেড়ে দেন। এরফলে বিহার, উড়িষ্যা সহ মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল এলাকায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনের সূত্রপাত ঘটে। উন্মত্ত ইংরেজদের হাতে একটা প্রহেলিকার মত এসে গেল মেদিনীপুর। তাই রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা চলে। মোঘল আমলে এই জেলার যেসব ছোট, বড় রাজা ও জমিদার ছিল, তারা ছিল অনেক স্বাধীন। নিজস্ব সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল থাকত। নিজেদের ধন সম্পদ রক্ষা ও পাশাপাশি শত্রু দমনই ছিল এদের কাজ।

ইংরেজরা জমিদারদের উপর অনেক বেশি খাজনা দাবি করল। এখানেই শুরু হল প্রথম বিপত্তি। ইংরেজদের অস্বাভাবিক খাজনার দাবিতে জমিদারেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল। অনেকেই খাজনা দিতে অস্বীকার করল। ফলে জমিদারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠল। মেদিনীপুরের এই কলহে প্রথম জড়িয়ে পড়েন ময়নাগড়ের জমিদার রাজা জলদানন্দ বাহুবলীন্দ্র। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বেশী খাজনা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ইংরেজরা তাকে বন্দী করার চেষ্টা করেন। তিনি সোজা কলকাতায় গিয়ে নিজে রেহাই পান। ধীরে ধীরে সেই প্রভাব গোটা মেদিনীপুরেই ছড়িয়ে পড়ে। কর্ণগড়ের রানী শিরোমণিও তা থেকে রেহাই পেলেন না।

এরপর ইংরেজরা চোয়াড়দের উপরও কালো থাবা বসিয়ে ছিল। ১৭৬৬ খ্রীঃ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জমিদারের অধীনে পাইক চোয়াড়েরা যে নিষ্কর জমি ভোগ করে তা কেড়ে নিয়ে তার রাজস্ব আদায় করা হবে। এই সিদ্ধান্তের খবর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকলে পাইক সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। জমিদারদের অধীনে এরা সংগঠিত হতে থাকে। তারপর প্রায় দুই দশক পরে এর প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠে।

পাইক হল রানা বা জমিদারদের পুলিশ বা মিলিটারির মতো প্রশাসনিক বাহিনী। শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহে তারাই অংশগ্রহণ করত। এদের নেতাকে বলা হতো সর্দার। এই গ্রাম্য পুলিশ বা পাইকেরা তাদের কাজের জন্য বেতন বা ভাতা পেত না। তাদের কাজের বিনিময়ে তারা জমিদারের অধীনস্থ জমি ভোগ করত, যার জন্য কোন কর বা খাজনা দিতে হত না। কোন কোন পাইকের এইরকম নিষ্কর জমির পরিমাণ ছিল ৬ বিঘা থেকে ২০০ বিঘা পর্যন্ত। এই জমিকে বলা হত - পাইকান জমি। দেখা যেত পাইকান জমি ভোগী পরিবারের লোকজনই বংশানুক্রমে পাইক হত।

এই সকল পাইকেরা অদ্ভুত রকমের পোশাক ব্যবহার করত। মাথায় বাঘের চামড়ার টুপি, বন্য জন্তুর লেজের কোমরবন্ধনী, লোহার বর্ম দিয়ে শরীরের বিশেষ অঙ্গ ঢাকা থাকত। সর্বদা তীর, ধনুক, টাঙ্গি, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা ও মশাল নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। কোন কোন জমিদার পাইকদের বন্দুকও দিতেন। এই অদ্ভুত বেশ পরে এরা গড়ের সামনে বা তোড়নের পাশে পাহারায় থাকত। রাজপ্রাসাদে মোতায়েন হোত, অভিযানে যেত, যুদ্ধ করত। এই পোশাক দেখলেই সাধারণ মানুষ ভয় পেত। এই সকল মানুষকে ইংরেজ ও ইংরেজদের পোষ্য দেশীয় মানুষেরা 'চোয়াড়' বা 'লায়েক' বলে গালাগালি করত।

পাইক বা চোয়াড়দের নিষ্কর জমি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় ইংরেজদের উপর পাইক বা চোয়াড়দের ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাঁধছিল। কিন্তু সঠিকভাবে তার ব্যাপ্তি ঘটেনি। এর বিস্ফোরণ ঘটল ১৭৯৩ - ৯৮ খ্রীঃ। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট১৭৯৩ খ্রীঃ পুরানো পাইকদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নতুন পাইক নিয়োগ করলেন। এর ফলে পূর্বের সর্দারেরা ক্ষমতা হারালো। এদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বিরোধিতা করল। পুরাতন অধিকার বজায় রাখার জন্য তারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। রানী শিরোমণিও চুপ করে থাকলেন না। তিনি এবং তাঁর লোকেরা ইংরেজদের এই মনোভাব সম্পর্কে জঙ্গলমহলের অন্যান্য সর্দারদের জানালেন। সর্দারেরা রানীকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আশ্বাস দেন। রানী ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হন। ফলস্বরূপ রামগড়ের কালেক্টর রানীর বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক গোলযোগের অভিযোগ তোলেন। রানীকে বিপর্যস্ত করার জন্য ম্যানেজমেন্ট ১৭৯৪ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারী রানীর জমিদারী নিয়ে নিলেন। পরিণতিতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। রানীর নেতৃত্বে চোয়াড়েরা ইংরেজদের সামনেই তাদের সবরকম ক্ষতি সাধন শুরু করল। মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ করে বিদ্রোহীরা আগুনের মশাল নিয়ে উদ্দাম আচরণ শুরু করে। ভয়ে মেদিনীপুর শহরের লোকেরা দরজা বন্ধ করে রাখে। ম্যাজিস্ট্রেটও অসহায় হয়ে পড়েন। সব কিছু তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। অবস্তা এমন হয় যে শহরে বসবাসকারী ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা কাঁসাই নদীতে গিয়ে নৌকাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এবং নৌকাযোগে কোলাঘাট হয়ে কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছিল। যদিও তা হয়নি, কারণ বাধ সেধেছিল প্রবল ঝড়বৃষ্টি।

দাবানলের আকারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সর্দারেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর

নেয়, এবং তিনটি জায়গা থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে - কর্ণগড়, বাহাদুরপুর ও শালবনী। রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিংহ, বগড়ীর পাইক সর্দার গোবর্ধন দলপতি প্রায় ৪০০ সশস্ত্র পাইক নিয়ে বিদ্রোহে সামির হয়। বিদ্রোহীরা প্রায় ৬-৭ টি গ্রাম নিজেদের দখলে আনেন। দিনের বেলা মাঠের শস্য কেটে ফেলা হয়। প্রায় ১৫টি গ্রামের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের গরু, ছাগল ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুঠ করতে থাকে। সরকারকে যে সকল দেশীয় মানুষ সাহায্য করে, বিদ্রোহীরা তাদের মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিতে থাকে। ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা মেদিনীপুর শহরে ত্রাসের সৃষ্টি করে। খুন, ডাকাতি, ও বিভিন্ন প্রকার নাশকতামূলক কাজ করে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সরকারের ভীত নাড়িয়ে দেয়। ইংরেজ কমান্ডিং অফিসার আদেশ দেয় যে রাত্রি ১১টার পরে কাউকে দেখলেই গুলি করে মারা হবে। সেই সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে ক্যাম্প বসানো হয়। বিদ্রোহীরা সেই ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালায় এবং সতর্ক করে দেয় যে তারা শীঘ্রই মেদিনীপুর শহর পুড়িয়ে দেবে। ফলে মেদিনীপুর ট্রেজারী পাহারা দেওয়ার জন্য গার্ড বাহিনী পাঠানোয় বিভ্রান্ত মেদিনীপুরের কালেক্টর এই অবস্থার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়ী করেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ইংরেজ সরকার ক্রমান্বয়ে কড়া হতে থাকে। কিন্তু কর্ণগড়ের রানীকে জব্দ করতে গিয়ে ইংরেজরা হিমসিম খেয়ে যায়। বিদ্রোহীদের প্রতাপে তারা কিছুই করতে পারেনি। মহিলা হলেও রানীর সাহস, বুদ্ধি ও জনগণের তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসা রানীকে বিদ্রোহে আরো বল যোগায়। কিন্তু রানীর নায়েব যুগলচরণ রাজ্যলোভী হয়ে ওঠে। কর্ণগড়কে যে কোন অজুহাতে নিজের অধিকারে আনার জন্য নায়েব যুগলচরণ ইংরেজদের সঙ্গে অনেক বেশী খাজনা দেওয়ার চুক্তি করে ফেলে। এই সময় ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে বিদ্রোহ দমনের জন্য ফাণ্ডসেন রানীর কাছে পাইকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুগলচরণের পরামর্শে কিছু পাইক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রানীর দাবিমত খরচ ইংরেজরা দিল না। ফলে রানী সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ —

১। গৌরীপদ চ্যাটার্জী - হিস্ট্রি অফ দ্য বগড়ী রাজ্য - .....

২। যোগেশচন্দ্র বসু - মেদিনীপুরের ইতিহাস (খন্ড -১) .....

৩। নরেন্দ্রনাথ দাস - মেদিনীপুরের ইতিহাস (খন্ড -১) .....

৪। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য - স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর .....

মোহনবাগান (১৯১১) : জাতীয়তাবাদ

- ঝিনুক সরকার

বিশ শতকের প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলার সমাজ জীবনের একটি দৈনন্দিন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল ফুটবল খেলার বিকাশ ও তার জনপ্রিয়করণ। বদলে যাওয়া সমাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই খেলাটি কেবল আর বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। ক্রমেই তা বাঙালীর এক সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রে পরিণত হয়েছিল।

প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্যকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। ফলে একদিকে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন আর অন্যদিকে বাঙালী যুব সমাজ বিপ-বী জাতীয়তাবাদের পথ বেছে নেয় - ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল- চাকীর আত্মবলিদান আর আলিপুর বোমা মামলার রায়ে বারীন ঘোষ, উল-াসকর দত্ত প্রমুখের দ্বীপান্তর ছিল যার প্রত্যক্ষ পরিণাম। স্বভাবতই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের এই উত্তাপ ফুটবল মাঠকেও স্পর্শ করেছিল। বলা যায়, বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ফুটবল ও জাতীয়তাবোধের মেলবন্ধনের সূচনা ঘটেছিল।

ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণে বাঙালী ছিল দুর্বল, অক্ষম, কাপুরুষোচিত জাতি। তাই বাঙালী এমন একটা উপায় খুঁজছিল যার মাধ্যমে তার দৈহিক শক্তি বা বাহুবলের প্রত্যক্ষ নমুনা ইংরেজকে দেখানো যায়। এই জন্যই শরীরস্পর্শী শক্তি পরীক্ষায় ইংরেজদের সম্মুখ লড়াই - এ পরাজিত করার হাতিয়ার হিসাবে ফুটবল সর্বজনীন ধারারূপে বাঙালী সমাজে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৯১১ খ্রীঃ ফুটবল খেলায় মোহনবাগানের শিল্ড বিজয় ভারতীয় খেলার ইতিহাসে এক বহুলচর্চিত বিষয়। খালিপায়ে (সুধীর চ্যাটার্জী ছাড়া বাকি ১০ জন) এই বাঙালী ফুটবল দল একের পর এক শক্তিশালী বুট পরিহিত ইউরোপীয় সিভিল ও মিলিটারি দলকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আই এফ এ শিল্ড প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়ে এক ইতিহাস তৈরী করেছিল। তাদের এই জবাব ছিল ইউরোপীয় উন্মাসিক মনোভাবের নাকে ঝামা স্বরূপ, পাশাপাশি ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালীর সমুচিত জবাব। বলাবাহুল্য তথাকথিত ক্ষীণকায়, দুর্বল বাঙালীর পৌরুষ ও আত্মমর্যাদার এক সদর্প আত্মপ্রকাশ ছিল এই আই এফ এ শিল্ড জয়, যা ইংরেজদের অপরাজেয়তার কিংবদন্ত ীকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছিল।

এর আগেও অবশ্য বাঙালী দল ফুটবলে গোরাদের হারিয়ে ট্রেডস কাপ বা অন্যান্য স্থানীয় ট্রফি জিতেছে। কিন্তু ঐ সব খেলায় গোরা সৈন্যদের বাঘাবাঘা দলগুলি অংশ নেয়নি। তাই শিল্ড খেলার মেজাজ আর ইজ্জতই ছিল আলাদা। এ যেন এক রোমাঞ্চকর স্বপ্নের হাতছানি রাজার জাত ইংরেজদের সম্মুখ সমরে, তাদের নিজেদেরি খেলায় নেটিভ ভারতীয়রা হারিয়ে দেবে।

১৯১১ খ্রীঃ ১০ই জুলাই প্রথম প্রতিপক্ষ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে মোহনবাগান

৩-০ গোলে পরাজিত করে। ১৪ই জুলাই বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল কাষ্টময় মাঠে খালিপায়ে বুটধারী শক্তিশালী রেঞ্জার্স দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিলে একযোগে বাঙালী থেকে সাহেব সবাই নড়ে চড়ে বসে। তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার পর কোয়াটার ফাইনালে ১-০ গোলে রাইফেল ব্রিগেটকেও পরাস্ত করে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবল এর আগে ময়দানী জনস্রোতের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দ্য স্টেটম্যান এ সম্পর্কে বলে যে, বিকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ভারতীয় যুবক জনতার প্রবল ভিড়ে মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। আবার ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ - এর প্রতিবেদন অনুসারে সেমি ফাইনালে মোহনবাগানের খেলা দেখতে ২৬ জুলাই মাঠে রেকর্ড জনসমাবেশ হয়েছিল। প্রত্যেকটি দর্শক অনবরত গলাফাটা চিৎকার করে মোহনবাগানকে সমর্থন জানিয়েছিল। মাঠে সেদিন যে উৎসাহ, উল-াস ও উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, কলকাতার খেলার ইতিহাসে তার জুড়িমেলা ভার। মিডিল সেক্সকে ৩ গোলে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ওঠে মোহনবাগান। বোম্বের বিখ্যাত পত্রিকা দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইলাসট্রেটেড উইকলি থেকে জানা যায়, ফাইনালে খেলার আগের দুদিন বাঙালীর সর্বক্ষণের আলোচ্য ছিল কেবল খালিপায়ে জেতা বাঙালী ছেলেদের কাছে বুটপরা ব্রিটিশ সেনাদের পরাজয়। খোদ শাসকের সেনাদল পরাজিত হয়েছে শাসিত নেটিভ বাঙালীদের কাছে, একথা মোটেই গোরাদের খুশি করেনি। হিতবাদী পত্রিকা লেখে যে, সেমিফাইনালের দিন সন্ধ্যায় ট্রেনের একই বগিতে ভ্রমণরত একজন ভারতীয় খ্রিষ্টান সহযাত্রী একজন ইংরেজের কাছে ঐ দিনের খেলার ফলাফল জানতে চাইলে ইংরেজটি প্রত্যুত্তরে তার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দেন।

২৯ জুলাই,১৯১১ ফুটবলে বাঙালীর যেন স্বাধীনতা যুদ্ধ সেদিন। খেলাটি দেখার জন্য সুদূর পাটনা, পূর্ণিয়া, কিষানগঞ্জ, ঢাকা ও অসম সহ পূর্ব বাংলার জেলা গুলি থেকেও অজস্র মানুষ কলকাতায় হাজির হয়েছিল। বিশেষ দর্শক সমাহত হতে পারে আন্দাজ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানী খেলার দিন বর্ধমান ও রাণাঘাট থেকে বিশেষ ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করে। সেদিন ময়দানে আশি হাজার থেকে একলক্ষের মত দর্শক এসেছিল সেই জনসমুদ্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ মিলেমিশে একাকার। সকলেরই এক আকাঙ্খা মোহনবাগানের জয়। ওদিকে গোরারাও কুশপুতুল ও কাগজের শিল্ড নিয়ে তৈরী ছিল। রয়টারের সংবাদদাতা জানান যে, অধিকাংশ খেলার কিছুই না দেখতে পেলেও খেলা চলাকালে তুমুল হাততালি দিয়েছিল। গাছের ওপর থেকে স্বেচ্ছাসেবক দর্শকরা খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন রঙের ঘুড়ি উড়িয়েও ফলাফল জানানো হয়েছিল। দ্য এম্পায়ার পত্রিকা ক্যালকাটা মাঠে একটি অস্থায়ী টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসিয়ে খেলার খবর সারা কলকাতায় জানিয়ে দিচ্ছিল টেলিযোগে।

ভারতে খেলার টিকিট নিয়ে কালোবাজারিও সম্ভব, তা ১৯১১ শিল্ড ফাইনাল থেকেই জানা যায়। ঐ দিন একটা ২ টাকার টিকিট ১৫ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। মাঠের দুধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখার জন্য দোকানদারেরা আট আনা থেকে শুরু করে ২ টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিতে থাকে বাক্স, টুল, টেবিল, পাটাতন এমনকি ইট-ও। পাইওনিয়ার পত্রিকা লেখে, একটা সিদ্ধ আলু ১ পয়সা আর একটা পান ১ আনায় বিক্রি হয়েছিল।

খেলা শেষের পাঁচ মিনিট আগে অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি এবং অভিলাস ঘোষ

পর পর দুটি গোল দিলে ২-১ গোরে শেষ প্রতিপক্ষ ইষ্ট ইয়র্কস দল পরাজিত হয়, শিল্ড জয় করে মোহনবাগান। জনতার মধ্যে তখন মুহুর্মুহু চিৎকার থ্রি চিয়ার্স ফর মোহনবাগান আর বন্দেমাতরম্ ও মোহনবাগান কি জয় ধ্বনি। কথিত আছে, তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মোহনবাগানের বীর খেলোয়াড়দের প্রশ্ন করেন যে, শিল্ড তো জেতা হল, কিন্তু ফোর্ট উইলয়ামের মাথায় উড়ন্ত ইউনিয়র জ্যাক পতাকাটি কবে নামাবে? অর্থাৎ মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়কে জাতীয় স্বাধীনতার সম্ভবনার সঙ্গে মেলানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খাকে নাড়া দিচ্ছে।

সারা কলকাতা সেদিন আলোতে আলোময়, কেবল সাহেব পাড়া নরিব, অন্ধকার। বস্তুত রাজার জাত ইংরেজরা নেটিভ প্রজা মোহনবাগানের জয় মেনে নিতে পারেনি। শাসক ইংরেজের কাছে এ ছিল এক দাসবিদ্রোহ।

১৯১১ -র শিল্ড জয় নিয়ে, ইতিহাস চর্চা এখন অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়। এই ক্রীড়া বিজয় শুধু ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে নয়, জাতীয়তাবাদের ইতিহাসেও এক দিকনির্দেশক ঘটনারূপে বিবেচিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কতগুলি ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারা লক্ষ্য করা যায়। টনিম্যাসন, পল্ডিসি প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকরা শিল্ড বিজয়ের জাতীয়তাবাদী ও জাতিগত তাৎপর্যকে ইংরেজদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদেরই চূড়ান্ত সার্থকতা হিসাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু সৌমেন মিত্র প্রমুখরা জাতীয়তাবাদী লেখকগণ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বাঙালী পৌরুষের সশক্ত প্রতিবাদ রূপে চিহ্নিত করেন।

কিন্তু এই ক্রীড়া জাতীয়তাবাদ চরিত্রগত দিক থেকে বাঙালী না ভারতীয় তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ঐ সময়কার সংবাদপত্র পত্রিকায় বাঙালী ও ভারতীয় নেশনকে প্রায় সমর্থক রূপে দেখানো হয়েছে। বস্তুত শ্রেণী জাতপাত-বর্ণ-ধর্ম এ সব কিছুর উর্দ্ধে ইংরেজকে খেলায় হারাবার স্বপ্নে বিভোর বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই ফুটবল বিজয়কে উপস্থাপনা করাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। শিল্ড জয় করে মোহনবাগান বাঙালী তথা ভারতীয় জনগণের অবচেতন মনে সার্বভৌম আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খাকে যেন বাস্তবায়িত করে তুলেছিল এই প্রেক্ষিতেই মোহনবাগান হয়ে উঠল এক জাতীয় ফুটবল দল খেলার দিগন্তে এত জাতীয়তাবাদী হিমালয় স্বরূপ।

জীবন-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সর্ব এই প্রভু ইংরেজের শাসন শোষণে জর্জরিত গোটা ভারতবর্ষ। এই চূড়ান্ত অপমানের একটা জবাব চাইছিল প্রত্যেক ভারতীয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজ বিরোধী রাজনীতিতে সকলের পক্ষে সামিল হওয়া সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ফুটবল মাঠে ইংরেজকে হারানোর মধ্য দিয়ে তারা পেতেন যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় লাভের এক অনাস্বাদিত মানসিক তৃপ্তি।

ফুটবল মাঠে এই জয় রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বসুমতী পত্রিকা লেখে যে, শ্রদ্ধেয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেও মোহনবাগান এত হৃদয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্য ইংলিশম্যান বলেন যে, কংগ্রেস ও স্বদেশীওয়ালারা এতদিনের চেষ্টায় যা পারেনি, নেটিভের চোখে ইংরেজদের অপরাজেয়তার সেই মিথকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল মোহনবাগান।

সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্যে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, শিল্ড জয় গভীরতর রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। শিল্ড জয়ের বছরেই ১২ ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিলি-তে স্থানান্তরিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে, রামচন্দ্র গুহ বলেন যে, ভবিষ্যতে পুনরায় অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পেরেই ব্রিটিশরা সুপরিকল্পিত ভাবে, দক্ষতার সঙ্গে তাদের ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্রকে বাংলার নিপুণ ফুটবলার ও তাদের তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নেন। রুদ্রাংশু মুখার্জী প্রায় একই সুরের প্রতিধ্বনি করেছেন। কিন্তু টনিম্যাসন উপরিউক্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করে বলেন যে, মোহনবাগানের জয়, কলকাতার দেশীয় জনতার মধ্যে কিছুটা আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছিল মাত্র। তবে খেলা ও রাজনীতির এরকম সমীকরণ নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক সত্ত্বেও বলা যায়, হয়তো কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শিল্ড জয় একটা পরোক্ষ অনুঘটকের কাজ করলেও করতে পারে।

দ্য স্টেটম্যান পত্রিকায় মোহনবাগানের তৎকালীন সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু শিল্ড বিজয়কে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন ও ফুটবল চর্চায় অসংখ্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের প্রতিদান বলে উলে-খ করেন। এই সূত্রে জয়দীপ বসু, অজয় বসু প্রমুখ ফুটবল ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্ককে কাকতালীয় বলে দেখিয়েছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাটির জাতীয়তাবাদী গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায়না। কারণ শিল্ড জয়ের প্রভাব জনমানসে তার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারিত ছিল। এই জয়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব সামাজিক ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের মাধ্যম রূপে ফুটবলের গুরুত্বকে স্পষ্ট করেছিল। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলার দিনগুলিতে যে ব্যাপক জনসমাগম ঘটেছিল, তাতে বাঙালী - অবাঙালী, মোহনবাগানের সমর্থক - অসমর্থক, ফুটবলপ্রেমী - উদাসীন, শিক্ষিত - অশিক্ষিত, বেকার সরকারী চাকুরে, যুবক - বৃদ্ধ, সাহেব মেম সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। বস্তুত একদিকে ছিল নেটিভদের হারিয়ে ইংরেজ শ্রেষ্ঠত্বকে বহাল রাখার অভিপ্রায়, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ সেনাদলের বিরুদ্ধে স্বদেশী দলের খেলায় স্বদেশীদের বিজয়ের তীব্র আন্তরিক তাগিদ তাদেরকে মাঠে টেনে এনেছিল। তাই মোহনবাগানের অভাবনীয় জয়ের পর তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে প্রেরিত তারবার্তায় রয়টার জানান যে, সে দৃশ্য ছিল বর্ণনাতীত। আর সাহেবরা হয়ে গিয়েছিল নীরব, শোকবিহ্বল, বিজয়ীদের শোভাযাত্রায় মুসলিমরাও সম্বর্ধনা জানায়। দ্য মুসলমান পত্রিকার বক্তব্য ছিল যে, নিজস্ব দেশীয় দল মোহনবাগান প্রমাণ করেছে ভারতীয়রা পুরুষালী খেলায় কারো চেয়ে কম নয়। যদিও মোহনবাগান হিন্দুদের নিয়ে গঠিত, তবুও মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা হিন্দু ভাইদের সাফল্যে উল-সিত হয়ে মাঠে ডিগবাজী দিয়েছিল। এই জয়ের জাতিগত তাৎপর্য আলোচনায় দুপক্ষের প্রতিবেদনের বৈপরীত্যের প্রমাণ। ঐ সময় কলকাতার ব্যবসায়ী মহল মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে বিক্রেতা সংস্কৃতি তৈরী করেছিল। দ্য স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল কোম্পানী বাইসাইকেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছুটা পরিমাণ মূল্য ছাড় দেন। সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় মঞ্চজগতে দ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তাদের সমকালীন প্রচলিত নাটক বাজীরাও এর প্রচারে বলে Mohan Bagan has won the shield, it is a victory for Bajirao . এখানে কোথাও মোহনবাগানের সাথে দেশাত্মবোধ জড়িয়ে

পড়েছে। তাই সব মিলিয়ে দেখা যায়, একটি বাঙালী দল মোহনবাগানের শিল্ড জয় এক লহমায় শাসক ইংরেজকে হারিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর জয়ে পরিণত হয়েছে - ক্রীড়া সাফল্যে জাতীয়তাবাদের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে - স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগরিত হয়েছে। ফুটবল ও জাতীয়তাবাদ মিলেমিশে একাকার হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ —

১। Goalless - story of unique footballing nation - Koushik Banerjee Boria Mazumdar, Koushik Banerjee
২। বাঙালীর ঐতিহাসিক ফুটবল যুদ্ধ - কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। খেলা যখন ইতিহাস - কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি জাতীয়তাবাদে নাটক ঃ সেকাল আর একাল

- অসীম কুমার মন্ডল

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে জাতীয়তাবাদী নাটক রচনার যে ধারা চলে আসছে, স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তরযুগে এবং একবিংশ শতকে এসেও তার অবসান হয়নি। বদল হয়েছে কেবল পাত্র পাত্রী, ঘটনা, বিষয়বস্তু এবং উপাদানে। সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এক নতুন কাল, নতুন মানুষ। দেশের স্বাধীনতার জন্য, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সমাজের এইসব সাধারণ মানুষের কঠিন আত্মত্যাগ, দুঃখ বরণ, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের আদর্শ ১৯৪৭ এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের দেশাত্মবোধক নাটকে নায়কত্বের গৌরব অর্জন করেছে। বিশেষ করে বিংশ শতকে রচিত অসংখ্য বাংলা নাটক এইরূপ জাতীয় জাগরণে সহায়ক হয়েছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মত নাটকও বাঙালি মানসে জাতীয় চেতনা সঞ্চার করে জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী এবং যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে উৎসাহিত করেছিল। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯ শতকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সকল জনগণের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত ঐক্যবোধ সেই অর্থে সম্ভব ছিল না। ইংরেজদের শোষণ সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তাই সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছিল সেই সময়ের অসংখ্য বাংলা নাটকগুলি।

উনিশ শতক বলছি এই অর্থে যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বলবৎ হওয়ার পর এই শতক থেকেই মূলতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। তাই প্রাচীন কাল থেকেই যেকোন আঙ্গিকে রচিত কিছু নাটক লেখা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত এই দেশের জন্য দেশাত্মবোধের ধারা ঐসব নাটকে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছিল, তা বিচার্য বিষয়। তাই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর থেকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটকের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠেছিল সেই দিকে লক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষের সর্বত্র বিভিন্ন পথে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ তুলে ধরার যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল বাংলা প্রদেশে বাঙালিরা সেই প্রচেষ্টায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী জনচেতনা জাগরণে বাঙালি নাট্যকাররা তাঁদের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক নাটক রচনার দ্বারা আপামোর বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করেছিল।১

ইংরেজ শোষণ বিরোধী জাতীয়তাবাদের মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে উনিশ শতকে রচিত অসংখ্য নাটকে। প্রকৃতপক্ষে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা ভাবনায় বৈপ-বকি পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থে উনিশ ও বিশ শতকে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের ভিত্তিতে নাটকের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ কতটা হয়েছিল, আমরা তাই বিশে-ষণ করার চেষ্টা করব। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকেই প্রথম জাতীয় জাগরণের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ শাসন ও শোষণের ভয়ঙ্কর দানবমূর্তি, তাদের দুর্বিসহ অত্যাচারের ক্ষুব্ধতা নীলদর্পণ নাটকে গণবিক্ষোভের

অনুভূতি সঞ্চার করেছিল। দেশাত্মবোধক নাটক সৃষ্টির আধুনিক প্রেরণা বিকাশলাভ করেছিল এই শতকে। বাঙালি মানসে বিপ-বী ভূমিকার প্রথম পদচিহ্ন পড়েছে এই 'নলিদর্পণে'। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব, স্বজাত্যবোধ, ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নিঃসন্দেহে এই নাটক। যদিও অর্থনৈতিক শোষণের রূপ আবিষ্কার ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সুস্পষ্ট কোন ধারণা তখনো দানা বাঁধেনি। কিরনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভরতযবন' (১৮৭৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত নাটক 'পুরু বিক্রম' ১৮৭৯ সালে 'অশ্রুমতি' নাটক, নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), ক্ষিরোদ প্রসাদের 'প্রতাপ আদিত্য'(১৯০৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌলা'(১৯০৫) প্রভৃতি নাটকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধের অনুভূতি জাগরিত হয়েছে।২

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮২ সালে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্তি বাংলা তথা সমগ্র ভারতবাসীকে অখন্ড জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। তাঁর এই প্রবন্ধ ও উপন্যাস তৎকালীন সময়ে নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ না হলেও এর বিষয়বস্তু ও চরিত্র আসমুদ্র হিমাচল মানুষকে নব জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই জাগ্রত জনমত গঠনের জন্য তাঁকে 'স্বাদেশিকতার ধর্মগুরু' এবং 'স্বজাত্যবোধের ঋত্বিক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।৩ উনিশ শতকে রচিত এবং বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত এইসব দেশাত্মবোধক নাটক বাঙালি মানসে ব্রিটিশ বিদ্বেষের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। আসলে এই সকল নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের অত্যাচার জনসমক্ষে সহজেই তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল। উলে-খ করা যায় যে, জাতীয়তাবাদী এইরকম অসংখ্য নাটক যখন বাংলার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত এবং তার মাধ্যমে ব্রিটিশ শোষণের চরিত্র জনগণের সম্মুখে ফুটে উঠতো, আর এই প্রয়াস অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করে। ১৮৭৬ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'জগদানন্দ' এবং 'যুবরাজ' নামের প্রহসনমূলক দেশাত্মবোধক নাটক পুলিশ বন্ধ করে দেয়। ১৮৭৬ সালের ৪ঠা মার্চ উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক চলাকালীন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাসসহ ৮জনকে গ্রেপ্তার করে। ঠিক এই সময়ে আর একটি নাটক 'শরৎ সরোজিনী' যাতে মঞ্চস্থ না হয়, ব্রিটিশ সরকার সেই ব্যবস্থাও করে। জনসমক্ষে নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে গণ জাগরণ বোধ করতে লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৬ সালের ১৪ই মার্চ ঘোষনা করেন, পুলিশের আগাম অনুমতি ছাড়া নাটক অভিনয় করা যাবে না, নাটকগুলি অভিনয়ের যোগ্য কিনা, তা পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিচার করে ঠিক করবেন এবং অভিনয়ের আগে সমস্ত নাটকের পান্ডুলিপি পুলিশের কাছে জমা দেওয়াও বাধ্যতামূলক করা হয়।৪ বাংলা প্রদেশের সর্বত্র বঙ্গীয় জাগরণ বোধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বেঙ্গলী ও সাধারণী পত্রিকার মত অনেক পত্র পত্রিকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হলে এবং কলকাতা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদে এই আইনের প্রতিবাদে ব্যাপক জনসমাবেশ হলে লর্ড রিপন এই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বহুলাংশে শিথিল করেন।

বাংলা নাটকে যথার্থ জাগরনের মুক্তি ঘটেছে বিংশ শতকে। এই শতকে বাংলা

নাট্য সাহিত্য প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔপনিবেশিক শাসনের অক্টোপাস থেকে দেশ ও জাতীয়তাবাদী আবেগ সঞ্চারিত করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, গান্ধিজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত নাটকগুলিতে মুক্তিকামী স্বদেশীয়দের সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্ভিকতা,আত্মবিসর্জন, আদর্শনিষ্ঠা, দুঃখবরণের আগ্রহ প্রভৃতি গুণগুলি সজবি হয়ে উঠেছিল। আর এইসব গুণগুলির ক্যানভাসে রচিত হয়েছিল নাটকের বীর চরিত্রগুলি।৫ স্বাদেশীকতার স্ফূরণে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌলা' ও 'মীরকাশিম' (১৯০৭) নাটক দুটির ঐতিহাসিক চরিত্র বাঙালিকে জাতীয়তাবোধে প্রেরণা দিয়েছিল। আবার ১৯০৮ এর 'পাঞ্জাব গৌরব' এবং ১৯০৯ সালে 'ময়ূর সিংহাসন' নাটকে দেশাত্মবোধ অন্য রূপে অন্য ধারায় লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপ সিংহ', 'মেবার পতন','শাহাজান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি জাতীয় চেতনামূলক নাটক বাংলা প্রদেশের সর্বত্র ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের চোখ খুলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' ও 'রক্ত করবী' নাটকের চরিত্রও বাঙালিকে চিরন্তন বন্ধন মুক্তির আহ্বান জানায়।

স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ধ্বনিত হয়েছে এরকম অসংখ্য নাটকে। জাতীয় অভ্যুত্থান এবং বিদ্রোহের পাঞ্চজন্যে এইসময় বাংলা নাটক সর্বত্র মুখরিত ছিল। গণসংযোগ দ্বারা গণ আন্দোলন সৃষ্টি ছাড়া বিপ-ব কখনো সম্ভব হতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণ আন্দোলনের ইতিহাসে অসংখ্য পত্র পত্রিকা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, নাটক প্রভৃতি রচনাবলী বিপ-ব সংঘটনে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি বাংলা এবং ভারতের সর্বত্র ঔপনিবেশিক বিরোধী গণসংযোগের প্রারম্ভিক দায়িত্ব পালন করেছিল অসংখ্য বাংলা নাট্য সাহিত্য বা নাটক। স্বাধীন ভারত সংগঠনে জাতীয় জাগরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায় বাংলা নাটককে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন নাট্যকার মন্মথ রায়কে দায়িত্বও দিয়েছিলেন।৬ নাট্যকার মন্মথ রায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথম স্বদেশী ভাবধারা সঞ্জাত নাট 'দেবাসুর' মঞ্চস্থ করেন। স্বাদেশীকতার আন্তরিক উপলব্ধি থেকে তাঁর নাট্য ভাবনা উৎসারিত হয় এই নাটকে। 'দেবাসুর' নাটকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রভুত্ব, হৃদয়হীন শাসন, উৎপীড়ন, অন্যায় অত্যাচার, ঔপনিবেশিক শোষণে অতিষ্ট দেশবাসীর অনুচ্চারিত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, বিদ্বেষ, ঘৃনা, ভয়ত্রস্ত মানুষের অসহায়তা পরাধীন ভারতের এক বাস্তব ছবি অতি সুন্দরভাবে পৌরাণিক পরিবেশের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। সমস্ত রকম পীড়নের বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট ছবি এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পৌরাণিক মহাভারতের দৃশ্যপট উপস্থাপনের দ্বারা বাঙালি মানসলোকে এক নতুন আবেগ উদ্দীপনা উৎসারিত করেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' নাটক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। লেখক এই নাটকে জনগণমন অধিনায়ক গান্ধীজির পূজা করেছেন। অহিংস সত্যাগ্রহের মূলে তাঁর দুঃসাহসী দুঃখবরণের যে কঠিন তপস্যা আছে, জাতিকে ভয়মুক্ত অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে শক্তি আছে, এই নাটকের বসুদেব চরিত্রে সেই সাধকোদ্দম মূর্তি গড়লেন নাট্যকার।৭ স্বদেশপ্রাণ লেখক নাটকে প্রতিকী চরিত্র রূপায়নের দ্বারা বাংলার গণচেতনাকে জাগ্রত করে গণশক্তিকে সুসংগঠিত করার সার্থক প্রয়াস নিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে শাসন পীড়ন,

লাঞ্ছনা, বঞ্চনার মর্মান্তিক জ্বালা থেকে জীবনকে মুক্ত করার জন্য যে বিদ্রোহ বিক্ষোভ মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তার আবেগকে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গণ বিপ-বের জমি তৈরী করলেন নাট্যকার।

ব্রিটিশ শাসনমুক্তি আন্দোলনের মধ্যগগনে ১৯৩০ সালে শচীন্দ্রনাথ সেনের' গৈরিক পতাকা' নাটকে বাঙালির নির্লোভ, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৩৮ এ তাঁর 'সিরাজদৌলা' নাটকে ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের ইন্ধন জোগাতে এবং দেশ জাতির মনে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে লেখক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন। নাটকে সিরাজ চরিত্রে জাতীয় চরিত্রের গুণসমূহ আরোপ করে দেশাত্মবোধক মাত্রা যোগ করেছেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক চেতনা সৃষ্টি করে এবং স্বার্থবোধ মুক্ত হয়ে দেশ জাতির সম্ভ্রম মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আত্মত্যাগ এবং দুঃখ বরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায় এই নাটক। ১৯৪২ এর অগাষ্ট আন্দোলন দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক গণজোয়ার এনেছিল তার আঁচ অনুভব করে স্বতস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে।৮ সর্বব্যাপী সামাজিক সমস্যার এক কাহিনী রূপ ছিল এই নবান্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যে ভয়াবহ অবক্ষয়, মহামারি, মন্বন্তর,দুর্ভিক্ষ বাংলা ও বাঙালি জীবনে সংকটের সূচনা করেছিল। এই নাটকে স্পষ্টভাবে তা প্রতিভাত হয়। আর এজন্য যে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনই দায়ী তাও প্রমাণিত হয় নাটকের সর্বত্র। ১৯৪৩ সালে তাঁর 'জবান বন্দী' এবং ১৯৪৪-এ 'আগুন' নাটকে একই রকম দুঃসহ দুর্বিপাকের অসামান্য বাস্ত ব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে আপামোর বাঙালির সামনে। ইংরেজ শাসনে দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী দারুণ মন্দা এবং অসহনীয় দুর্দশার বেদনাতিক্ত অভিজ্ঞতা, মন্বন্তর ক্লিষ্ট মানুষের অসীম জীবনী শক্তি ও সহিষ্ণুতা ফুটে ওঠে দ্বিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' নাটকে। ১৯৫০ সালে বিভক্ত বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে তাঁর 'মশাল; নাটক আচ্ছন্ন করে গোটা বাঙালি সম্প্রদায়কে। স্বাধীনতা পূর্বকালে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' এ বাংলার একজন অসহায় দরিদ্র, একগুয়ে চাষীর অপূর্ব প্রতিবাদের কাহিনী বর্ণিত হয়। স্বাধীনচেতা, দীপ্তময় ও পৌরুষদীপ্ত এই চাষীর প্রতিবাদী চরিত্র বাঙালি সত্ত্বাকে ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা জোগায়। দেশাত্মবোধ উৎপাদনকারী এইসব নাটক মঞ্চস্থ হবার ফলে বাঙালি মননে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে।৯

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ করে ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা নাটকে আমরা লক্ষ্য করি তথাকথিত জাতীয়তাবাদ বলতে যে ব্রিটিশ বিরোধী জাগরণকে বুঝি, এই সময়ের নাটকে সেই জাতীয়তাবাদ স্বভাবতই গৌন হয়ে পড়ে। এই পর্বের অসংখ্য নাটকে দ্বিখন্ডিত বাংলায় ছিন্নমূল বাঙালি সমাজের গ-ানি, দুঃখকষ্ট, হতাশা, নিজভূমে পরবাসী হওয়ার জীবন যন্ত্রণার রূপ ধরা পড়ে। আমাদের সচেতন উপলব্ধিতে এইসব অভিনীত নাটক থেকেও বাঙালি সত্ত্বায় জীবনের বিভিন্ন আঁকে বাঁকে যে প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টিগোচর হয়, তা থেকে মুক্তির রসদ, লড়াই করার মনোবৃত্তি এবং কঠিন সময়ে বাঁচার প্রেরণা লাভ করি। কোমল মনের বাঙালি জাগরণকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? প্রখ্যাত নাট্যকার ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' ও 'জ্বালা' নাটক পূর্ববঙ্গের এমনই আশ্রয়হীন মানুষের জীবনের দলিল। দুই বাংলার মানুষের আশ্রয়হীন জীবনের গল্পে তাদের বিক্ষোভ বিদ্রোহ মানব মনকে নতুনভাবে

ভাবাতে শেখায়। বুভুক্ষু ক্ষুধাতুর মানুষের বুক ফাটা হাহাকার নিঃসন্দেহে কাঁপুনি দিয়েছে গোটা সমাজকে।১০ বাংলায় কয়লা খনি শ্রমিকদের জীবন তুচ্ছ করে খনিতে কাজ করার অসুবিধা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয়, খনি মালিকদের মনোভাব, শ্রমিকদের প্রতি তাদের দুর্ব্যবহার, অত্যাচারের জীবনালেখ্য বাঙালি মনকে হৃদয় বিদারক করে তোলার মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটকে। তাঁর 'ফেরারী ফৌজ' এ সামাজিক বিপ-বের এক পরিচ্ছন্ন রূপ উদঘাটিত হয়েছে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য কঠিন ত্যাগ স্বীকার যারা করলো, তাদের সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা মানুষের হীন স্বার্থপরতায়, বৈষম্য ও শোষণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এই নাটকের মাধ্যমে বাঙালি মনের বৈপ-বীক শক্তি, তেজ, সাহস ও অনমনীয় মনোবল সৃষ্টির জন্য সশস্ত্র বিপ-ব আন্দোলনের দ্বারা তার এক আদর্শ সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিয়ে বাঙালি জনসমাজকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন উৎপল দত্ত তাঁর 'কলে-ল' নাটকের মধ্য দিয়ে। মানুষের অধিকার রক্ষায় সংগ্রামের এক অনবদ্য নাট্যরূপ নিঃসন্দেহে 'কলে-ল' নাটক।১১

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে দেশাত্মবোধক নাটকের গৌরবময় প্রভাব ও প্রসার আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এইসব নাটকের মধ্যে পরাধীন জাতির অন্তহীন লজ্জা ও বেদনা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের এক সুদৃঢ় সংকল্প এবং প্রবল প্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত করবার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রচন্ড জাতীয় আবেগ শান্ত হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্ভবও কমে যেতে থাকে। কিন্তু ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীন শান্তিকামী ভারতের উপর আক্রমণ হানলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থায় বাংলা নাট্য সাহিত্য নব জাগ্রত জাতীয় আবেগ সঞ্চার করে বাঙালি তথা ভারতীয়দের অকস্মাৎ এক অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। পুরানো দেশাত্মবোধক নাটকগুলি যেমন পুনরায় পুনরুজ্জীবিত হতে থাকলো, তেমনি সংকটের রূপ প্রতিফলিত করে বাংলায় নতুন নতুন নাটক লেখা এবং অভিনয় করার চাহিদা বেড়ে যেতে দিয়েছিল।১২ ভুলে গেলে চলে না যে, তখন সদ্য স্বাধীন পূর্ব বাংলার নাট্যকাররাও পবিত্র কর্তব্য মনে করে দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পেশাদার ও অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্য পরিচালকরা ঐ সব নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে জনসাধারণের মনে দীপ্ত আবেগের উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। শুধু রঙ্গমঞ্চেই নয়, রাস্তাঘাটে, পার্কে-ময়দানে এইসব নাটক অভিনয় দ্বারা জাতীয়ভাব বন্যার মত প্রবাহিত হয়ে প-াবিত করে দিয়েছিল গোটা দেশকে। গোপনে গোপনে বিদেশী শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরাও জাতীয় ভাবধারায় খড়কুটোর ন্যায় ভেসে গিয়েছিল। তবে স্বীকার করতে হবে যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে নাটকগুলি লিখিত ও অভিনীত হওয়ায় যুদ্ধের উন্মাদনা ও উত্তেজনা সেভাবে নাটকে প্রস্ফূটিত হয়নি। দর্শকদের কৌতুহল ও রসতৃষ্ণা এইসব নাটকের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি পায়নি। কিন্তু অতি অল্প সময়ে রচিত ছোট ছোট এই নাটকগুলি জাতীয় জাগরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'মহাপ্রেম' এই রকমই বৈদেশিক আগ্রাসন বিরোধী একটি জাতীয়তাবাদী নাটক। 'স্বর্ণকীট' নাটকেও লেখক পার্থিব সকল স্নেহ সম্পর্কের উপরে দেশাত্মবোধের জয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনা হয়, তেমনি

তাঁর 'জওয়ান' নাটকে সমাজ বিরোধী দেশীয় লোকদের সৈনিকের ভূমিকায় প্রয়োগ করে লেখক দেশাত্মবোধের আবেগ জনগণের মধ্যে সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', দিগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক', 'অমর', 'রক্তপদ্ম' প্রভৃতি নাটক সমাজের সামনে বিদেশী আক্রমণের রূপ তুলে ধরেছিল।১৩ আসলে নাটকের মধ্যে লেখকের কল্পনা এক একটি চরিত্র পেয়ে তা সমাজের , দেশের সামনে বিভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে ওঠে। সমসাময়িক ভাবধারার সঙ্গে জনগণ নাটকের মত সাহিত্যের দ্বারা একাত্ম হয়ে ওঠেন। এখানেই নাট্যকার এবং নাটকের তাঃপর্য। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘ' সুনীল দত্তের 'সীমান্ত প্রহরী' কিরণ মৈত্রের 'মৃত্যুর গর্জন' এমন অসংখ্য বাংলা নাটকে দেশের প্রতি মানুষের জাগরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লক্ষণ আমাদের সামনে ধরা পড়ে।

বিংশ শতকের শেষ দিক থেকে প্রকৃত অর্থে দেশাত্মবোধক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি, সে রকম নাটক রচনা কিন্তু অনেক কম। মেনে নিতেও হবে যে, স্বাধীনোত্তর সময়ে এইসব নাটক লেখা বন্ধ হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। এতদিন ধরে অর্থাৎ ১৯ শতক থেকে ২০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাংলার বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, রঙ্গনা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, রঙমহল থিয়েটার তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি থিয়েটারে অসংখ্য জাতীয়তাবাদী নাটক অভিনীত হওয়ায় জাতীয় ভাবের সঞ্চার যেমন হয়েছে পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সব থিয়েটারেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। একমাত্র রঙ্গনা থিয়েটার ব্যতীত অন্য সব থিয়েটারই আজ স্মৃতির আড়ালে। কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে অ্যাকাডেমি হল, উত্তম মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, বিদ্যাসাগর মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন প্রভৃতি আধুনিক নাট্য পরিবেশনার স্থান। পুরানো ও নতুন বহু নাট্যদল তাদের নতুন নতুন নাট্য ভাবনা নিয়ে উপস্থাপন করে চলেছে অসংখ্য নাটক। নিঃসন্দেহে আজকের নাটকের আঙ্গিক বদলেছে, ধারা উপধারায় পরিবর্তন এসেছে, মানুষের চাহিদায়, মানসিকতায়, ভাবনায়ও বদল এসেছে, কিন্তু দেশাত্মবোধের সেই উত্তেজনা, আবেগ, শিহরণ আমরা আজকের নাটকে পাইকি? অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমানকালের আধুনি নাট্য ব্যবস্থাপনায় যে গতি, কারুকার্য, তন্ময়তা উপলব্ধি করা যায় তা সেকলের নাটকে অনেকাংশেই অনুপস্থিত ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে নান্দীকার, বহুরূপী, নান্দীমুখ, স্পন্দন এমন অসংখ্য নাট্যদল কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মঞ্চে যেসব নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে, সে নাটকগুলির মাধ্যমে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন রকম সংকীর্ণতার রূপও কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।১৪ নাটকের মধ্য দিয়ে যদি সেই স্ব স্ব সময়কালের অন্ধকার, অস্বচ্ছতার দিকগুলি ফুটে ওঠে এবং জনগণের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারে, অসাধু চিন্তা চেতনাকে আঘাত করতে পারে, যেকোন রকম শোষণ অত্যাচার, বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেওতো নিঃসন্দেহে জাতীয় চেতনার একটা রূপ।

নাটকের এই বিপ-বোত্মক রূপের পিছনে যে নব নাট্য আন্দোলনের বলিষ্ঠ প্রেরণা রয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আজ যে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় তা এই নাট্য আন্দোলনের জন্যই সম্ভব হয়েছে।১৫ আসলে 'আন্দোলন' অর্থই হল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত ব্যবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে, জাতির মহাসঙ্কট ও দুর্গতির মুহূর্তে তার সঞ্জীবনী শক্তি আশ্চর্যভাবে

আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তখনই সমাজকে, দেশকে বাঁচানোর জন্য একটি প্রবল জীবনীশক্তি এই নাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে শোষণ, বিভেদ, নিপীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই নাট্য আন্দোলন বিভিন্ন প্রতিবাদী চরিত্রের মাধ্যমে সেইরূপকে জনসমক্ষে তুলে ধরে জীবনের আশা ও আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাই জাতীয় জাগরণের উন্মেষ বিবর্তনের পথ ধরে সাম্প্রতিক কালকে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন ধারায় উপধারায়। নাটক এবং নাট্য সাহিত্য সেকাল আর একালের মধ্যে এই যে দেশাত্মবোধমূলক যোগসূত্র রচনা করেছে সেখানেই নাটকের আসল তাৎপর্য।

সহায়ক সূত্র ঃ

১) ডঃ দীপক চন্দ্র - বাংলা নাটকে আধুনিক গণচেতনা - পৃঃ ১৮
২) তদেব, পৃঃ ১৯
৩) তদেব, পৃঃ ১৬৭
৪) শচীন্দ্রনাথ মন্ডল - মাধ্যমিক ইতিহাস সহচর, পৃঃ ৪৩২
৫) দর্শন চৌধুরী - বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পৃঃ ২০৩
৬) অজিত কুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৩
৭) তদেব, পৃঃ ৩৫৫
৮) তদেব, পৃঃ ৩৯৯
৯) আধুনিক ভারতের রূপান্তর - সমর কুমার মলি-ক, পৃঃ ৩১৪
১০) ডঃ দীপক চন্দ্র - বাংলা নাটকে আধুনিক গণচেতনা - পৃঃ ২৬৮
১১) তদেব, পৃঃ ২৭০
১২) কুন্তল মুখোপাধ্যায় - থিয়েটার ও রাজনীতি, পৃঃ ১২৭
১৩) অজিত কুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৪৭৭
১৪) আনন্দ বাজার পত্রিকা - তারিখ, ১৪.১০.২০১১, পৃঃ ৪
১৫) অজিত কুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৫১৫

মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুন্সি ও বিড়ি শ্রমিক : একটি সমীক্ষা

- অলোক কুমার বিশ্বাস

সারাংশ

পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী স্থানে সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের মত মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। একদা বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। এই জেলার অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষি নির্ভর। এরসঙ্গে এ জেলার কুটির শিল্প হিসাবে বিড়ি শিল্প পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মধ্যেও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিড়ি উৎপাদক মালিক আর শ্রমিক এবং এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী হিসাবে মিডিল ম্যান বা মুন্সী। মুন্সী বিড়ি উৎপাদন করে না তবে তাঁর ছাড়া বিড়ি উৎপাদনও একেবারেই সম্ভব নয়। মুন্সী বিড়ি উৎপাদক মালিক এবং বিড়ি উৎপাদনকারী শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে। কারখানা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদনকারী শ্রমিকের বাড়ীতে সেই কাঁচামাল পৌঁছে দেওয়া এছাড়া উৎপাদনকারী শ্রমিকের বিড়ি বাঁধার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার কাজও মুন্সী করে থাকে। ফলে বিড়ি উৎপাদক সংস্থা এবং বিড়ি উৎপাদনকারী শ্রমিক উভয় পক্ষই মুন্সীর উপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতার জন্য মুন্সী এক পক্ষকে ফাঁকি দেয় আর অন্য পক্ষকে শোষণ করে। বিড়ি উৎপাদক সংস্থা মুন্সীও ফাঁকি দেবার কথা জেনেও তাকে কাজে রাখে আর বিড়ি উৎপাদনকারী শ্রমিক মুন্সীর শোষণের বিষয় জেনেও তার অনুগত থাকে। কিন্তু কেন? কিভাবে ফাঁকি দেয় আর কিভাবে শোষণ করে? এই প্রবন্ধের বিষয় মুর্শিদাবাদের বিড়ি উৎপাদনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত এই মুন্সীদের ক্রিয়াকলাপের তথ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে

বিশেষ শব্দার্থ ঃ বিড়ি শিল্প, বিড়ি শ্রমিক, মুন্সী

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যপ্রান্তের একটি পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদ জন পরিচিত। তবে একদিন এই জেলা পিছিয়ে পড়া ছিল না। যখন মুর্শিদাবাদ ছিল সুবা বাংলা বিহার ঋড়িষ্যার রাজধানী। সে আজ ইতিহাস। তবু ইতিহাসের সেই ক্ষীণ স্মৃতি ধরে মুর্শিদাবাদকে যদি আমরা দেখি মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ হয়েছে 'মুর্শিদাবাদ' শহরের নাম থেকে। ১৭০৪ সালে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ প্রাদেশিক রাজস্ব সংগ্রহের কেন্দ্র, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ শহরে স্থানান্তরিত করেন। অবশ্য মুর্শিদাবাদ নগরের পত্তন তিনি করেননি। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে পর্যটক ট্যাভারনিস মাদেসুবাজারকি বলে যে স্থানটিকে অভিহিত করেছেন সেই স্থানটি মাসুমবাজার নামটির অপভ্রংশ।১ ১৭৮৬ খ্রীঃ লেখা সিয়ার-উল-মুত্তাক্ষরিন এর অনুবাদক রেমণ্ড-এর মতেস্থানটির প্রাচীন নাম মুরসুদাবাদ, পরবর্তী নাম মকসুদাবাদ এবং সর্বশেষ নাম - মুরশিদাবাদ বা বানানের পরিবর্তনে মুর্শিদাবাদ। ১৭০০ সালে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান করে সুবা বাংলা

প্রদেশে পাঠান। তিনি ঢাকা থেকে রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র মকসুদাবাদে সরিয়ে আনেন। পরবর্তীতে সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নাজিম পদাভিষিক্ত হওয়ার পর এই শহরের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ নগর হয়ে ওঠে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী। ১৭৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দলিল দস্তাবেদে মুকসুদাবাদ নামটি দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলা পাঁচটি মহকুমা নিয়ে গঠিত। লালবাগ, সদর বা বহরমপুর, কান্দি, জঙ্গীপুর এবং ডোমকল। পাঁচটি বিভাগে মোট ২৬টি ব-ক, ২৬টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ২৬টি থানা। এই জেলার মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ২৫৪টি এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ১৯২৫টি। উপরিউক্ত তথ্য ২০১১ এর জনগনণা তথ্য অনুসারে। এই জেলার বড় শহরগুলি হল বহরমপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, কান্দী, সাগরদিঘী, ফারাক্কা, ডোমকল প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদ জেলা ৭টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালের জনগননা তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদের আয়তন ৫৩২৪ বর্গ কিমি.। গ্রামাঞ্চল ৯৯৫.১১ বর্গকিমি. এবং মোট জনসংখ্যা ৭১০২৪৩০ জন। এই জেলার প্রতিটি ব-কেই কম বেশী বিড়ি শ্রমিক দেখতে পাওয়া যায়।২

মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্প সম্পর্কে প্রকাশিত ভাবনা ছড়ানো ছিটানো অবস্থাতে পাওয়া যায়, কিছু গবেষণা পত্রে ও কিছু আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত পত্র পত্রিকায়। এর মধ্যে সুজিৎ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯২) এর বীক্ষণ পত্রিকায় আওরঙ্গাবাদের বিড়ি শিল্প এবং সুজাতা দে (বসু) (১৯৯২) - এর বীক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষুদ্র শিল্প শীর্ষক প্রবন্ধ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাগচী ও মুখোপাধ্যায় (১৯৯৬) এর ইবভরধ কতথযয়ক্ষ ভশ আননধভ ঐশধয়ড়ঢ়ক্ষঁ খয়ক্ষড়বভধতথতধ ঈভড়ঢ়ক্ষভদঢ় ভশ ঠনড়ঢ় আনশফতর শীর্ষক গবেষণা পত্রটি যথেষ্ট উলে-খযোগ্য । এছাড়াও ২০০৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলার গেজেটিয়ারটিতে জেলার বিড়ি শিল্প সম্পর্কিত অংশটি যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্য। তবে ২০১২ সাল পর্যন্ত আনুবীক্ষনীক স্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্পকে নিয়ে বিশে-ষনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবনা চিন্তার জগৎ প্রায় ছিল না বললেই চলে।

নেশা অতি পরিচিত শব্দ। যার প্রচলন সেই কবে, সেটাও ইতিহাসের পাতায় দিনক্ষণ দিয়ে লিপিবদ্ধ নয়। যদিও সর্বনাশা নেশার কুপ্রভাব সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। তবুও নেশার নেশা থেকে পরিত্রান পাবার যষেষ্ট চেষ্টা নেশাপ্রেমীদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। ধূমপান, যা সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত চলছে। প্রাচীনকালে মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আজ নেশা গ্রহণের পদ্ধতিগত কৌশলের পরিবর্তনের বদান্যতায় আপামর জনসাধারণ নেশার মরণ সৌভাগ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাচীনকালে তাম্রকূট গ্রহণের প্রচলন ছিল এবং তখন তাম্রকূট সকলের জন্য সেইভাবে প্রচলিত ছিল না বা সকলের অধিকারে ছিল না। তারপর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নেশা গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। একসময় জমিদারদের মধ্যে গড়গড়া প্রচলন ছিল আর মধ্যবিত্তের মধ্যে হুঁকোর ব্যাপক প্রচলন ছিল।৩ কিন্তু হুঁকোর মাধ্যমে তামাকজাত নেশা গ্রহণ করা জটিল ছিল। কারণ হুঁকোর কলকেতে তামাক সাজানো, জলের সাহায্যে সেই নেশা গ্রহণ করা। এইসব প্রক্রিয়া ছিল জটিল। আর একটি বড় মুশকিল ছিল হুঁকো

সব জায়গা নিয়ে যাওয়া ছিল ভীষণ অসুবিধাজনক। ফলে সব অসুবিধাকে জয় করে নেশাপ্রেমীদের জন্য বর্তমানে সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া, সহজে পান করা, সহজে বিতরণের মাধ্যমে কয়েকজন মিলে ধুমপান করার অনাবিল আনন্দ যোগায় আজকের বিড়ি। সব ব্যবস্থার দিকে নজর রেখে তৈরী হয়েছে সিগারেট এবং বিড়ি। সিগারেট একটু আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ উচ্চবিত্তের জন্য। সিগারেটের নেশা একটু আভিজাত্যেরও প্রতীক। কিন্তু নেশাপ্রেমীদের প্রাণ খোলা চাহিদা মেটাতে অব্যর্থ ঔষুধের মধ্যে খাঁকি রঙের পাতায় মোড়া বিড়ি সমাজ স্বীকৃত 'বিড়ি'।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতের মধ্যেও এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বিড়ি বাঁধার কাজ পূর্বে হত কারখানা কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে। বর্তমানে এই পদ্ধতির কিছু হলেও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সম্পূর্ণরূপে বিড়ি বাঁধার কাজ হয়ে থাকে বিড়ি শ্রমিকের বাড়ীতে। এবং বিড়ি বাঁধার কাজ হয়ে থাকে সাধারণত চুক্তি ভিত্তিক। কারখানার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। এক সময় মুর্শিদাবাদের বিড়ি তৈরী হত কারখানায় মালিকের তত্ত্বাবধানে। আজ আর সেই প্রথা নেই। আজ ঘরে ঘরে বিড়ি তৈরী এবং ঘরে ঘরে কারিগর, যারা দক্ষ এবং অদক্ষ। বিড়ি শ্রমিক বিড়ি তৈরীর মজুরি বিড়ি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পায়। শ্রমিক বিড়ি তৈরীর সব রকম উপকরণ মিডিল ম্যানদের বা মুন্সীদের থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিড়ি তৈরীর প্রধান উপকরণ হল কেন্দুপাতা, তামাক এবং সুতো। মহিলারা মূলত সংসারের সব কাজ করলেও বাড়ীর সকলে মিলে বিড়ি বাঁধার কাজ করে থাকে। আজ বিড়ি বাঁধা মহিলাদের প্রাথমিক কাজ, তারপর তাদের সাংসারিক এবং আনুসঙ্গিক কাজ। বিড়ি প্রস্তুতের প্রাথমিক পর্বে তামাক পাতাকে সুন্দরভাবে বিড়ি তৈরীর ডাইস বা ছাঁচের মাপে কাটা হয় এবং ঐ কাটা পাতা দিয়ে তারসঙ্গে তামাক মিশিয়ে বিড়ি তৈরী করা হয়।

বিড়ি তৈরীর নির্দিষ্ট তামাক এবং পাতা বিড়ির কারিগরগণ মুন্সী তথা মিডিলম্যানদের থেকে সংগ্রহ করে। একহাজার বিড়ি তৈরী করতে বিড়ি শ্রমিক নির্দিশ্ট পরিমাণ বিড়ি বেঁধে মুন্সীকে ফেরৎ দিতে হয়। বিনিময়ে সে পরের বিড়ি বাঁধার জন্য তামাক, পাতা পেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক পাতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বিড়ি না দিতে পারলে তার পারিশ্রমিক হতে সমপরিমাণ বিড়ির অর্থ কেটে নেওয়া হয় অথবা সেই পরিমাণ বিড়ি বাঁধাই করে নেবার ব্যবস্থা থাকে। বিড়ি বাঁধার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে চুক্তি ভিত্তিক প্রথার উপর। এখানেও বিড়ি শ্রমিকগণ মুন্সী নামক কর্মচারীদের আয়ত্ত্বাধীন থাকে।

বিড়ি শ্রমিকগণ সকাল সন্ধ্যে বিড়ি বাঁধার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এখানে সময় তাদের কাছে খুব বেশী প্রয়োজন। তবে সময়ের অনুসারী তারা নয়। যখন যেমন সম্ভব তেমনি করেই বিড়ি বেঁধে চলেন। তবু হিসাবের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে সাধারণত একজন বিড়ি শ্রমিক গড়ে দৈনিক ৯০০ - ১৫০০ বিড়ি বাঁধতে সক্ষম। অবশ্য যদি সে বিড়ি বাঁধার কাজে পারিবারিক সদস্যদের সাহায্য লাভ করে তবেই। যদিও চত্বরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিক একক ভাবেই উক্ত সংখ্যক বিড়ি বাঁধতে পারে এবং গড়ে দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা বিড়ি বাঁধে। তবে তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই সাধারণভাবে এর থেকে বেশী বিড়ি বাঁধা প্রায় অসম্ভব। তবে বর্তমানে চত্বরকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে নিযুক্ত বিড়ি শ্রমিক আর নেই।

বাড়ি কেন্দ্রিক বিড়ি বাঁধার কাজেই বিড়ি শ্রমিকগণ বেশী করে যুক্ত থাকেন। আর এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে মুন্সী নামক কর্মচারীর উপর।

মুর্শিদাবাদের বিড়ি তৈরীর কাঁচামাল পাওয়া না গেলেও শুধু মাত্র সস্তার শ্রমিকের উপর নির্ভর করেই এই জেলা বিড়ি তৈরীতে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য তার কিছু সঙ্গত কারণও আছে - বর্তমানে মুর্শিদাবাদের যে অংশে বিড়ি বাঁধার প্রচলন সবথেকে বেশী যেমন পদ্মা নদীর দক্ষিণে ধূলিয়ান, ঔরঙ্গবাদ, জঙ্গীপুর, পদ্মা নদীর পশ্চিম পাড়ের লালগোলা, ভগবানগোলা, ভাগীরথী নদীর পূর্বে বেলডাঙ্গা অঞ্চলগুলিতে বিড়ি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। বিড়ি শিল্প এক সময় ঔরঙ্গাবাদ, ধূলিয়ান, জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সমধিক প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ধারার সঙ্গে বিড়ির যুক্ত হয়েছে।

নদীভাঙন ছিল মুর্শিদাবাদের একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভাগীরথী নদীতে ব্যাপক আকারে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছিল। ফলত কৃষক ও সাধারণ চাষীদের জোত জমির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বহুলাংশে কমে যায়। তদানিন্তন জমিদাররা বিনিয়োগের বিকল্প পথের সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। কারণ গঙ্গার ভাঙন প্রথম দিকে বেশ কিছু জমিকে গ্রাস করে গঙ্গার চরে পরিণত করেছিল। অন্যদিকে মুসলমান অধ্যুষিত ধূলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের জনসংখ্যা ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য একটু বেশি। স্বাভাবিক কারণেই বেকার শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে লাভজনক ভাবে উৎপাদন করার দিকে নজর দিয়েছিল তদানন্তিন বিত্তবানেরা। আর সেই জন্য এইসব অঞ্চলগুলিতে প্রথম বিড়ি উৎপাদন শুরু হয়।

একথা বললে হয়তো অতুক্তি হবে না যে - মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি তৈরীর কারখানা। প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি বাড়িতে আজ বিড়ি তৈরী হয়, একথা হয়তো অতুক্তি নয়। কিন্তু এই জেলার কতজন বিড়ি তৈরী করে আর কত জন বিড়ি তৈরীতে সাহায্য করে তার পরিসংখ্যান কোন তথ্য নেই। এই জেলার ২৬টি ব-কে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১ লক্ষের উপর। বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট মালিকদের মোট উৎপাদিত বিড়ির পরিমাণ ৬০ কোটির উপরে। জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার ৬টি ব-ক বাদে ২০টি ব-কে ছোট ও মাঝারি মানের মালিকের অবস্থান।৪ এরা উৎপাদিত বিড়ি স্থানীয় বাজার ও পার্শ্ববর্তী জেলায় বিক্রি করে। এদের উৎপাদন পদ্ধতি ও মালিকের অবস্থান একই প্রকার। বৃহৎ মালিক ঠিকাদার মারফৎ সাগরদিঘী, লালগোলা, সালার, জলঙ্গী, বেলডাঙ্গা ইত্যাদি ব-কগুলি থেকে বিড়ি উৎপাদন করছে। কারণ জঙ্গীপুর মহকুমায় বিড়ি শ্রমিকদের প্রতি হাজারে উৎপাদন মূল্য অন্য ব-কের থেকে বেশী দিতে হয়। এছাড়া এইসব অঞ্চলের শ্রমিকরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে মজুরী বৈষম্যের স্বীকার এবং পি.এফ. এর সুযোগ থেকে শ্রমিক বঞ্চিত।৫

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শ্রমিক কত? এই প্রশ্নের সদুত্তোর পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ এই তথ্যের গোপনীয়তা শুরু হয়, বিড়ি যিনি বাঁধেন তার থেকে, কারণ তিনি তার বাড়ীর শিশু শ্রমিক যিনি বিড়ি বাঁধেন তার সংখ্যা বা নাম গোপন করেন। মুন্সী যিনি বিড়ি প্রস্তুতকারক ও বিড়ি কারখানার মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন তিনি কখনোই শ্রমিক সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করেন না। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর শ্রমিকদের পি.এফ. ও অন্যান্য সুবিধা না দেবার জন্য শ্রমিক সংখ্যার ফাঁকি দেন। তবুও যে তথ্য সংগ্রহ করা

গেছে - মুর্শিদাবাদ জেলার 'ডেপুটি লেবার কমিশনের দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭৬১৮৫ জন।৭ কেন্দ্রীয় সরকারের বিড়ি শ্রমিক আইন অনুযায়ী ২০০৮ সালের পর থেকে রাজ্য শ্রমদপ্তর আর বিড়ি কার্ড বা বিড়ি শ্রমিকদের বিড়ি বাঁধার পরিচয় পত্র আর প্রদান করে না। নিমতিতা কেন্দ্রীয় বিড়ি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ৭৬৪১৬ জন এবং বহরমপুর কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েলফেয়ার দপ্তর হতে প্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১২৩২০ জন।৮ অর্থাৎ সরকারী নথি ২০১৩ এর জানুয়ারী এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতে মোট বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ৪৬৪৯২১ জন। যে সংখ্যা পাওয়া গেল এরা নথিবদ্ধ বিড়ি শ্রমিক। নথিবদ্ধ শ্রমিক ছাড়াও সম সংখ্যক বা তার থেকে বেশী সংখ্যক বিড়ি শ্রমিক মুর্শিদাবাদ জেলাতে আছে। বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

মূলত বিড়ি ব্যবসা দাঁড়িয়ে আছে, বিড়ি যিনি বাঁধেন তিনি মধ্যস্ততাকারী মুন্সী এবং কারখানার মালিক বা বিড়ি মালিকের উপর। এই তিন স্তম্ভকে যিনি যোগসূত্র তৈরী করে দেন তিনি হলেন মুন্সী। আরো ভালো করে বললে বলা হয় বিড়ি কোম্পানী যে ব্যবস্থাপনার উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে একটা অংশ হল মুন্সী। প্রতিষ্ঠিত বিড়ি কোম্পানীগুলি মুন্সীর মাধ্যমে বিড়ি তৈরী করে থাকে। মুন্সী বিড়ি কোম্পানীর থেকে একটা কমিশন বা ছাড় পায়। এই মুন্সী কোম্পানীর ঘর থেকে কাঁচামাল (কেন্দু পাতা, তামাক পাতা, সুতা) সংগ্রহ করে। সেই কাঁচামাল বিড়ি শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর উৎপাদিত বিড়ি আবার মালিকের ঘরে বা কারখানায় পৌঁছে দেয়। বিড়ি কোম্পানীগুলি সরাসরি কখনো বিড়ি শ্রমিককে বিড়ি তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করে না। শ্রমিক এবং মালিক বা কারখানার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে এই মুন্সী। এই সম্পর্কের সেতু তৈরীতে মুন্সীর অবদান অনস্বীকার্য।

মুন্সী সংক্রান্ত যে তথ্য আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে পেয়েছি তা হল। মুন্সী কোম্পানীর গুদাম থেকে তামাক, পাতা এবং সুতো সংগ্রহ করে। এবার মুন্সী কারখানা থেকে কি ভাবে কত পরিমাণ তামাক বা পাতা সংগ্রহ করে। মুন্সীকে কারখানার মালিক প্রতি লক্ষ বিড়ি তৈরী হবে এমন হিসাবে তামাক পাতা এবং কেন্দু পাতা সরবরাহ করে। নিচের সারণিতে দেখানো হল ;

বিড়ির সংখ্যা	কাঁচামাল	পরিমাণ
এক লক্ষ (১০০০০০)	কেন্দুপাতা	৪৫ কেজি
এক লক্ষ (১০০০০০)	তামাক	৩৫ কেজি

এছাড়া মুন্সী বিড়ি শ্রমিককে দিয়ে এই বিড়ি তৈরীর ব্যবস্থা করার জন্য মালিক তাকে এক লক্ষ বিড়ির জন্য ৩৫০ টাকা পারিশ্রমিক দেয়। মালিক চুক্তি ভিত্তিক বা ঠিকা ভিত্তিক বিড়ি বাঁধার কাজ করে থাকে। এখানে মুন্সী মালিকের ঠিকা ভিত্তিক শ্রমিক। বিশ্বস্ততার মাধ্যমে মুন্সী এই কাজ করে থাকে। কিন্তু মুন্সী মালিকদের বিশ্বস্ত ঠিকাদার হলেও মালিকের পক্ষে কম বেশী হিসাবের গড়মিল দেখিয়ে নিজের আখের তৈরী করে। মুন্সী মালিকের থেকে বিড়ি বাঁধার কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করে। মুন্সী যে হিসাবে

বিড়ি শ্রমিককে তামাক পাতা বিতরণ করে ঃ

বিড়ির সংখ্যা	কাঁচামাল	পরিমাণ
এক হাজার (১০০০)	কেন্দুপাতা	৪০০ গ্রাম
এক হাজার (১০০০)	তামাক	৩০০ গ্রাম

উপরিউক্ত সারণি দুটি লক্ষ্য করলে একটা বিষয় লক্ষনীয় হয়ে ওঠে তা হল মুন্সী বিড়ি উৎপাদক মালিকের থেকে যে পরিমাণ বিড়ি তৈরীর কাঁচামাল সংগ্রহ করে করে এবং যে পরিমাণ বিতরণ করে তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মুন্সী মালিকের থেকে প্রতিহাজারে হিসাব ৪৫০ গ্রাম কেন্দুপাতা এবং ৩৫০ গ্রাম তামাক। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের নিকট বিতরণের সময় প্রতিহাজারে ৪০০ গ্রাম কেন্দুপাতা এবং ৩০০ গ্রাম তামাক পাতা বিতরণ করে। মুন্সীর প্রথম ধাপে বিড়ি শ্রমিককে কম তামাক এবং কেন্দুপাতা দিয়ে ঠকায়, এটা মুন্সীর শোষণের প্রথম ধাপ।

মুন্সীর লাভ্যাংশ আত্মসাতের দ্বিতীয় পর্যায় যেভাবে মুন্সী বিড়ি শ্রমিককে ঠকায় তা হল, এক ১০০০ বিড়ি তৈরী হলে মুন্সী যখন শ্রমিকের থেকে বিড়ি সংগ্রহ করে তখন প্রতি ১০০০ বিড়িতে এ দুই থেকে তিন মুঠা (প্রতি মুঠায় ২৫টা বিড়ি) বা ৫০ থেকে ৭৫ টি বিড়ি বেশী নেয়। এই অতিরিক্ত বিড়ি বা ছাট বিড়ি নেওয়ার কারণ, যদি বিড়ি শ্রমিকের বিড়ি মালিকের ঘরে পৌঁছে কোন রকম ত্রুটির জন্য বিড়ি বাদ যায় তবে এই অতিরিক্ত বিড়ি বা ছাট বিড়ি সেই ক্ষতি পূরণ করবে। কিন্তু এই ছাট বিড়ি নেওয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত যে নিয়ম আছে, তা হল ছোট বিড়ি কখনোই ২.৫ থেকে ৫ শতাংশের বেশী হবে না।৮ আবার বিড়ি শ্রমিকের বিড়ি, যদি ছাট বিড়ি হিসাবে বাদ যায় তবে সেই বিড়ি অবশ্যই বিড়ি শ্রমিককে ফেরত দিতে হবে অথবা তার জন্য যে মূল্য হয় তা দিতে হবে। কিন্তু মুন্সী যেমন ছাট বিড়ি ফেরত দেয় না তেমনি তার জন্য কোন মূল্যও দেয় না। বিড়ি শ্রমিকগণ মুন্সীর এই শোষণ বা অন্যায়ের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে না, কারণ বিড়ি শ্রমিকগণ এই সত্যটা জানে যে, মুন্সীর সঙ্গে কোনরূপ অশান্তি করলে পুনরায় বিড়ির কাজ পেতে বেগ পেতে হবে। মুন্সীর সব রকম অন্যায় কাজের শিকার হয়েও বিড়ি শ্রমিকরা কোনরূপ আন্দোলন করে না। সমীক্ষা থেকে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় যে মুন্সীগণ মহিলা বিড়ি শ্রমিককে বেশী পছন্দ করে। পুরুষ বিড়ি শ্রমিক হলে মুন্সী এই কাজ মহিলা বিড়ি শ্রমিকের থেকে তুলনামূলক কম করে। এখানেও মুন্সীর শ্রমিক নির্বাচনে সুবিধা ভোগ করে।

মুন্সীর এই শ্রমিক শোষণ এবং মালিক ঠকানো পদ্ধতিই তাঁর আয়ের বড় উৎস। যদিও মুন্সী এই সব কাজ বরাবরই গোপনীয়তার সঙ্গে করে থাকে। বিশেষ করে মালিক পক্ষ মুন্সীর এই গোপনীয় অবৈধ কাজের বিষয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে জানলেও মালিক তাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য মুন্সীর বিরুদ্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। মুন্সী শ্রমিকদের নিকট থেকে ছাট হিসাবে সরকারী নিয়ম নীতি একেবারে মেনে চলে না। বিড়ি বাঁধার ব্যাপারে প্রস্তুতকারক/কন্ট্রাকটর/এজেন্টরা দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন অসৎ উপায়ে অবলম্বন করে আসছে। বিড়ি শ্রমিক দ্বারা তৈরী বিড়ি কখনও কেন্দুপাতা, তামাক,

সুতো ইত্যাদি খারাপ - এর ছুতোয়, কখনো নির্দিষ্ট মানের না হওয়ার অজুহাতে মোট বাঁধা বিড়ির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে সমান পরিশ্রমে শ্রমিকরা কম মজুরী পাচ্ছেন। ১৯৯৪ - ৯৫ সালে রিজিওনাল শ্রমিক মন্ত্রীদের সম্মেলনে ত্রিপাক্ষিক মান নির্ণায়ক কমিটি এবং জেলার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কমিটি কাঁচামালের ন্যুনতম পরিমাণও নির্দিষ্ট করেছে। সাধারণ মানের ৮০০ গ্রাম কেন্দুপাতা এবং ৩০০ গ্রাম তামাক ১০০০ বিড়ি বাঁধতে লাগানো হবে। এতে খারাপ মানের ভিত্তিতে বাতিল করায় মজুরী ক্ষতির পরিমাণ ২.৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ এর বেশী হবে না।৯ বিকল্পে বাদ যাওয়া ছাট বিড়ি অবশ্যই বিড়ি শ্রমিককে ফেরত দিতে হবে। কেন্দুপাতা ও তামাকের দাম বাদ দিয়ে সেই বিড়ির জন্য মজুরী সরকার নির্দিষ্ট করবে। এই ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারগুলি ও ওয়েলফেয়ার কমিশনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তার ১৯৬৬ সালে বিড়ি ও সিগারেট আইনের বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি ব্যাপক প্রচার করে। কিন্তু বাস্তবে সেই কাজ কোন ওয়েলফেয়ার দপ্তর করে না। আবার বিভিন্ন কারণে তাদের পক্ষে করাও সম্ভবপর হয় না।

মুন্সী শ্রমিককে বিড়ি বাঁধার জন্য বিড়ির সমস্ত কাঁচামাল সংগ্রহ করেন এবং পরিমাণ মত কাঁচামালের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিড়ি সংগ্রহ করেন। যে এই রকম মুন্সী বিড়ি শ্রমিককে ৪০০ গ্রাম কেন্দুপাতা এবং ৩০০ গ্রাম তামাক সরবরাহ করে, এক হাজার বিড়ি তৈরীর জন্য কিন্তু মুন্সী যে কাজটা করে তা হল, প্রতি হাজার বিড়ি এবং ছাট বিড়ি ৫০ থেকে ৭৫টা সংগ্রহ করে। অর্থাৎ মোট বিড়ি সংগ্রহ করে ১০৫০ টি বা ১০৭৫ টি। মুন্সী ১০৫০টি বা ১০৭৫ টি বিড়ি সংগ্রহ করে বিড়ি শ্রমিককে মূল্য দেয় ৭৫ টাকা। বিড়ি শ্রমিকে যদিও পাওয়ার কথা প্রতি হাজারে ৭৫টাকা।১০ অর্থাৎ কাজের পরিশ্রমের নিরিখে তিনি কমই পারিশ্রমিক দেন।

মুন্সী শুধুমাত্র বিড়ি শ্রমিককে বিড়ি বাঁধার কাঁচামাল নয়, বিড়ি শ্রমিকে পরিচয় পাওয়া সব ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাঁর, আর এখনই মুন্সী বেশ সুক্ষ্মতার নিরক্ষর, সরল, সাধারণ বিড়ি শ্রমিককে কথার জালে ফাঁসিয়ে বাড়তি টাকা আদায় করে। এটাও ঠকানোর একটা পদ্ধতি - মুন্সী শুধু যে এইভাবে ঠকায় তা নয়, বিড়ি শ্রমিককে বিড়ি পরিচয় পত্র পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত নেয়। এইভাবে হয়তো বা কেউ কেউ বিড়ি 'পরিচয় পত্র' পায় কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মুন্সী পরিচয় পত্র সকলকে দিতে পারে না। কিন্তু অনেকের থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে, সে বিভিন্ন অজুহাতে সেই টাকা আত্মস্যাৎ করে।

বিড়ি পরিচয় পত্র যেহেতু শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে লাগে, সেহেতু তারা যেন তেন উপায়ে বিড়ি পরিচিতি পত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মুন্সীদের দ্বারস্থ হয়। কারণ, যেহেতু মুন্সী বিড়ি শ্রমিকের বেশী পরিচিত একসময় বিড়ি শ্রমিক মুন্সীকে বিশ্বাস করে বসে। আর মুন্সীও সেই সুযোগ গ্রহণ করে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Sarkar, Jadunath.(1953): Old Murshidabad;Krishnath College 100 year Centenary Volume; Berhampore, Murshidabad; P. 132.

২ .DISTRICT STATISTICAL HAND BOOK, MURSHIDABAD, Bereau of applied Economics and Statistics government of West Bengal. 2008; P: iii

৩. ঘোষ, কেশব (২০০৩): মুর্শিদাবাদের বস্ত্র ও হস্তশিল্প - ১৭৫০-১৮৫৯; এম.ফিল.গবেষণাপত্র, যাদবপুর; পৃঃ ৫৫

৪. সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাবলী. (১৩-১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০): মুর্শিদাবাদ জেলা, বিড়ি মজদুর এন্ড প্যাকার্স ইউনিয়ন; ৮ম সম্মেলন, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাবাবলী ; পৃঃ ৮

৫. 'Government of West Bengal (2012) ACHIVEMENT REPRIT AS ON MARCH' MURSHIDABAD, Deputy Labour Commissioner, Berhampore, Murshidabad.

৬. নিমতিতা এবং বহরমপুর শ্রমদপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর রেকর্ড। ২৫/০২/২০১৩

৭. সমীক্ষক, (মার্চ ১৫, ২০১৩): ক্ষেত্র সমীক্ষা

৮. সমীক্ষক, (মার্চ ২০, ২০১৩): ক্ষেত্র সমীক্ষা

৯. নাগরিক মঞ্চ (২০০৩) : প্রসঙ্গ শ্রমিক, প্রকাশক, নবদত্ত, নাগরিক মঞ্চের পক্ষে, কলি: পৃঃ ২৯

১০. সমীক্ষক, (মার্চ ৫, ২০১৩): ক্ষেত্র সমীক্ষা

১১. সমীক্ষক, (মার্চ ২৯, ২০১৩): ক্ষেত্র সমীক্ষা

হুগলী জেলার শিল্পায়ন (১৮৫০ - ১৯৪৭)

-মীনাক্ষী হালদার

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরএস.এন. গার্লস কলেজ উত্তরপাড়া, হুগলী।

জনপদ হিসাবে হুগলী বহু পুরনো আর বন্দর হিসাবে হুগলী মধ্যযুগেও বিখ্যাত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে সরস্বতী নদীর স্রোত ও জলধারা কমে আসে, পরিবর্তে ভাগীরথীর মূলধারা হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে সপ্ত গ্রাম বন্দরের গুরুত্ব কমে যায়, পরিবর্তে হুগলী বন্দর হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন 'পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইতো। সেইজন্য এই নদী খুব বিপুলকায়া ও বেগবতী ছিল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল এবং তাহার ফল স্বরূপ সেই নদী ক্রমশ শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিল।''[১] মুঘল আমলে হুগলী একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চল হয়ে ওঠে। মুঘল আমলে হুগলী বন্দর ও শহর হিসাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি এটি ছিল নবাবদের নিজস্ব জাগীর এবং বাংলাদেশের পশ্চিমদুয়ার ও সীমান্ত ঘাটি যার মধ্য দিয়ে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের সাথে বাংলার যোগাযোগ বজায় থাকত। তাছাড়া হুগলী ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব উপকূলের শুল্ক সংশোধনাগার (custom clearance) ও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের ছাড়পত্র (permit) গ্রহণের কেন্দ্র এবং পূর্ব উপকূলের সমস্ত বর্হিবাণিজ্যের ওপর নজর রাখার মুঘল ঘাঁটি।

হুগলী জেলার মৃত্তিকা পলি গঠিতহওয়ায় চিরকালই হুগলী কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিল। পাশাপাশি প্রাচীনকাল থেকে হুগলী শিল্পোন্নত অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থান হুগলীকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিল। J.J.A. Campos হুগলী সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন- "In Indo European history, there is not undoubtedly, a more interesting Indian town than Hooghly; because there with in a range of five miles seven European nations fought for supremacy; the potuguese, Dutch, The Enghlish, The Danes, The Flemish and The Prussiaans."[২] যদিও Campos ফরাসীদের নাম করেননি, কিন্তু এই সাতটি জাতির মধ্যে ফরাসীরাও ছিল। পর্তুগীজ বণিকেরা বঙ্গদেশে প্রথম ব্যবসা করতে আসে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম ছিল তাদের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরস্বতী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সপ্ত গ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে এবং ভাগীরথীর মূল জলপ্রবাহ হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পুর্তগীজরা হুগলীকে বন্দর হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। এরফলে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে হুগলীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীঘ্রই অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও হুগলীতে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি তৈরী করে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাচেরা হুগলীতে বাণিজ্য করতে

আসে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তারা শাহজাহানের কাছ থেকে ব্যবসার ফর্মান পায়। হুগলী শহরের পাশে চুচুড়াতে তারা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দিনেমার বণিকরাও চন্দন নগরে তাদের কুঠি নির্মাণ করে ও বাণিজ্য শু(করে। প্রায় সমসাময়িককালে হুগলীতে ফরাসী বণিকদের আগমন ঘটে। প্রাশিয়ান বা জার্মান এবং বেলজিয়ান বা ফ্লেমিস বণিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। হুগলীতে ইংরেজ বণিকদেরও আগমণ ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই। তবে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল ফরাসী ও ইংরেজরা। অনেক যুদ্ধ-বিবাদের পর ফরাসীরা হুগলী জেলার চন্দন নগরে টিকে ছিল, তবে তা' অনেকবার ইংরেজদের হাতে চলে গিয়েছিল।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের শাসন কার্যের সুবিধার্থে বর্ধমান জেলাকে ভেঙে তার দ(ণ অংশে ১৩টি থানা নিয়ে গঠন করলো হুগলী জেলা, যার সদর শহর ছিল হুগলী শহর। এই তেরোটি থানা ছিল- হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, পান্ডুয়া, বেণীপুর, ধনিয়াখালি, হরিপাল, রাজবলহাট, জাহানাবাদ, দেওয়ানগুঞ্জ, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, বাগনান, আমতা। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর জজ ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীনে আনা হ'ল তিনটি শহরকে, যেগুলি এতদিন অন্য বিদেশীদের হাতে ছিল- চুঁচুড়া, চন্দননগর আর শ্রীরামপুর। ১৮১৪ তে চব্বিশ পরগণা থেকে বৈদ্যবাটি ও রাজপুর থানা দু'টি হুগলীর অন্তর্গত করা হয়। ১৮১৯-এ যুক্ত(হয় কোটরা ও উলুবেড়িয়া থানা। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর আবার ফরাসীদের হাতে চলে যায়। ১৮৪৩ ত্রী(ষ্টাব্দে হুগলী জেলার দ(ণাংশ নিয়ে তৈরী হয় হাওড়া জেলা। পূর্বের যে ১৮টি থানা ছিল তার মধ্যে বাগনান আমতা, রাজপুর, কোটরা এবং উলুবেড়িয়া হাওড়া জেলায় চলে যায়। ১৮৭২ খ্রীঃ চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল থানা চলে যায় মেদিনীপুরে। আর জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা চলে যায়, বর্ধমান জেলায়। ১৮৭৯ খ্রীঃ আবার এই দু'টি থানা হুগলী জেলার অন্তর্ভূক্ত(হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদের নাম বদল করে রাখা হয় আরামবাগ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেশীয় শিল্পের অবনতি হতে থাকে এবং ইউরোপীয়ানদের হাত ধরে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। আধুনিক শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে নগরায়ণের পথ ও প্রশস্ত হয়। হুগলী নদীর দুই তীরে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। হুগলীর শিল্পায়ন ও নগর বিকাশে সহয়তা করেছিল রেলপথ নির্মাণ। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া থেকে পান্ডুয়া পর্যন্ত রেলগাড়ি চালাবার উপযুক্ত(রেলপথ প্রস্তুত হয়, কিন্তু ফরাসী অধিকৃত চন্দন নগর এর মধ্য থাকায় ফরাসী সরকারের সঙ্গে লেখালেখি করে মত পেতে তিন বছর সময় লাগে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ৪০ মাইল রাস্তা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে রেল চলাচল শু(হয়। ১লা সেপ্টেম্বর পান্ডুয়া পর্যন্ত ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত ১২০ মাইল রাস্তায় রেল চলাচল শু(হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস পর্যন্ত এই লাইন বর্ধিত হয়। ঐ বছরেই মোগলসারাই পর্যন্ত এবং ১৮৬৪ তে গাজিয়াবাদ পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হয়।[৩] ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া থেকে বেঙ্গল নাগপুর নামে রেলপথ চালু হয়। এরফলে হাওড়া ও হুগলীর সঙ্গে পশ্চিমে নাগপুর ও বোম্বের এবং দ(ণে উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[৪] এছাড়া ন্যারোগেজ ছোট দু'টি রেলপথ হওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা স্থাপিত হয় যা হাওড়া ও হুগলী জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে।[৫]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া-তারকে(র রেলপথ স্থাপন হয়। এই রেলপথ স্থাপনের (ত্রে হুগলীর কয়েকজন জমিদারদের বড় ভূমিকা ছিল। এই রেল লাইন স্থাপনের ফলে কলকাতার বাজারের সাথে হুগলী জেলার প্রত্য(সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এছাড়াও হুগলী জেলার জমিদারবর্গের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ভারতে প্রথম স্বদেশী রেল প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল কোম্পানী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তারকে(র থেকে বসুয়া পর্যন্ত ১২ মাইল এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বসুয়া থেকে মগরা পর্যন্ত প্রায় ১৯ মাইল রেলপথ চালু করে। ত্র(মশ এই কোম্পানী মগরা থেকে ত্রিবেনী এবং দশঘরা থেকে জামালপুর পর্যন্ত তাদের শাখা বর্ধিত করে।[৬] এইভাবে রেল ব্যবস্থার প্রসারের ফলে হুগলী শহর ও হুগলী জেলার অন্যান্য অঞ্চলের সাথে কলকাতা ও হাওড়ার যোগাযোগ অনেক সহজ হয়। এমনকি ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সাথে ও যোগাযোগসূত্র অনেক সহজ হয়। হুগলীর বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্য খুব দ্রুত কলকাতা হাওড়া এমনকি ভারতের যেকোন স্থানে পাঠানো অনেক সহজ হয়। পরিবহণের উন্নতির ফলে বাজার যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি কাঁচামাল সংগ্রহ অনেক সহজ হয়। রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। রেল ব্যবস্থার মাধ্যেমে পরিবহণের ফলে কয়লা, মেশিনারী ও শ্রমিক সহজলভ্য হয়। এরফলে, বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে।

রেলপথ ছাড়াও হুগলী জেলার পরিবহণ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি শিল্প বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। প্রাচীন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হুগলী জেলার গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে। রেললাইন প্রস্তুত হবার বহুপূর্বে গঙ্গা ও গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এই দুই এর সমন্বয় হুগলী জেলার শহরগুলি নির্মার্নে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সহয়তা করেছিল। পরবর্তীকালে যখন রেলপথ তৈরী হয় তখন তা হুগলী জেলার এই শহরগুলির বিকাশে সহায়তা করেছিল। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়াও ওল্ড বেনারস রোড, ত্রিবেনী মহানাদ রোড ও অসংখ্য আঞ্চলিক রাস্তা হুগলী জেলার শিল্প বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে তোলে।[৭] এর সঙ্গে যুক্ত(হয় জল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। ১৮২৩ সালে প্রথম ভাগীরথী নদীতে হুগলীর কাছে বাস্পচালিত পোত চালান হয়। ১৮২৬ খ্রীঃ চুঁচুড়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাত্রীবাহী স্টীমার চালু হয়। এছাড়া রূপনারায়ণ থেকে রানীচক পর্যন্ত স্টীমার চলত এবং কলকাতা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঙ্গার হাটখোলা থেকে কালনা পর্যন্ত মাল ও যাত্রীবাহী স্টীমার চালাত। D.G. Crawford এর Hooghly Medical Gazetteer থেকে জানা যায় এই সময়ে শেওড়াফুলি, ভদ্রে(র ও চন্দননগরে স্টীমার চলাচল করত।

এইভাবে রেল, সড়ক ও জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের ফলে হুগলী নদীর দুই তীরে বিদেশী পূঁজিতে গড়ে উঠলো কলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল। ইউরোপীয় শিল্পপতিদের উদ্যোগে হুগলী জেলায় একে এক গড়ে উঠল চটকল, চট প্রেস, কাপড় কল, ময়দা কল, লবন তৈরীর কারখানা, ছাপাখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাবারজাত শিল্প, বেল্টিং শিল্প, রেয়ন শিল্প, মোটরগাড়ি তৈরীর কারখানা, হাড়গুড়ো কারখানা, রাসায়নিক তৈরীর কারখানা ইত্যাদি। এছাড়া উনিশ শতকের শেষার্ধে কৃষি অর্থনীতির সংকট ও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার হুগলীর দেশীয় জমিদার ও পূঁজিপতিদের একাংশকে আধুনিক শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছিল।বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল কোম্পানী ছিল হুগলী জেলার জমিদারদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা একমাত্র দেশীয় পূঁজি নির্ভর রেল কোম্পানী।

১৯০৬ খ্রীঃ সম্পূর্ন স্বদেশী উদ্যোগে গড়ে ওঠে বঙ্গল(ী কটন মিল। যার প্রাথমিক মূলধন ছিল ১২ ল(টাকা।[৮] কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী সাবান শিল্প। উত্তরপাড়ার পিয়ারীমোহন মুখার্জীর উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফেক্চারিং কোম্পানী। উত্তরপাড়ার মুখার্জীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে জাহাজ শিল্প।[৯]

হুগলী জেলার আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে প্রবীণতম হল পাটকল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই শিল্প হুগলী জেলার একটি সমৃদ্ধ হস্তশিল্প। যা পরবর্তী সময়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ চটকলগুলি গড়ে উঠেছিল হুগলী নদীর দুই তীরে। হুগলী জেলার চটকলগুলি ছিল মূলতঃ শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, চাঁপদানি, ভদ্রে(র ও তেলেনিপাড়া অঞ্চলে। বাংলাদেশের প্রথম পাটকলটি স্থাপিত হয় হুগলী জেলার রিষড়ায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে যার নাম ছিল ওয়েলিংটন জুট মিল।[১০] ১৮৬৬তে শ্রীমারমপুরে ইন্ডিয়া জুটমিল, ১৮৭৩ এ চাঁপদানিতে চাঁপদানি জুট মিল, ১৮৮৫ তে তেলেনি পাড়ায় ভিক্টোরিয়া জুটমিল ও রিষড়ায় হেস্টিংস জুট মিল স্থাপিত হয়। এই পাঁচটি জুটমিলে দৈনিক ১১ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করতো।[১১] ১৯২১ সালের মধ্যে হুগলী জেলায় মোট ১২টি চটকল গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে চটকলের সংখ্যা দাড়ায় ১৬।[১২] মূলতঃ হুগলী নদীর দুই তীরেই পাটকলগুলি সন্নিবেশিত ছিল। হুগলী জেলার পাটকলগুলির কথা বলতে গিয়ে ওম্যালি লিখেছেন- 'All the jute mills are big concerns engaged in jute spining and in jute weaving.[১৩]

চটকলগুলিকে কেন্দ্র করে হুগলী জেলার বিভিন্ন অংশে ধীরে ধীরে জনাকীর্ণ এলাকা গড়ে উঠতে লাগল যেমন- রিষড়া, ভদ্রে(র, তেলেনিপাড়া। এই সময় ব্রিটিশ নীতির ফলে দেশীয় শিল্পগুলির পতন ঘটলে ঐ কারিগর শ্রেণী শহরে এসে কলকারখানায় কাজের জন্য ভিড় করে আবার ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে কৃষক শ্রেণীও শহরে এসে কলকারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হয়। আর শুধুমাত্র স্থানীয় লোকজনই চটকলগুলিতে কাজ করার ভিড় জমিয়েছিল তা' নয়, বহু বহিরাগত অভিবাসী, শ্রমিক ও চটকলগুলিতে কাজ করার জন্য এসে ভিড় করল। বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু শ্রমিক চটকলগুলিতে কাজ করত। এই কারণেই দেখাে যায় ১৮৭২থেকে ১৯০১ খ্রীঃ মধ্যে শ্রীরামপুরের লোকসংখ্যা ২৪,৪৪০ থেকে বেড়ে ৪৪,৪৫১ হয়। কারণ, এই পর্যায়ের চটকলগুলির বেশিরভাগই শ্রীরামপুর সাব্ডিভিশনেই গড়ে উঠেছিল। আর এই জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল অভিবাসী শ্রমিক।[১৪] ১৮৯০ সালের আগে পর্যন্ত চটকলগুলিতে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রতিটি আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায় যে, বাংলার হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণার ও কলকাতার চটকলগুলিতে অভিবাসী শ্রমিকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

The Labour force in the jute industry began to grow from the second half of the 19th century. Bengal was a labour receiving and not a labour supplying province. It was the famine or poor harvest in other provinces which affected the labour supply in jute mills of Bengal. The jute

industry mainly received labour from Bihar, United provinces and Orissa.[১৫]

হুগলী জেলার আর একটি সমৃদ্ধ শিল্প ছিল সূতী বস্ত্র শিল্প। এই জেলার সবচাইতে পুরনো কাপড়ের কলটি গড়ে উঠেছিল মাহেশে যার নাম ছিল Bengal Laxmi Cotton Mill বা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।[১৬] শ্রীরামপুর সাবডিভিশনেই সবচাইতে বেশি কাপড়ের কল কেন্দ্রীভূত ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিলগুলি হল- বঙ্গে(রী কটন মিল, রামপুরিয়া কটন মিল, কোন্নগরের Sri Durga Cotton Spining and Weaving Mill Ltd ও রিষড়ায় Bengal Fine Spining and Cotton Mill Ltd.। ১৯০৮ সালে বঙ্গলক্ষ্মী মিলে ১,০২৬ জন শ্রমিক কাজ করতো এবং ২০০ তাঁতে ২৬ হাজার মাকুর সাহায্যে ৩১,৬১৭ টন সুতো উৎপাদন হতো। ১৯১২ সালে কোম্পানীটির শেয়ারের মূল্য ছিল ১২ ল(টাকা।[১৭]

এই সময়ে আভ্যন্তরীন অনুকূল পরিস্থিতির সাথে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উপাদান ও হুগলী জেলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প বিকাশে সহায়তা করেছিল। ১৮৭০ সালে সূয়েজ খাল উন্মুক্ত(হয়। এর ফলে খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি ইউরোপের কারখানায় তৈরী হওয়া পণ্যদ্রব্য প্রাচ্যদেশে আসছিল। ইউরোপের বাজারে এই সময়ে চটের চাহিদা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় পরপর চটকল গড়ে উঠতে থাকে। তাছাড়া ইউরোপের বাজারে ভারতে তৈরী বস্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। পাটকল ও সুতাকল ছাড়াও আরো যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শ্রীরামপুর পেপার মিল। ১৮৫৩তে কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় রাসায়নিক তৈরির কারখানা। ১৮৬১ সালের মধ্যে এই কারখানায় সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন শু(হয়। এছাড়া উত্তর পাড়া ও বাঁশবেড়িয়াতে ২টি হাড় গুড়ো করবার কারখানা তৈরি হয়।[১৮]

এই সময় হুগলী জেলায় ভারী শিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন (ুদ্র শিল্পের সমৃদ্ধিও ল(J করা যায়, যেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ছাপাখানা, ভাটিখানা, চালকল, হিমঘর, অ্যালয় ইস্পাত তৈরী, লৌহ ঢালাই কেন্দ্র, পিতল ও কাঁসা শিল্প, সাবান ও সুগন্ধি তৈরী, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হুগলীর উন্নতি প্রসার ও নগরায়ণ যুক্ত(ছিল কলকাতার সঙ্গে। কলকাতা থেকে হুগলীর দূরত্ব মাত্র ২৩ মাইল। আষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কলকাতা ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং কলকাতার সঙ্গে হুগলীর বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়তে থাকে। স্থলপথ ও জলপথ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও কলকাতা ও হুগলীর যোগাযোগ বেশ গভীর। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কলকাতার সাথে হুগলীর যোগাযোগ যেমন বৃদ্ধি পেল তেমনি হুগলীর সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে পণ্যসামগ্রী আদান প্রদান ও নানাভাবে লোক যাতায়াতের যোগাযোগ সূত্র বাড়তে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতা ও তার পা(বর্তী অঞ্চলগুলিতে পাটশিল্প, সূতীবস্ত্র শিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকায় কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি বাড়তে থাকে। হুগলীও কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি হিসাবে পাট সূতীবস্ত্র যোগান দিতে থাকে। তাছাড়া জলপথে আসাম, উত্তর বঙ্গ ও বাংলাদেশের সাথে হুগলী যুক্ত(ছিল। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এই জলপথ দিয়েই ব্যবসা বাণিজ্যের বেশির ভাগটাই চলত। দামোদর নদ দিয়ে

রানীগঞ্জের কয়লা হাওড়া, হুগলী ও কলকাতায় আসত। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শু(করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে হুগলী জেলা একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়, জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে ঘিঞ্জি জনবসতি গড়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ ঃ-

১। সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, কলকাতা।
২। J.J.A. Campos, History of the Porttuguese in Bengal.
৩। Eastern Railway, A year of progress 1957-58.
৪। O' Mally and Manmohan Chakraborty : Bengal District Gazetteers, Howrah 1909.
৫। Report on the Administration of Bengal, 1899-1990.
৬। D.G. Crawford, Hooghly Medical Gazetteer
৭। সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, কলকাতা।
৮। অমিত ভট্টাচার্য, স্বদেশী এন্টারপ্রাইজ ইন বেঙ্গল।
৯। Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal.
১০। D.R. Wallace, Romance of jute, Calcutta 1909.
১১। Bengal District Gazetteer Hooghly.
১২। Nirban Basu, The Working Class Movement.
১৩। O' Mally- Bengal District - Gazetteers (Hooghly) Calcutta 1912.
১৪। West Bengal District Handbooks, Hooghly.
১৫। Shiv Rao - The industrial worker in India, London 1939.
১৬। Bengal District Gazetteer (Hooghly District), B Volune, Industrial Statistics
1911-12 to 1920-21, Calcutta 1923.
১৭। District Statistical Handbooks (Hooghly District); BAES Government of West
Bengal for different years.
১৮। Amit Mitra Census 1951 West Bengal District Handbooks, Hooghly.

Minakshi Haldar
Baganbari, Lalpur, Chakdaha, Nadia. Mob. No.: 8926541702
email : minakshi.history@gmail.com

দ্বীপ জ্বেলে যাই

-উত্তম মন্ডল

বি(োয়নের সুর আজ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। যার পদভারে প্রকম্পিত হচ্ছে তৃতীয় বি(ের দেশগুলি। বিপন্ন হচ্ছে শি(া-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি। বিপন্ন হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বদেশ। মুক্ত(বাজার অর্থনীতিই গণতন্ত্রের একমাত্র গ্যারেন্টি — এই হল আজকের বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানের সারকথা। এই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের অগুন্তি বই-এর পাতায়, আন্তর্জাতিক সেমিনার বা কনফারেন্সে, টেলিভিশনের বিতর্কে। গত কয়েকবছরে ভারত যেন হয়ে উঠেছে এই থিসিসের জ্বলন্ত উদাহরণ। বি(ের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত মুক্ত(-বাজার অর্থনীতির পথে হেঁটে ত্র(মেই হয়ে উঠেছে Economic Super Power.

সমাজ প্রগতির হাতিয়ার ছাত্রসমাজ। বি(োয়নের উদারনৈতিক আত্র(মনের জাঁতাকলে পিষে মরছে ছাত্ররাও। ১৯৯০-এর দশক থেকে শু(করে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের আত্র(মন বেড়েছে বহুগুন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বি(েব্যাঙ্ক ও বানিজ্যসংস্থা মারফত বি(েব্যাপী উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের ধাক্কায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে শি(া-শিল্প-কৃষি ও পরিষেবা (ে ত্রগুলিতে। এই সংকটের তীব্রতা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে কর্ম সংকোচন, কর্মহীনতা। ফলে আজকের ছাত্র-যুবকদের বেঁছে থাকার জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। যে আর্থিক নীতির জন্য এই কর্মহীনতা বা কাজ পাওয়ার সমস্যা, যারা এই নীতির স্রষ্টা ও পরিচালক তারাই ছাত্র ও যুব সমাজের সামনে উপস্থিত করছে একা বাঁচার দর্শন। একদিকে বেঁচে থাকার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে সংস্কৃতির নামে ভোগসর্বস্বতার ফলে ছাত্রসমাজের চেতনা ও জাগরণে প্রকোট হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সুবিধাবাদ। আজকের দিনে ত(ণ প্রজন্মের একাংশের মধ্যে আধুনিকতা ও জীবনবোধের ঝোঁক ত্র(মবর্ধমান। ছাত্রসমাজের এই অংশটিকে পঙ্কিল আবর্তে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য সাইবার দুনিয়া - Mobilization -এর সঙ্গে প্রচার মাধ্যমের একটি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শুধু ছাত্র সমাজকে নয়, অভিভাবকদের চেতনাকেও অদ্ভুদভাবে গ্রাস করেছে প্রচার মাধ্যমগুলি। একা বাঁচার দর্শনের স্রষ্টারা শৈশবকাল থেকে যাতে মাথা চিবিয়ে খাওয়া যায় তার ব্যবস্থা ত্র(মান্বয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিযোগিতামুখী মনোভাব গড়ে তুলতে তাঁর ছোট্ট শিশুকে উৎসাহিত করছেন বন্ধুর প্র(ের উত্তর ভুল দেবার জন্য। প্রতিযোগিতায় শিশুকে শি(িত করা গেলেও প্রকৃত মানুষ তৈরী করা সম্ভব হল না।

প্রকারান্তরে মরণাপন্ন জীবকে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিশেষ শি(ার সাহায্যে বাঁচিয়ে তোলেন বলে আমরা চিকিৎসকদের জীবনদাতা বলে মনে করি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি(ফিরিয়ে দিয়ে আমরা অসীম তৃপ্তি বোধ করি, কোন বিপর্যয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা 'কৌটা কালেকসন' করে

অসহায়-পীড়িতদের পাশে দাঁড়াই। সবকিছুই কেবলমাত্র একটি জীবকে জীব হিসাবে বাঁচতে সাহায্য করা। মানবধর্ম ও মানবিকতার এমন দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ-পরিসরে আজও ল(্য করা যায়। প্রকৃত শি(াই বুঝিয়ে দিতে পারে জীব আর মানুষের পার্থক্য কী। আজ সারা দেশ সহ বি(্বে অগ্রসরগামীর মেরাথন দৌড়ে নেমেছে, বি(্বোয়িত পৃথিবী, সময় ত্র(মশ নিত্য-নুতুনের পানে ধাবিত। অথচ একুশ শতকের এই দ্বিতীয় দশকেও আমাদের দেশে শি(ার আঙিনায় আসতে পারেননি অনেকে, সমাজে নানা অব(য়ের চালচিত্র দেখতে দেখতে আগামী প্রজন্মের কাছে ভীতি সঞ্চারিত হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথে সরকারের নানা নীতি ও আইন প্রনয়নের পরেও থেকে গেছে বহুবিধ বাধা। দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে সকলের। 'UNICEF' প্রদত্ত সমী(া অনুসারে জানা যায় আমাদের দেশে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত প্রায় ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোন বিদ্যালয় গৃহ নেই, এখনো প্রায় ৮১,০০০ বিদ্যালয়ে কোনও ব্ল্যাকবোর্ড নেই, ৪২ শতাংশ বিদ্যালয়ে গৃহের অবস্থা খারাপ। অন্যদিকে বি(্বব্যাঙ্ক ও 'United Nations Development Programme' - এর পরিসংখ্যানে ভারতের ৩৭.২% (২০১০) মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান ১৪ বছর বয়সের কম শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ভারতে সর্বাধিক। আমাদের দেশে ৭ বছর এবং তার বেশি বয়সিদের মধ্যে যারা যেকোন একটি ভাষায় লিখতে পড়তে পারে তাদেরই সা(র হিসেবে গণ্য করা হয়। তার নিরিখে ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী দেশে সা(রতার হার ৮২.১৪% এবং মহিলা সা(রতার হার ৬৫.৪৬% ।

এই বিশাল বিচিত্র বি(্বে শিখবার ও জানবার শেষ নেই। পরিসংখ্যানগত মানদণ্ডও এই বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের একটি লেখ্যমাত্র। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল মানব সভ্যতার ত্র(মবিকাশ বিশাল মানব সমাজের অজ্ঞতা ও নির(রতা দ্বারা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন প্রকৃত শি(ার। আমাদের দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনে মুখ না ফিরিয়ে নিয়ে অব(য়িত সমাজের মঙ্গলার্থে এই বিরাট কর্মযজ্ঞে সামিল হতে পারি, পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে পারি। কঠোর নি(ৎসাহ ব্যঞ্জক নিন্দার কাছে পরাজিত সমাজের বিপুল সংখ্যক নির(র ব্যক্তি(দের আত্র(মন না করে একটু ধৈর্য্য, একটু সহানুভূতি দিয়ে তাদের ব্যর্থ জীবনের কষ্ট ও হতাশা কাটাতে সাহায্য করতে পারি। আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে— 'পশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। অসংখ্য লোক নির(র-অজ্ঞ থাকলে বাকি লোকেরা সমাজে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না, সমাজের সুস্থ সংস্কৃতি অটুট থাকতে পারে না। এক কলসী জলে চারটি হ্যালেজেন ট্যাবলেট আর কয়েকটা পোকা ছেড়ে দিলে সে কলসীর জল যেমন বিশুদ্ধ থাকে না, তেমনি একই পরিবারে দুজন শি(িত লোক বাকি সকলে অশি(িত হলে সে বাড়ির আচার-ব্যবহার মোটেই আধুনিক ও যুগোপযোগী হবে না। গোটা গায়ে ঘামের গন্ধ আর জামার কলারে এক ফোঁটা কান্তা বা আতর, তাতে মোট ফল কিন্তু ঘামের গন্ধ। সুতরাং ধামাচাপা বা উপর পালিশ দিয়ে তখনকার মতো কাজ চলে যেতে পারে কিন্তু, পরিনামে সকলেরই (তি। আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তা গুণে বলা যায় না, এভাবেই আমরা শি(ালাভ করি। জ্ঞান মানুষে মানুষে বিভেদ শেখায় না, জ্ঞান অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মধ্যে তারতম্য শেখায় না, জ্ঞান সমাজকে অব(য়ের পথে ঠেলে দিতে শেখায় না। আমরা কাজ চলার মতো কিছু কিছু শিখে নিয়ে নিজেদের নির(রদের থেকে উন্নত জীব ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। ওদের মুর্খ ভেবে ক(ণা করি, অবজ্ঞা করি। মানবাত্মার প্রতি এত বড় অপমান অরা কি-ই বা হতে পারে। ভারতের বৃহত্তর পরিসরে

এহেন দারিদ্র পীড়িত গ্রামভিত্তিক সমাজে শুধু পড়তে পারা আর না পারা নিয়ে মুর্খের স্বর্গে বাস করছি। তারা পড়তে পারেনি বলে চিরকাল অবহেলিত, আমরা নিজেদের জ্ঞানী-গুণি ভেবে আত্ম শ্লাঘা অনুভব করবো? কৃষি নির্ভর ভারতে যেখানে দারিদ্রতা, গ্রাম্যতা ও উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে ইঁদুর দৌড়ে বি(্বোয়নের থাবা আঘাত হানে, সেখানে একথা ভাববার সময় এসেছে। কারণ এই সকল প্রান্তিক মানুষগুলি, শিশু শ্রমিক ও পথ শিশুগুলিই সমাজের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে যাচ্ছে। ত্র(মান্বয়ে অপরাধ জগতের আঁতুড় ঘরে এদের প্রশি(ণ চলছে সমাজকে বিপথগামী করবার।

শি(াই পারে সমাজ রাষ্ট্রের মঙ্গলদ্বীপ জ্বালতে। তাই যাদের উপর আমাদের ছায়া পড়ছে, তাদেরকে আমাদের সমগোত্রীয় করে তুলতে হবে। আমাদের অজ্ঞতার কারণে বা প্রকৃত শি(ার অনেক দূরে অবস্থানের কারণে। নতুবা সামাজিক, রাজনৈতিক বা কোন অর্থনৈতিক অভিসন্ধি। কিন্তু যাই হোক না কেন সমাজের সকল স্তরের এই অব(য় প্রকৃত শি(া (খে দিতে পারে। আমাদের ভাবতে হবে সেই ছেলেটির কথা যে রোজ সকালে উঠে খবরের কাগজ বয়ে বেড়ায়, যে চায়ের দোকানে পে-ট ধোয়, কারখানার আগুনে কচি হাতে ফোস্কা ফেলে। সে গন্ধ পেয়েছে, ছুঁয়ে দেখেছে, কিন্তু বিদ্যালয়দ্বারে প্রবেশের অধিকার পায়নি। বিশাল অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সুপেয় গঙ্গা ধারার মতো অথচ সেই শিশুরা তাকে সমুদ্রের অপেয় লবনাক্ত(জল ভেবে অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। আমরা তাদের সেই অ(মতা আর ত্রুটি দূর করে জ্ঞান সমুদ্রে গণ্ডুষ পান করতে প্রেরণা দিতে পারি। আপামর জীবনস্রোত আমাদের আত্মসর্বস্বতা এত বেশি বেড়ে চলেছে যে তা ভাববার অবকাশ নেই অধিকাংশের। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> ''আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না, আড়ম্বর করি
> কাজ করিনা, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বি(্বাস করি
> না, যাহা বি(্বাস করি তাহা পালন করিনা। ভুরি প্রমাণ
> বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ
> করিতে পারি না।''

কিন্তু এভাবে আর কত দিন। চলুন আমরা দ্বীপ জ্বেলে যাই তাদের জন্য— যারা এখনো রয়েছে অন্ধকারে।

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের শি(াসম্পর্কিত

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঃ-

- মাম্পি ঢালী

ভূমিকা ঃ- মানব সভ্যতার প্রধাণ ভিত্তিভূমি হল তার শি(া ব্যবস্থা। বৈদিক যুগ থেকে শু(করে আজ এই আধুনিক শি(াযুগ পর্যন্ত শি(ার বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্যযুগের শেষে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের - শি(া - সমাজ তথা সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তৎকালীন সময়ে এদেশের মানুষের শি(া বা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতস্থ উচ্চতম কতৃপ(ধর্ম সংস্কৃতি ও শি(া(ত্রে উদার নিরপে(নীতি অনুসরণ করে।

সনদ আইন - ১৮১৩ খৃঃ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ ভারতের শি(ার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল। এই সনদ আইনের শি(াধারাকে ভারতে সরকারীভাবে শি(া বিস্তারের প্রথম পদ(প বলা যেতে পারে। এইখানেই ভারতীয় শি(ার (ত্রে সর্বপ্রথম সরকারী অর্থ মঞ্জুর করা হয়। সনদের ৪৩ নং ধারায় ভারতে শি(া বিস্তারের একটি শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। তাতে বলা হয় যে, 'সাহিত্যের পুন(জ্জীবন এবং বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যে অধিবাসীগণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের প্রচার ও উন্নয়নকল্পে কোম্পানী অন্যান্য দাবী মেটাবার পর বাৎসরিক অন্যূন একল(টাকা ব্যয় করবে। জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন - ১৮২৩ খৃঃ। সনদে অধিকৃত একল(টাকা কী ধরণের শি(ার জন্য ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন তথ্য নির্দেশ ঐ প্রস্তাবে ছিল না। প্রাচ্যবাদীরা এই অর্থকে আরবী, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে এবং ঐ সব ভাষার পন্ডিতগণকে উৎসাহ ভাষা হিসাবে প্রদান করার স্বপ(মত প্রকাশ করেন। অপরপ(পাশ্চাত্যবাদীরা দাবী জানাতে থাকেন ঐ অর্থ মিল্টনের কাব্য ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জ্ঞান - বিজ্ঞানের প্রসারে ব্যয় করার জন্য। এরূপ পরিস্থিতিতে দশজন সভ্য নিয়ে GCPI গঠিত হয় এবং এই সমিতির ওপরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়। এই কমিটিতে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন প্রাচ্যবাদী। ফলে পরবর্তীকালে ইংরাজী শি(ার প্রাধান্য বাড়ার ফলে কমিটির সদস্যরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যান প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী।

মেকেলের মিনিট - ১৮৩৫ খৃ -

এহেন পরিস্থিতিতে তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক কতৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে লর্ড মেকেলে ১৮৩৫ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করলেন তা ভারতীয় শি(া(ত্রে এক ঐতিহাসিক বিবরণী বলে পরিগণিত হয়ে আছে। মেকেলে সাহেবের মিনিটে ইংরাজী ভাষাকে শি(ার মাধ্যম করার প্রস্তাব বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল। লর্ড

মেকেলের বিবরণীর প্রধান বক্তব্যগুলি ছিল —

- ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই শি(া দিতে হবে।
- পুরানো অকেজো দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে।
- নতুন যুগের নতুন শি(ার উপযুক্ত স্কুল-কলেজ খুলতে হবে।

মেকেলে সাহেব তার ঐতিহাসিক বিবরণীতে সর্বপ্রথমে ১৮১৩ খৃঃ সনদ আইনের ৪৩নং ধারার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর মতে ''সাহিত্য বলতে ইংরেজী সাহিত্যের কথা বোঝায়'' শি(ত ভারতবাসী বলতে সেই ভারতবাসীর কথা বলা হয়েছে যারা লক সাহেবের দর্শন, মিল্টনের কবিতা পাঠে আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান শি(ার প্রবর্তন ও প্রসার বলতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলন করার কথাই বলা হয়েছে।

এ্যাডামের বিবরণী - ১৮৩৮ খৃঃ -

উইলিয়াম এ্যাডাম তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রাম্য শি(া ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ১৮২৯ ও ১৮৩৪ খৃঃ দু'বার লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং দু'বার প্রত্যাখ্যাত হবার পর তৃতীয়বার ১৮৩৫ খৃঃ প্রস্তাব পাঠান এবং সমী(ার অনুমতি পান। ১৮৩৫ খৃঃ তথ্যভিত্তিক দু'টি বিবরণ এবং ১৮৩৮ খৃঃ তথ্য ও সুপারিশ সম্বলিত আর একটি বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করেন। এই তিনটি বিবরণ ইতিহাসে এ্যাডামের রিপোর্ট নামে খ্যাত হয়ে আছে।

- প্রথম বিবরণী - ১৮৩৫ খৃঃ ১লা জুলাই এই বিবরণীতে তিনি দাবী করেন যে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল এক ল(অর্থাৎ প্রতি চারশত জনের একটি করে বিদ্যালয় ছিল।
- দ্বিতীয় বিবরণী - ১৮৩৫ খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর এখানে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে ৪৮৫ টি গ্রামে ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ছাত্র সংখ্যা ২৬২ জন ছিল।
- তৃতীয় বিবরণী - ১৮৩৮ খৃঃ এই বিবরণীতে এ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শি(া ব্যবস্থা বিবরণ ও পরিসংখ্যানমূলক হিসাব দেওয়া হয়েছে। মোট ৫টি জেলার ২৫৬৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০,৯১৫ জন পাঠ গ্রহণ করত।

উডের ডেসপ্যাচ- ১৮৫৪ খৃঃ-

১৮৩৫ খৃঃ সনদ নবীকরণ করার সময় কোম্পানী ভারতের শি(াব্যবস্থায় আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এর ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শি(া নির্দেশ প্রকাশিত হয়। এর সভাপতি উড সাহেবের নামে এই মূল্যবান শি(া নির্দেশ রচিত হয়েছিল বলেই তা উডের ডেসপ্যাচ নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই ডেসপ্যাচের প্রধান

সুপারিশগুলি হলঃ

- বিভিন্ন নতুন শি(া বিভাগ স্থাপন।
- বি(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- প্রাথমিক শি(া।
- অনুদান ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক জেমস এই ডেসপ্যাচ সম্পর্কে হলেছেন - "It was the magna carta of English education in India"

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ - ১৮৫৯ খৃঃ -

প্রথম সেক্রে(টারী অব স্টেট লর্ড স্ট্যানলী ১৮৫৯ খৃঃ যে শি(া নির্দেশনামা প্রনয়ণ করলেন তাই স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। এটি উডের ডেসপ্যাচের পরিপূরক মাত্র। উড ও স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ একই দলিলের এপিঠ এবং ওপিঠ বলা যায়।

হান্টার কমিশন - ১৮৮২ খৃঃ -

লর্ড রিপন ১৮৮২ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী হান্টার সাহেবের সভাপতিত্বে একটি শি(া কমিশন নিয়োগ করেন এটি হল ভারতের প্রথম শি(া কমিশন। ২০ জন সদস্য নিয়ে এই শি(া কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে আনন্দ মোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি ছিলেন। এই কমিশন প্রাথমিক শি(ার উন্নতির পাশাপাশি নারীশি(া, মুসলিম শি(া, অনুন্নত সম্প্রদায়ের শি(ার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। প্রাথমিক শি(া উন্নতিকল্পে ৩৬টি সুপারিশ করেন।

সিমলা শি(া সম্মেলন, ১৯০১ খৃঃ -

কার্জন ১৯০১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় ভারতের শি(া সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সমস্ত প্রদেশের ডিরেক্টর এবং বি(বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শি(া বিশেষজ্ঞদের সাথে একপ(কাল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর শি(া সংস্কার সংক্র(ান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

গোখেল এর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শি(াবিল - ১৯১০ খৃঃ -

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ গোপালকৃষ(গোখেল বড়লাটের আইনসভার সদস্য হিসাবে প্রাথমিক শি(াকে বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক শি(ার সম্প্রসারণ ভারত সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

স্যাডলার কমিশন - ১৯১৭ খৃঃ -

ভারত সরকার কলিকাতা বি(বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান ও মান উন্নয়নের

জন্য একটি নতুন শি(া কমিশন গঠিন করেছিল। যা কলিকাতা বি(বিদ্যালয় বা স্যাডলার কমিশন নামে খ্যাত। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ মাইকেল স্যাডলার। কমিশন শি(ার বিভিন্ন ে(ত্রে সুপারিশ করেছিলেন, যেমন মাধ্যমিক শি(া, বি(বিদ্যালয়ের শি(া, শি(ক শি(ন, স্ত্রী শি(া, শরীর শি(া, বৃত্তি শি(া, আন্তঃ বি(বিদ্যালয় সংস্থা গঠন প্রভৃতি।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা - ১৯৩৭ খৃঃ -

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হরিজন পত্রিকায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে গান্ধীজী তাঁর শি(া সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শি(া মন্ত্রীগণ ও বিশিষ্ট শি(াবিদগণ গুজরাটের ওয়ার্ধায় এক বৈঠকে মিলিত হন। একে নিখিল ভারত জাতীয় শি(া সম্মেলনও বলা হয়। এতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

- দেশে প্রাথমিক শি(াকে অবৈতনিত ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- শি(ার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।
- শি(াকে বৃত্তিমুখী করে তা থেকে শি(কদের বেতন উপার্জিত হতে পারে ইত্যাদি।

সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট - ১৯৪৪ খৃঃ-

১৯৪৩ খৃঃ কেন্দ্রীয় শি(া উপদেষ্টা কতৃক স্যার জন সার্জেন্টের সভাপতিত্বে ভারতের যুদ্ধোত্তর শি(া পরিকল্পনার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত(হয়। ১৯৪৪ খৃঃ প্রকাশিত রিপোর্ট সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টটি একটি বৈপ-বিক মনোভাব নিয়ে রচিত। বস্তুত এই রিপোর্টটি একটি নতুন পরিকল্পনা নয়, বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপক ে(ত্রে সমন্বয় এবং এভাবে আংশিককে জাতীয় পরিণত করাই এর মস্ত দান।

উপসংহার ঃ

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে শি(ার উন্নতি খুব একটা সম্প্রসারণ না হলেও তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি(গণ তথা শি(াবিদ, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তি(গণ তাদের কঠোর পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানে শি(ার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

- অধ্যাপক ভক্তি(ভূষণ ভক্ত(া, ভারতীয় শি(ার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী, আগষ্ট, ২০০৯।
- সেন এবং সুন্দরম, ডব্লু. বি. সি. এস. এস. সি., মৈত্রিয়ী দাস টিচার্স বুক কনসার্ন, জুন, ২০১১।

রঙ্গমঞ্চ ও নাটক ঃ ঐতিহ্য ও নবীকরণ

- মোহন কুমার মন্ডল,

সহ অধ্যাপক, রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

'কাব্যেষু নাটকংরম্যম্' কাব্যের মধ্যে নাটক হল সব থেকে রমণীয়। আসলে এই রমনীয়ত্বের কারণ হল এই নাটকের দ্বারাই আমাদের সব থেকে বেশী রসোপলব্ধি ঘটে বা নাটকের দ্বারাই আমরা অলৌকিক আনন্দ লাভ করতে পারি। এই অলৌকিক আনন্দ লাভ নির্ভর করে, কবি বা নাট্যকারের রচিত নাটকের বিষয় বা সেই বিষয় যেভাবে নাটকের কুশীলববৃন্দ আমাদের নিকট উপস্থাপন করেন তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের উপর। যদিও এখানে নাটক বুঝতে পারা বা রসোপলব্ধির জন্য স্বহৃদয় ব্যক্তির উপস্থিতিও আবশ্যক। তাইতো কালিদাস তার নাটক উপস্থাপনের আগে খুব সচেতন ভাবে সূত্রধারের দ্বারা জানান দিয়েছেন 'অভিরূপ ভূয়িষ্ঠাপরিষদিয়ম্' অর্থাৎ নাটক দেখার জন্য যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা হবেন জ্ঞানী গুণী সজ্জন অর্থাৎ স্বহৃদয় ব্যক্তি। তবে স্বহৃদয় ব্যক্তিরা থাকলেই যে নাটক রমণীয়ত্ব হবে তা নয়, সেই খানে প্রয়োগ নৈপুণ্যেরও প্রয়োজন আবশ্যক। ''আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্। বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেত।।'' (১) অভিজ্ঞান / প্রথম অঙ্ক /২

আমরা নাটকে নাট্য কৌশলের প্রয়োগ নৈপুন্য দেখি এবং রসোপলব্ধি করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সেই প্রয়োগ নৈপুণ্যতা নির্ভর করে উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। এই রঙ্গমঞ্চ যদি উপযুক্ত সুসজ্জিত বা সুপরিকল্পিত না হয় তাহলে নাটকের প্রয়োগ নৈপুণ্যতা কখনই সম্ভব হয় না। আজকে আমি সেই রঙ্গমঞ্চের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, নাটক উপস্থাপনা করার জন্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকার তথা নাট্যকারেরা কি ভাবে রঙ্গমঞ্চের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। লোকপ্রবাদ ঃ নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি গল্প আছে ত্রেতাযুগে দেবতারা সকলে ব্রহ্মাকে সকল বর্ণের জন্য পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলে তিনি ঋগ্বেদ থেকে পাঠ, সাম বেদ থেকে গীত ও যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস গ্রহণ করে পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি বিশ্বকর্মাকে নাট্যশালা নির্মানের জন্য আদেশ দেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্টকলাকে কাজে লাগাবার জন্য ভরতকে উপদেশ দেন। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখতে পাই ভরত ব্রহ্মাকে বলছেন, সর্গে মন্ডপ তৈরী, দেবতাদের ও পূজা শেষ, এখন নাটক অভিনীত হবে। আপনি আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মার আদেশে অমৃতমন্থন ও ত্রিপুরদাহ নামক দুটি নাটক অভিনীত হয়। প্রচলিত প্রবাদ এই যে পৃথিবীতে ব্রহ্মাই নাটকের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। আর বিশ্বকর্মাকে নাট্যশালা নির্মাণের স্রষ্টা ধরা হয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চের বিবরণ ঃ-

ভরত মুনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে তার বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় যুগের নাট্যমঞ্চ কেমন ছিল তার আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। ভরত বলেছেন নাট্য অভিনয়ের জন্য তিনরকম রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা ছিল সেকালে। (ক) বিকৃষ্ট, (খ) চতুরস্র , (গ) ত্র্যস্র 'বিকৃষ্টচতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মন্ডপ

ঃ'। (২) নাট্যশাস্ত্র / ২য় অধ্যায়/ ৯। 'বিকৃষ্ট' শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃহদাকার। ডঃ মনোমোহন ঘোষ এর অর্থ করেছেন আয়তাকার। 'চতুরস্র' - চতুষ্কোন বা বর্গক্ষেত্রাকার। আর 'ত্র্যস্র' শব্দের অর্থ ত্রিকোন বা ত্রিভূজাকার। এই তিন প্রকার প্রমান্য রঙ্গমন্ডপকে পরিমান অনুযায়ী আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) জ্যেষ্ঠ, (খ) মধ্যম, (গ) অবর। এই জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও অবর রঙ্গ মন্ডপের মাপ ছিল ১০৮ হাত, ৬৮ হাত, ও ৩২ হাত পরিমান। জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় দেবতাদের জন্য, মধ্যমাকার রঙ্গালয় রাজাদের জন্য এবং অবর স্থির কার ছিল জনসাধারনের জন্য। এর মধ্যে সব থেকে উৎকৃষ্ট রঙ্গমন্ডপটি হল 'চতুরস্র - মধ্য' এর আয়তন লম্বায় চৌষট্টি হাত এবং প্রস্থে বত্রিশ হাত। ভরত বলেছেন ঃ- তেষাং ত্রীনি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্। প্রমাণমেষাং নির্দ্দিষ্টং হস্ত দন্ডসমাশ্রয়ম্।। শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্দ্বাত্রিংশচ্চেতি নিশ্চিতঃ। অষ্টাধিকং শ্ম জ্যেষ্ঠৎ চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।। কণীয়স্তু তথা বেনম হস্তা দ্বাত্রিৎশদিষ্যতে।। দেবানাং ভবনংজ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ। শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে।। নাট্যশাস্ত্র ২/৮-১১। (৩)

কারো কারো মতে বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও অবর। যে কারণে অভিনব গুপ্তের নয় প্রকার রঙ্গালয়ের কথা বলেছেন। (ক) বৃহৎ বিকৃষ্ট, (খ) বৃহৎ চতুরস্র, (গ) বৃহৎ ত্র্যস্র, (ঘ) মধ্যম বিকৃষ্ট, (ঙ) মধ্যম চতুরস্র, (চ) মধ্যম ত্র্যস্র, (ছ) অবর বিকৃষ্ট, (জ) অবর চতুরস্র, (ঝ) অবর ত্র্যস্র। ''অন্যেতু প্রত্যেকং ত্রিত্বমিতি নবৈতেহত্রভেদা ইত্যাহুঃ। (৪) (অভিনবভারতী টীকা)

রঙ্গপীঠনির্মাণ পদ্ধতি ঃ-

ভরত রঙ্গপীঠ (স্টেজ) তৈরী করবার বিধি করেছেন। কিন্তু তৎপূর্বে বলেছেন - প্রেক্ষাগৃহের ভূমিভাগ আগে বাস্তুপ্রমাণের দ্বারা পরীক্ষ করে নাট্যগৃহের আরম্ভ করা প্রয়োজন। তারপর নাট্যগৃহ নির্মান উপযোগী প্রথমে ভূমি দেখতে হবে তাতে নাট্যমন্ডপ প্রস্তুত করতে হবে। এই রূপ ভূমি পাঁচ প্রকার, সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত। (৫) তারপর ভূমিকে শোধন করতে হবে। নাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করে অস্থি, কীলক, কপাল ও তৃণ গুল্মাদি পরিস্কার করতে হবে। ছেদ নেই এমন রজ্জু দ্বারা ভূমির মাপ নিতে হবে। চৌষট্টিহাত হবে মন্ডপের দৈর্ঘ্য। তার আবার দুই ভাগ করতে হবে। এই দুইভাগ করা ভাগের পিছনে যে ভাগ থাকবে তার অর্ধেকাংশ করতে হবে। তার অর্ধেকাংশ হবে রঙ্গপীঠ। (৬)

নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ঃ-

ভরত বলেন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র নাট্যমঞ্চের ভিত্তিস্থাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বাজাতে হবে। রঙ্গালয়ের ভিত্তি থেকে -পাষণ্ড, কষায়পরিচ্ছদ পরিহিত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সরিয়ে দিতে হবে। রাত্রিবেলা দশদিক সুগন্ধ, ফুল, ফল দিতে হবে এবং ভিত্তিস্থাপনের দিন ব্রাহ্মণদের ঘি ও পায়েস মিশ্রিত অন্ন, রাজাকে মধুপর্ক ও নাট্যকলাবিদগণকে গুড় মিশ্রিত অন্নদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (৭) এরপর ভরত নাট্য মন্ডপের বা রঙ্গালয়ের প্রধান দুটি ভাগের কথা বলেছেন। ১) নাট্যমণ্ডপের অর্ধাংশ প্রেক্ষা বা দর্শকের বসবার জায়গা। অপর ভাগ রঙ্গ বা স্টেজ এখানে অভিনয় হয়। দর্শকাসন হবে সোপানাকৃতি ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরী। ভূমি থেকে এক হাত উপরে, এই আসনগুলি ঢালুভাবে মেঝেতে বসানো থাকবে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা আসন নির্দিষ্ট থাকবে।

নাট্যমণ্ডপের আয়তন ঃ-

লোকে সচরাচর দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত ও বিস্তার ৩২ হাত নাট্যমন্ডপ নির্মান করেন। নাট্য মণ্ডপের আকৃতি লম্বা চওড়ায় এর থেকে বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ নাট্যমণ্ডপের আয়তন এর থেকে বেশী হলে নাট্য অস্ফুট হয়ে পড়ে। অভিনেতাদের আওয়াজ কিছু শোনা যায় না। যদি অভিনেতাদের স্বর শোনাও যায় তবুও শ্রোতাদের কাছে সেটা বিস্বর বোধ হয়। রসোবোধে ব্যাঘাত ঘটে। কুশলবগণ অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষের দ্বারা যে সকল লাস্যগত ভাব স্বহৃদয় দর্শকদের উপলক্ষ্যে দেখানোর চেষ্টা করেন সেটা প্রেক্ষাগৃহের বা মন্ডপের আয়তন বড় হলে স্বহৃদয় দর্শকের কাছে সেই বার্তা অস্পষ্ট ও অব্যক্ত বোধ হবে। সে কারণে নাট্যশালার আয়তন মধ্যম পরিমাণের হওয়া উচিৎ। আর মনুষ্যসৃষ্ট নাট্যশালা মধ্যমশ্রেণির হলে কুশীলবের অভিনয়, গান সব কিছু স্বহৃদয় দর্শকের অলৌকিক আনন্দ লাভেও ব্যাঘাত হয় না। তাই ভরত বলেছেন - চতুঃষষ্টি কারান্ কুর্য্যাদ্ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্। দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারং মর্ত্যানাং যোজযেদিহ।। অত উধ্বং ন কর্তব্যঃ কর্ত্তৃ ভির্নাট্যমণ্ডপঃ। যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি। মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিত স্বরম্। অনিঃসরণ ধর্মত্বাদ্ বিস্বরতং ভৃশং বৃজেৎ।। যশ্চাপ্যাস্যগতো রাগো ভাবসৃষ্টিরসাশ্রয়ঃ। স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাঃ পরম্।। প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে। যস্মাৎ পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখং শ্রব্যতরং ভবেৎ।। নাট্যশাস্ত্র ২/১৭-২।

আর দর্শকের স্থান স্তম্ভ দিয়ে চিহ্নিত থাকবে। সন্মুখের সাদা রঙের স্তম্ভ তার নাম ব্রাহ্মণ স্তম্ভ। এই ব্রাহ্মণ স্তম্ভের নীচে সোনা দিতে হবে। তার পর ক্ষত্রিয়দের জন্য লাল রঙের স্তম্ভ। এই স্তম্ভের নীচে তামা দিতে হবে। উত্তর পশ্চিম হলদে রঙের স্তম্ভ এটা বৈশ্যের। এর নীচে রুপো থাকবে। আর উত্তর পূর্বে নীল কৃষ্ণ স্তম্ভ শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট। এর নীচে লোহা দিতে হবে। এছাড়া সকল স্তম্ভের মূলে লোহা দিতে হবে। তরপর রঙ্গপীঠ করণীয়। (৮)

নাট্যমণ্ডপের চিত্রায়ন ঃ

দর্শকের সামনে যে রঙ্গমঞ্চ বা স্টেজ থাকতো তা চিত্র বা মূর্তি দ্বারা সাজাতে হত। রঙ্গের শেষে রঙ্গশীর্ষেও নানরকম মূর্তি দিয়ে সাজানোর কথা পাওয়া যায়। রঙ্গশীর্ষের গর্ত কালো মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। এবার রঙ্গপীঠ কেমন হবে এ বিষয়ে ভরত বলেছেন - ''কুর্মপৃষ্ঠেরমত বা মৎস্যপৃষ্ঠের আকারে। এছাড়া রঙ্গশীর্ষের কাঠের কাজ থাকবে, সিংহ ব্যাঘ্রাদির অট্টালিকা, পুতুল, বেদিতৈরী করে কাঠের কাজ শেষ করতে হবে। (৯)

যবনিকা ঃ

কেমন হবে এ বিষয়ে ভরত হলছেন - এটি একটি রঙকরা পর্দা। পটি, অপটি, প্রতিশিরা নামের পর্দা থাকবে। যবনিকার রঙ লাল হবে। নেপথ্যগৃহ হবে পর্দার পিছনে। এটা মূলত সাজঘর, অভিনেতাদের অধিকৃত (১০) নেপথ্য গৃহ থেকে দৈববাণী হত। আবার একসঙ্গে অনেক উচ্চ কণ্ঠধ্বনি এখানে থেকে করা হত। রঙ্গ থেকে নেপথ্যে যাওয়ার দুটি দ্বার থাকত। 'দ্বিভূমিনাট্যমণ্ডপ' ২/৬৯। নাট্যমণ্ডপের আকার পর্বতের গুহার মত হত। (১১)

সংস্কৃত নাটকে রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য ও পরম্পরা ঃ

সংস্কৃত নাটক ভারতীয় নাটকের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। এই সংস্কৃত নাটকগুলিতে নাট্যমণ্ডপের কিছু তথ্যসূত্র পাঠই প্রাচীন ভারতে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন সঙ্গীত শালা অথবা প্রেক্ষাগৃহ ছিল তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাণী হংসপদিকা সঙ্গীতশালায় বসে স্বরালাপ করছেন। বিদূষকের মুখে সে কথা

আমরা জানতে পারি। বিদূষক রাজা 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বিদূষক বলছেন - 'তোমরা দুই দলই এখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সঙ্গীত রচনা করে রাজার নিকট দূত পাঠাও'। (১৩) এই উক্তি থেকে বোঝা যায় রাজপ্রাসাদে সঙ্গীতশালা ছিল। এখানে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা হত। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে নান্দীর পর সূত্রধার বলছেন - 'আমি কার্যবশে অযোধ্যাবাসী, সেই সময়ের লোক' চারিদিক অবলোকন করে - 'ওহে! এটাই পৌলস্ত্য বংশের ধূমকেতু স্বরূপ মহারাজ রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় হয়। তবে তো দিবারাত্র আনন্দ সঙ্গীতের প্রবাহ চলবে। তবে এখন রাজপ্রাঙ্গন কেন চারণদের সঙ্গীত বর্জিত।' (১৪) এই থেকে অনুমান করা যায় ভবভূতির সময়ে সঙ্গীতশালার ধারা (ঐতিহ্য) বর্তমান ছিল। সেখানে সঙ্গীতগৃহে নৃত্য ও অভিনয় অনুষ্ঠিত গত। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের প্রথম অঙ্কে সূত্রধার নিবেদন করছেন - 'আমি সুধীজনের প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করছি, আমরা 'মৃচ্ছকটিকম্' নামে একটি প্রকরণ মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছি। ..... একি আমাদের সঙ্গীত শালা শূন্য, আমাদের নট-নটীরাই বা কোথায়। (১৫) সূত্রধারের মুখ দিয়ে নাট্যকার শূদ্রক নটনটীরা বা কুশলবরা যে সংগীতশালায় অভিনয় নৈপুন্য দর্শকদের কাছে মঞ্চস্থ করতেন তার একটি ব্যাঞ্জনা তুলে ধরেছেন। এছাড়া সূত্রধার শূদ্রক কৈশিকী বিদ্যা পারঙ্গম বলে জন সাধারণকে বলছেন। কৈশিকী বলতে অনেকে ধারণা গণিকাবিদ্যা বা গণিকারা যে কলা চর্চা করেন। দশকুমার চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'গীতবাদ্যনাট্যাস্বাদ্য-গন্ধপুষ্পকলাসু লিপিজ্ঞানবচন কৌশলাদিষু চ সম্যগ্‌বিনয়ম্'। তাই অনেকে কৌশিকী বলতে নাট্যকলা বা ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে বুঝিয়েছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় নাট্যকার শূদ্রক নাট্যকলায় পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু কুশলী নাট্যকার ভাস তার স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে সূত্রাধার বলেছেন - 'মাননীয় দর্শক কি সাধারণকে জানচ্ছি কিন্তু এ কি! আমি নিবেদনে ব্যস্ত থাকার সময়েই যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা দেখি। (১৬) এই ভাবে প্রেক্ষকের উদ্দেশ্যে কিছু উপস্থাপনা না করে অব্যক্ত ভাবে যেন নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রেক্ষকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন শেষ করলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা কালে নাট্যমণ্ডপের অবস্থানের দিকে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে ও সঙ্গীত শালাটি অবস্থান রাজান্তপুরে। উত্তররামচরিত নাটকে ও রঙ্গমঞ্চটি অযোধ্যার রাজান্তপুরে। এখানে চারুদত্ত এক ব্রাহ্মণ; পূর্বে তিনি ধনী ও অভিজাত বাঙালী ছিলেন। বর্তমানে ভাগ্যবশে তিনি দরিদ্র হয়েছেন। একথা সূত্রধারের মুখে আমরা জানতে পারি।

এ থকে আমরা বুঝতে পারি রাজান্তপুরের রঙ্গালয় থেকে অভিনয় নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের কুটির দ্বারে। সেখানে 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে নাট্যকার শূদ্রক নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনায় একটু আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন।

সংস্কৃত নাটকে নেপথ্যে, রঙ্গপীঠ ও রঙ্গপ্রেক্ষাগৃহের ঐতিহ্য ও পরম্পরা ঃ

প্রাচীন ভারতে নাট্যগৃহের যে তিনটি অংশ ছিল তার অপূর্ব নিদর্শন সংস্কৃতনাটকে পাওয়া যায়। (১) নেপথ্যগৃহ, (২) রঙ্গপীঠ, (৩) রঙ্গপ্রেক্ষাগৃহ। ১) প্রথমত ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে সূত্রধার নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বলছেন, বেশ রচনা শেষ হয় তাহলে এদিকে একবার এসো, সূত্রধার ঃ ('নেপথ্যমুখমবলোক্য) আর্যে যদি নেপথ্য বিধানমবসিতম্।

ইত্যস্তাবদাগম্যতাম্। নটী - (আর্যপুত্র, ইয়মস্মি), সূত্রধার-আর্যে অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অদ্য খলু কালিদাস গ্রথিত বস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাপব্যমস্মাভি। তৎপ্রতিপ্রতিপাত্রয়তাং যত্নঃ"। (১৭)

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে নাট্যগৃহের যে তিনটি অংশ - নেপথ্য, রঙ্গপীঠ ও রঙ্গপ্রেক্ষাগৃহ ছিল তা বিদগ্ধনাট্যকার কালিদাস পরিস্কার ভাবে তুলে ধরতে পরেছেন। ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতম্' নাটকের সপ্তমঅঙ্কে অরুন্ধুতি পুরবাসী ও নগরবাসীদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার কর বলছেন, নাটকের প্রথমাঙ্কে তোমার যে সীতা চরিত্রের অহেতুক সন্দেহ করেছিলে, তা সীতার প্রতি অন্যয় হয়েছে। তিনি বলছেন - 'হে পুরবাসী নগরবাসীগণ, আমি অরুন্ধুতি ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী সীতার এরূপ প্রশংসা করে আমার কাছে সমর্পণ করেছিলেন, পূর্বে ভগবান অগ্নির দ্বারা ও সূচিতা নির্ণীত হয়েছে। ব্রহ্মার সঙ্গে দেবগণও এর সাধুবাদ করেছেন। ইনি সূর্যবংশের কুলবধূ। যজ্ঞভূমি থেকে সমুৎপন্না এখন সীতা দেবীকে গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে আপনারা কি মত করেন। (১৮) এখানে ভবভূতি নাট্যমণ্ডপে তিনটি অংশ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ এর পূর্বে নেপথ্যে দৈববানী ছিল। ভাসের 'স্বপ্নবাসদত্তম্ ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে এই ভাবে সামনা সামনি নেপথ্য, দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্রের উল্লেখ সেখানে নেই। সেখানে অভিনেতা ও দর্শক আসনের উল্লেখ আছে সেটা সূত্রধারের মুখে জানা যায়।

নেপথ্যবিধান ঃ-

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে সূত্রধার নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বলছেন আর্যে যদি বেশ রচনা শেষ হয় তাহলে এদিকে একবার এসো। 'নেপথ্যমভিমুখমবলোক্য; আর্যে যদি নেপথ্য বিধানমবসিতম্ ইত্যস্তাবদাগম্যতাম্। (১৯) রাঘব ভট্ট তার টীকায় নেপথ্য বলতে যবনিকা, রঙ্গভূমি ও প্রসাধন বুঝিয়েচেন 'নেপথ্যংস্যাদ্ যাবনিকা রঙ্গভূমিঃ প্রসাধানম্। ইত্যজয়ঃ। নেপথ্য নাটগৃহের পিছনে থাকতো। এবং এর দুটি প্রবেশ দ্বার থাকতো। তাই প্রত্যেকটি নাটকে তত প্রবিশতি ও প্রস্থান এই কথা দুটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। নেপথ্যেই নট-নটী সাজত এবং এখান থেকে দৈববাণী হত। কালিদাস তার নাটকে নেপথ্যে যবনিকান্তে দৈববাণীর উল্লেখ করেছেন। ''ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যোন হন্তব্যঃ।'' (২০) স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে ভাস ও নেপথ্যে যবনিকান্তে দৈববাণীর উল্লেখ করেছেন 'উস্সরহ উস্সরহ আর্য্যা। উস্সরহ। সরে যান, সরে যান, আর্যগণ সরে যান। নেপথ্য থেকে দৈববাণী একটা প্রামাণ নাটকে আমরা পাই। মূল নেপথ্য বোঝায় নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গসজ্জা ও বস্ত্রসজ্জার। এই নেপথ্যের চারটি অঙ্গসজ্জা। যথা পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। এদের মধ্যে অলঙ্কার ও অঙ্গরচনাকেই আমরা খাঁটি রূপসজ্জা ও বস্ত্রসজ্জার মধ্যে ফেলতে পারি। প্রাচীন নাট্যকারদের নাট্যে দেখি অলঙ্কার ও অঙ্গরচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। নাট্যকারদের রুচি, সৌন্দর্যবোধ, ও আঙ্গিক চেতনা কত সূক্ষ্ম ও গভীর ছিল তার প্রমাণ ভাস ও কালিদাস থেকে শুরু করে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে দেখা যায়।

অলঙ্কার বলতে গাত্রাভরণ ও বস্ত্রধারণ বোঝায়। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে মালা পাঁচ প্রকার ও অলঙ্কার চার প্রকারের ব্যবহার দেখা যায়। কুন্ডল, অভেদ্য কুন্ডল, বন্ধনীয়, শ্রেণিসূত্র ও অঙ্গদ প্রভৃতি। পুরুষ ও নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুযায়ী অলঙ্কারের শ্রেণী বিভাগ হয়েছে।

পুরুষের ব্যবহার্য অলঙ্কারের নাম চূড়ামণি, মুকুট, কুন্ডল, মুক্তবলী, অঙ্গলীয় মুদ্রা, বাহুনালী, রুচিক ও কেয়ুর। নারীর ব্যবহার্য অলঙ্কার - শিখাপাশ, মুক্তজাল, কুন্ডল, মোচক, কর্ণিকা, কর্ণমুদ্রা, কর্ণবলয়, কাঞ্চী, মেখলা, নুপুর, প্রভৃতি বিভিন্ন নাটকে দেখা যায়। শুধু কেবল স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার নয়, নাটকে সুগন্ধ প্রলেপেরও কথা জানা যায়।

নাট্যমঞ্চ দৃশ্যায়ন ঃ-

কালিদাস তার নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাট্যমঞ্চে শকুন্তলার একটি চিত্রফলক আমরা গেখেছি, নাটকে চুতরিকা হাতে চিত্রফল নিয়ে নাট্য মঞ্চে প্রবেশ করেন যবনিকা উত্তোলন না করেই। বিদূষক শকুন্তলার এই চিত্রটি দেখে বললেন 'বন্ধু তুমি চমৎকার এঁকোছো। ছবিতে অঙ্গের বিন্যাস এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে মনের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। ছবিতে আঁকা উঁচুনিচু জায়গায় আমার চোখ স্থির থাকছে না।' আমরা দেখেছি সেকালে নাট্যমঞ্চে দৃশ্যসজ্জার ব্যবহারের কথা ভরত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কালিদাস তার নাটকে চিত্রফলকটি প্রেক্ষকেরা দেখেছেন নাটকে অল্প সময়ের জন্য। আবার ভাস তার 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে নাট্যমণ্ডপে এইরকম একটা চিত্র ফলকের আবতারণা করেছেন সেটা বাসবদত্তার। হয়তো কালিদাস ও ভাস যে সময় নাটক লিখছেন সে সময় নাট্যমণ্ডপ দৃশ্যায়নের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। কেবল নাট্য সংলাপের মাঝখানে কোনচিত্র নিয়ে এসে বোধান হত। কিন্তু ভবভূতি তার নাটকে চিত্রদর্শনের অবতারণা করেছেন সেখানে লক্ষণ নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করে বলছেন - 'আমার বন্ধু অর্জুন এই অটবীপাশে রামসীতার চিত্র অঙ্কন করেছেন'। নাট্যকার ভবভূতি উত্তর রামচরিত নাটকে অর্জুনের দ্বারা নাট্যশালাটি চিত্রায়িত করেছে। লক্ষণ সীতাকে সেই চিত্রদর্শনের কালে দর্শকগণও অভিভূত হন যা নাটক অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাহলে বলা যায় ভবভূতি নাট্যমঞ্চ দৃশ্যায়নে একটু অন্যভাবে ভেবেছিলেন।

সবশেষে একথা বলি রামগড় পাহাড়ের গুহায় খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি রঙ্গমঞ্চ আবিস্কৃত হয়েছে। তাতে যে প্রস্তর নির্মিত আসনগুলি দেখা যায় - এ থেকে অনুমান করা যায় সেগুলিতে বসে দর্শক কোন নাট্য অভিনয় দর্শন করতেন। তা যাই হোক প্রাচীন কালের নাট্যকারদের সেই নাট্যকৃতিগুলি যে আজও আমাদেরও নাট্যশৈলী বা ভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে তা অনস্বীকার্য। হয়তো বর্তমান প্রযোজকরা রঙ্গমঞ্চের নুতন আঙ্গীকে নাটকগুলি আবার উপস্থাপনা করবেন। কিন্তু নাটকের যে কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তা অক্ষুন্ন থাকবে।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ-

(১) অভিজ্ঞানশকুন্তল্ ১ম/২, (২) নাট্যশাস্ত্র / ২/৯, (৩) নাট্যশাস্ত্র ২/৮-১১, (৪) নাট্যশাস্ত্র অভিনবভারতী টীকা, (৫) নাট্যশাস্ত্র ২/২৫,
(৬) নাট্যশাস্ত্র ২/২৬, (৭) নাট্যশাস্ত্র ২/৩৬-৩৯, (৮) নাট্যশাস্ত্র ২/৫০-৫৩, (৯) নাট্যশাস্ত্র ২/৭৫-৮৫, (১০) নাট্যশাস্ত্র পৃঃ ২০৫,
(১১) নাট্যশাস্ত্র ২/৬৯, (১২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৫/১, (১৩) মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রথম অঙ্ক,
(১৪) উত্তররামচরিতম্ প্রথম অঙ্ক,
(১৫) মৃচ্ছকটিকম্ প্রথম অঙ্ক, (১৬) স্বপ্নবাসবদত্তম্ ষষ্ঠ অঙ্ক, (১৭) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথম অঙ্ক, (১৮) উত্তররামচরিতম্ ষষ্ঠ অঙ্ক
(১৯) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথম অঙ্ক, (২০) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথম অঙ্ক।

মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষা চর্চা ও ভাষা সমী(া

অম্বালিকা সরকার

গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া

মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে আরও নিত্যনতুন শব্দের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তবে নীচে উল্লিখিত শব্দ ভাণ্ডার দেখলে মুর্শিদাবাদ জেলার শব্দ ব্যবহার বিষয়ে একটা ধারণা অবশ্যই পাওয়া যাবে।

রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চলের ভাষা বৈচিত্র্য

রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চলের একই শব্দের রূপ ও উচ্চারণগত তারতম্যের চিত্র দেওয়া হল—

পুস্তকগত বাংলা ভাষা	**পশ্চিম রাঢ়**	**পূর্ব রাঢ়**	**বাগড়ী**
অপদার্থ	ওঁতাল	ওঁতাল	উরালী
অকর্মণ্য	কুর‍্যা	কুর‍্যা	গড়্যে, গড়্ছে
আসলাম/আসিলাম	এলাম্	এল্যাম	আনু, আলেম
আলো	চিক্যাস্	চিক্যাস্	চিক্যাস
আমাদিগকে	হামার ঘের / মোর ঘের	হামারদের	আমাধেরে
আঙিনা / আঙ্গিনা	আগীন্যা	আগ্নে	আগনে, আঙ্গনে উঠেন
আ(/ প্রথম উৎপন্ন	আগোর্	এগোর্	আইঘ্র
আমি	হামি	আম্ভি	আমি
আমাকে	হামাকে / মোকে	আম্ভাকে	আমাকে
ই(	রোখ/এখে	কুশুর / কুশাইর	আক্, , কুশোর
এদিকে	এত্তরে	এত্তরে	এদিক্
একটি মাছের নাম	দিঁড়্রি	দিঁঙ্রি	ছিমড়ি, উফল, ল্যাটা
ওদিকে	ঔরে	ঔরে	উদিক্
ওলো, ওলা (স্ত্রী লোকের সম্বোধন বিশেষ)	ওটে	ওটে	ওরী বা ওরীত্র
কোদাল	ফাওরা	কোদাল	কোদাল
কোথায়	কোতি	কোতি	কোতি
কোনখানে	কুন্ঠিয়ে	কুন্ঠে	কুন্ঠে
কাঁপ্ছ/কাঁপিতেছে	কাঁপছ্যা	কাঁপ্ছ	হেলছ
খুন্তি	খুন্তি	চিচ্কে	চিচ্কে
খুঁজে/অন্বেষণে	ঢুঁরে	ঢুঁরে	ঢুঁর্হে
খামার	খামার	খামার/ খোলা	খোলেন

গিয়াছিলে	গেল্ছিলে	গিয়্যাছিলা/ যেথ্যাছিল্যা	যেয়াছিল্যা/ যেল্ছিলে
গ(র গাড়ীর চাকা	পেঁয়্যাহাঁ	পেঁয়ে	পেঁইহে
গর্ত্ত	গোঢ়্যা	গোঢ়্যা	গোড়হে
গিয়েছিলাম	গেলাম্	গেলাম, গেনু	গেনু, গালেম / গেল্ছিলেম্
গ(র গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিশেষ	চ্যেদ্রা	চ্যেদ্রা	তেঁদ্রা
ঘুঁটে (শুকনো গোবড় যা উনুনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)	ঘসি	ঘুঁট্যে	লোধা
চুমো, চুম্বন	চোঁহা	চোঁহা	চুম্যা
ছোট পুকুর	ডোমা	ডোবা	লাল্হা
ছেলে	গুধ্যা	ছাইল্যা	গোধা / ছেল্হে
জ্ঞান	সান্	সান	সিয়ান
জার্জ	জের‍্যা	জের‍্যা	জের্হে
তুমি	তুম্ভি	তুমি	তুমি
তোমাকে	তুম্ভাকে	তুমাকে	তুমাকে
দাড়িপাল্লা/তুলাদণ্ড	তরাজু	দাড়িপাল্লা	দাঁড়িপাল্হা
দুষ্ট	ত্যাঁদড্	ত্যাঁদড্	কল্লা/ডম্ফা
দুগ্ধবতী	দোহন	দুধ্যাল	দুধ্যাল
দুশ্চরিত্র	ভ্যাংরা	খাচ্রা	খাচ্ড়া
নিত্য	লিতুই	লিত্থই	নিতি
পরা (পরিধান করা)	পেঁধা	পেঁধা	পিঁন্ধ
প্রদীপ	পদিম্	পিদিম্	চেরাম
পাঁঠা	পাঁঠা	পাঁঠা	বতক্
পানা	পানা	পানা	বাতরাজ
পাঁচন (রাখালদের ছোট লাঠি)	পাঁচুন	পাঁচুন	পাণ্ঠ
প্রাতঃকালে	পোঁহাতে	পোহাতে,	শোনকালে বিহ্যান্ / বড়ভ্যানে
পা বা পদ	ভোঁইড্	পা	পা
পিছনে	পিছে	পিছে	পাছে
পাকা	পাকা	পাকা	ডাকর
পথ্	গাহন	খাঁটা	পথ্

বলছ / বলিতেছ	কহিছ	বুল্ছো	বুলছো
বারন্দা	ওসারা	ওযারা	পিড়্যা
বাড়ীর	লাছ	নাছ	নাচ্ছ
সামনের রাস্তা			
বড়	বিক্যা	বিকা	বড্ডা/মহস্হা
বুঝি	ব্যাখিল	বুঝিন	বুজিন
বাদলা / বর্ষা	গাজর	গাজল	গাজল,বাদল
বধির	কালা	কালা	বোবা
বয়স	বয়স	বঁয়স	বঁয়স
ভগ্নিপতি	বঁনুই	বুঁন্যুই	বুনহই
ভবিষ্যত	ওখনি	ওখনি	ওখ্নি, পরে
ভয়	ডর	ডর	ডর
মত	ল(াৎ	মতন	মুতন
মাছ / মৎস্য	মাহা	মাছ	মাছ
মেয়ে	গুধী	ছাইলা / বিটি	গুধী / বিটি
মুছিয়ে	মুদে	মুদে	কুক্রে
মুক / বাকহীন	বোবা	বোবা	কালা
যাচ্ছ / যাইতেছ	যেছো	যেছো	যাইছ
লজ্জা	সরম্	সরম্	লজ্জ্যা
লাঠি	লগ্ড়ি	লগ্ড়ি	লগ্ড়ি
শিশির	লিহোর	লিহোয়্	লিহর/ নেউহস্
সাপ / সর্প	সাপ্	সাপ্	সাঁপ্
স্ত্রী	মেয়্যা	সী	চী
সামনে	আঁগু	আগে	দুমু
সার	সার্	সার্	সাহার্
সে	ছে	ছেঁ	সে

এত(ণ আমরা রাঢ় ও বাগড়ীর এই দুই ভাষার সন্ধান পেলাম- যার ব্যবহার বৈচিত্র্যের নমুনাও আমরা দেখলাম। এবার উপরের আলোচনা থেকে সার্বিক ভাবে রাঢ় ও বাগড়ী ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. রাঢ় অঞ্চলে 'শ' ও 'স'- এর প্রায়শই 'ছ' এর উচ্চারণ হয়ে থাকে।

যথা — বসেছিল > বোছোছিচ্
শ্যামাসুন্দর ঠাকুর > ছামসুন্দর ঠাকুর

একটা বাক্য ল(্য করা যাক —

সিতাতে দিবার বালিস নাই
আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ছিথানে দিবার বলিছ নাই

খ. পদের আদিতে 'আ' কার এবং পরে 'ই' কার থাকলে 'আ'-এর উচ্চারণ 'এ'র মতো হয়

—

যথা — রাতি > রাইত > রেত
জাতি > জাইত > জেত

গ. 'অ'-কারের জায়গায় অনেক সময় 'আ' উচ্চারিত হয় —

যথা — আরম্ভ > আরাম্ভ
পাগল > পাগাল

ঘ. কতকগুলি শব্দের - 'য়' এর স্থানে 'হ' অন্ত্য 'আ' কারে ও 'এ' কারের স্থানে 'য' ফালা আকার ব্যবহার করা হয়ে থাকে—

যথা — কুলা > কুল্যা
বুনা > বুন্যা
বিয়ে > বিহ্যা
মড়ে > মড়্যা ইত্যাদি

ঙ. পদে অবস্থিত অ-কারের শেষে অনেক 'ও' কার উচ্চারিত হয়—

যথা — মশা > মোশা

চ. 'ও'-কারের উচ্চারণ 'উ'-কারের মতো হয় —

যথা — দোকান > দুকান
কাপ > কাপুড়

ছ. 'এ' কারের স্থানে 'অ্যা' উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায় —

যথা — তেল > ত্যাল
পেট > প্যাট

জ. নাসিক্য ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয় —

যথা — বাসন > বাসুন
আমন > আমুন
সময় > সুময়
সোমবার > সুমবার

ঝ. শব্দের মধ্যে অবস্থিত অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয় —

যথা — শাক > শাগ
কাক > কাগ

এ(. শব্দের অন্তে অবস্থিত 'ত' শব্দের উচ্চারণ 'থ' এর মতো হয় —

যথা — তাক > থাক

ট. শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'ন' শব্দের উচ্চারণ 'ল' এর মত হয় —

যথা — নৌকা > লৌকা
নবান্ন > লবান
নয় > লয়

ঠ. পদের আদিতে (াসাঘাত পড়লে পদের মধ্যে অবস্থিত একক মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ হয়—

যথা — মাঝি > মাজি
চোখের > চোকের

মাছ > মাচ
ঘুঘু > ঘুগু
বাঘ > বাগ
কাঁধে > কাঁদে

ড. 'র' যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সমীভবন লক্ষ্য করা যায় —
যথা — করছি > কচ্ছি / কচ্চি
করতে > কত্তে
ধরলে > ধল্লে
মরল > মল্ল

ঢ. বাউড়ি ইত্যাদি নিম্নবর্গের জনতার ভাষায় 'ড়' এবং 'র' উচ্চারণে স্থান বিপর্যয় ঘটে —

ড় > র — বর, নারা, দরি
র > ড় — মড়া, সড়া, পড়াণ, সড়ণ

ণ. 'স' ও 'শ' এর জায়গায় 'ছ' উচ্চারিত হয় —
যথা — শোন > শুন > ছুন
মহাশয় > মহাছয়
সঙ্গে > ছঙ্গে

ত. শব্দের স্বতোনাসিক্যভবন দেখতে পাওয়া যায় —
যথা — কাচ > কাঁচ
ঘোড়া > ঘোঁড়া
সাপ > সাঁপ
ভেড়া > ভেঁড়া
শশা > শাঁশা
উট > উঁট

থ. পদের আদিতে স্বরাগম ঘটে অর্থাৎ আদি স্বরাগম হয়।
যথা — সূর্য্য > সুজ্জ
চন্দ্র > চান্দ

দ. শব্দের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন অর্থাৎ অন্ত্যবঞ্জনাগম ঘটে —
যথা — বিত্রি > বিক্কিরি
মিস্ত্রি > মিস্তিরি

ধ. স্বরসঙ্গতির ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় —
যথা — মতা > খ্যামতা
ভিক্ষা > ভিক্কে
বাঁকা > ব্যাঁকা
কাঁথা > ক্যাঁথা
ঘৃণা > ঘেন্না
তেমন > ত্যামন

বমি > বুমি
ঔষদ > ওষুধ

ন. পদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিস্বরীভবন ঘটে —
যথা — বোধহয় > বোধায়
লাউ > কদু
হলুদ > হলদি
নোট > লোট

প. পদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে বিসমীভবন ঘটে —
যথা — আন্দাজ > আনজ্যাদ
লোকসান > লোসকান
রিকসা > রিসকা
বাক্স > বাসকো

ফ. শব্দের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে 'হ' এর আগাম হয় —
যথা — সার > সাহার
গম > গহম

ব. শব্দদ্বিত্ব থাকলে অনেক সময় তার স্থান বিপর্যয় ঘটে —
যথা— মারামারি > মারিমারা
গালাগালি > গালিগালা

ভ. অপিনিহিতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় —
যথা — বলিয়া > বইল্যা > বল্যা > বুল্যা

ম. 'আ' কারান্ত শব্দে 'য' ফলা যুক্ত হয় —
যথা — বোন > বুনা > বুন্যা
কুলো > কুলা > কুল্যা

য. শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের স্থানে 'র' যুক্ত হয় —
যথা — আম > রাম
উকিল > রুকিল

র. কতকগুলি শব্দে 'র' স্থানে 'অ' / 'আ' উচ্চারণ হয় —
যথা — রাত্তির > আত্তির
রস > অস

রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. কতকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদের 'অ' কার স্থানে 'ঙ' কার ব্যবহার করা হয় —
যথা — বল > বুল
বলছি > বুলছি
বলব > বুলবো ইত্যাদি

খ. 'ও' কারান্ত ক্রিয়া পদের 'ও' কার স্থানে 'উ' কার ব্যবহার করতে দেখা যায় —
যথা — বোঝ > বুঝ
পোষ > পুষ ইত্যাদি

গ. অসমাপিকা ক্রি(য়ার শেষে 'ইকার' 'ও' ও (ং) সংযোগ করে থাকে —

যথা — করিয়া > করিং
যাইয়া > যাইং
ডুবিয়া > ডুবিং

ঘ. কতকগুলি ক্রি(য়াপদের ভূতকালে প্রথমবর্ণের পরে — একটি হসন্ত 'ল' কারের আগম হয়ে থাকে —

যথা — তোমার জ্বর হয়েছিল?
আঞ্চলিক কথ্য ভাষার রূপ — তুমাকে জ্বর হোল্‌ছিল?

ঙ. কতকগুলি বিশেষ্য পদের শেষে 'র' কারের স্থানে 'অ' কার উচ্চারণ করে থাকে —

যথা — রাত্রিরে > আত্তিরে
রসিক > অসিক

চ. কতকগুলি স্বরাদ্য বিশেষ্য পদের স্বরবর্ণের স্থানে 'র' উচ্চারণ করা হয়ে থাকে—

যথা — রাম > আম
উকিল > (কিল ইত্যাদি

ছ. অনেক সময় সমাপিকা ক্রি(য়ার শেষে 'ও' এবং বাক্যের শেষ শব্দটি 'হোক' ব্যবহার করতে দেখা যায় —

যথা — নিমতন্ন খেতে যাবা হোক।

জ. ক্রি(য়ার রূপের (ে ত্রে স্বরসঙ্গতি লি(ত হয় —

যথা — গিয়েছে > যেছে
নিয়েছেন > নেছে
খেয়েছে > খেছে
করিলাম > কল্যাম
বলিলাম > বল্যাম

ঝ. যে সমস্ত অসমাপিকা ক্রি(য়ার শেষে 'ইআ' যুক্ত(থাকে সেখানে 'ং' যুক্ত(হয় —

যথা — করিয়া > করিং
ডুবিয়া > ডুবিং
যাইয়া > যাইং

এ(. এই কথ্য ভাষায় 'বট' শব্দের ব্যবহার ল(্য করা যায়।

যথা — কুথা যাবেক বটে

ট. কতকগুলি ক্রি(য়াপদের অতীত স্থানের রূপে 'ল'-এর আগম ঘটে —

যথা — হয়েছিল > হোলছিল

ঠ. সম্বোধনে শব্দের শেষে 'আ' যুক্ত(হয় —

যথা — দেওর > দেওরা
(শ্বশুর > সসুরা
ছেলে > ছেল্যা

ড. সম্বোধন অর্থে নিম্নবর্গীয় মেয়েদের মধ্যে 'ওটে' শব্দের প্রচলন দেখা যায়—

যথা —ওটে, তু কোন টিয়ে গেল্‌ছিলি?

ণ. এই ভাষার 'গম' ধাতু সমর্থক ক্রি(য়ারূপে ব্যবহৃত হয় —

যথা — মাঠে চল > মাঠকে চল
জলে চল > জলকে চল
ঘাটকে চল > ঘাটে চল

বাগড়ী অঞ্চলের প্রচলিত কথ্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. পদের অন্তে 'অ'কারের স্থানে 'অ্যা' ব্যবহার করে থাকে।

যথা — হুক্যা, কোল্‌ল্যা, মূল্যা, তুল্যা, কুল্যা ইত্যাদি।

খ. শব্দের আদিতে 'ও' কারের স্থানে 'উ'কার ব্যবহার করা হয়।

যথা — দোকান > দুকান
বোকা > বুকা
বোতাম > বুতাম
রোগা > (গা ইত্যাদি

গ. পদের অন্তে 'য়' এর স্থানে 'হ' তে পরিণত হয় —

যথা — বিয়ে > বিয়া > বিহ্যা
কুয়ো > কুহ্যা

উদাহরণ— ''মাহৈ! দুয়্যারটা খুলতো কুহ্যার পানি লিবো।''

আবার,

''বুলতো — বিহ্যা বাড়িতে আগে বিহ্যাইকে ঢুঁড়ে পালেম না।''

ঘ. অনেক শব্দের শেষে 'হ' আনায়ন করা হয় —

যথা — সার > সাহার
চিনি > চিন্‌হি
চুলো > চুলহ্যা
আড়োল > আড়াহলে
গম্‌ > গহম
নালা > লাল্‌হ্যা ইত্যাদি।

ঙ. 'ড়' এর স্থানে 'ঢ়' এর ব্যবহার হয়ে থাকে —

যথা — বুড়া > বুঢ়্যা
কুড়া > কুঢ়্যা
মুড়া > মুঢ়্যা ইত্যাদি।

চ. আদিতে 'এ' কারের স্থানে 'অ্যা' হতে দেখা যায় —

যথা — তেল > ত্যাল
বেল > ব্যাল
তেঁতুল > ত্যাঁতোল
লেপ > ল্যাপ্‌ ইত্যাদি।

ছ. 'ণ' কারের স্থানে 'ল' উচ্চারিত হতে দেখা যায় —

যথা — নাক > লাক

বর্তমান ভারতবর্ষে সংহতি ও ভগবদ্‌গীতা

- গৌতম কুমার ঘোষ

(সহ অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর)

যখন মানুষের মধ্যে বিভেদ ও হানানি শুরু হয় তখনই বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে সংহতির অভাব ঘটেছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ত্যাগের আদর্শ। অপরের সম্পত্তি ভোগের মাধ্যমে আমাদের সন্তুষ্টি নেই আমাদের সন্তুষ্টি রয়েছে অপরের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে। আমাদের ভারতীয় দর্শনের মূল বক্তব্য মানুষের মনুষ্যত্ব তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ নিজের গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্যত্র নিজেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। নিজের বাইরে কিছু ভাবাই মহত্বের লক্ষণ। এ ধরনের স্বার্থত্যাগ করব কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যহারা আমাদের বাইরে আছেন তারা আমাদের থেকে আলাদা নন। এ তারা আমাদের আত্মারই অংশ বা 'আত্মীয়'। এ ধরণের ব্যাপারকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয়—''আত্মবিস্তৃদি'। অন্যদের ভালোবাসা তখনই যায় যখন আমাদের আত্মবিস্তৃদি ঘটে। আত্মবিস্তৃদির জন্যই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে পারে। তার ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ দূর হতে পারে এবং মানুষের মধ্যে সৌভ্রাদৃত্ববোধ জাগতে পারে। এ ধরনের সৌহার্দ্য থাকলেই যথার্থ সংহদি আসতে পারে। এ ধরনের মহত্বের অধিকারী যে ব্যক্তি তাকেই আমরা বলতে পারি উদার। তাই আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বলা হয়েছে—'উদারচবিতানাং তু বসুবৈধ কুটুম্বকম্"। সাধারণ ব্যক্তির কাছে আপনপর বিচার আছে, কিন্তু উদার চরিত্রের লোকের কাছে সমস্ত পৃথিবীই আত্মীয়, কুটুম্ব। এর চেয়ে বড় সংহতির কথা আর কী থাকতে পারে?

সংহতির কথা আরো পরিষ্কার ভাবে উক্ত হয়েছে ঈশোপনিষদের মন্ত্রে—''যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মোন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূদেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সদে।।" অর্থাৎ যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে যখন দেখেন তখন তিনি কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না। উপনিষদের অন্যত্রও সকলের উন্নতির কথা বলা হয়েছে।

ভারত বর্ষে ত্যাগের মহিমা সর্বজন স্বীকৃত। প্রাচীন কাল হতে মানুষকে সব সময় ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শাস্ত্র রচিত হয়েছে। এই ত্যাগ দু ধরনের—পারিপার্শ্বিক লক্ষ্যে এবং ঐহিক লক্ষ্যে ত্যাগ। অনেকের ধারণা বোধ হয় শাস্ত্র আমাদের কেবল পারমার্থিক লক্ষ্যে ত্যাগের কথা বলে। প্রকৃত পক্ষে ইহলৌকিক প্রয়োজন সাধনের জন্য ত্যাগের এক মহান ভূমিকা আছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ত্যাগকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ত্যাগই আমাদের মধ্যে শান্তি, সুখ ও সামঞ্জস্য আনতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানাভাবে কর্মে উদ্যমী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এখানে অর্জুন ত্যাগক্লিষ্ট একজন সাধারণ মানুষের প্রতি ভূ। সমস্ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগকে সামাজিক সুখ ও শান্তির উপায় বলে বর্ণনা করেছেন।

সমাজজীবনে ত্যাগ সতত প্রশংসনীয় এবং অপরিহার্য। যদি মানুষ সর্বদাই স্বার্থপর জীবন যাপন করে অথচ অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে না তাদের আমরা 'অসামাজিক' বলে বর্ণনা করে থাকি। যদি কোন কাজ বিশ্বের জন্য উৎসর্গীকৃত হয় তাহলে তাকে ত্যাগ বলে উল্লেখ করতে পারি। কাজেই যা মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রসূত নয় এবং যা অন্যের স্বার্থে জাতির স্বার্থে বা সামাজিক ব্যক্তিদের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত তাই এই 'ত্যাগ' থাকে ভগবদ্‌গীতায় যজ্ঞ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যদি মানুষ এভাবে পরীক্ষায় চিন্তার দ্বারা কার্য করে তাহলে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নিজের কল্যাণ লাভ করে। অন্যের স্বার্থ-পুরণের মধ্যে নিজের স্বার্থ পুরণ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায়। কেননা একজন সামাজিক ব্যক্তির স্বার্থ অন্যের স্বার্থের সাথে জড়িত থাকে। অন্যের শান্তির উপরে আমাদের শান্তি নির্ভর করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বকীয় চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকেন এবং অন্যের সুখে বা দুঃখে সহানুভূতি না দেখান তাহলে তাকে আমরা অসামাজিক আখ্যা দিয়ে থাকি। এখানে 'যজ্ঞ' বলদে আমরা বুঝি 'ত্যাগ' যা মানুষকে স্বকীয় সুখ ও শান্তির উর্দ্ধে নিয়ে যায়। যা অন্যের উদ্দেশ্যে বা জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত তাকেই বলা হয় 'ত্যাগ'। মানুষ এ ধরনের ত্যাগকে অবলম্বন করে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই তার স্বার্থসিদ্ধি হবে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আমাদের পারলৌকিক সুখের সঙ্গে ইহলৌকিক সুখেরও ইঙ্গিত দেয়। গীতা আমাদের এমন সমস্ত কর্ম করতে বলে যায় ফলে আমাদের মধ্যে নেমে আসতে পারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি। তাই 'কর্তব্য পালন' মানুষের ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কর্তব্যপালনরূপ ধর্মাচরণের মাধ্যমে মানুষ ইহজাগতিক ও পারলৌকিক শান্তিলাভ করতে পারে।

গীতার উপদেশ কিভাবে মানুষের ইহলৌকিক প্রয়োজন সাধন করতে পারে না দেখা যাক। যখনই 'যজ্ঞ'কে একটা ভিন্ন অর্থে বা ত্যাগের অর্থে গ্রহণ করা হয় তখনই তার এক অসীম সামাজিক মূল্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবেশীর প্রতি তথা সামাজিক ব্যক্তির সহানুভূতি, সহমর্মিতা বা সমাজ সেবা প্রভৃতিও এক ধরনের যজ্ঞ, যেহেতু তা অপরের প্রতি ত্যাগেরই সূচক। এই ত্যাগের মহিমা আরো বেশী প্রকটিত হয় যখন দেখি যে কোন ব্যক্তি 'স্বার্থপর'-এ উক্তিতে ভূষিত হতে চান না। মানুষের অন্তঃস্থিত ত্যাগের অভাবকে সূচিত করে বলেই মানুষ স্বার্থপর আখ্যা লাভ করতে চায় না। কেননা তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অনভিপ্রেত। সমাজ তো দূরের কথা পরিবারের মধ্যেও ত্যাগের প্রয়োজন আছে। তা না হলে পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। যে পরিবারে এবং যে সমাজে ত্যাগ নেই সেখানে দেখা যায় পারস্পারিক বিদ্বেষ, ভুল বোঝাবুঝি প্রভৃতি। সে জন্য আমাদের শাস্ত্রে সমাজ কল্যাণ, দান প্রভৃতি ত্যাগমূলক কার্যগুলোকে 'সুগুণ' বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভগবদ্‌গীতাও 'স্বার্থপরতা' ও 'কার্পণ্য' প্রভৃতিকে দোষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ত্যাগের ভাব থাকে সংস্কারগত দিক দিয়ে। যখনই মানুষের মধ্য কার্পণ্য বা স্বার্থপরতার আগমন হয় তখন তার ত্যাগের স্বভাব ঢাকা পড়ে যায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে—''কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ" (২/৭)। গীতার মতে 'যজ্ঞ' করা বা ত্যাগ করাই জীবনে উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেছেন। যাতে উক্ত জগতে মানুষ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বেহচে থাকতে পারে সেজন্য ত্যাগের কথা বলেছেন। মানুষ যেমন কামধেনু থেকে যখন যা চায় তাই পায়, তেমনি মানুষ সমস্ত অভীষ্ট জিনিস লাভ করতে পারে যজ্ঞের বা ত্যাগের মাধ্যমে। তাই বলা

হয়েছে---'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক।" (৩/১০)। এখানে 'প্রসবিষ্যধবম্'-এ শব্দের দ্বারা মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উন্নতির কথা বলা কল্যাণের কথা সুচিত হয়েছে।

গীতার যে মর্মার্থ তা হল আমরা যেন শোক করে আমাদের শক্তির অপচয় না করি। আমরা যেন কর্মরূপ যজ্ঞে আমাদের সর্বশক্তিকে নিয়োগ করতে পারি। তবেই হবে আমাদের শক্তির যথার্থ রূপায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অর্জুন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধরূপ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। শোক বা দুঃখ মানুষকে জড় করে তোলে—ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। ফলে শোকের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে আসে এক সর্বগ্রাসী 'ক্লীবতা বা জড়তা', মোহও আমাদের অনুরূপ ক্লীবতা নিয়ে আসে। তাই যা কিছু আমাদের কর্মযজ্ঞের পরিপন্থী সে সমস্ত শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতিকে দূরে রাখা উচিত। সেজন্য অর্জুনের প্রতি তথা আমাদের প্রতি গীতার সাবধানবাণী—''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যাতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোদিষ্ঠ পরন্তপ।।" (২/৩)। অর্থাৎ হে অর্জুন! ক্লীবতা বা জড়তাকে আশ্রয় কোর না। কেননা এ ধরণের জড়তা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

গীতায় প্রোক্ত এই ত্যাগের মহিমা আরো বেশী প্রকটিত হয় যখন বলা হয়েছে যে মানুষ যদি অন্যকে কিছু না দিয়ে প্রতি দানে কোন কিছু উপভোগ করে তাহলে সে চোরেরই সামিল। ''তৈ দর্ত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এস সঃ" (৩/১২)।

যদি কোন ব্যক্তি যশোলোভে বা বিনিময়ে কিছু পাওয়ার লোভে কোন কাজ করে তাহলে তাকে কি 'যজ্ঞ' বলে ধরা হবে? মানুষ যা কিছু করবে সমস্ত কিছুই এক ধরণের নিষ্কামতা নিয়ে মানুষের করা উচিত —একথা সমস্ত গীতায় ধ্বনিত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ করে তাহলে তাকে কখনই 'যজ্ঞ' বলা যায় না, তাই আমাদের প্রতি গীতার উপদেশ আমরা যেন কোন উদ্দেশ্য বা ফলকে মনের অন্তরালে রেখে কাজ না করি—উদ্দেশ্যমূলক কোন কাজ মানুষকে 'স্বাধীন' না করে পরাধীন করে তোলে। কোন কর্মই যা মানুষের স্বার্থপ্রসত নয় তা সমস্তই 'যজ্ঞ' বলে অভিহিত। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—কাজেই গীতার মদে যুদ্ধ রূপ কর্তব্য পালনও একরূপ যুদ্ধ যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে যজ্ঞীয় বহ্নি এবং যোদ্ধারা হচ্ছেন পুরোহিত। গীতার এ উক্তি থেকে একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে প্রতিটি মানুষেরই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্তব্য আছে। যহারা এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন তাদের কাছে এটি যজ্ঞস্বরূপ। যদিও গীতা 'মা ফলেষু কদাচন'-এ নীতিতে বিশ্বাসী তবুও ফলের কথা 'অবহেলিত' একথা চিন্তা করা সমীচীন নয়। মানুষ ফলের কথা ভেবে কাজ করবে না ঠিকই—কেননা ফলের কথা ভাবলে স্বার্থের কথা এসে পড়ে—ফলে কর্মকে যজ্ঞ বলে বর্ণনা করা যায় না। এখানে বলা যেতে পারে যে যদি কোন ব্যক্তি, যথাযথ ভাবে কর্তব্য পালন করেন, তাহলে স্বাভাবিক ও স্তবঃস্ফূর্ত ভাবেই তিনি ফল লাভ করবেন। এই ফল মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত।

কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সুখ অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ করা উচিৎ নয়। এমনকি লাভ ও ক্ষতি, জয়ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করা উচিৎ। মানুষের কর্তব্য পালনই সবচেয়ে বড় কথা। সেখানে নিজের জয়, পরাজয় লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি বিচার সমীচীন নয়। (''সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ

জয়াজয়ৌ" ২/৩৮)। এমন কর্তব্যপালনের কথা একমাত্র গীতাতেই পাওয়া যায়। মানুষ যদি গীতার এ বক্তব্য অনুসরণ করে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তীক্ষ্ণভাবে কর্তব্যপরায়ণ হন তাহলে সমাজে সমস্যা থাকতে পারে না।

পূর্বে বলা হয়েছে যে গীতা কর্মবাদী। মানুষকে জড়তা তথা ক্লীবতা থেকে মুক্ত করে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। কেননা কর্মই গীতার মূলমন্ত্র। সেখানে বার বার বলা হয়েছে—কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্মহীন ব্যক্তির দেহযাত্রা নির্বাহ হতে পারে না। (''নিযতং কুরু কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মনঃ।।" (৩/৮)। যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম কখনই পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। এ সমস্ত কর্ম করা উচিত। কেননা এসমস্ত কর্ম মনীষীদের চিত্তশুদ্ধিকারক। মানুষ যতই ত্যাগাদি—কর্মের অনুশীলন করবে ততই তার মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং চিত্তের মালিন্য দূর হবে। (''যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনামি মনীষিণাম্।।" (১৮/৫) গীতায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে এক প্রতীক রূপে ধরা হয়েছে। মানুষের জীবনও এক প্রকার সংগ্রাম বা যুদ্ধ। মানুষের অন্তঃস্থলে সব সময় চলছে সংগ্রাম। এ যুদ্ধ সব সময় মানুষের অন্তঃস্থিত সু ও কু-এর যুদ্ধ। মানুষের মধ্যে যেমন কিছু দৈবী সম্পদ রয়েছে আবার তেমনি রয়েছে আসুরী সম্পদ। ফলে মানুষের মধ্যে রয়েছে সুরাসুর সংগ্রাম। যে সমস্ত গুণ মানুষকে সংসারে বিস্তৃত করে সংকুচিত না করে তাই দেবীসম্পদ। যা মানুষকে সংকুচিত করে (বিস্তৃত করে না) তাই অসুরী সম্পদ। মানুষের মধ্যে সব সময় অসুরী গুণ থাকবে তা ভাবার কোন কারণ নেই। মানুষের মধ্যে দৈবীগুণই বেশী। যখন এ সমস্ত গুণগুলো অসুরী গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তখনই সুরসত্তা আবত হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে—'দৈবী-সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা'। (১৬/৫)। মানুষের মধ্যে যেমন সুরসত্তা আছে তেমনি সমাজসেবা প্রভৃতি গুণের মধ্যে। আবার যাদের হৃদয় বাসনায় পূর্ণ, দম্ভ অভিমান ও মদযুক্ত তাদের রয়েছে অসুরসত্তা। (''কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ। মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদ্‌গ্রাহান প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।।" (১৬/৩০)। মানুষের মধ্যে এই সমস্ত অসুরিক গুণের আধিক্য ঘটলে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কামক্রোধাদির আধিক্য ঘটলে মানুষ বিষয়ভোগের জন্য পরধন অপহরণ রূপ অসদুপায় অবলম্বন করে। তাই আসুরিকগুণ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। (''ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং... কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চ য়ানম্।। (১৬/১২)। এ ভাবেই মানুষের অন্তরের মধ্যে সুরাসুর সংগ্রাম চলছে। তাদে সুর যদি জয়লাভ করে তবেই আসবে মানুষের যথার্থ শান্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার। সেখানেই রয়েছে স্বর্গ। অপর দিকে যেখানে আসুরিক গুণের আধিপত্য সেখানেই রয়েছে নরক। কাম, ক্রোধ, ও লোভ এ তিনটি আসুরিক গুণকে নরকের দ্বার রূপে বর্ণনা করলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। সেজন্য গীতায় বলা হয়েছে বার বার দৈবীগুণ অবলম্বন করতে এবং আসুরিকগুণ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। ''ন্যাশনামাত্মনঃ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তন্মাদেৎ ক্রয়ং ত্যাজেৎ।।" (১৬/১২)। এখান থেকে মানুষ মুক্ত হলে কেবল সে পারলৌকিক কল্যাণের সাথে যুক্ত হয় তা নয়, মানুষ স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং শ্রেয় অনুষ্ঠানবশত ইহলোকের সুখভোগ ও মনুষ্যজন্মের সার্থকতারূপ মোক্ষ লাভ করে। এখানে সর্ববিধ কল্যাণময় অবস্থায় বিরাজমান হওয়ার নামই মোক্ষ। যেখানে মনুষ্য

কল্যাণযুক্ত হয় তাই স্বর্গ। (''এদৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাদি পরাং গতিম্''।। (১৬/২২)।

বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে যা সমস্যা সমস্তই আসুরীগুণপ্রসূদ। বর্তমান যুগে অসুরী গুণের প্রকোপ এত বেশী যে দৈবীগুণগুলো আবৃতই থাকে। ফলে সমাজ সংসার সমস্তই এক রণভূমিতে রূপান্তরিত। সর্বত্রই রয়েছে স্বার্থান্ধতা, কামক্রোধাদির লীলাক্ষেত্র। ফলে পারস্পারিক বিদ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতি সমাজকে কলুষিত করছে। তাই আজকের দিনে গীতার বাণী খুবই প্রণিধানযোগ্য। ত্যাগের আদর্শে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ হওয়া দরকার। কর্মের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া দরকার। ত্যাগের মাধ্যমে ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের অন্তঃস্থিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান। পরিণামে আমরা পেতে পারি আত্মিক ও দৈহিক শান্তি। ফলে অন্যদেরও আমরা শান্তির পথ দেখাতে পারি। গীতা আমাদের সেই পথেই নিয়ে যায়। যখনই আমাদের মধ্যে সুরাসুরসংগ্রাম শুরু হয় তখনই গীতার বাণীর প্রয়োজন। বাহ্যিক উপদেশ আমাদের অন্তঃস্থিত শত্রুকে পরাজিত করে আমাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমরা স্বমহিমায় সুরসত্তা জাগ্রত তখনই সেখানে বিরাজিত হয়—শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, বিজয়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় এবং অব্যভিচারী নীতি (''তত্র শ্রী বিজয়ো ভূদি ধ্রুবা নীতি র্মতি র্মম।'' (১৮/৭৮)

প্রাচীন মুনিঋষিগণ জানতেন 'সংহিতা কার্যসাধিকা'। তাই তারা সবসময় সংহত হয়ে মানুষের মধ্যে সংহতি আনয়নের চেষ্টা করছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র চদু বর্ণ যে একই ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি তা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে দেখানে হয়েছে। ঈশ্বরকে যদি একটি পুরুষরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। যেহেদু সমস্ত বর্ণাশ্রমই এক ও অখণ্ড পুরুষ বা ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি হয়েছে যেহেতু কোন বর্ণই নীচ বা উচ্চ নয়। সকলেই সমান কর্মের দিক দিয়ে বর্ণের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তাতে তাদের নীচতা বা উচ্চতা প্রমাণিত হয় না। যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যেহেতু তাকে বেদ পাঠাতি বা অধ্যাপনার কাজ দেওয়া হয়েছে। বাহু থেকে উৎপন্ন বলে ক্ষত্রিয়ের কাজ বাহুবলে প্রয়োগ করা বা যুদ্ধ বিগ্রহ করা। উরু থেকে উৎপত্তি বলে বৈশ্যের কাজ কৃষি পশুপালন প্রভৃতি। পা থেকে উৎপন্ন বৈশ্যের কাজ শ্রমদান করা। এভাবে কর্মভিত্তিক একটা পার্থক্য থাকলেও তাদে নীচতা বা উচ্চতা প্রমাণিত হয় না। বর্তমানে নীচতা বা উচ্চতা যা আরোপিত —মূল শাস্ত্রে কখনই ছিল না। মানুষ সুপ্রাচীনকালেরই চিন্তা করেছিল যে একজন ব্যক্তি সমষ্টি থেকে আলাদা হয়ে কখনই উন্নতি লাভ করতে পারে না। কেননা মানুষের মধ্যে 'আমি বড়, সে ছোট'-এ ধরনের ব্যবহার জটিলতার সৃষ্টি করে। যখন আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কিছু করতে পারব তখনই যথার্থ শান্তি বিরাজ করবে। তাই আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মতো প্রার্থনা করতে হবে—''সংগচ্ছধবং সংবদধবং সং বো মনাংসি জানদাম—'' ইদ্যাদি। অর্থাৎ সকলে আমরা যেন এক সাথে চলি, একভাবে বলি এবং একই মনের অধিকারী হই। শুধু তাই নয় আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ও সংঘ যেন এক হয় (''সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী'')

যখনই মানুষ এই শাশ্বত সত্যের কথা বিস্মৃত হয় তখনই মানুষের মধ্যে আসে বিভেদবোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ—আমরা সকলে একই সত্যের অধীনে এবং আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন নই। যখনই আমরা ভুলে যাই যে আমরা একই আত্মার অংশ অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের 'আত্মীয়' তখনই বিচ্ছিন্নদাবোধ মাথাচাড়া নিয়ে ওঠে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধই সংহতির পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। তাই আমাদের বর্তমান যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন দরকার শুধুমাত্র আমাদের সংহতিকে ফিরে পেতে। এই সংহতির কথা মনে রেখে শাস্ত্রীয় রীতিতে ভাষায় আমরা কামনা করি—''সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।'' অর্থাৎ সকলে সুখী হোক, সকলে ব্যাধিমুক্ত হোক্। সকলে যেন যা কিছু শোভন বা সুন্দর তাই যেন দেখে। (অর্থাৎ জগতও যেন সুন্দর হয়) এবং কেউ যেন দুঃখ না পায়।

টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী :

১। রঘুনাথ ঘোষ : শিল্প, সত্তা ও যুক্তি, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা-২০১০
২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।
৩। বেদান্তপরিভাষঅ, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী
৫। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২ শ খণ্ড, শত বার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ প:ব: সরকার।
৬। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : হিন্দুদের দেবদেবী, ফ্যার্মা, কে.এল. কলকাতা, ১৯৯৭
৭। কঠোপষিদ ১/১/৪
৮। ঈশোপরিষদ
৯। সদ্যজ্যোতি চক্রবর্তী (অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগার),সর্বদর্শনসংগ্রহ : সাহিত্যশ্রী কলকাদা-১৪১৩

গল্প

খাদের কিনার থেকে

- তাপস হালদার

কলিং বেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। কি জানি আবার কে এল। — মা তোমাকে উঠতে হবে না, আমি দেখছি। আবার কলিং বেলটা বেজে উঠতেই সাড়া দিয়ে বললাম, আসছি। দরজাটা খুলে মুখ বাড়াতেই দেখি, আমার এক সহপাঠী হেমেন। — কি রে সময় করে তবে এলি! ঠিকানা পেলি কোথা থেকে? হ্যাঁরে শীলা, তুই কলেজের এত কাছে থাকিস্ বলিসনিতো কোনদিন। কি বলব বল্, দেখছিস তো বাড়িঘরের অবস্থা। মার শরীর সবসময় ভাল যায় না। এক হাতে সব সামলাতে হয়। তারপর কয়েকটা কচি-কাঁচাকে পড়াই। ছুটির দিনে আবার নাচের ক্লাস, তাই তোদেরকে ইচ্ছা থাকলেও আসতে বলতে পারিনা বলে মনে কিছু করিস না। তুই এসেছিস আমার খুব ভাল লাগছে। জানিস বাবার মৃত্যুর পর এই বোধহয় তুই প্রথম আপনজন হিসাবে বাড়িতে এলি।

যাকগে, শোন, দুপুরে এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া না করে যেতে পারবি না। ডাল,ভাজা,তরকারী আর টক ডাল করেছি। হয়ত খেতে তোর একটু অসুবিধে হবে, তবু তুই খেলে মা, আমি দু'জনেই খুশি হবো। আমি আর মা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের আর কেউ নেই। আর আমরা গরীব তাই আমাদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন কেউই আসে না বললেই চলে। আয় খেয়ে নে।

হেমেন অবাক হয়ে শীলার সব কথা শুনছে আর মনে মনে ভাবছে এই অবস্থার মধ্য দিয়েও ও আমাদের কলেজে পড়াশুনায়, নাটকে সবার কাছে প্রিয়। ওর ব্যবহারে আমরা কলেজের সবাই মুগ্ধ হয়ে যাই।

এইতো সেবার মোটরবাইক থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণ চোট পাই। ওরা পাশ দিয়ে কলেজে ঢুকছিল। আমার এই অবস্থা দেখে অন্য বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। ওর আন্তরিকতার সত্যিই অভাব নেই।

— কি রে কিছু ভাবছিস ? আয় খেয়ে নে। আমাদের ডাইনিং টেবিল নেই। মাটিতে বসে খেতে হবে, তোর একটু কষ্ট হবে। আচ্ছা এত ইতস্তত করছিস কেন ?

— না রে, আজ আমি কিছু খাব না। অন্য একদিন এসে জমিয়ে খেয়ে নেব।

আবার কলিং বেল বেজে উঠল। আসছি, বলে দরজা খুলতেই রাণীকে দেখে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হেমেন আড়াল থেকে রাণীকে দেখে তৎক্ষণাৎ 'আসছি' বলে চলে গেল। রাণী ততক্ষণে ঘরে ঢুকে মাসিমার খাটের পাশে গিয়ে মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল — মাসিমা কেমন আছেন ? প্রশ্ন শুনে মাসিমা মুখ ঘুরিয়ে রাণীকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বললেন — কি রে, কেমন আছিস ? এতদিনে তোর আসার সময় হল ?

— না মাসিমা, বেশ কিছুদিন আমি এখানে ছিলাম না। বেকারত্বের জ্বালা নিবারণে আমাদের কলেজের এক সহপাঠী হেমেন আমার একটা চাকরীর সুযোগ করে দেবে বলে

বম্বে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে শ্যামবাবুর বাড়িতে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ জুটিয়ে দিয়ে ওখান থেকে কলকাতায় চলে আসে। শ্যামবাবু লোকটা খুবই অসৎ। নানা ধরণের অসৎ কাজে লিপ্ত। আমাদের মত গরীব ঘরের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে বাজে কাজ করিয়ে নিত। কথার অবাধ্য হলে আর নিস্তার ছিল না।

একদিন রাতে নেশা করে, আমার ঘরে ঢুকে বাজে ব্যবহার করে এবং বলতে থাকে, জানিস, তোর এখানে কোন অসুবিধা হবে না। আমি হেমেনকে বলে দিয়েছি। শুধু মাঝে মাঝে আমায় একটু সময় দিবি — এই বলে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে আমি ওখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে এসে হন্যে হয়ে হেমেনকে খুঁজে যাচ্ছি। হঠাৎ তোদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেই তোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ভাবলাম একবার তোর সঙ্গে দেখা করে হেমেনের আচরণের কথা বলে যাই। ও যে ভদ্রবেশে কার কি ক্ষতি করেছে কে জানে।

রাণীর কথা শুনে শীলা খুবই অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগলো রাণীর কথা সত্য না মিথ্যা। আবার ভাবল আজকাল যে কোন সময়ে যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। সতর্ক হওয়াই ভাল।

— আচ্ছা রাণী, তুই বর্তমানে কোথায় থাকিস ?

— আমার কোন স্থায়ী থাকবার জায়গা নেই।

— তাহলে ?

— তাহলে আর কি? মোড়ের মাথায় কচিবাবুর বাড়িতে আপাতত আছি। উনি তো গত হয়েছেন, ওনার স্ত্রী দূর সম্পর্কে আমার মাসি হয়। অনেক অনুরোধে উনি আমায় ঠাঁই দিয়েছেন। সকাল-বিকাল রান্না করি, রাতে ওনার সেবা করি। খাওয়া-পরা বাদে মাসে দু'শো টাকা হাতখরচ দেন। মনে মনে ভেবেছি আমি আবার পড়াশোনা করব। আমাকে তোর নোটগুলো দিয়ে একটু সাহায্য করবি তো ?

— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব। কিন্তু রাণী, আমরা তো জানতাম হেমেন তোকে মনে মনে খুব ভালবাসে। সেবার ঘর চাপা পড়ে যখন তোর মা, বাবা একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ঐ তো সহপাঠীদের নিয়ে তোদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

— ওর উদ্দেশ্য ছিল ভালবাসার ছলনা করে, চাকরীর লোভ দেখিয়ে সমাজের বুকে ভালমানুষ সেজে থাকা। বিভিন্ন ব্যবহারে যখন বুঝতে পারলাম ও স্বার্থপর, নিজের স্বার্থ ছাড়া ও কিছু বোঝে না, ও যে ভালমানুষের মুখোশের আড়ালে কত নিরীহ মানুষের ক্ষতি করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

থাকগে ওসব কথা। তোর সঙ্গে হেমেনের কখনো দেখা হলে আমার সাথে একটু দেখা করতে বলবি তো। শুনেছি ও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কি একটা কাজ করে। আজ আসি।

— পরে আসবি তো ?

— হ্যাঁ, অবশ্যই আসবো।

— সাবধানে যাতায়াত করবি। মনে রাখিস তোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

ফিরে এলি খাদের কিনার থেকে।

এক আদিবাসীর চরম দুর্ভোগ

- প্রবীর কুমার দাস

‘ বিনোদ ওরাঁও’ ঝাড়খন্ডের রাঁচির অজ গাঁয়ের দুঃস্থ, সহজ সরল গরীব এক আদিবাসী যুবক। তবে বেশ গাট্টাগোট্টা পাথরের মূর্তির মতো। অভাবের সংসার। সে দুই মেয়ে ও এক ছেলের বাবা। কোনরকমভাবে দিন গুজরান করে। পেটের তাগিদে, কিছু অর্থ উপার্জনের আশায় টুকটাক কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু অভাব যেন কিছুতেই মেটে না।

এমন সময় জনৈক সাউজি নামে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। লোকটি আদৌ সুবিধার ছিল না। সহজ, সরল ও শক্ত কাঠামোর মানুষটিকে কাজের লোভ দেখিয়ে তাকে এবং ঐ অঞ্চলের আরও নয়জনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায়, ইটভাটার শ্রমিক হিসাবে কাজের জন্য নিয়ে আসে। লোকটি ছিল একজন প্রতারক। এই কাজের জন্য জনৈক ইটভাটার মালিকের থেকে সে একলক্ষ টাকা নেয়। পরিবর্তে তার নাকি নব্বইজন শ্রমিক যোগান দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাত্র দশ জনকে মালিক আর কাজে নিয়োজিত করতে রাজি হয়নি। ফলে রাঁচি থেকে আগত মানুষগুলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সাউজির আর দেখা পাওয়া যায়নি।

অগত্যা বিনোদ ও অন্যান্যরা মিলে পুনরায় বাড়িতে ফিরে যাবার ব্যাপারে মনস্থির করে। কিন্তু সঙ্গে তাদের কানাকড়িও নেই। বেআইনি কাজ জেনেও তারা বাধ্য হয়ে শিয়ালদহমুখী লালগোলায় বিনা টিকিটে চেপে বসে। উদ্দেশ্য কলকাতা হয়ে রাঁচিতে নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়া। কিন্তু ..... ট্রেনটি রাণাঘাট ষ্টেশনে এলে হঠাৎ Special Checking- এ বিনোদ ছাড়া সবাই ধরা পড়ে যায়। স্থানীয় স্কুলের কিছু ছেলের ধাক্কায় বিনোদের হুঁশ হয় এবং উল্টোদিকের দরজা দিয়ে লাফিয়ে টিটির হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়।

সহজ সরল আদিবাসী লোকটি তখন নিরুপায় হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাণাঘাট ষ্টেশন থেকে রেললাইন বরাবর পায়ে হেঁটে একসময় নৈহাটি ষ্টেশনে পৌঁছায়। সারাটা দিন অভুক্ত থেকে ষ্টেশনে রাত্রে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সঙ্গে ছিল তার একটা ব্যাগ, যাতে জামা, প্যান্ট, চাদর ইত্যাদি ছিল। এছাড়াও ছিল তার আধার কার্ড ও পুরানো দশ টাকার একটা Xerox। জানিনা ঐ Xerox এর আসল উদ্দেশ্য কি ছিল। হয়ত এটা ছিল তার অনুপ্রেরণা ও একটা প্রতীক। কেননা টাকার পিছনেই ছুটে চলেছে দুনিয়া। এই টাকার জন্যই হতে হয়েছে তাকে গৃহছাড়া। বেচারা বিনোদ ভাবতেই পারেনি যে তার থেকেও অভাগা মানুষ এই পৃথিবীতে আছে। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখে তার ব্যাগ কাটা অর্থাৎ চুরি হয়ে গেছে। খোঁয়া গেছে তার আধার কার্ড ও পুরানো নোটের Xerox। এ যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

বিনোদ ভেঙে পড়ার পাত্র নয়। ভিক্ষা সে করবে না বলে জানায়। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে দশ টাকার নোট দিয়ে কিছু খেতে নিতে বলে। কথামতো সে সামান্য কিছু খায় ও কাটা ব্যাগটা সারায় এবং অতঃপর সে হেঁটে পুনরায় লাইন বরাবর ব্যারাকপুর ষ্টেশনে

এসে পৌঁছায়। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তার দুই পা ব্যথায় অবশ হয়ে যায়। অভুক্ত থেকে সে কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়ে। কিন্তু ভিক্ষা সে করবে না বলে জানায়। বরং সে কিছুটা আশাবাদী হয়ে জানায় রাত্রে ব্যারাকপুর ষ্টেশনে কাটিয়ে সকালে আশপাশে কোন যোগালির কাজ করবে। বিনোদ জানায় সে ১৩৫ টাকার বিনিময়ে যে কোন ধরণের কাজ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ১৩৫ টাকা কেন ? উত্তরে সে বলে কলকাতা থেকে রাঁচি যেতে ট্রেনের ভাড়া ১৩৫টাকা। তাই ঐ টাকা হলেই সে যেকোন কাজে প্রস্তুত। একইরকমভাবে ব্যারাকপুর ষ্টেশনেও এক সহৃদয় ব্যক্তি ঘটনাচক্রে তার এই দুরবস্থার কথা শুনে ষ্টেশন চত্তর থেকে খাবার কিনে তাকে দেয়। সে তা গ্রহণ করে এবং কৃতজ্ঞতা জানায়।

বিনোদের এই সহজ সরল ও দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে খুবই ভালো লাগলো। বিনোদের মধ্যে প্রবেশ করেনি তথাকথিত শিক্ষার কোন আলো। তার চেহারায় নেই কোন লালিত্য অথচ মনে রয়েছে অদম্য উৎসাহ ও জেদ। আমরা যারা শহরে বসবাস করি, তথাকথিত শিক্ষিত, আধুনিক জীবনে অভ্যস্থ, তারা কি বিনোদের মানসিক দৃঢ়তার ধারে কাছে যাওয়ার যোগ্য ?

আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা

- শঙ্কর ভারতী

কি কেস বস্ ? দেখে তো ভদ্রলোক মনে হচ্ছে, তা এই অপমৃত্যুর কাউন্টারে কেন ?
— আর ভদ্রলোক। ভদ্রলোক হলে কি আর এই কাউন্টারে বসে থাকতাম। আর মরেও শান্তি নেই। সকাল থেকে কোন খবর নেই। যমদূত বলে গেল , এখানে সার্ভারে গন্ডগোল হয়েছে। চিত্রগুপ্তের দপ্তর সাময়িক বন্ধ আছে। লিংক আসলে ডাকবে, দেখি, কখন ডাক পড়ে।
— আর তুমি আত্ম-হত্যা করতে গেলে কেন ?
— আরে, বলেন কি মশায় ! আমি হলাম বাংলার পুলিশ! আমি আত্মহত্যা করবো, অসম্ভব ব্যাপার। আমার কেসটা একটু গোলমেলে, এটা ঠিক তবে, আত্মহত্যার দলে মিশিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। আমি যমদূতের বিরুদ্ধে আপিল করবো। লিংক আসুক ; দেখছি। যমদূতের চাকরি খেয়ে ছাড়বো। শালা আমায় চেনে না; এবার চিনবে - বাংলার পুলিশ কাকে বলে।
— আরে দাদা, যমালয়ে এত রাগ করলে চলে, মাথা ঠান্ডা করে বসো। তোমার গোলমেলে কেসটা একটু বল, শুনি।
— আর বলনা বস্। গত পরশু সকালবেলা থানায় ডিউটিতে ছিলাম হঠাৎ থানায় ফোন আসলো, পাশের কলেজে ছাত্ররা মারপিট করছে। কলেজটা থানার মাথাব্যথার কারণ। বড়বাবু সেদিন ছুটিতে, সেকেন্ড অফিসার চার্জে আছেন। সেকেন্ড অফিসারের নির্দেশে জনা পাঁচেক পুলিশ, মরচে পড়া খান চারেক গাদা বন্দুক নিয়ে থানার গাড়িতে কলেজে ঢুকলাম। সেকেন্ড অফিসার আমাদের সঙ্গেই ছিল। আমরা যা খবর পেয়েছিলাম ঘটনাটা ততটা হালকা ছিল না। গন্ডগোল তখন আর দু-দল ছাত্রের মধ্যে ছিল না। চারিদিকে বোমা পড়ছে ফুলঝুরির মত; চারিদিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কলেজ চত্তরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। আমাদের আশপাশ দিয়েও লোকজন ছুটছে। আমাদের অফিসারের সাথে উপর মহলের কথা হচ্ছে। উপর মহলের কেউ দায়িত্ব নিয়ে কোন নির্দেশ দিচ্ছেন না। মাঠের একপাশে আমরা ক'জন পুলিশ আর চ্যানেলের কিছু সাংবাদিক। সাংবাদিকদের বলিহারী সাহস; এত গোলাগুলির মধ্যে, ওরা ছবি তুলেই চলেছে। ধোঁয়ায় আবছা দেখছি; একজন দাদা মার্কা লোক হাতে পিস্তল নিয়ে আর এক দাদাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চিত্র সাংবাদিক ঐ ছবি তোলার জন্য দৌড়াচ্ছে। একজন তাড়া খেয়ে বাঁচার জন্য পুলিশের দিকে আসছে। আমার গায়ের কাছে আসতেই পেছন থেকে দাদা দমা-দম গুলি চালিয়ে বসলো। ওরা তো শিয়ানা মাল, ভাব বুঝে আগেই মাটিতে শুয়ে পড়েছে, পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সোজা আমার পাজর ভেদ করে হৃদপিন্ডকে ছুঁয়ে গেল। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করলাম, তাজা রক্তে কলেজের মাঠ ভেসে গেল। আমার সহকর্মীরা আমাকে

পাজাকোলা করে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে যমদূত হাজির ; আমাকে নিয়ে এখানে চলে এলো, তুমি বল বস্, এর মধ্যে আত্মহত্যা কোথায় ?
— না না এটা আত্মহত্যার কেস হতেই পারে না ; তুমি লড়ে যাও। তবে গুলির সময় তুমিও ঐ শিয়ানা মালগুলোর মতো মাটিতে শুয়ে পড়তে পারতে। তাহলে হয়ত এবারের মত বেঁচে যেতে।
— সে পারতাম বস্, যদি বছর দশেক আগে হত। এই দশ বছরে ইয়া বড় ভুড়ি, আর শরীর আনফিট হয়ে গেছে।
— তোমাদের বন্দুক থেকে ক-রাউন্ড গুলি চালাতে পারতে ?
— আরে বস্, ব্যাপারটা এত সোজা না। গুলি চালাতে গেলে উপর মহলের নির্দেশ লাগে। এটা আমাদের দেশ। এখানে জওয়ানের জীবনের চেয়ে বন্দুকের গুলির মূল্য অনেক বেশি।
— সে তো বুঝলাম কিন্তু তুমি তো মরে গেলে, তা তোমার পরিবারের কি হবে ?
— সে নিয়ে কোন অসুবিধে হবে না। আমার বৌ জিনিয়াস, ও ঠিক একটা ব্যবস্থা করে নেবে। আর অন-ডিউটি অবস্থায় মারা গেছি, বৌকে একটা চাকরি দেবে নিশ্চয়। আর গত কয়েক বছরে সামনে - পেছনে দুহাতে যা টাকা কামিয়েছি, ঐ টাকা তো আছেই। সমস্যা হলো বৃদ্ধা মা আর ছোট্ট বাচ্চাটার, ওরা অবুজ তো সামলে উঠতে একটু সময় লাগবে। আর মিডিয়াগুলো হা করে বসে থাকে এরকম মুচমুচে খবরের অপেক্ষায়। প্রত্যেক চ্যানেল অন্তত দু'দিন আমাকে সামনে রাখবে, ব্রেকিং নিউজ করবে। দশ দিন সমানে টক-শো-তে তর্ক - বিতর্কের তুফান উঠবে। আমি মহান হয়ে থাকবো। চ্যানেলের টি-আর-পি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। আমার অসহায় বৃদ্ধা মাকে কোন চ্যানেল টানতে টানতে নিয়ে যাবে। অসহায় মহিলার চোখের জলের বিনিময়ে যতি চ্যানেলের টি-আর-পি আর একটু বাড়ে। তবে এই অফার আমার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত থাকবে না। এর মধ্যে চ্যানেল অন্য কোন ব্রেকিং নিউজ পেয়ে যাবে। আর মানুষের দুর্বল স্মৃতি থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবো আমি।

আর বকতে ভাল লাগছে না বস্, চলো বাইরে বেড়িয়ে দেখি, কাউকে পাওয়া যায় কিনা ? ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছি, কোন টিফিনের ব্যবস্থা নেই, কোন ব্যবস্থা এখানে ঠিক নেই! ভাবা যায়, যমপুরীর মত জায়গায় এই পরিষেবা ! হাজার বদনাম থাকলেও , মর্ত্যের পরিষেবা ঢের ভালো।
তা বস্, তুমি এখানে কেন? তোমার গল্পটা একটু বল।
— আমার গল্প অতি সাধারণ। পরিবার বলতে আমার স্ত্রী আর দুটি ছেলে মেয়ে। পি ডবি-উ ডি অফিসের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্রস্থ বেতন। তবে সংসারের অভাব আমার কোনদিন কাটতো না।
ছেলে মেয়েরা শহরের নামি স্কুলে পড়ে। ওঁদের জন্য নিজস্ব গাড়ি আছে। আমার স্ত্রীর বাস - ট্রেনে চড়তে সম্মানে লাগে, তাঁর জন্যও গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। মাস মাইনের একটা বড় অংশ চলে যায় ফ্ল্যাটের লোনের কিস্তিতে, বাকী টাকার মধ্যে লোনের কিস্তি, ড্রাইভারের মাইনে, ছেলেমেয়েদের স্কুলের ফি, প্রাইভেট মাষ্টার, এল-আই-সির প্রিমিয়াম, বাকী টাকার মধ্যে সংসার খরচসহ অন্যান্য খরচ। গিন্নীর বহুদিনের শখ একটা হীরের নেকলেস। সে আর হয়ে ওঠেনি। ছেলে মেয়ের অনেক ন্যায্য আবদার পূরণ করতে পারিনি। এই টানাটানির মধ্যেও একটা অনাথ আশ্রমে প্রতি মাসে কিছু টাকা দিতাম। এই টাকার কথা কোনদিন

আমার গিন্নীকেও জানায়নি। হাত খরচের নাম করে এই টাকাটা রাখতাম।
— তোমার হাতখরচ চলতো নিশ্চয়। এধার - ওধার করা টাকায়। পি-ডবি-উ-ডি অফিসের ঝাড়ুদাররাও নাকি লাখপতি হয়ে যায়। আর তোমার .....।
— আর বলোনা ভাই, ঐ এধার ওধার না করতে পেরেই তো মরতে হলো। আর আমার তেমন কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই, নেশা-টেশাও করিনা। আর অফিসের কোন সুন্দরী কলিগও আমার গায়ে ঘেসা-ঘেসি করেনা। আমি অফিস কিংবা বাড়িতে যতটা সম্ভব পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করতাম।
কত কনট্রাক্টর কতভাবে আমাকে টলাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, আমার এই স্বচ্ছ ইমেজই অফিসের অন্যদের কাছে আমাকে শত্রু বানিয়েছে।
যার ফলে অফিসের সবাই আমাকে ফাঁসানোর সদা চেষ্টা করেছে। জীবনে একবারই ওদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছি। ঐ একবারই জীবনে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছি। এই এক ভুলেই আমার মরণ ডেকে আনলো।

এক অনাথ আশ্রমের পাঁচতলা বিল্ডিং এর কাজ সবে শেষ হয়েছে। সরকারী অনুদানে তৈরী বিল্ডিং। বিল্ডিং তৈরীর সময় কনট্রাক্টার এত বাজে মেটিরিয়াল দিয়েছিল, যেটা কোনভাবে অনুমোদন যোগ্য ছিল না। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ঐ প্রোজেক্টের দায়িত্বে ছিলাম। প্রায় এক বছর আটকে রেখেছিলাম। বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসতে থাকে, অদৃশ্য চাপ। কনট্রাক্টারের হাত অনেক লম্বা। পারিবারিক নিরাপত্তার অভাববোধ এবং অনাথ আশ্রমের কমিটির অনুরোধে আমি বিল্ডিং ব্যবহারের ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।
বিল্ডিং চালু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ঐ বিল্ডিং এর পাঁচতলার একটা অংশ ভেঙে পড়ে, চারজন অনাথ শিশু মারা যায়। এই ঘটনায় চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বিভিন্ন চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ হতে থাকে। বাধ্য হয়ে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আমাকে শোকজের চিঠি দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে আমাকে ছুটিতে পাঠানো হয়। ফাইনাল তদন্তের রিপোর্ট আগামী মাসে বের হবে। এমত অবস্থায় আমার পরিবারও আমাকে সন্দেহ করতে থাকে। আমি জানতাম আগামী মাসে ফাইনাল রিপোর্ট অবশ্যই আমার বিরুদ্ধে যাবে। আমার চাকরি চলে যাবে। আমার পরিবারকে নিয়ে সকলে তামাশা করবে, এ অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না। গত পরশু অফিস থেকে বের হওয়ার আগে আমি অফিসের ফাইলে যাবতীয় কাগজপত্রের কপি - গ্রায়েচুটি, পি.এফ, এল-আই-সি, ফিক্স ডিপোজিট ইত্যাদির একটি কপি অফিসে আর আসল কপি বাড়ির আলমারীর ফাইলে সাজিয়ে রেখেছি। গতকাল ভোর রাতে রকেট সার্ভিসের একটা নতুন গাড়িতে চাপা পড়েছি। সবাই ভাববে মর্নিং ওয়াকের সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে ইঞ্জিনিয়ার মারা গেছে। এটা নিশ্চয় দুর্ঘটনার কেস হবে। আত্মহত্যার প্রশ্নই উঠবে না। আমার চরম শত্রুরাও আমার বাড়ীতে ফুল নিয়ে এসে আমার স্ত্রীকে শান্ত্বনা দিচ্ছে, কত সহানুভূতি দেখাচ্ছে। রুমালে চোখ মুচছে, আহা, কি নাটক ! আমার মৃত্যুর পর অনাথ আশ্রমের বিল্ডিং ভাঙার তদন্তের ফাইল অতল সমুদ্রে ডুবে যাবে। আর কোনদিন ঐ তদন্তের ফাইনাল রিপোর্ট বের হবে না।
— আরে বস্, ঐ দেখ যমদূত আসছে টলতে টলতে। সার্ভার ঠিক হলো মনে হয়।

নবীন বরণ

- মালা তালুকদার

আজ কলেজে ২৫শে বৈশাখ আর নবীন বরণ দু'দুটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অনেক স্টুডেন্ট এসেছে, সবার মধ্যে যেন এক দারুণ এক্সাইটমেন্ট। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী তারপর নবীন বরণ। সবার আনন্দে কলেজটা যেন গমগম করছে। মনে হচ্ছে আনন্দের বাজার বসেছে। সবার এই ব্যস্ততা আর হৈ-চৈ এর মধ্যে হঠাৎ আমার একজনের দিকে চোখ পড়ল। সে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমি ঠিক তাকে বুঝতে পারছিলাম না। তাই একটু এগিয়ে তার কাছে গেলাম, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে দেখলাম তার দু-চোখে জল ছলছল করছে। আমার মনে হল সে যেন না পাওয়া অনেক কিছু পেয়ে গেছে। আমি নিজে থেকেই যেচে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার চোখে জল কেন? সে বলল আজ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন 'স্বাধীন আকাশের মুক্তপাখি"। আমি বললাম এমনটা ভাবার কি বিশেষ কোন কারণ আছে? সে বলল হ্যাঁ আমার জীবন থেকে তিনটে বছর নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক এমনই একটা দিনে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এইদিনে আমার বিয়ে হয়েছিল। সম্বন্ধটা পিসি এনেছিল। পিসির বাড়ির কাছেই ছিল তাদের বাড়ি। এক প্রকার প্রতিবেশী বলা যেতে পারে। তার নাম 'সৌম্য রায়'। তার পরিবারে বাবা, মা আর বোন ছোট পরিবার। সৌম্য একটা বেসরকারী কোম্পানীতে চাকরি করে।

আমার মা বলল ওতো এখনো ছোট। আর তাছাড়া ওর তো পড়াশুনা শেষ হয়নি। হঠাৎ পিসি বলে উঠলো মেয়ে মানুষের অতো বেশি পড়াশুনা করে কী হবে? মা বলল ওর সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও আরও পড়তে চায়। আর গানটাও ছাড়তে পারবে না। পিসি বাবাকে বলল ছোটন তোর মেয়েকে সৌম্য মাথায় করে রাখবে। পড়াশুনা শেখাবে আর গানও করতে দেবে। সৌম্য বাবাকে কথা দিলো।

দিন তারিখ সব ঠিক হয়ে গেল, পরীক্ষার পরেই বিয়ে। পরীক্ষা শেষ হতেই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম। কিছুদিন যাওয়ার পর থেকেই আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমায় একটু একটু করে বুঝিয়ে দিতে লাগলো যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোন আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, ইচ্ছা এগুলোর আর কোন মূল্য থাকে না। বিয়ের আগে বাবাকে দেওয়া কথা সৌম্য মনে রাখলো না। আমার জীবনে ঘন কালো মেঘের মত অন্ধকার নেমে আসলো। গান করতে দেবে বলেছিল তাই বাড়ি থেকে আসার সময় হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসেছিলাম শ্বশুরবাড়িতে। শ্বাশুড়িমা বলল ওটা আর কোন কাজে আসবে না, ওটা বিক্রি করে দাও। কথাটা শুনে আমার মনে হল পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। প্রতিবাদ করায় অত্যাচার শুরু করে আমার ওপর। দু'দিন না খাইয়ে রেখেছিল।

হঠাৎ একদিন বাবা আসে। আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে বাবা

ওখান থেকে আমায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। তখন আমার শ্বাশুড়িমা আর সৌম্য বলে ওঠে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছেন যান কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। বাবা কিছু না বলেই ওখান থেকে আমায় নিয়ে চলে যায়। কিছু দিনের মধ্যে আমার আর সৌম্যর ডিভোর্স হয়ে যায়।

এইভাবে আমার জীবনের তিনটে বছর নষ্ট হয়ে যায়। আজ সেই দিন। আজ জীবন আমায় একটা নতুন পথের দিশায় এগোতে বলছে আর আমি এগোতে চাই .....।

ওর জীবনের এই চরম মুহূর্তের ঘটনার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার কানে ভেসে আসে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সকল নবাগত স্টুডেন্টদের 'হলে' যাওয়ার জন্য ডাকছে। আমি ওর হাত ধরে তার নতুন জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করলাম। (হলে নিয়ে গেলাম) আমি ওকে বরণ করলাম। ওর নাম নীলাঞ্জনা —।

টেরাকোটা

- রবিশংকর সেন

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তার ধারে থাকা ফুট চারেকের লম্বা টেরাকোটার ঘোড়াটা দেখে সতীশবাবু আর লোভ সামলাতে পারলেন না। দরাদরি করে চারশো টাকার ঘোড়াটা দেড়শো টাকায় রফা করে বাড়ী ফিরলেন। যদিও দোকানী সেটাকে খুলেটুলে ভালো করে প্যাকিং করে দিয়েছিল, তবুও অতবড় জিনিষটা বাড়ী পর্যন্ত টেনে আনাতো কম ঝকমারি নয়। কিন্তু বাড়ী পৌঁছে সেটাকে জোড়া দিয়ে খাড়া করতেই যেন সব পরিশ্রম মুছে গিয়ে মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। ভারী সুন্দর জিনিষটা। টেরাকোটার ঘোড়া তো অনেকের বাড়ীতেই আছে। তাই বলে এত্তোবড়ো ! দোকানিটারও যেন এটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বাবু এমন জিনিষ আমি কখনো সখনো বানাই। আসলে যতটা পরিশ্রম হয়, দামে তার পড়তা পড়ে না। তবুও মনের তাগিদে বানাই। সাবধানে রাখবেন কিন্তু।

সত্যিইতো, এর মূল্য দেবার লোক কোথায় ! সতীশবাবুও কি পেরেছে তার যোগ্য দামম দিতে! হয়তো বিক্রি হচ্ছে না বলেই লোকটা দিতে বাধ্য হল। কোথায় কোথায় টেনে নিয়ে বেড়াবে? ঘোড়াটা দেখে নীলাও বোধ হয় খুশী হয়েছিল। তবুও মাসের শেষে এতগুলো টাকা! নীলা বলে, কি দরকার ছিল এতগুলো টাকা খরচ করার। তবুও নীলা যে একদম অখুশী হয়নি তা তার কথাতেই ধরা পড়ে।

তবে সব থেকে বেশি খুশী হয় মালতী। আর মানাই বোঝে কি না বোঝে, শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কাছে যাবার সাহস হয় না। মালতী এ বাড়ীর কাজের মেয়ে। বয়স চৌদ্দ - পনের। মানাই-এর জন্মের পর থেকেই সে এ বাড়ীতে। বড় ভালো মেয়ে। এ বাড়ীটাকে আপন করতে তার দেরী হয়নি। সতীশবাবুকে সে বাপী আর নীলাকে ডাকে মানি বলে। মানাই তার ভাই। মানাইকে সাথে নিয়ে সে ঘোড়াটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। ভারী চমৎকার হাতের কাজ। এমন সময় সতীশবাবু পেছন থেকে বলে, ঘোড়াটা পছন্দ হয়েছে মালতী ? নিবি?

হ্যাঁ - আচমকা উত্তরটা মুখ ফুটে বেরোতেই মালতীর খেয়াল পড়ে ভাইয়ের কথা। সে বলে, আমাকে ঘোড়াটা দিবি ভাই?

মানাইও সাথে সাথে বলে দেয় হ্যাঁ। তারপর খিলখিল করে হেসে ওঠে। আর সেই দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মালতী ফিরে যায় তার অজগ্রামের বাঁশ-মাটি-টালির তৈরী আসল বাড়ীটায়। সেই মাটির ঘরে আরও একটা মাটির জিনিষ। আরও একটা জিনিষও তো আছে সেখানে, তার একরত্তি নিজের ভাই। মানাইয়ের ঘরে তো কত রকম খেলনা পুতুল। তার ভাই গুলের তো কিছুই নেই। সে এটাকে পেলে .....। হ্যাঁ বলার জন্য ঝাপসা দৃষ্টির পেছন থেকেই সে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় মানাইকে।

কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা জরুরী কারণে সতীশবাবুর বদলীর অর্ডার আসে।

যেতে হবে সুদূর গুজরাটে। সতীশবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, ওখানে কি মালতীকে নিয়ে যাবে? নীলা বলে, গেলেতো ভালোই হতো। কিন্তু ওর বাড়ীর লোক কি বলে তারপরে ভেবে দেখতে হবে।

মালতীর বাড়ীর লোকেরা রাজী হয় না। এটাই স্বাভাবিক। মালতীর বাবা খবর পেয়ে এসে সতীশবাবুর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলেন, দাদাবাবু, আমি জানি, আপনারাই ওর বাবা মা হয়ে উঠেছেন। তবু বলি, বাবা হিসাবে আমি ওর বিয়ে দেবার জন্য একটা ভালো পাত্রও জোগাড় করে ফেলেছি। এর মধ্যেই আমাদের আসতে হতো। এবার .... কি আর বলবেন সতীশবাবু। গ্রামের যেটা রেওয়াজ। ওরা নাবালক - নাবালিকা বা বিয়ের আইন কানুন কিছু বোঝে না। গায়ে গতরে বেড়ে উঠলেই যেন মেয়েরা ওদের কাছে বোঝা হয়ে ওঠে। অবশ্য ওই মানুষগুলোরই বা দোষ কী! গ্রাম্য আবহাওয়ায় যদি এই বয়সের সুপ্ত তাড়নায় ওরা কোন ভুল করে বসে, তাকে সামাল দেবার মতো ক্ষমতা কোথায় ওদের। সেই দায়টুকু অন্যের কাঁধে ঠেলে দেবার জন্যই যেন আজও প্রাণপণ চেষ্টা করে চলা।

সব শুনে মালতী কেমন যেন গুম মেরে যায়। মনের কথা কাউকে খুলে বলতে পারে না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাসফাঁস করতে থাকে। আর সেই সুযোগে সময় যেন তাকে ঠেলতে ঠেলতে খাদের কিনারার দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

সতীশবাবু মালতীর বাবাকে বলে, আপনাকে অনুরোধ করবো মালতীর বিয়ের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন। মালতী এখানে যে পড়াশুনা করছে সেটা চালিয়ে গেলে ভালো হয়। ওকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি করতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সরকারই আপনাদের সবরকম সাহায্য করবে। আমরা হয়তো বছর দু'য়েক বাদে ফিরবো। এ কদিন যদি আপনারা মালতীর পড়াশুনাটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে আপনাদেরই মঙ্গল, আপনার মেয়ের মঙ্গল। আমি আমার কথাটুকু বললাম। সামনের সোমবার আমরা যাব। ঐ দিন আপনি এসে মালতীকে নিয়ে যাবেন। আর মালতীর জন্য আমি কিছু টাকা দিয়ে যাব। আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করবেন।

একটা গাড়ীতে সব মালপত্র ওঠানো হয়ে যায়। মালতীর বাবা সকাল-সকাল এসে সব ঠিকমতো গুছিয়ে দেয়। মালতী দরজার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকে। মানাইও চুপচাপ তাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের বাপী আর মানি ভীষণ ব্যস্ত। সব কাজ সারা হয়ে গেলে সতীশবাবু, মালতীর বাবাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একতাড়া নোট গুজে দিয়ে বলেন, আমার কথাগুলো মনে রাখবেন। আরও মনে রাখবেন যে, মালতী কিন্তু আমারও মেয়ে। জল চলে আসে দু'জনের চোখেই। সব ভুলে দুই বাবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যেন পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে খুঁজতে থাকে।

ওদিকে নীলা ডেকে নেয় মালতীকে। নিজের হাত থেকে দু'গাছা সোনার চুড়ি খুলে পরিয়ে দেয় মালতীর হাতে। কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু মালতীর মাথাটা প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে। ওদিকে কি এক ভয়ে মানাই তাকে মা'কে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে কাঁদতে থাকে।

বিদায়ের পরিবেশটা এতই আবেগ ঘন হয়ে ওঠে যে ওরা যেন কেউ কাউকে

ছাড়তে চায় না। এক অব্যক্ত ভয়ে যন্ত্রণায় অবুঝ মানাইও কাঁদতে পারে না। শুধু তার দু'চোখের কোল বেয়ে ঝরতে থাকে জলের ধারা।

বিদায় নেবার মুহূর্তে সতীশবাবুর মনে হয় যে, একটা কাজ তো বাকী থেকে গেছে। সে সবাইকে একটু অপেক্ষা করতে বলে মালতীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের সেইখানটাতে। যেখানে টেরাকোটার বিশাল ঘোড়াটা গাড়ীতে ওঠার ছাড়পত্র না পেয়ে একা একা পড়ে আছে এক অসীম শূন্যতার মাঝখানে। সতীশবাবু সেটাকে দেখিয়ে মালতীকে বলেন, একদিন বলেছিলি না তুই এটাকে নিবি! নিয়ে যাস্ । এটা তোর জন্যই রেখে গেলাম। বলতে বলতে সতীশবাবু ছিটকে পালিয়ে এসে গাড়ীতে উঠে বসেন। গাড়ীটাও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাড়ীটা চলে গেলে মালতী আর তার বাবা, দু'জনে এসে দাঁড়ায় ঘোড়াটার সামনে। মালতীর বাবা বলে, চল্ মালতী, এটাকে আগে বাইরে নিয়ে রাখি। কিন্তু মালতীর বাবা খেয়াল করেনি যে, এরমধ্যেই কখন মালতীর চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে সেখানে অভিমানের চাপা হল্কা বইতে শুরু করেছে। মালতী সেই প্রবল অভিমানে মুহূর্তের মধ্যে এক প্রচন্ড ধাক্কা মারে সেই নিস্প্রাণ বস্তুটার গায়। ঘোড়াটার পল্কা অস্তিত্ব সেই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে উল্টে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আর তার পরপরই তার হতভম্ব বাবাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে মালতী ঘর থেকে ছিট্কে বেরিয়ে এসে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে সেই পথ ধরে, যে পথে কিছু আগেই তার বাপী, মানি আর ভাইকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে গাড়ীটা।

তারকেশ্বরের মহিমা

- চিত্ত সরকার

আমি, নিতাই, বাবলু, সুভাষ, তারক, পাচু, কটা, ভজা, শ্যামল, বিনয়, এই আমরা ১০জন বন্ধু বয়েস হবে ১৫ আ ১৬ বৎসরের মধ্যে, ভজা, শ্যামল, বিনয় পাশের পাড়ায় থাকে, আমি, নিতাই, তারক, পাচু এই চারজন থাকি ৬নং ছকু খানসামা লেন, কোলকাতা - ৯, বাবলু, সুভাষ, কটা এই পাড়ার অন্য বাড়ীতে থাকে। এই ১০ জনের দলের মধ্যে কয়েকটা কথা প্রচলিত ছিল যে, নিতাই সবার সাথে মিশতে জানত, সুভাষের বেশি সাহস ছিল, বাবলু খুব শান্ত, কটার মাথায় বদবুদ্ধি, ভজা বোকা চালাক, আমি পেয়েছিলাম বুদ্ধি আবিষ্কার করা ও সমস্যা হলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমাধান করা এমন একটি দপ্তর।

শিয়ালদহের কাছে উত্তর দিকে সূর্য সেন বাজার তার কাছে ছিল প্যারামাউন্ট সিনেমা হল, বর্তমানে নাম পাল্টে রাখা হয়েছে জগৎ সিনেমাহল। এই সিনেমা হলের পিছনের পাড়াটাই আমাদের পাড়া ছকু খানসামা লেন। এই সময়ে এই পাড়াতে বেশ কয়েকজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন, যেমন শিক্ষার দিকে, স্বাস্থ্যের দিকে ও ফুটবল খেলার দিকে, যাদের নাম গোটা বাংলার মানুষ জানতো।

একটা নাম না লিখলেই নয়, বাংলা সিনেমা জগতে উত্তম কুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম কে না জানে, দাদাসাহেব ফাল্কে পুরষ্কার প্রাপ্ত মহান শিল্পী সৌমত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনটা এই পাড়াতেই কেটেছে।

এবার মূল বিষয়টাতে ঢুকে পড়লাম, শ্রাবণ মাস পড়েছে। তাই ঘটে গঙ্গার জল ভরে শ্যাওড়াফুলি থেকে হেঁটে হেঁটে বাঁক কাঁধে নিয়ে তারকেশ্বর যাওয়া হয়, পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য। এই মাসে লাখ লাখ লোক যাবে তারকেশ্বরে, তবে কেন যাবে বা যাচ্ছে, গেলে কোন ভালো ফলাফল হবে - কি হবেনা এই নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। ভজা বাদে আমরা নয়জন, পর পর দুইবার গেছি তারকেশ্বরে, এবার ভজা যোগ হবে পূণ্য সঞ্চয় করতে।

সবাই সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা গেঞ্জি ও লাল গামছা সবই নতুন কিনে নিলাম, আমাদের কাঁধে নেওয়ার বাঁক আছে, বাঁশ দিয়ে বানানো, শুধু ভজার নেই, যাবার সময় শ্যাওড়াফুলি থেকে কিনে নিতে হবে। সবার বাড়ীতে মানে এই ১০ জনের বাড়ীতে নিরামিষ রান্না হল, দুপুরে খাবার পর্ব শেষ করে, নতুন সাদা পোশাক পরে কোমরে লাল গামছাটা বেঁধে মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বিকেল বেলা রাস্তায় বেড়িয়ে জড়ো হলাম। ভজা, শ্যামল, বিনয় আমাদের পাড়াতে অল্প কিছু সময় আগে এসেছে, আমাদের দেখার জন্য রাস্তায় ভিড় জমে গেল। জানালা দিয়ে অনেকে উঁকি মেরে দেখলো, একজন পড়শি বললেন, ছেলেরা এখনো ছোট, ১৫,১৬ বছর বয়স হবে, ওদেরকে যেতে দিচ্ছ, তোমাদের চিন্তা হচ্ছে না।

একজন মা বললেন চিন্তা তো হয় দিদি, কিন্তু যাচ্ছে তো ভগবানের বাড়ী, বারণ করব কী করে ? অন্য একজন মা বলেন, যার বাড়ীতে ওরা যাচ্ছে, তিনিই ওদেরকে রক্ষা

করবেন। আমরা মিছি মিছি ভাবব কেন? আমরা ১০ জন সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে পাড়ার বাইরে চলে এলাম।

শিয়ালদহ থেকে ট্রাম গাড়ীতে করে হাওড়া এলাম, হাওড়া থেকে ট্রেনে করে শেওড়াফুলি এলাম। রবিবর ছিল। তাই ট্রাম ও ট্রেনে ভিড় কম ছিল। যখন শেওড়াফুলি গঙ্গার ধারে এলাম, তখন সন্ধ্যা হতে চলেছে, এখানকার বাজার হতে দুটো বড় ঘট যাতে দুই লিটার করে জল ধরে, আর দুটো ছোট ঘট, যাতে হাফ লিটার করে জল ধরে। ফুলের মালা, কাদা, ধূপকাঠি, প্রত্যেকেই কিনে নিলাম। নিতাই ভজাকে একটি বাঁশের তৈলী বাঁক কিনে দিল। একজন একজন করে সবাই গঙ্গায় নেমে স্নান করে যার যার ঘটগুলি গঙ্গার জল দিয়ে ভর্তি করে নিলাম, এই জলটাই তারকেশ্বরের মাথায় ঢালতে হবে, এখানে অনেক মানুষ রয়েছে আমাদের মতো, তারাও তারকেশ্বরে যাবে। এখানে বাঁক রাখার জন্য উঁচু করে বাঁশ বাঁধা আছে। ঐ বাঁশের উপরে বাঁক রেখে তার দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে শিকে বাধা আছে। সেই শিকের মধ্যে প্রথমে জল ভরা বড় ঘট বসিয়ে তার মুখে সরা দিয়ে তার উপরে ছোট জল ভরা ঘট বসিয়ে দিলাম এবং মাটি দিয়ে ঘটের মুখগুলি এমনভাবে বন্ধ করে দিতে হয় যাতে সরাগুলি সরে যেতে না পারে আর ঘট থেকে জল পরে যেতে না পারে। এরপর ফুলের মালা দিয়ে বাঁকটাকে ভালো করে সাজিয়ে দিলাম, এমনভাবে ঘুঙুর বেঁধে দিলাম যাতে হেঁটে যাবার সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়, ধূপকাঠি জ্বেলে ঘটের মুখে, মাটিতে বসিয়ে দিলাম এইভাবে বাঁক সাজাবার কাজ শেষ হল।

আমরা ১০জন নিজেদের মধ্যে কথা সেরে নিলাম। এরপর যার যার বাঁক কাঁধে নিয়ে তারকবাবার নামে ধ্বনি দিয়ে একসাথে ১০জন শেওড়াফুলিকে অন্তিম বিদায় জানিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, সারা রাত এই হাঁটার কাজ জ্বলবে।

বেশ কয়েক মাইল হাঁটার পরে পৌঁছে গেলাম ডাকাত কালী বাড়ী, নামটা সবারই শোনা। হয়তো সবার যাওয়া হয়নি। কেউ কেউ গেছেন বটে। এখানে বাঁক রাখার জন্য উঁচু করে বাঁশ বাঁধা আছে। এভাবে তারকেশ্বর পর্যন্ত এই রাস্তার পাশে পাশে মাঝে মাঝেই বাঁশ বাঁধা আছে। এই ডাকাত কালীবাড়ীতে এখন ডাকাত নেই। তবে মন্দির আছে পুজো হয়। এখানে ছোট এক ঘট জল ঢালতে হবে, বাঁশের উপরে বাঁক রেখে ছোট একটা জলের ঘট নিয়ে জল ঢেলে এলাম, আর তিনটি ঘট রইল।

রাত ৯টা বাজে। এখন সবার খিদে পেয়েছে। এখানে নিরামিষ খাবারের অনেক দোকান আছে। তীর্থযাত্রীরা অনেকেই খাচ্ছে, আমরাও লুচি তরকারী খেয়ে - যে যার নিজের নিজের পয়সা দোকানদারকে দিয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে তারকবাবার নাম করে হাঁটা শুরু করলাম।

এবার হেঁটে যাব কাশীবিশ্বনাথে। ১০-১২ মাইল দূরত্ব হবে। এর মাঝে দাঁড়াবার আর কোন জায়গা নেই। ফলে পুরো রাস্তাটা বাবার নামে ছড়ার বোল বলতে বলতে আনন্দের সাথে যাওয়া হবে, ছড়াগুলি এইরকম যেমন - ভোম ভোম তারক ভোম, ভোলে বাবা পার করেগা, পাগলা বাবা পার করেগা, জটা বাবা পার করেগা, লোকনাথ বাবা পার করেগা, ভূতনাথ বাবা পার করেগা, এইভাবে ধ্বনি তুলে তালে তালে ছড়াগুলি বলতে হয়।

ডাকাত কালীবাড়ী থেকে প্রায় ৫ মাইল এগিয়ে গেছি, সেইসময় ভজা আনন্দের সাথে হাসতে হাসতে একটি কথা জানালো আমাদের। ভজার কথাগুলি এইরকম, ডাকাত কালীবাড়ীর দোকানদারটা খুব বোকা। কেনরে ভজা, দোকানদার কি বোকামি করেছে, নিতাই জিজ্ঞাসা করে। ভজা বলে - তোরা যখন খাবারের দাম দিচ্ছিলি, আমি তখন দাম না দিয়ে চালাকির সাথে বেড়িয়ে এসেছি, ধরতেই পারলনা।

বাবলু তুই কাজটা ঠিক করিস নি ভজা। কটা - কত টাকা বাঁচালি ভজা। সাত টাকারে। নিতাই - তুই মিথ্যে বলছিস ভজা। মাইরি বলছিরে, সাত টাকা বাঁচলো আমার। এই টাকায় এক মাসে সিনেমা দেখতে পারবো। সুভাষ - ঐ শালাকে ধরে নিয়ে আয়তো আমার কাছে। ওর কোমরে একটা লাথি মারি। ভজার কথা শুনে আমার মাথায় বজ্রঘাত হল। জিজ্ঞাসা করি এই ভজন তুই কি সত্যি বলছিস, নাকি আমাদের বোকা বানাচ্ছিস। নারে চিত্ত আমি খাবারের দাম দিইনি।

খাবারের দাম দিতে ভুলে গেছিস এইতো। না না আমি ভুলে যাইনি। ইচ্ছে করেই দাম দিইনি। সাত টাকা বাঁচলো তো। ভজার কথাগুলি আমার বুকে বিঁধলো। তুই এমন কাজ কেন করলিরে ভজা। তুই পূণ্য অর্জন করার জন্য মনটাকে পবিত্র করে কাঁধে বাঁক নিয়ে এতো কষ্ট করে চলেছিস অথচ মনের মধ্যে পাপ ঢুকিয়ে নিলি কেন, বাবা তারকনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে নে, উনি বড় দয়ালু, নিশ্চয় ক্ষমা করে দেবে। ভজা আমাদের কারো কথা কানে নিল না, কোনরক অনুতাপ নেই। আরো আনন্দের সাথে বলে ছাড়তো যা হবার হয়ে গেছে। কতজনা কত বাজে কাজ করে, আমিতো মাত্র সাত টাকা মেরেছি। মনে মনে বললাম হে ভগবান ভজাকে ক্ষমা করে দাও, ও তোমার অবুজ ছেলে, না বুঝে ভুল করেছে।

এরপর তীব্র গতিতে পথ চলা শুরু হল। গতি কারো বেশি কারো কম। আগে পিছে হয়ে গেলাম, আগে গেল নিতাই ও সুভাষ। তারপরে আমি আর বাবলু, বাকিরা আরো পিছনে রইল। কাশীবিশ্বনাথ এখনও দূরে, হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথায় কন্‌কন্‌ করছে, দেখে মনে মনে ভাবি ঐতো দূরে আলো দেখা যায়। ঐখানে গেলে একটু বিশ্রাম করা যাবে, যত এগিয়ে যাই আলোও পিছিয়ে যায়, রাস্তা আর কমে না, তবে রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে। পায়ে ব্যথা থাকে ঠিকই, কিন্তু মন থাকে আনন্দে ভরা। মনে হয় স্বর্গের পথে চলেছি। পথ চলতে চলতে কাশী বিশ্বনাথে পৌঁছে গেলাম। নিতাই সুভাষ আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে পাঁচু ও তারক, তারপরে একে একে সবাই এলো, সবার পিছনে এলো ভজা। ভজার বাঁকে বড় ঘটটা নেই। নিতাই - কিরে ভজা তোর বড় ঘট কোথায় ? কাকে দান করলি ? কটা - ও করবে দান, তাহলেই হয়েছে, কাঁধে ভার বইতে কষ্ট হচ্ছে, তাই হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছে। সুভাষ - ওকে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে, ওর কোমরে একটা লাথি না মারলে ও সোজা হবে না। আমি বললাম - ভজন তোর একটা বড় ঘট কি হল বল। ভজা - বলছি, এক শালা মাড়োয়ারীর বাচ্চা, ইয়া বড়া বড়া দুটো পিতলের কলশ কাঁধে নিয়ে চলেছে তার সাথেই আমার টক্কর হয়ে গেল, ব্যস ঘট ফিনিশ, জল রাস্তায় শুয়ে পড়লো বাঁকটা নিতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল, কাঁধ ব্যথা হয়ে গেছে, এখন কিছুটা হাল্কা হয়েছে।

একে একে আমরা সবাই ভজাকে উপদেশ দিলাম, কথাগুলি ভজা কানেই নিল না। কাশী বিশ্বনাথে এখন মাঝরাত্রি, এখানে বিশ্রাম নিয়ে, অন্য কাজ গুলি সেরে কাঁধে বাঁক নিয়ে বোম বোম ভোলে বোম ধ্বনি দিয়ে আমরা সবাই একসাথে হাঁটা শুরু করলাম। একটু একটু করে হাঁটার গতি বাড়তে লাগলো। রাস্তার দুই পাশে ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত বাড়ীঘর অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। আবছা আবছা যা কিছু দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ঐগুলি দৌড়ে দৌড়ে আমাদের পিছনে চলে যাচ্ছে বেশ লাগছে।

লম্বা মত এই পথটার লেজের দিকটা পিছনে ফেলে পৌঁছে গেলাম নন্দ কুটিরে। রাত তখন ভোর হয় হয়। বাঁক রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই পাশাপাশি বাঁক রেখে দিয়ে প্রতিদিনের মতো সকালের জরুরী কাজটা করে নিয়ে, স্নান করে সবাই হাল্কা হলাম। সূর্য ওঠার আগে তার লালচে আভাকে আকাশ পথে পাঠিয়ে দিয়েছে, সোমবারের ভোরকে অভিনন্দন জানিয়ে সবাই কাঁধে বাঁক নিতে শুরু করলাম।

হঠাৎ ভজা চেঁচিয়ে উঠল, আমার বাঁক কই ? সবাই কাঁধের বাঁক নামিয়ে ভজার বাঁকটা খুঁজতে লাগলাম। তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পেলাম না। ভুল করে যদি কেউ নিয়ে যায়, তাহলে তার বাঁকটাতো থাকবে। অতিরিক্ত কোন বাঁকও নেই। অর্থাৎ ভজার বাঁক উধাও। এবার ভজার মুখে মেঘ দেখা দিল। সবাই বললাম চিন্তা করিস না ভজা, এখন আমরা লোকনাথের মন্দিরে যাব। ওখানে জল ভরা ঘট কিনতে পাওয়া যায়। নন্দ কুটিরকে টাটা জানিয়ে সবাই হাঁটা শুরু করলাম।

ক্লান্ত শরীর, পা মাঝে মাঝে অভিমান করতে চাইছে। ভোরের আলোতে এবার আশে পাশের সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, সূর্য এখনো ওঠেনি, তেব তার লাল পাখা, গোটা আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। সারা রাত্রে ঘুম নেই, ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় যুগল নয়ন কিছু বলতে চায়, সব বাধা কাটিয়ে, গুটি গুটি পায়ে পৌঁছে গেলাম লোকনাথ বাবার মন্দিরে। এখানে ভজা এক জল ভরা ঘট কিনে নিল, সবাই জল ঢালার কাজ করলাম। বেশী দেরী করা যাবে না। সূর্যদেব ভিলেনের মতো হাসি দিয়ে একটু একটু করে উপরে উঠতে থাকে, রোদ বেশি হলে পথে হাঁটা যাবে না। সবাই খালি পায়ে হেঁটে এলাম, হেঁটে যাবো, ভজাকে বললাম আরো এক ঘট জল কিনে নে, তারকেশ্বরের জন্য। এরপর লোকনাথ বাবার অনুমতি নিয়ে, তারকনাথকে পাখির চোখ ভেবে এগোতে শুরু করলাম ১০ জন এক সাথে।

এত ঘন্টা হাঁটার প্রতিযোগিতা ছিল, কার আগে কে যেতে পারে, এখন হাঁটার ধরণটা পাল্টে গেছে, কে কত ধীরে ধীরে হাঁটতে পারে, কারণ পদযুগল পুরোপুরি বিদ্রোহ করেছে, সে আর গতি নিয়ে চলতে পারবে না, তাই হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে যেতে হবে, সূর্যের তাপ আলতো করে পিঠে হাত বুলাতে শুরু করেছে। যেন কাটা ঘায়ে লবণের প্রলেপ। এমনি করেই পৌঁছে গেলাম তারকেশ্বর, তারকনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে।

আমরা পৌঁছলাম, মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ভিতরে এখন পুজো হবে। দুই ঘন্টা পর আবার দরজা খুলে যাবে। তখন জল ঢালা যাবে, এখন বিশ্রাম পর্ব। এখানে বিশ্রামের জন্য জায়গা আছে। বিশ্রাম কক্ষে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়, না না গুঁতো খাওয়ার ভয় নেই, ও শ্বেত পাথরের তৈরী নন্দী মহারাজ। যাকে শিবের বাহক বলা হয়।

আমাদের জলের ঘটগুলি ওখানে একপাশে রেখে বিশ্রাম করা শুরু করেছি, কেউ বসে আছি, কেউ বা শুয়ে পড়েছে। ভজা শুয়ে আছে, এক ঘন্টা পরে সবাই উঠে পড়লাম। মন্দিরের দরজা খুলতে এখনও এক ঘন্টা বাকি আছে। তবুও উঠতে হল, কারণ ইতিমধ্যে দরজার নিকট থেকে লম্বা লাইন পড়ে গেছে, আমাদের ও লাইনে দাঁড়াতে হবে। ভজা ওঠার সময়ে ওর পা লেগে ওর জলের ঘট পড়ে গেল। এবং ভেঙ্গে গেল। ভজার চোখে এবার জল চিক চিক করছে, সবাই ওকে শান্ত্বনা দিলাম। ওখানেও জল ভরা ঘট কিনতে পাওয়া যায়। ভজা তাই কিনে আমাদের সাথে লাইনে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে ভজা ছিল নয়জনের পিছনে, লাইনে ভিড় বাড়ছে, পিছনদিকে অনেক দূর পর্যন্ত লাইন চলে গেছে। আমরা রয়েছি মন্দিরের অনেকটা কাছে, মন্দিরের দরজা খুলতে আর ১০ মিনিট বাকি, বুক কাঁপছে আনন্দে, লাইনে ঠেলাঠেলি পিছন থেকে চাপ আসছে। আর পাঁচ মিনিট বাকি প্রতি মিনিট এখন শিহরণ। পিছন দিক থেকে খুব জোরে একটা ধাক্কা এলো। লাইন থেকে ২০ জনের মতো ছিটকে গেল। তার মধ্যে ভজাও রয়েছে। কেউ কেউ লাইনে ফিরে এল, কেউ কেউ ফিরতে পারলো না। ভজার ঘট পড়ে গেছে। জল সব পড়ে গেছে। ভজাকে তো আমরা লাইনে ঢুকিয়ে নেব কিন্তু জল পাবে কোথায় ? বাবা তারকনাথের মাথায় ঢালবে কি ? হাউ হাউ করে কেঁদে দিল ভজা, আমি এখন কি করব, নিতাই ভেবেই পাচ্ছে না, কি বলবে ও ভজাকে। ভজাকে দেখে আমাদের মায়া হতে লাগলো। নিতাই ভজাকে বলে, তুই চিত্তকে জিজ্ঞাসা কর, চিত্ত যা বলে তাই কর। আমার কাছে এল ভজা, আমি শান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দ্যখ ভজা তোর মনের ব্যথাটা আমরা সবাই অনুভব করছি। ডাকাত কালীবাড়ীতে দোকানদারের সাথে তুই যে ব্যবহার করেছিস, তাতে বাবা তারকনাথ মনে কষ্ট পেয়েছে। তাই তোর জল উনি নেবেন না। তুই এখন এক ঘট জল কিনে, ঐ ষাঢ়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নি, জল ষাঢ়ের মাথায় ঢালবি। এতে ভগবান খুশি হয়ে তোকে ক্ষমা করে দেবে, পরের বছর এসে তুই নিশ্চয় বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে পারবি। আমার পরামর্শ মতো ভজা ঘট কিনতে গেল, এদিকে মন্দিরের দরজা খুলে গেল। লাইনে খুব চাপ রয়েছে। লাইন এগোতে লাগলো। যথাসময়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি ও নির্বিঘ্নে জল ঢেলে বেড়িয়ে আসি।

মন্দির থেকে বেড়িয়ে এসে আমরা ভজার কাছে যাই, ভজা অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখে একগাল হেসে বলল, আমার মনটা এখন হাল্কা লাগছে। মনে হয় বাবা তারকনাথ আমাকে ক্ষমা করেছে। ফিরে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ষ্টেশনের দিকে এগোচ্ছি, ভজা নিচু হয়ে রাস্তা থেকে কি যেন একটা তুলে নিল, কি তুলেছে দেখিনি। কিছু তুলেছে দেখেছি, ভজা নিজেই জানাল একটা ১০ টাকার নোট। কি করব এই টাকা দিয়ে। আমি বললাম টাকাটা হাতেই রাখ যা ভালো বুঝিস তাই কর। কিছুটা এগোতে একজন ভিক্ষুক দেখে মনে হয় উনি মুসলমান, দুটো পয়সা দেবেন, সকাল থেকে কিছু খাওয়া জোটেনি। বারে বারে এই কথাটা তিনি বলছেন, ভজা তার হাতে ১০ টাকার নোটটা দিল, আমরা সবাই দেখলাম, এরপর ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম।

স্রষ্টা

- প্রশান্ত পাল

লোকবসতির পরিবেশ থেকে কিছুটা দূরে আধাশহর এলাকায় রাস্তার পাশেই প্রতিদিনের মতো বাজার জমে উঠেছে। এমন সময় বছর চব্বিশ-এর সুন্দরী অবিবাহিতা লাজুক ও মার্জিত স্বভাবের একটি মেয়ে এক মুদি দোকানে এসে হাজির হল। ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় কেনাকাটার এক ফর্দ বের করে মৃদু হেসে দোকানীর হাতে দিল। পাশেই এক দোকানের বেঞ্চে বসেছিল কয়েকজন যুবক। একজনের মোবাইলে তখন বেজে উঠল - "একখানা মেঘ ভেসে এল আকাশে।" পাশের যুবক ৫০ টাকার নোট বের করে তার পাশের এক বন্ধুকে বলল একটু ঘনিষ্ট হয়ে প্রেমপ্রস্তাবটা শুনিয়ে আয়। বন্ধুটি দোকানে পৌঁছাতেই বেজে উঠল - "রূপসী দোহাই তোমার/ তোমার ওই চোখের পাতায়।" লজ্জায় মাথা নীচু করে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল।

আরেক যুবক দেশলাই কেনার বাহানায় শুনিয়ে গেল - "রূপ তেরা মস্তানা, প্যার মেরা দিবানা....."। লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া মেয়েটি দোকানের মাল নিয়ে ফিরে যেতেই পথে সাইকেল চালিয়ে একজন শোনাল - "ও কেন এত সুন্দরী হল -"। এমন সময় চলার পথেই মাঝবয়সী একজন কবির সান্নিধ্য পেয়ে মৃদু ইশারায় ভাব বিনিময় করে দু'জন এগিয়ে যেতে থাকল। সাইকেলের যুবকটি "কবিদাদা ভাল তো?" বলে বিদায় নিল। কবির সাথে কথা বলতে বলতে দু'জনে এগিয়ে যেতে থাকল।

কবি বলল ঃ বেশ ক'দিন ধরে বুঝতে পারছি এরা তোমাকে বিরক্ত করছে।

মেয়েটি বলল ঃ আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যতদিন যাচ্ছে এদের উত্যক্ত করার মাত্রা বাড়ছে। এখন তো মোবাইল ফোনের রেকর্ডিংকেও ব্যবহার করছে।

কবি ঃ আসলে বেকারদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা ভাবে জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে। মা বাবা কত ত্যাগ স্বীকার করে এদের বড় করে। প্রতিদানে এরা আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করে। বর্তমানে কাজের বাজারে পৌঁছাতে গেলে অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। নতুন কোন ভোকেশনাল ট্রেনিং নেওয়া যায়। কম্পিউটার শেখা যায়, কুটির শিল্পের ট্রেনিং নেওয়া যায়। কিন্তু অকর্মের ঢেঁকি এরা।

মেয়েটি বলল ঃ আসলে এদের লক্ষ্য শুধুমাত্র মুখস্থ করে বমি করা। এমন শিক্ষার ভিত আর কত ভাল হবে বলুন ?

কবি ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। বিষয়বস্তু আত্মস্থ করার শিক্ষা, আত্ম উপলব্ধির শিক্ষা, সত্যিকারের চরিত্রগঠনের শিক্ষা, দেড়শো বছর আগেই স্বামীজি বলে গেছেন, ওসব থেকে বর্তমানের যুবসমাজ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। (মেয়েটির মনে হল স্বামীজিই স্বয়ং কথাগুলি বলছেন) (কথা বলতে বলতেই দু'জনে মেয়েটির বাড়ির সামনে হাজির হয়ে গেল।

মেয়েটি বলল ঃ কথায় কথায় আমরা এসেই গেলাম। ভিতরে আসুন পীজ, এককাপ চা অন্ত তঃ খেয়ে যান।

কবি ঃ না না, এই অসময়ে চা কেন, থাক্ পরে হবে।

মেয়েটি ঃ আরে আসুন তো, চায়ের আবার নির্দিষ্ট সময় হয় না কি? - এই বলে মেয়েটি কবিকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গেল। কবিকে একটি ঘরের চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটি পাশের ঘরে - মাসিকে (যিনি এই বাড়িতে থাকেন, মেয়েটিকে ছোটবেলা থেকেই অভিভাবকের মতো দেখাশোনা করেন) চায়ের কথা বলতে গেল। কবি দেখলেন এই ঘরটি যেন ছোটখাটো লাইব্রেরী। চারিদিকে রামকৃষ্ণ, স্বামীজি, কৃষ্ণ, শিব, নিবেদিতা, নেতাজী, মাদার টেরিজা এঁদের ছবি টাঙানো। টেবিলেও রাখা কয়েকটি বই। তা থেকে একটি বই হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন। এমন সময় চায়ের পে-ট সহ মেয়েটি ও মাসিমা উপস্থিত হল।

মেয়েটি বলল ঃ এ বাড়িতে এই মাসি আর আমি থাকি।

মাসি বলল ঃ জন্মের পর থেকেই ও আমার কাছে। ওর গর্ভধারিনী বেঁচে নেই। বাবা বিদেশ থেকে খরচ ইত্যাদি পাঠিয়ে থাকেন। আপনজন বলতে আমারও আর কেউ নেই। কবি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বিষন্ন মনে গভীর ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন। চায়ের কাপ থেকে ওঠা গরম বাষ্পের সাথে কবির অনন্ত ভাবনা রাশিগুলি মহাশূন্যের জগতে বিলীন হয়ে যেতে থাকলো। সেই মহাশূন্যের মধ্যে থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকের একটি গোলকের মাঝখানে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি এক এক করে জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে, সব শেষে মেয়েটির মুখচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। (মেয়েটি মঞ্চে কবিতা পাঠ করছে, কবি তখন দর্শক আসনে)

"তুমি লিখেছো মানুষের কথা তোমার কবিতাতে
অসীম উপলব্ধির ব্যথা ঘাত ও প্রতিঘাতে।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঝড়, এমন অসংখ্য অনুভূতি
প্রতিবাদের উদ্দীপনা তোমার কলমের সাথী।
কত প্রশংসা পেয়েছ তুমি ব্যথা ভরা ভাষা দিয়ে
শুধু একটিমাত্র কবিতা; কেন লেখ না আমাকে নিয়ে?
শুধু একটিমাত্র কবিতা; লিখতে কি পার না আমাকে নিয়ে?"

শেষ লাইনের এই শব্দগুলো কবির মনে বারংবার উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। প্রতিধ্বনির প্রশ্নবাণেই একসময় কবির চেতনা ফিরে আসলো। বাস্তব জগতে কবি দেখলো সে নিজে চেয়ারেই বসে আছে। মেয়েটি ঘরের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কবিকে বলছে —

"হে কবি, শুধু একটি কবিতা লেখো আমাকে নিয়ে
মনটা তোমার হালকা হবেই, আগাম দিচ্ছি জানিয়ে।
পঁচিশতম বসন্ত আমায় ছোঁবে কাল প্রভাতে
কেউ জানে না আমি বেঁচে আছি নকল হাসির সাথে
উপচে পড়া যৌবনভারে আমি নাকি সুন্দরী
সবাইভাবে ডাগরদেহী আমি যুবতী নারী।"

এরপর মেয়েটি অট্টহাসির মতো হেসে উঠলো ঃ হা....হা....হা....

এই পর্যন্ত শোনার পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উত্যক্ত করার ঘটনাগুলি কবির মানসপটে ভেসে আসতে থাকলো। কবির মনে হল বর্তমান সময়ের ওই যুবক দল তাদের লালসার দ্বারা একটি অগ্নিবলয় বা আগুন প্রজ্জ্বলিত বড় বৃত্ত রচনা করেছে। তার মাঝখানে মেয়েটি আটকে পড়েছে। বেড়িয়ে আসার সমস্ত চেষ্টাই যেন ব্যর্থ হয়ে পড়ছে ....। বারংবার চেষ্টা করেও মেয়েটি বেড়িয়ে আসতে পারছে না। গভীরভাবে কোন দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা কবির মুখমন্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে মাসি এসে ঘরের ফ্যানের সুইচটা চালু করে দিল। বে-ডগুলো ক্রমশঃ তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে বাতাসকে ছড়িয়ে দিতে থাকলো। একটি কাগজের টুকরো সেই বাতাসে উড়তে উড়তে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ভাবনার বাতাসে আন্দোলিত হতে হতে কল্পলোকের মতো কবি এসে হাজির হল একটি নার্শারির সামনে। সেখানে অনেক টবের মধ্যে চারা বা কলমের গাছ সাজানো রয়েছে। দুয়েকটিতে কুড়ি বা ফুলও আছে। সেই আংশিক ফোটা ফুলেই মধু সংগ্রহ করতে কয়েকটি ভ্রমর, প্রজাপতি ইত্যাদি বারংবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কবি দেখল একটি ফুল যেন বিরক্ত হয়ে ওই মেয়েটির রূপ ধরে বলছে —

"সুন্দরী ভেবে শত প্রস্তাব দেয় যুবকের দল
পথের মাঝেতে বিরক্ত করে দুই চোখে আসে জল।
আমারও আছে কামনা বাসনা প্রেমিকার মতো মন
জননী হবার শত আকাঙ্খা দেহ মনে অনুক্ষণ।
একথা ঠিক প্রেম প্রস্তাবে রাঙা হয়ে আমি উঠি
কেউ জানে না স্ত্রী চরিত্রে আমি বেমানান জুটি।
তোমার কলমে একটি কবিতা লেখো কবি শিরোমণি
কবিতার মাঝে বেঁচে রব আমি, হোক গোপন জানাজানি।
অর্ধজীবন নিয়ে বেঁচে আছি কণ্ঠের স্বর নামিয়ে
মহিলার মতো এ দেহের গঠন, গোঁফ দাড়ি রাখি কামিয়ে।
ওরা তো জানে না বোবার মতো কেন আমি পথ চলি
আমি যে হিজড়া, শেষ পরিণতি বৃহন্নলার গলি।"

একথা শুনে কবির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। তার চোখে আর পাঁচটা হিজড়ার আচরণ ভেসে উঠতে লাগল। হিজড়াদের অঙ্গভঙ্গি, চলনবলন এসব তার স্মৃতিতে ভিড় জমাতে থাকলো। দেখলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি কিশোরী হিজড়াকে (মেয়েরূপী) কয়েকজন বয়স্ক হিজড়া বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে - এসব কল্পনা তাকে বিব্রত করে তুলতে থাকলো। তখন কবির মানসপটে আছড়ে পড়তে থাকলো কবিতার কথা - "আমি যে হিজড়া, শেষ পরিণতি বৃহন্নলার গলি, বৃহন্নলার গলি ....বৃহন্নলার গলি"। পাশেই কোন মন্দির থেকে উচ্চশব্দে ঘন্টার ধ্বনি বেজে উঠতেই কবি চমকে উঠে আত্মস্থ হয়ে বাস্তব জগতে ফিরে এল। দেখল একটি রেকাবে ফল ও ফুল সাজিয়ে মেয়েটি একটি শিব মন্দিরের দরজাতে দাঁড়িয়ে কবিকে প্রশ্ন করছে —

কি হল কবি চমকে উঠলে, আমাকে হিজড়া জেনে?

একদিন আমিও আঁতকে উঠেছিলাম কিশোরীর অভিমানে।
ভেবেছিলাম এ জীবন বৃক্ষে উঠবে ফুটে ফুল
রসিক ভ্রমর চুম্বন দেবে হাসবে নবমুকুল।
বাসনা ছিল এ জীবন কুসুম প্রভুর সেবাতে যাবে
বিকশিত প্রেম পরম-স্বামীর ধূলিকণাটুকু পাবে।"

(হঠাৎ ধুলোমিশ্রিত একপলকের হালকা হাওয়া বয়ে গেল) মেয়েটি বলতে শুরু করল ঃ

'' আজ হতাশার লগ্নে উদাস হাওয়া হৃদয়ের পাল ছুঁয়ে
বলছি তোমায়, শুধু একটি কবিতা লেখো আমাকে নিয়ে।
নিজ অধিকার ছিনিয়ে নেবার সাহসেও অসঙ্গতি
কোনটা আমি আদায় করব, প্রেম নাকি পরিণতি?
জানি আগামীকালের জন্মদিনেও উপহার পাবো ব্যথা,
সময় পেলে লিখবে তো তুমি এই জীবনের ব্যর্থতা ?"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কবি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে একবার মেয়েটির পূজা দিতে আসার বিষয়টি ভাবতে থাকলো। আরেকবার ভাবতে থাকল মেয়েটি স্বহস্তে দ্বাদশ মন্দিরে শিবের মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢেলে, আকন্দ মালা পড়িয়ে, ভক্তিভরে পুজোতে ব্যস্ত রয়েছে। পুজোর পোশাকে সে যেন স্বয়ং পার্বতী হয়ে উঠেছে। একটি ছোট্ট শিশু তার আঁচলের অংশ ধরে রয়েছে। পুজোর শেষে সে যে মায়ের সাথেই বাড়ি ফিরবে। ভিতর থেকে উচ্চস্বরে একজন ব্রাহ্মণের শিবস্তব শোনা যেতে থাকল। পুজোর পরে শিশুটির হাত ধরে মন্দিরের বাইরে আসতে আসতে এক স্বর্গীয় কল্পনার জগতে হারিয়ে গিয়ে পার্বতীরূপিনী বলল ঃ —

"তন্দ্রা আমায় স্বপ্ন দেখায় মা হয়েছি আমি
পাশে বিছানায় বিশ্রামে মোর অগ্নিসাক্ষীর স্বামী।
দু'জনের মাঝে আদরে ঘুমায় ফুটফুটে এক শিশু
সে যে আমাদের যশোদা দুলাল, বুদ্ধ, আল-া, যিশু।
ওগো দয়াময় বাস্তবে কেন আসেনি এমন ক্ষণ ?
ফুল বা ফল না-ই যদি ফোটে বৃথা এ প্রাণীজীবন।"

একটি একটি করে ১২টি শিবমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে পৃথক ১২ প্রকার শিবলিঙ্গের মাথায় সে দুধগঙ্গাজল ঢেলে সাথে অশ্রুবিসর্জন করে বলতে থাকল পুনরায় —

ওগো দয়াময় বাস্তবে কেন আসেনি এমন ক্ষণ ?
ফুল বা ফল না-ই যদি ফোটে বৃথা এ প্রাণীজীবন!"

করুণ প্রার্থনায় রত হয়ে সে নিজের মাথা ঠুকতে শুরু করল। একসময় তার সিঁথি বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকল। এসব দৃশ্য দেখে কবির চোখদুটো বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে উঠল। অদূরেই বিসর্জনের ঢাকের বাজনা শোনা যেতে থাকল —

"ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ
ঠাকুর যাবে বিসর্জন।"

কয়েকবার বাজনা বাজার পর দেখা গেল বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে শিবপার্বতীর মূর্তি

গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সমবেতভাবে বিসর্জনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে শিব - পাবতীর নামে, সবাই বলল - 'জয়', কয়েকবার বলার পর গঙ্গার জলধারায় নিমজ্জিত হল। এ সময় কবি দেখল কিছুটা দূরেই ঐ মেয়েটি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত। চিৎকার করে ছুটে গিয়ে কবি বলে উঠল - না, কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। স্বজন হারানো মূর্চ্ছনায় কবি মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ, একাকী বসেই রইল। নির্জন হয়ে পড়ল গঙ্গার তীর। এরপর পিছন দিক থেকে কে যেন তার একটি কাঁধ স্পর্শ করল। কবি ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি জীবিতই আছে, এসব তার স্বপ্ন ছিল। এ সময় মেয়েটি বলে উঠল —

" সর্বত্যাগী হতে পারব না স্নেহ মমতার টানে
নাস্তিক হয়ে সারাটা জীবন কাটবে কি অভিমানে?"

এসময় কবি আত্মস্থ হয়ে তার ডাইরীতে কবিতা লিখতে শুরু করল। দেখা গেল কবি বড় মঞ্চের উপরে একপাশে বসে কবিতা লিখছে, কখনও শুনছে। আর মেয়েটি সেই মঞ্চেই কবিতা পাঠ করছে। অসংখ্য দর্শক করতালি দিচ্ছে সামনে বসে। মেয়েটি বলছে —

" কোন জনমের কোন অপরাধে আমাকে করেছো নীচ ?
প্রাণ যদি দিলে কেন কেড়ে নিলে ভবিষ্যতের বীজ ?"

"কেন কেড়ে নিলে ভবিষ্যতের বীজ" - এই কথাটি বারংবার উচ্চারিত হয়ে ব্যাকুল করে তুলল। মেয়েটি বলল —

"আমি প্রতিটি দিনেই স্রষ্টা তোমাকে করে যাব উপহাস
কবিতা কথার আলিঙ্গনেই হবে মোর সহবাস।

কবিতা কথার আলিঙ্গনেই হবে মোর সহবাস
ওগো সকল কবির স্রষ্টা সাবাস, তোমায় সাবাস।"

এই পর্যন্ত বলার পর স্রষ্টাকে উপহাস করে সে উচ্চস্বরে বেদনার্ত অট্টহাসি হেসে উঠলো। সেই অট্টহাসি ও দর্শকের হাততালি আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরেকটি প্রতিমার বিসর্জনের ঢাকের শব্দ ক্রমশঃ তার হাসির ও হাততালির শব্দকে অতিক্রম করে বাজতে থাকল। একসময় শুধুমাত্র ঢাকের শব্দই শোনা যেতে থাকল। শোনা গেল আসছে বছর - আবার হবে। আসছে বছর - আবার হবে।

বেস্ট অফ লাক

- বিপ-বেন্দু বিশ্বাস

কলেজে যখন পড়তো দিবানাথ তখন আর পাঁচজন ছাত্রের মতই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নানান স্বপ্ন দেখতো। আর যে কোন নতুন বিষয় পেলে ভীষণ রকম উৎসাহী হয়ে উঠত।

একবার চাকদহ ডাউন প-াটফর্মে অসীম ঘোষের বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে নানারকম বই ঘাটতে ঘাটতে দিবানাথের চোখে পড়ে যায় কিরোর লেখা হস্তরেখা বিষয়ের একটা বই। ব্যাস্, অমনি বইটা কিনে নিয়ে এসে শুরু হয়ে গেল তার পড়াশুনা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুরো বইটা পড়ে ফেলল দিবানাথ। এরপর শুরু হলল অন্য আরেক উদ্যম। বন্ধু, বান্ধব, সহপাঠী যাকে সামনে পায় তার হাতখানা অমনি টেনে ধরে দেখতে শুরু করে আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে ওর বলা কথাগুলো কতটা মিলছে বা মিলছে না। বন্ধুরাও বেশ মজা পায় দিবানাথের এহেন পাগলামোর জন্য। দিবানাথ কিন্তু বন্ধুদের নানা রকম টিকা টিপ্পনি শুনেও কিছুই মনে করে না। এর কিছুদিন পর বি.এ. থার্ড ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষা চলে আসার দরুণ তখনকার মত হাত দেখার বিষয়টি বন্ধ করে দিবানাথ।

এম. এ. পড়ার সময় এই হাত দেখার বিষয় নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করেনি দিবানাথ। কারণ এম.এ.-তে পড়াশুনার চাপটাও অনেক বেশী ছিল এবং সেখানে ছিল সব নতুন ধরণের বিভিন্ন সহপাঠী।

পড়াশুনাতে দিবানাথ বরাবরই বেশ ভালই ছিল। ফলে এক চান্সে এম.এ. পাশটাও করে যায়। এরমধ্যে দিবানাথের বাবা বিশ্বনাথ দাস চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়ে যান। কি একটা ছোটখাটো প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করতেন দিবানাথের বাবা। তাই সরকারী চাকরির মতন পেনশনের কোন ব্যবস্থা ছিল না ঐ চাকরিতে। সামান্য যা কিছু টাকা হাতে পেয়েছিলেন সেইগুলো ব্যাঙ্ক আর পোষ্ট অফিসে জমা রেখে মাসে মাসে সুদ তুলে সংসারটা কোন রকমে চালাতেন।

বিশ্বনাথবাবু মুখে সরাসরি কিছু না বললেও দিবানাথের বুঝতে অসুবিধে হতো না যে বাবা এখন চান দিবানাথ নিজে এখন সংসারের হাল ধরুক। যাইহোক, দিবানাথ একটা চাকরি জোগাড়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকে।

দিবানাথ ছাত্রাবস্থায় দেখেছে প্রাইভেট কোম্পানীতে ওর বাবাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় পারিশ্রমিক ছিল বেশ কম। তাই প্রথম থেকেই দিবানাথ সরকারী চাকরি পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্ত খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের পরিদর্শক শ্রেণীতে চাকরি পেয়ে যায়।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের এই চাকরিতে দিবানাথ বহুবার বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয়েছে তবে এর মধ্যে বারদুয়েক পদোন্নতিও হয়েছে। শেষবার প্রোমোশন পেয়ে দিবানাথকে জয়েন করতে হয় মুখ্য পরিদর্শক পদে কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলা খাদ্য দপ্তরের অফিসে। ততদিনে অবশ্য দিবানাথের মা এবং বাবা দুইজনেই পরলোক গমন করেছেন। দিবানাথ

তখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভরা সংসারী লোক। কিন্তু সমস্যা একটা ছিল দিবানাথের। দিবানাথের ছোট বোন রমলাকে নিয়ে। বিয়ের প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে রমলাকে চলে আসতে হয়েছিল বাবা-দাদার সংসারে। আসলে দিবানাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে রমলাকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসেছিল। রমলার স্বামী ছিল একজন ব্যবসায়ী লোক এবং একজন পাকা মদ্যপ। প্রায় প্রতি রাতেই ঘরে ঢুকে রমলার উপর শারীরিক অত্যাচার চালাতো আর নানা অছিলায় বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য মারধোর চালাতো।

দিবানাথের তখন প্রায় নতুন চাকরি। বিশ্বনাথ বাবুও অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। এই অবস্থার প্রথম প্রথম দুই একবার কিছু টাকার ব্যবস্থা করে ওরা রমলার হাত দিয়ে পাঠিয়েও ছিল। কিন্তু এতে ফল হয়েছিল বিপরীত। ভগ্নীপতি হরিপদর লোভ তাতে বরং আরও বেড়ে যায়। দিনে দিনে বেড়ে যায় রমলার প্রতি অত্যাচারের মাত্রা। তাই বাধ্য হয়েই একদিন ওখানকার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বোন রমলাকে নিয়ে চলে আসে দিবানাথ। রমলা সেই সময়ে বেশ কয়েক মাসের অন্তঃসত্বা ছিল। এর অল্পকয়েক মাস বাদে রমলা এক কন্যা সন্তানের মা হয়। সেই থেকে রমলা এবং মেয়ে রূপসা দিবানাথের সংসারেই রয়ে যায়।

দেখতে দেখতে দিবানাথের নিজের ছেলে রঘুনাথ তখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওদিকে ভাগ্নী রূপসাও এম.এ. পাশ করে বি.টি. পড়ছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে দুইজনের পড়ার খরচ চালিয়ে সংসার চালাতে দিবানাথের তখন হিমসিম অবস্থা। এদিকে আবার অবসর গ্রহণের দিনও নিকটেই। দিবানাথ মনে মনে তাই ঠিক করে রাখে অবসর গ্রহণের পর যে কটা টাকা পাওয়া যাবে সেখান থেকে কিছু টাকা ভাগ্নীর বিয়েতে খরচ করবে আর কিছুটা ঘরবাড়ির পিছনে লাগাতে হবে। বাদ বাকি যা টাকা হাতে থাকবে সেগুলো দিয়ে কোনভাবে সংসার চালিয়ে নেবে।

তাছাড়া ছেলেকে পড়াতে গিয়ে প্রতিবছর দিবানাথের সব মিলিয়ে প্রায় লাখখানেকের মত খরচ করতে হচ্ছে। তখনও চার-পাঁচটা সেমিস্টারের টাকা দিবানাথকে দিতে হবে। তাই মনে মনে একটা পরিকল্পনা দিবানাথ করেই রেখেছিল। কেননা, এর আগে হাউস বিল্ডিং লোন তুলে বাড়ি করা, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে ছেলের পড়ার পিছনে খরচ করা এবং লোনের ইন্টারেস্টের একটা মোটা অঙ্ক পরিশোধ করার পর উলে-খযোগ্য তেমন কিছু কপালে জুটবে না তা দিবানাথের একপ্রকার জানাই ছিল।

এর উপর চাকরির শেষ মাসে দিবানাথ এল.টি.সি. নিয়ে সপরিবারে দক্ষিণ ভারত ঘুরে আসে। হঠাৎ করে ঘুরতে যাওয়ার প-্যান হওয়াতে এ্যাডভান্স বাবদ অফিস থেকে যে টাকাটা পাওয়া যায় সেটা সময়াভাবে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত ট্যুর শেষ করে ফিরে আসার পর দিবানাথ বিল জমা দেয় অফিসে এবং বিল জমা দেওয়ার দুইদিন পর দিবানাথের চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে যায়।

স্বভাবতই দিবানাথের অফিসে যাওয়ার প্রশ্ন এখন আর নেই। ট্যুরের টাকার বিল জমা দেওয়া সময়মতো দিলেও তিন-চার মাস পার হয়ে যায়। কিন্তু টাকার কোন হদিস হয় না। ডিলিং ক্লার্কের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে কৃষ্ণনগর ট্রেজারি অফিসেই সেই বিল আটকে রয়েছে। কারণ ট্রেজারি অফিসার যিনি আছেন তিনি কোন কারণে অফিসে আসছেন না। অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার যিনি রয়েছেন তিনি এই ট্যুর সংক্রান্ত বিল সই

করছেন না।

এমতাবস্থায় দিবানাথের স্মরণে আসে খাদ্য দপ্তরে কর্মরত দেবব্রত রায়ের কথা। দেবব্রত বাবু জেলা খাদ্য দপ্তরের অধীনে কাজ করলেও মূলত উনি ট্রেজারি বিভাগের লোক। খাদ্য দপ্তরে যেহেতু ধান-চাল ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারগুলো রয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার একটা মোটা অংক লেনদেনের বিষয়ে জড়িত তাই সরকার সরাসরি একজন ট্রেজারির স্টাফ নিয়োজিত রেখেছেন। এরা অ্যাকাউন্টস বিষয় দেখভাল করেন। তাই এ্যাকাউন্টস অফিসার বলা হয় এদের। সংক্ষেপে সকলে এ.ও. সাহেব বলেই জানে।

এক অফিসের অভ্যন্তরে অনেকদিন কাজ করার সুবাদে রায়বাবুর সাথে দিবানাথের একটা সুসম্পর্ক গড়েও উঠেছিল। দিবানাথ কাজের অবসর সময়ে প্রায়সই রায়বাবুর চেম্বারে এসে নানা গল্প গুজব করে সময় কাটাতো। তাছাড়া বিকালে ফেরার সময় পাশের অফিসের মহকুমা নিয়ামক খাদ্য দপ্তরের সঞ্জীববাবু, পুরো নাম সঞ্জীব হালদার, এ.ও. সাহেব রায়বাবু এবং দিবানাথ এরা তিনজন একসাথে অফিসের গাড়িতে এসে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামতেন ও লালগোলা ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরতেন। দিবানাথ নেমে পড়তেন চাকদহতে আর উনারা দুইজন ব্যারাকপুর নেমে পরের ট্রেন ধরে সোদপুরে চলে যেতেন। উনারা দুইজন আসতেন সোদপুর থেকে আর সন্ধ্যার এই ডাউন লালগোলার কোন স্টপ না থাকায় এইভাবেই ফিরতেন উনারা দুইজন। ফলে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করা, ঘরে ফেরা ইত্যাদি মিলিয়ে উনাদের মধ্যে একটা গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

দিবানাথ একদিন সময় করে কৃষ্ণনগরের খাদ্য দপ্তরে গিয়ে রায়বাবুকে বলেন আমার নিজের অফিসে ট্রেজারির লোক থাকতেও আমার ট্যুরের বিল ট্রেজারিতে আটকে রয়েছে। আর এই কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে !

দেবব্রত বাবুও সাথে সাথে বলে ওঠেন, সে কি? সি.আই. সাহেবের বিল আটকে রয়েছে ! এতো ভাল খবর নয়। আমি আজই খোঁজ নিচ্ছি। আপনি শুধু বিলের এক কপি জেরক্স আমাকে দিন। এরপর সামান্য হাসিঠাট্টা বিনিময়ের পর অফিসের মেশিন থেকে জেরক্স করিয়ে এক কপি হাতে নিয়ে রায়বাবু বলেন, জানেন তো সি.আই. সাহেব আপনি অবসর নিলেন আর আমার চারদিক থেকে সময়টাও খারাপ হয়ে গেল।

কি - রকম খারাপ - জিজ্ঞেস করে দিবানাথ ?

আমিও আপনার মতো হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে বাড়ি করেছি। সেখানে আসল টাকা শোধও হয়ে গেছে কিন্তু ইন্টারেস্টের টাকা নিয়ে একটা ঝামেলা পাকিয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে কোন টাকা জমা হচ্ছে না। বলেছে হিসাব ঠিক না হওয়া পর্যন্ত টাকা জমা দেওয়া বন্ধ থাকবে। এদিকে বাবার শরীরটাও বেশ খারাপ করেছে, বুঝতে পারছি না টিকবে কি-না। তাছাড়া সামনে প্রোমোশন ঝুলছে। সেটা নিয়ে আবার কোন ঝামেলা পাকায় সেই এক চিন্তা। এদিকে বাবার শরীর খুব খারাপ। আবার যদি বাইরে দূরে কোথায় পোস্টিং দেয় তাই সব মিলিয়ে আমার মানসিক শান্তিটাই চলে যেতে বসেছে কথাগুলো বলেন দেবব্রত বাবু।

কথাগুলো শোনার পর দিবানাথ হঠাৎ করে রায়বাবুর ডানহাতটা টেনে ধরে বেশ মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে। এ.ও. সাহেব খানিকটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে আপনি হাত দেখতে জানেন জানতাম নাতো। এতোদিন একসাথে কাজ করলাম, কৈ বলেননি

তো, কোনদিন !

আরে বলার মত কিছু না। ছাত্রজীবনে বইটই টুকটাক একটু পড়েছিলাম। তা সে সব তো কবেই ভুলে গেছি। ঐটুকুই বিদ্যার দৌড়। আসলে আপনার খারাপ সময়ের কথা শুনে কি কৌতুহল হল, হাতখানা ধরে একটু চোখ বোলালাম - এছাড়া আর কিছু না, দিবানাথ বলে কথাগুলো।

দেখলেন তো, তা কি বুঝলেন - জিজ্ঞেস করেন দেবব্রত বাবু ?

না তেমন বলার মত কিছু না। তবে আপনাকে একটা রেখা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে একবার করে দেখে রাখবেন। এই মুহূর্তে কোন কিছু বলার দরকার নেই কাউকে। এমনকি আপনার মিসেসকেও নয়। এরপর দিবানাথ বিশেষ একটা ছোট রেখা চিহ্নিত করে বলে এই রেখাটি যতদিন আপনার হাতে থাকবে ততদিন এইরকম ঝুটঝামেলা থেকে যাবে। তবে আপনার বাবার প্রাণ সংশয় ঘটবে না। উনি সেরে উঠবেন। তবে আমার ধারণা এই রেখাটি আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে উধাও হয়ে যাবে হাত থেকে আর তখন দেখবেন সবকিছু আপনার পজিটিভ রেজাল্ট দিচ্ছে। এরপর দিবানাথ অন্য প্রসঙ্গে গল্প গুজব করে বিকেলে একসাথেই বাড়ি ফেরে।

এ.ও. সাহেব সত্যিসত্যি তারপরদিন ট্রেজারিতে গিয়ে দিবানাথের বিলের ক্লিয়ারেন্স করিয়ে দিয়ে চেক ইস্যু করার ব্যবস্থা করে আসেন এবং দিবানাথও যথারীতি ঐ চেক ঠিকঠাক মত হাতে পেয়ে যায়।

এরপর আরও দুই-এক মাস কেটে যায়। অফিসের গল্প গুজবের কথাও দিবানাথের মন থেকে মুছে যায়। একদিন দুপুরবেলা দিবানাথ সবে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে এমন সময় মোবাইলে দেবব্রত রায়ের অর্থাৎ এ.ও. সাহেবের ফোন নম্বর ভেসে ওঠে। দিবানাথ তাড়াতাড়ি মোবাইল কানে লাগিয়ে হ্যালো বলতেই দেবব্রত বাবু বলে ওঠেন সি.আই. সাহেব, আপনি তো মশাই ম্যাজিশিয়ান। এতো ভাল হাত দেখতে জানেন আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ! মনে আছে আপনার, আপনি লাস্ট যেদিন এর আগে অফিসে এসেছিলেন সেদিন একটি রেখা আমাকে দেখিয়ে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। সেই কথাগুলোর একশো পারসেন্ট মিলে গেছে। আরে আপনি তো রীতিমতো একজন পি.সি. সরকার।

আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন আমার সাথে। আসলে বিন্দু বিসর্গও মেলেনি, তাইতো! মিলবার কথাও নয়। সেই কবে ছাত্রজীবনের শেখা বিদ্যা সে সব এতদিন ধূলোবালিতে চাপা পড়ে গেছে। যাক্‌গে, অন্য কোন লোককে কিছু বলেন নি তো! দিবানাথ বলে কথাগুলো।

বলিনি মানে ! আমার মুখে সব কথা শোনার পর এখন সারা অফিসে তোলপাড় পড়ে গেছে। এরপর কোনদিন আপনি অফিসে আসছেন শুধু সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে আমাকে - জানায় দেবব্রত বাবু।

এরপর আরও জানায় যে সি.আই. সাহেব আমি আপনার কথামত রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার করে সেই রেখাটি দেখতাম। মাস ছয়েক পরে একদিন সত্যি সত্যি দেখি সেই রেখাটি উধাও। বর্তমানে আমার বাবাও বেশ সুস্থ। ক'দিন আগেই আমার প্রোমোশনের অর্ডার বেরিয়েছে, সাথে পোস্টিং অর্ডারও আছে। পোস্টিং দিয়েছে হুগলীতে

ট্রেজারি অফিসার হিসাবে। বাড়ির এত কাছে পোস্টিং পাব আমি তো কল্পনাতেও আনতে পারিনি। আর সব চাইতে বড় কথা হাউস বিল্ডিং লোনের ঝামেলাটাও এরমধ্যে পুরো মিটে গেছে। বর্তমানে আমি এক প্রকার টেনশন ফ্রি হ্যাপী মানুষ। তা আপনি এরমধ্যে আমি থাকতে থাকতে একদিন অফিসে আসুন। অফিসের সকলেই আমাকে বিরক্ত করে মারছে আপনাকে আসতে বলবার জন্য।

সব শুনে দিবানাথ হাসতে হাসতে বলে উঠলো আপনি তাহলে যাওয়ার আগে পুরোপুরি আমার বারোটা বাজিয়েই ছাড়লেন।

সে কি? আরে মশাই অফিসে একদিন এসেই দেখুন না - সবাই আপনার কেমন ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে - কথাগুলো রায়বাবুও হাসতে হাসতে বলে।

ক্লায়েন্ট! বাঃ সুন্দর বললেন তো। তাহলে তো নতুন করে এবার আমাকেও ভাবতে হচ্ছে - দিবানাথ বলে।

আরে, আপনার অনুমতি ছাড়াই না হয় আর একটা ট্যুর করবার ব্যবস্থা আমি যাওয়ার আগে করে গেলাম। কি বলেন দিবানাথ বাবু - হাসতে হাসতে বলে ওঠেন রায়বাবু।

হ্যাঁ - হ্যাঁ, এবার তাহলে কোন বটগাছের ছায়ায় চট বিছিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই - হাসতে হাসতে দিবানাথও কথাগুলো এ.ও. সাহেবকে বলে ওঠে।

এরপর আর কিছু হাসি ঠাট্টার কথা বার্তা সেরে নিয়ে দিবানাথ জানায়। আচ্ছা এ.ও. সাহেব, আপনার নতুন কর্মস্থল মধুর হোক। 'বেস্ট অফ লাক' বলেই দিবানাথ মোবাইল নামিয়ে নেয়।

ভালোবাসা বনাম মৃত্যু

- ধ্রুব তালুকদার

সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন আনন্দে আনন্দে কাটছে, কারণ আজ সুবর্ণা আসরে দেখা করতে, তাই ব্যান্ডেল ঝাপপুকুর, শ্যামাপ্রসাদ হাইস্কুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুবল। বহুদিন আগে আজ থেকে প্রায় সাত মাস আগে ব্যান্ডেলের ঝাপপুকুর এলাকায় যাত্রার অভিনয় করতে গিয়েছিল সুবল, আর সেখানেই পরিচয় হয় সুবর্ণার সাথে সুবলের। সুবল অবশ্য যেচে আলাপ করতে যায়নি। সুবর্ণাই প্রথম তার এক কাকিমাকে নিয়ে পরিচয় করতে এসেছিল। পরিচয়ের প্রথম পর্বে সুবর্ণা বলেছিল তুমি খুব ভালো অভিনয় করো। এবং অভিনয়ের সাথে সাথে চোখের ইশারাও ভালোই করতে পারো বলে দুজনে খুব হেসেছিল । আর এদিকে সুবল তো পুরো থতমত খেয়ে গেছে, আর ভাবছে 'এ কিরে বাবা কাকে আবার চোখে ইশারা করলাম'। জীবনে কোনদিন ইশারা করা তো দূরে থাক কোনদিনও ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত মেয়েদের দিকে। কারণ অভাব মানুষকে শিষ্ট স্বভাবে পরিণত করে। কেননা পেটের দায়ে আজ ছয় বছর হল ঘরছাড়া হয়ে যাত্রাদলে নাম লিখিয়েছি, যাইহোক তবুও কোন মেয়ের মুখে তার অভিনয়ের প্রশংসা শুনে সুবল আজ অভিভূত হয়ে পড়েছে। এরপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হল হাসি ঠাট্টা ও মজার ছলে দুজন দুজনকে দেখে নিচ্ছিল বারবার। একরকম ইচ্ছে করেই সুবল সুবর্ণার সম্মতিতে সুবলের ফোন নম্বর নিয়ে নিল সুবর্ণা। কিন্তু সুবর্ণার নিজস্ব কোন ফোন ছিল না।

এরপর কেটে গেল প্রায় সাত মাস। সুবলও সুবর্ণার ফোন আসার অপেক্ষা করতে করতে একসময় ভুলেই গেল সুবর্ণাকে। হঠাৎ একদিন অচেনা নম্বর থেকে কল এল, এবং তা রিসিভ করতেই ফোনের অপরপ্রান্তে শোনা গেল একটি মেয়েলি গলা। ও প্রশ্ন করছে 'কেমন আছো?' সুবল সাধারণ হতবাক্ হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল 'আপনি কে?'। অন্য প্রান্ত থেকে মেয়েটি বলল - 'আমি সুবর্ণা', ব্যান্ডেল ঝাপপুকুর থেকে বলছি।' সুবলের শরীরে যেন বিদ্যুৎ বেগে শিহরণ খেয়ে গেল, এবং কাঁপা কাঁপা গলায় বলল 'হ্যাঁ আর তুমি ?' সুবর্ণা বলল 'এই চলছে কোন রকমে', সুবল তখন বলল - 'এটা কি তোমার নিজস্ব ফোন?'। সুবর্ণা বলল 'না এটা আমার মাসির ছেলে অর্থাৎ দাদার ফোন,আমি মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।' এরপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো। শেষে বলল আমি বাড়ি গিয়ে তোমাকে ফোনের বুথ থেকে ফোন করব বলে ফোন রেখে দিল। এরপর প্রায় পাঁচদিন কেটে গেল, কোন ফোন এলো না। সুবল অপেক্ষায় রইল কত দিনে আসে। হঠাৎই একদিন বিকালে ফোন এল নতুন নম্বর থেকে, ফোন করেই বলল- 'আমি সুবর্ণা বলছি, তুমি কেমন আছো ? আমি বেশী ভালো নেই, কারণ তোমাকে দেখার পর থেকে আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না'। সুবল বলল - 'আমারও তাই তোমার সাথে কথা বলার পর থেকে তোমায় শুধু দেখতে ইচ্ছে করছে?' সুবর্ণা যেন উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল তাই সাথে সাথে বলে উঠল কাল তাহলে দেখা করি চলো, তোমার যাত্রা নেই তো ? সুবল বলল - 'সব প্রোগ্রাম ছেড়ে দিতে পারি শুধু তোমায় দেখার জন্য', সুবর্ণা বলল- 'না আমার মত সাধারণ, সামান্য একটি মেয়ের জন্য তোমার জীবনের রুটি রোজগারকে

বিসর্জন দিও না।' সুবল বলল - 'তুমি সমগ্র জগতে সাধারণ, সামান্য হতে পারো, কিন্তু আমার তুমি অসাধারণ, অসামান্যা।' আসলে দুটি মনের চিন্তা-ভাবনা,কামনা, বাসনা এক হয়ে যায় তখন সুন্দর হয়ে ওঠে সৌন্দর্যাতীত অর্থাৎ সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা, নদী যেমন পাগলপারা হয়ে সাগর বন্ধুর দিকে ধেয়ে চলে, কোন বাধা মানে না, ঠিক তেমনই দুটি মন ছুটে চলে এক নীরব স্বর্গের নতুন ঠিকানায়। ভ্রমর যেমন মধু পান করে ফুলের সৌন্দর্য দেখে না, ঠিক তেমনই মানুষের মনে যখন ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্গম হয় তখন মন ফুলের নিষ্কাম মধুপান করার জন্য কালো নয় উজ্জ্বল সাদা ভ্রমর হয়ে ছুটে আসে। যেখানে যৌবনের তীব্র কামনা বাসনা তুচ্ছ হয়ে যায়, আজ সুবল সুবর্ণারও ঠিক একই অবস্থা। এক অন্যের প্রতি ভালোবাসার রূপদানে ব্রতী হয়ে উঠেছে। তাই জীবনের কর্মকান্ড আজ তুচ্ছ সুবলের কাছে। এরই নাম বোধহয় ভালোবাসা। এরপর অনেক কথা হল এবং ঠিক হল পরের দিন-ই তারা দুজনে এক অপরের সাথে মিলিত হবে ডানলপ ঘাটের শিবমন্দিরে।

সারা রাত ঘুম হয়নি সুবর্ণার, সুবল ঘুমোতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু সুবর্ণার শুধু মনে হয়েছিল রাত পোহালেই প্রাণের বন্ধুর সাথে দেখা হবে,নয়নে নয়ন রেখে ভালোবাসার ভাব বিনিময় হবে। ধৈর্য্য যেন কিছুতেই বাঁধ মানে না। কারণ সুবর্ণার এখন অভিসার পর্যায় চলছে, মনের মানুষের সাথে মিলিত হবার আগে যে প্রণয় রূপ হৃদয় মাঝে ফুটে ওঠে তাকেই তো বলে অভিসার। সময়ের শুধু নিবৃত্তি ঘটে না, ঘুমোতে গিয়ে ও যেন একবার ওঠে, একবার বসে থাকে। এরকম করতে করতে ভোরের মিষ্টি বাতাসের স্পর্শে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই রাতে তা নিজেও টের পায়নি সুবর্ণা। যখন ঘুম ভাঙলো দু-নয়ন মেলে দিনের প্রথম আলোকে স্বাগত জানালো তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। এদিকে সুবল সারাদিন নানা কাজের মধ্যে দিয়ে সময়কে বিদায় আর শুভ মুহূর্তকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে, ঠিক যখন দুপুর আড়াইটে বাজে তার এক ভাইপোকে সাথে নিয়ে সুবল বেরিয়ে পড়ল ব্যান্ডেলের উদ্দেশ্যে। পৌঁছাতে সাড়ে তিনটে বাজলো। কথা ছিল সুবর্ণা ঠিক চারটের সময় ডানলপ ঘাটে আসবে। ডানলপ ঘাটে গিয়ে সুবল ও তার ভাইপো প্রায় একঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে উঠল। সুবলের ভাইপো বলে উঠল - 'কাকা, তোমাকে বোধহয় মিথ্যে কথা বলেছে, ও আসবেনা আজ।' সুবল যেন অভিমানের সুরে বলল - 'হতেই পারে না।' যাইহোক এরপর আরো পনেরো মিনিট কাটিয়ে সুবর্ণার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল সুবল। সুবর্ণার বাড়ির সামনে যাবার ঠিক আগে দেখতে পেল সবেমাত্র সুবর্ণা ও তার কাকিমা পথে বের হয়েছে। এরপর দুজনের পিছু নিতে নিতে একটি বাজারে এসে পড়ল চারজন। সবাই মিলে দেখা হবার পর একসাথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বলল। সুবল ও সুবর্ণা দুজনে একসাথে একটু আগে আর কাকিমা ও ভাইপো একটু পিছে। কিছুটা পথ যাবার পরই আকাশে খুব বিদ্যুৎ চমকালো এবং দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। এরপর যখন মন্দিরে এসে সবাই পৌঁছালো, তখন তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে চুপ চুপ করছে জলে। ভালোবাসার টানে ভিজেছে সবাই বরিষণের বাণে। মন্দিরে প্রবেশ করার পর দেখা গেল একটি শিবমন্দির মাঝখানে ফাঁকা। তারপর কালি মন্দির। সুবল আর সুবর্ণাকে দুই মন্দিরে মাঝখানে রেখে কাকিমা ও ভাইপো মন্দিরের বাইরে এল। অর্থাৎ তারা বুঝিয়ে দিতে চাইলো যে, তোমাদের এখন একান্ত মনের ভাষা বোঝানোর সময়। বৃষ্টি অনবরত পড়েই চলেছে, দুজনে ভিজে কাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কোন ভাষা নেই। একে অপরের দিকে এক রূপময় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানিতে দুটো

মানুষের নিষ্কাম প্রেমের প্রথম স্তর ফুটে উঠেছে, ঠিক যেন চন্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলীর জীবন্ত উদাহরণ —

'নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে উপজিলহি।
হৃদয়ে হৃদয়ে স্পর্শ কাতরে উপজিলরি ॥
অধরে অধরে প্রেম সুধাদানে উপজিলতি।
দিজ চন্ডীদাস কহে এই তিনে হইল পিরিতি ॥'

আজ সুবল সুবর্ণা নয়নে নয়নে এক আশা, স্বপ্ন নিয়ে প্রিয়া প্রিয়কে প্রেম নিবেদন করছে। তার ফলস্বরূপ হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূতি জেগে উঠেছে। এরকম করে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট কেটে যাবার পর দুজনের যেন নেশাগ্রস্ত অবস্থার পরিশেষ হল ভাইপোর ডাকে - 'কাকা কাকিমাকে ছেড়ে দাও নইলে তোমার শ্বশুর মানে আমার দাদু রাগ করবে আর আমায় পেটাবে, বলবে আমি কেমন ভাইপো যে কাকিমাকে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে বাড়ি পাঠাচ্ছি, তোমাকে তো আর বলবে না কারণ তুমি তার আদরের জামাই।' হা...হা...হা... হাসতে হাসতে সুবল বলল 'বেশী পাকামো করিস না, আমার শ্বশুর তোর আগে আমাকেই পেটাবে।'এই হাসি ঠাট্টায় চারজনের মন উৎফুল-তায় ভরে উঠল। এরপর বিদায় নেবার পালা, কারণ রাত বাড়ছে আর ওদিকে বৃষ্টিও থামছে না। সুবর্ণার মন কিছুতেই মানছে না, কারণ আর দেখা হবে কিনা, কথা হবে কি না তা স্বয়ং ভগবান-ই জানেন। চোখের জল আর ভরসা নিয়েই দুজনেই বাড়ি ফিরল।

কিছুদিন পর হঠাৎ সুবলের মনে কি হল যে সেই ভাইপোকে সাথে করে সুবর্ণাকে না জানিয়ে ওদের বাড়িতে হাজির জামাই-এর মতো। সাথে মিষ্টির প্যাকেট, ফল দেখে ভাইপো তো বলেই ফেলল 'কাকা তুমি কি জামাই ষষ্ঠীতে যাচ্ছো?' কিন্তু এই দিন যে সুবল আর সুবর্ণার ভালোবাসার জীবনে ছেদ পড়বে কেউ ভাবতেও পারেনি। কারণ সুবল যখন সুবর্ণাদের বাড়িতে পৌঁছল, তখন সবাই অবাক। যাত্রার ছেলে তাদের বাড়িতে কি করতে এসেছে? তাই অতিথি হিসাবে যতটুকু করা দরকার তাই করেছিল সুবর্ণার মা। কিন্তু কি করে যেন সুবল আর সুবর্ণার ব্যাপারটা সুবর্ণার বাবা টের পেয়ে গিয়েছিল তাই তিনি ঢুকে যখন সুবলকে দেখতে পেল, যেচেই বলল আগামী পাঁচ মাস বাদে সুবর্ণার বিয়ে, ক্যানিং তালদি এলাকায় ছেলের বাড়ি। আকাশ ভেঙে পড়ল সবার মাথায়, কারণ সুবল তো দূরের কথা সুবর্ণার মা, ভাই এমনকি সুবর্ণা নিজেও জানতো না। এইরকম একটা বেদনাদায়ক কথা। এরপর আর সুবলের থাকা চলে না। বিদায় নিয়ে চলে এল বাড়িতে। তারপর কয়েকটা দিন চলে গেল দুজনের চোখের জলে। কারণ সেই দিনের পর থেকে বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি স্কুলে গেলে হয় ঠাকুমা নিয়ে যায় ও নিয়ে আসে। একদিন সুবর্ণাকে মানসিক চাপ দিয়ে সুবলের ব্যাপারে সব শুনে নেয় ওর বাবা। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে একদিন সুবর্ণা লুকিয়ে সুবলকে ফোন করল যে আগামী কাল শনিবার তুমি আমাদের স্কুলে নিতে আসবে আমি বাড়ি থেকে একটা চুড়িদার ও মাধ্যমিক অ্যাডমিট ব্যাগ করে নিয়ে পালিয়ে আসবো স্কুলে যাবার নাম করে। সুবর্ণা সুবল একটাই ভালোবেসে ফেলেছিল যে পালিয়ে যাবার পর যদি সুবর্ণার বাবা সুবলের নামে নাবালিকা হরণের কেস দেয়, তাহলে বয়সের প্রমাণ হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট দেখাবে আর যতই চেষ্টা করুক ঘরে ফিরে যাবে না। এমতাবস্থায় সুবল ফোনের এপ্রান্ত থেকে গভীর চিন্তায় মগ্ন, সুদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে একের পর এক স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে। সব কথা বলার পর সুবর্ণা কান্না করতে করতে বলছে -

'যদি পারো এই দুখী মেয়েটাকে কষ্ট দিও না, বাকিটা সম্পূর্ণ তোমার মতামত কারণ এই দুখী মেয়েটাকে সুখী করতে গিয়ে নিজে দুখী হয়ো না।' সারারাত বসে নানারকম চিন্তাভাবনা করে হাতে যা টাকা পয়সা ছিল ও বাড়ি থেকে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে পরের দিন সকালে বেড়িয়ে পড়ল সুবর্ণার স্কুলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভগবান যার বিপক্ষে, তার স্বপক্ষে কেউ থাকে না। তাই স্কুলে পৌঁছানোর পর দেখা গেল স্কুলের গেটের সামনে সুবর্ণার বাবা স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল নিয়ে। দূর থেকে সুবল দেখে একটু গলির মুখে ঢুকে গিয়ে স্কুল অবধি বসে থাকলো। স্কুল যখন ছুটি হল, তখন সুবর্ণা শুধু এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর সাইকেলে উঠে বসছে। কারণ ওর বাবা ওকে বকাবকি করছে। এমনকি পুরো জোর করে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। এরপর সুবর্ণাদের সাইকেলের পিছনে যখন সুবল একটু একটু করে হেঁটে যাচ্ছে, তখন সুবর্ণার দুচোখে অঝোর ধারায় বাণ বরিষণ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঠিক যেন প্রথম দিনের ঘটনার মত দুটি নয়ন যেন দুটো মন্দির স্বরূপ আর মাঝখানে বিরহ ও কষ্ট নামে দুজন পরস্পর দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের নয়নের বরিষণ ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিরহ ও কষ্ট কারোরই বাড়ি ফেরার কথা মনে নেই। যখন সুবলকে সুবর্ণা দেখতে পেয়েছে, হঠাৎই সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে সোজা সুবলকে জড়িয়ে ধরেছে। আর কান্না করতে করতে বলছে, 'চলো আমরা পালিয়ে যাই সুবল, এরা কেউ আমাদের মেনে নেবে না, আমাকে নিয়ে চলো সুবল দয়া করে, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি, দয়া করে আমায় এই সাগরে ভাসিয়ে দিও না।' কথাগুলো বলতে না বলতেই সুবর্ণার বাবা এসে সুবর্ণাকে চড় মারতে লাগলো, আর সুবলের উদ্দেশ্যে শুধু বললো যদি নিজের ভালো চাও তো এখনি এখান থেকে চলে যাও। সেদির আর সুবলের নিজের ভালো মন্দ চাওয়ার সময় বা জ্ঞান ছিল না। তাই সুবর্ণাকে যতক্ষণ না নিয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত সুবল দাঁড়িয়েই রইল। তারপরে ও ঠিক একই স্থানে প্রায় দুই ঘন্টা একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন শুধু পথে পড়ে থাকা দুটো মানুষের চোখের জল ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে এটুকু মনে পড়ছে যখন সুবর্ণাকে জোর করে ওর বাবা নিয়ে যাচ্ছিল তখন সুবর্ণা চোখের জলে ভেসে ভেসে হাত দিয়ে না না দেখিয়ে ছিল, সুবল এমতাবস্থায় তার মানেটা বুঝতে পারেনি।

তিন থেকে চার মাস কেটে গেল সুবল প্রায় পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। সময় মতো খাওয়া দাওয়া করে না, নিজের যত্ন করে না, প্রয়োজনে যতটুকু দরকার ততটুকু আর যাত্রার টিম নিয়ে সারাক্ষণ মগ্ন থাকে। কারণ ঐ দিনের পর থেকে সুবল-সুবর্ণার কারোর মধ্যে আর কথা হয়নি। সুবল জানে না, সুবর্ণা কেমন আছে বা কি করছে? কারণ সুবর্ণার ফোন নেই আর সেই কাকিমার ফোন নেই যে যোগাযোগ করবে। হয়তো সুবল ভেবেছে যে সুবর্ণা কষ্ট বুকে নিয়েই ওর বাবার কথা মেনে নিয়েছে। বিয়ে করেছে সেই ছেলেটাকে। এরকম করে প্রায় আট থেকে নয় মাস কেটে যাবার পর একটা নতুন নম্বর থেকে কল এল তা রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে?কোন একটি মেয়েটি বলছে -'আপনি কি সুবল বলছেন, সুবল হ্যাঁ বলতেই মেয়েটি বলল - 'আপনি এখন কোথায় আছেন? প্রোগ্রামে আছেন নাকি বাড়িতে আছেন? এবার সুবল প্রশ্ন না করে থাকতে পারলো না, বলল - 'আপনি কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন? মেয়েটি বলল আমি সুবর্ণার বান্ধবী বলছি। ও এখন আমাদের বাড়িতে আছে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আপনি এসে ওকে নিয়ে যান ও খুব কান্নাকাটি করছে। সুবল তো পুরো অবাক কারণ অন্য কিছু ভাবা তো দূরের

কথা ও এখন বর্তমানে প্রোগ্রামে সুন্দরবনে আছে। এখানে তিনদিনের প্রোগ্রাম, না শেষ করে ও যেতে পারবে না। কারণ ওর মালিক ওকে ছাড়বে না। এই আটমাসে সুবল প্রায় যাত্রার দলে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে। তাই কিছু বলছে না। মেয়েটি বলল - 'কি হল কথা বলছেন না যে? আপনি আসতে পারবেন কিনা বলুন।' সুবল বলল - 'আমি প্রোগ্রামে আছি, আসতে পারবো না। কারণ আমার আসার পথ বন্ধ। আমি যেতে চাইলেও আমার মালিক যেতে দেবে না। মেয়েটি বলল - 'ঠিক আছে আপনি আপনার প্রোগ্রাম নিয়ে থাকুন। আর আসতে হবে না।' পাশ থেকে সুবর্ণা বলছে থাক ওকে আর জোর করিস না, কারণ ও ভালো থাক সেটাই আমি চাই। এরপর ফোনটা কেটে গেল। সুবল আবার এই নম্বর-এ ফোন করতেই ফোনটি রিসিভ করল স্বয়ং সুবর্ণা আর বলল - 'কাল দুপুর এগারোটা অবধি আমি আছি যদি পারো তাহলে এসো, এগারো পার হয়ে গেলে হাজার খুঁজলেও সুবর্ণাকে আর পাবে না।' ফোনটি কেটে গেল। সুবল সেই রাতেই যাত্রার দল ছেড়ে পালিয়ে এসে ছিল কেননা ভালোবাসার টানে সবাই জীবন দিতে পারে। আর এ তো সামান্য যাত্রার টিম, সুন্দরবন থেকে ব্যান্ডেল আসতে আসতে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল, ব্যান্ডেল পৌঁছে যখন সুবর্ণার বান্ধবীর নম্বরে ফোন করল, তখন সুবর্ণা ফোন রিসিভ করে বলল - 'আমি বাঁশবেড়িয়া ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কোথায়? কথা বলতে বলতে সুবল বুঝতে পারলো সুবর্ণা ও তার পাশে আরেকটি মেয়ে অর্থাৎ যার ফোন সে হয়তো রয়েছে। হঠাৎ সুবর্ণা বলে উঠল - 'তুমি আমাকে ভুলে যাও, কারণ আমার বাবা মা খবর পেয়েছে আমি এখানে আছি, তাই তুমি আসছো, বাবা-মা আসছে আমি কার সাথে যাবো বল? তোমার সাথে যদি যাই তাহলে বাবা-মা কষ্ট পাবে, আর বাবা-মার সাথে গেলে তুমি কষ্ট পাবে, আমি কাউকে কষ্ট দিয়ে সুখী থাকতে পারবো না সুবল। আমায় ক্ষমা করো। এই নাও আমার বান্ধবীর সাথে কথা বলো, বলে ফোনটি সুবর্ণা বান্ধবীর কাছে ফোনটি দিল। তখন সুবল সুবর্ণার বান্ধবীকে বোঝাচ্ছে ও যেন কিছু না করে বসে, বলতে বলতে শুনতে পেলো সুবর্ণার বান্ধবী বলছে 'এই সুবর্ণা ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস, এদিকে আয়, কি রে শোন, এই ...সুবর্ণা.....এই .....এই.....ও মা ব্রিজের রেলিং-এ উঠছিস কেন .....সুবর্ণা .....সুবর্ণা.....আ.....আ .....। ফোনটি কেটে গেল। সুবল যখন বাঁশবেড়িয়া ব্রিজে পৌঁছালো, তখন ব্রিজের মাঝখানে পুলিশ. ডুবরি রয়েছে। অনেক লোক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই দেখতে পেল সুবর্ণার বাবা-মা মাটিতে পড়ে কান্না করছে। একটি মেয়ে মুখে হাত দিয়ে কান্নাতে রোধ করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কারণ রোধ করবার শক্তি থেকে কান্নার শক্তি দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর। কিছু ব্রিজের নিচে জলের দিকে তাকাচ্ছে আর বলাবলি করছে, 'ঐ তো ঐখানেই পড়েছে।' সুবল যখন লোকজনদের পাশে গিয়ে দাঁড়লো ও ব্রিজ থেকে নিচে জলের দিকে তাকালো, গঙ্গার অথৈ জলে সুবলের চোখের জল এক নিমেষে মিলে গেল। মনে পড়ে গেল সুবলের প্রথম দিনের দেখা করার কথা। আর আজ যেন সেরকমই ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছে সামনে। বাঁশবেড়িয়া আজ যেন শিবমন্দির। আর গঙ্গা হল কালিমন্দির মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা যেখানে ভালোবাসা ও মৃত্যু নামে দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কারোরই আজ বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, আর ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অঝোরে বৃষ্টিধারায় ভিজিয়ে দিচ্ছে সুবলের চোখের জল। ভালোবাসা ও মৃত্যু দুজনেই ভিজে চুপচুপ হয়ে গেছে নয়ন বৃষ্টির বান বরিষণে।

অশ্রুধারা

- কল্পনা মন্ডল বিশ্বাস

নামটি শুভেচ্ছা হলেও শুভেচ্ছার জীবনে শুভ ইচ্ছা কোনদিনই পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। শুভেচ্ছার মা সৎমায়ের কাছে মানুষ। শুভেচ্ছাও মা থাকতেও সৎ মায়ের কাছে মানুষ। অবশ্য শুভেচ্ছার মা কখনো তার সৎ মায়ের কাছে খারাপ ব্যবহার পায়নি। শুভেচ্ছার মায়েরা তিন বোন, শুভেচ্ছার মা বড়। শুভেচ্ছার ছোট মাসি হল শুভেচ্ছার সৎ মা। শুভেচ্ছার বাবা শুভেচ্ছার মাসিকে বিয়ের অনেক আগে থেকেই ভালবাসতো। শুভেচ্ছার মাকে সম্বন্ধ করে বিয়ে করেছিল শুভেচ্ছার বাবা। বিয়ের অনেক পরে শুভেচ্ছার মাসি আর তার বাবা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। শুভেচ্ছা তখন জন্ম নেয়নি। শুভেচ্ছার ছোট মাসি মা হতে গিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের অপমৃত্যু ঘটে। সেই দোষ পড়ে শুভেচ্ছার মা-এর উপর। শুভেচ্ছার মা বোনেদের কখনো সৎ বোন ভাবত না, দুই বোনকে নিজের বোনের মতই ভাবত। শুভেচ্ছার মাসি জীবনে কখনো আর মা হতে পারবে না তাই শুভেচ্ছার মাকে শপথ করিয়ে নেয় তোর প্রথম সন্তান যাই হোক না কেন আমাকে দিয়ে দিতে হবে। শুভেচ্ছার মায়ের দোষ ছিল এই যে, জলের বালতি থেকে জল পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে আর সেই জলে পিছল খেয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

শুভেচ্ছা জন্ম নেবার পর থেকে মায়ের কাছে ছিল যতদিন দুধ খেত ততদিন। শুভেচ্ছা নিজের মায়ের কাছেই থাকত। মাকেই চিনত। আর ছোট মাসি ভাবত শুভেচ্ছা হয়ত কখনো ওর মাসিকে মা বলে ডাকবে না তাই একই বাড়িতে আর থাকবে না বলে ঠিক করল।

শুভেচ্ছা দুধ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুভেচ্ছাকে নিয়ে আলাদা একটু দূরে সরে আসল। শুভেচ্ছাও সৎ মায়ের কাছে মানুষ হতে থাকল। শুভেচ্ছা সৎ মায়ের কাছে বড় হল। যখন শুভেচ্ছা দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন শুভেচ্ছার মেজ মাসি এল শুভেচ্ছাকে নিতে। শুভেচ্ছার মেজমাসির মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে মানে শুভেচ্ছার দিদি। শুভেচ্ছার মেজমাসির মেয়ের শহরে বিয়ে হয়েছে। তাই শুভেচ্ছাকে নিতে এসেছে এই বলে যে এখান থেকে শহরে গিয়ে পড়াশুনা করলে অনেক ভাল ফল হবে। আমার সঙ্গে চল দিদির বাড়ী, তোকে রেখে আসি। এতে সবার মত আছে। শুভেচ্ছা গ্রাম থেকে শহরে গেল দিদির বাড়ী পড়াশুনার জন্য। ওখানে দশম শ্রেণীতে পড়ে এখন। ক'দিন যাবার পর একদিন শুভেচ্ছা তখন পড়ার টেবিলে বসে পড়ছে সবাই তখন শুয়ে পড়েছে। তখন শুভেচ্ছার জামাইবাবু শুভেচ্ছার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর শুভেচ্ছাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি জান তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

শুভেচ্ছা বলল- হ্যাঁ, আমাকে তো পড়াশুনার জন্য আনা হয়েছে।

জামাইবাবু বলল - না, তোমাকে তার জন্য আনা হয়নি।

শুভেচ্ছা বলল - তাহলে কিসের জন্য?

জামাইবাবু বলল- তোমাকে আনা হয়েছে এর জন্য যে তোমার দিদি কখনো মা হতে পারবে না, তুমি তোমার দিদিকে মা করবে আমার দ্বারা।

শুভেচ্ছা বলল - মানে?

ওর জামাইবাবু এসব বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

এইসব শোনার পর শুভেচ্ছা দুচোখ মেলাতে পারল না রাতে। তার পরদিনই কাউকে কিছু না বলে চলে আসল গ্রামের বাড়িতে। এসে মায়ের কাছে সব বলল। শুভেচ্ছার সৎমাও ব্যাপারটা শুনল। ইতিমধ্যে মেজমাসি শুভেচ্ছাকে নিতে চলেও এসেছে। সবাই ব্যাপারটা শুনে শুভেচ্ছাকে বকাবকি করছে আর বলছে জামাইবাবু একটু ইয়ার্কি করেছে তাতে এভাবে কাউকে কিছু না বলে চলে আসতে হয়। শুভেচ্ছার মনে ভয় হয়। শুভেচ্ছা কাউকে বোঝাতে পারল না, নিজের মাকে বারবার বলা সত্ত্বেও মা মেজমাসিকে বিশ্বাস করছে।

শুভেচ্ছা আবার চলে আসতে বাধ্য হল শহরে। সেখানের ব্যাপারই আলাদা। শুভেচ্ছার দিদি এখন প্রত্যেক রাতে মদের বোতল আনে এবং শুভেচ্ছাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ি করে। শুভেচ্ছা খেতে চায় না তবুও তাকে বাধ্য করে। শুভেচ্ছা অনেক চালাকি করে একটু খেয়ে সবটুকু লুকিয়ে ফেলে দেয়। দিদি জামাইবাবু, শুভেচ্ছার ঘরেই শুভেচ্ছাকে সঙ্গে নিয়ে শুয়ে পড়ে। শুভেচ্ছা অনেক সতর্ক থাকে। এভাবে শুভেচ্ছা আর পারছে না। রোজ রোজ ভয়ে ঘুম আসে না। একদিন অনেক মদ এনেছে। সেদিন খুব জোর করেছে ওর দিদি। তোকে আজ যেটুকু দেব সেটুকু তোর খেতে হবে। শুভেচ্ছা তো খাবে না, খুব কান্নাকাটি করছে। তখন ওর দিদি বলছে তোর আজকেই সবটুকু খেতে হবে। যদি সবটুকু খাস তাহলে আর কোন দিন তোর খেতে হবে না কথা দিলাম। শুভেচ্ছা ভাবল আজ রাতটা যেভাবেই হোক পার করতে হবে। শুভেচ্ছা ভাবল যদি আমি কষ্ট করে খাই তাহলে আর আমাকে কোন দিন তো খেতে হবে না। আজ আমার যা হবে হোক। শুভেচ্ছা সেদিন কষ্ট করে খেয়ে নিল। তার পরদিন শুভেচ্ছা অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠল। আগের রাতে কোন জ্ঞান ছিল না শুভেচ্ছার। শুভেচ্ছা ঘুম থেকে ওঠার পর বারবার নিজেকে আয়নায় দেখল কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে পারল না।

দুইমাস কেটে যাবার পর শুভেচ্ছা জানতে পারল ও মা হতে চলেছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারছে না। একদিন দিদি বাবার বাড়ী গেলে জামাইবাবুকে বলল আজ রাতে তুমি আমার জন্যে মদের বোতল এনে দেবে। জামাইবাবু সত্যি এনে দিল। শুভেচ্ছা আজ রাতে অল্প মদ খেয়ে বেশী মাতালের নাটক করল এবং এই সুযোগে জামাইবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করল তার মা হবার কারণ। জামাইবাবু তা স্বীকার করে। নিজের দোষ গোপন করল না।পরে শুভেচ্ছা জামাইবাবুকে ডেকে ভালভাবে বলল তুমি কোন ব্যবস্থা কর না হলে আমি সবাইকে বলে দেব। জামাইবাবু শুভেচ্ছাকে ওষুধ এনে দিল কিন্তু কোন কাজ হল না। সেই ওষুধের পাতাটা নিয়ে ওষুধের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল এটা কিসের ওষুধ। দোকানদার বলল কোথায় পেয়েছ? শুভেচ্ছা বলল দিদির ঘরে। শুভেচ্ছা বুঝতে পারল জামাইবাবু তাকে ঠিক ওষুধ এনে দিয়েছিল। এবার দিদিকেও বলল। তুই কোন ব্যবস্থা কর না হলে আমি চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দেব। ওর দিদি এবার নড়েচড়ে বসল।

শুভেচ্ছার দিদি শুভেচ্ছাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। শুভেচ্ছাকে শিখিয়ে নিয়ে গেল বলবি টিউশন পড়তে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু ওই নার্সিংহোম কোন কাজ করাল না। এদিকে মাস যেতেই থাকল শুভেচ্ছার দিদি কোন কিছু করতে না পেরে শুভেচ্ছার দিদির এক বান্ধবীকে ডেকে নিল যে নার্সের চাকরি করে। সে আসার পর সব ঘটনা শুনে বলল ওযেন বলে ওর বর ওকে রেখে অন্য মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সব শেষে শুভেচ্ছা এক মৃত বাচ্চার জন্ম দিল। পরে যখন শুভেচ্ছা গ্রামের বাড়িতে আসে তখন শুভেচ্ছা ওর মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কান্না করল। মাকে সব খুলে বলল। এখন আর বিশ্বাস করানোর মত কিছু ছিল না কারণ তার চেহারায় সব ফুটে উঠেছে। ক'দিন মায়ের কাছে থাকার পর আবার সৎ মায়ের কাছে চলে আসেন। এবার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। সৎ মা বলল এখণ আর কি করবি, কোন কাজ কর। সৎ মা একটা কাজ ঠিক করে দিতে নিয়ে গেল গ্রামের এক বড় লোকের বাড়িতে শুভেচ্ছা দেখল সৎমা সেই লোকের থেকে টাকা নিল আড়ালে। শুভেচ্ছা ভাবল গ্রামের চেনাশোনা লোক টাকা পাবে তাই হয়তো নিয়েছে। শুভেচ্ছা বার বার জিজ্ঞেস করল কাজটা কি? সৎ মা বলল ভালো কাজ-ই তো দেবে বলেছে। শুভেচ্ছা একা যখন গেল তখন শুভেচ্ছাকে বলল সন্ধ্যার পর তোমার কাজ। শুভেচ্ছা বলল মা তো সন্ধ্যার পর আসতে দেবে না। সেই লোক বলল তাহলে কাল সকাল ন'টায় গাড়ী আসবে তোমাকে নিয়ে যাবে আমার অন্য বাড়ীতে সেখানে কাজে করবে। শুভেচ্ছা কথামতো সকাল ন'টায় গাড়ীতে উঠল। দেখল আরেকটি মেয়ে আছে। সারাদিন গাড়ী চলল। সন্ধ্যার পর মেয়েটি, তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে জিজ্ঞেস করল। শুভেচ্ছা তখন একটি ঘরে ঢুকছে আর বলছে মা। মেয়েটি বলল তোমার মা? শুভেচ্ছা ঘরে ঢুকেই দেখল গ্রামের সেই লোকটি। শুভেচ্ছার আর বুঝতে বাকি রইল না যে তার সৎমা তাকে বিক্রি করে দিয়েছে। কিছুদিন কেটে গেল। পরে যখন বাড়ী ফিরল আবার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল, সৎমায়ের কাছে আর আসল না। শুভেচ্ছার মা অনেক কষ্টে বলল, তুই মর ! তোকে আর কে বিয়ে করবে। শুভেচ্ছা এবার বাড়ী থেকে চলে আসল এক বান্ধবীর বাড়ী। বান্ধবীর স্বামী নেই, বান্ধবী কাজ করে খায়। বান্ধবীর একটা বাচ্চা আছে। শুভেচ্ছা সেখানে গিয়ে বান্ধবীর বাচ্চা দেখাশোনা করে। সেখানে অনেক দিন থাকার পর শোনে, শুভেচ্ছার বাবা অসুস্থ। পরে মারা যায়। শুভেচ্ছা বাড়ী গেলেও আবার ফিরে আসে বান্ধবীর বাড়ী। বান্ধবীর বাড়ী থাকাকালীন শুভেচ্ছার ভালবাসা হয় ওখানকার একটি ছেলের সাথে অনেকদিন ধরে। বান্ধবী বাড়ী থাকে না, থাকে তার বাচ্চা। এই সুযোগে প্রেম গাঢ় হয়। ছেলেটি শুভেচ্ছাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুভেচ্ছার কাছে যায়। এদিকে শুভেচ্ছার মাও এই মুহূর্তে অসুস্থ তাই আবার শুভেচ্ছা চলে আসে কিন্তু মাকে শেষ দেখাটুকু দেখল তবে মৃত। শুভেচ্ছার নিজের বলতে আর কেউ রইল না। শুভেচ্ছা ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। সব সামলে নিয়ে শুভেচ্ছা ভাবল এবার বিয়ে করে সে বিবাহিত জীবন সুখের কাটাবে তার ভালোবাসার মানুষটির সাথে। শুভেচ্ছা ভাবল মা যদি দেখে যেতে পারত তবে একটু হলেও শান্তি পেত। শুভেচ্ছা সৎ মায়ের কাছে আর গেল না। সৎমা জেনেও সে থাকত সেই সৎমায়ের কাছে। সেই সৎমা তাকে শেষ পর্যন্ত কিনা বিক্রি করে দিয়েছিল। শুভেচ্ছা এখন সব মায়া কাটিয়ে

চলে যাচ্ছে সেই বান্ধবীর বাড়ী। তখন শুভেচ্ছা আর তার ভালোবাসার মানুষটির সন্তান শুভেচ্ছার গর্ভে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। শুভেচ্ছা শেষমেষ ফিরে আসল বান্ধবীর বাড়ী। বান্ধবীর বাড়ী আসা মাত্রই শুভেচ্ছার জীবনে আকাশ ভেঙে পড়ল। শুভেচ্ছার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যখন শুনল তার ভালবাসার মানুষটি তাকে ধোকা দিয়ে অন্য জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছে। শুভেচ্ছা এই মুহূর্তে আর নিজের বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে। আবার এখন শুভেচ্ছা যখন বান্ধবীকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেছে তখন শুভেচ্ছা জানতে পারে তার বান্ধবী তার ছোট্ট বাচ্চা রেখে প্রতিদিন কোন চাকরিতে যায়, তখন তো আরো ভেঙে পড়ে। শুভেচ্ছার বান্ধবী প্রতিদিন ওই ছোট্ট বাচ্চাকে রেখে চলে যায় দেহব্যবসার কাজে। শেষ পর্যন্ত নিজের বান্ধবীও একাজে। বান্ধবী যায় নিজের ওই ছোট্ট বাচ্চাটা যাতে ভাল থাকে, ভাল রাখতে পারে তার আশায়। এই মুহূর্তে শুভেচ্ছার বান্ধবীও শুভেচ্ছাকে বলে তার সঙ্গে একই ব্যবসায় থাকতে। শুভেচ্ছা এখন কি করবে? শুভেচ্ছার জীবনটা অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কে দায়ী এর জন্য, কাকে দায়ী করবে শুভেচ্ছা? নিজের ভাগ্যের? সবদিক থেকে শুভেচ্ছার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল।

"শুভেচ্ছা, হায়রে হায়,
সুখ বুঝি ছিল তোর অন্তরায়।
তাই যদি নাই হবে,
কেন এই পরিণতি তবে।"

অমৃতের সন্ধানে

- নন্দদুলাল কর্মকার

দীপেন মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়িতে আসে, আজ সকাল বেলায় এসে আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি ওর গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি, তাই বল-াম আয় ভিতরে। দীপেন ঘরে এসে চেয়ারে বসে বলে এত সকালে কি পড়ছিস? (আকাশে কালোমেঘ করেছে) দীপেন বলে আরে ভাই তোর বাড়িতে এসে তো মুশকিলে পড়লাম দেখছি! আকাশের যা অবস্থা এখুনি জোর বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। আমি বলি যা গরম পড়েছে বৃষ্টি একটু হলেই ভালো হয় আবহাওয়াটা একটু ঠান্ডা হবে। গরমে রাতে ঘুমোতে পারিনি। জানলা দিয়ে গরম হাওয়া আসছিল। আগুনের হলকার মত এই দেখ কেমন ঘামাচি উঠেছে। তুই বস জগাদাকে চায়ের কথা বলে আসি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। দীপেন হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা নিল। চায়ের কথা বলে এসে বসেছি। দীপেন বলে আজকের কাগজটা দেখেছিস? বল-াম এখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। মেঘ আরও ঘনিয়ে এল। তেমনি মেঘের গর্জন, তেমনি বিদ্যুতের চমক। জগাদা আসল নাম জগদীশ দত্ত কিন্তু জগাদা নামেই সকলের কাছে পরিচিত। চায়ের দোকান করেই জীবনটা আজ বার্ধক্যের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। জগাদা চা বিস্কুট দিয়ে গেল। চা পান করতে করতেই বৃষ্টি পড়া শুরু হলো, বেশ জোরেই বৃষ্টি হতে লাগল। দীপেন খবরের কাগজে চোখ রেখেই বলতে লাগল খবরে শুধুই চোর জোচ্চোর আর নারী পাচারকারী ঠগবাজদের খবর ছাড়া আর কোন খবর নেই। এই দেখ নারী পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে, এই সব খবরের নতুনত্ব কিছু নেই। আমি একটা ছেলেকে জানি, সেই ছেলেটার হাত জন্মগত ভাবে পঙ্গু ছিল। সেই ছেলেটাও গ্রামের একটা মেয়ের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। নিজে পঙ্গু হলেও মেয়েটাকে নিয়ে কয়েকদিন হোটেলে থেকে শেষে মেয়েটাকে কারো কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে হয়তো, নিজে আজও নিখোঁজ, কোথায় আছে কেউ জানে না। গ্রামের লোক কেউ জানলেও মুখ খোলেনি ভয়ে কারণ ছেলেটি ওই গ্রামের জমিদারের ছেলে ছিল। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে জমিদারের ছেলের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করবে। জমিদারের বসে খাওয়া ছেলেটার নাম ছিল সূর্যনারায়ণ। আজকের কাগজেও এরকমই একটা খবর আছে, এই ছেলেটির বাবা হলেন পুলিশ কর্তা।

পুলিশের উপর মহল এবং রাজনৈতিক নেতাদের ছেলেরা কোন অনৈতিক কিছু করলে সাধারণের কিছু করার থাকে না। দীপেন কাগজটা রেখে একটু হাসল। আমি বলি দীপেন আমি সূর্যনারায়ণ চৌধুরি নামে একজন চিনতাম, জানি না এখন বেঁচে আছে কিনা। কিশোর বয়সেই ঠাকুর দেবতার প্রতি আকর্ষণ ছিল হয়তো কোন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর সাথে চলে গিয়েছিল। এর বাবাও জমিদার ছিলেন বিপ্রনারায়ণ চৌধুরি। অনেক খোঁজ করেও একমাত্র ছেলের কোন সন্ধান না পেয়ে, বাবা-মা দুজনেই ছেলের শোকে অস্বাভাবিক জীবন কাটাতে লাগলেন। সূর্যের ডান হাতটাই পঙ্গু ছিল। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো ছাত্র

ছিল, বাঁ হাতেই লিখত, অতি সুন্দর ছিল তার হাতের লেখা। সূর্য অনেক বৎসর বাদে মা-বাবার অসুস্থতার খবর শুনে তাদেরকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু নায়েব কিছুতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিল না। সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে কে তুমি? ভিতর বাড়িতে ঢুকছো তোমার সাহস তো কম নয়। সূর্য বলে নায়েব কাকা আমি তোমাদের সূর্য, আমাকে চিনতে পারছো না। শুধু একবার মাকে দেখতে চাই আর কিছু চাই না।

নায়েব ধমক দিয়ে বলে এখানে বসে থাকো বাবু না আসা পর্যন্ত নায়েব বামাচরণ ঘোষ একটি ছেলেকে বলে যা বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়তো। সূর্যকে একটি রংচটা অনেকদিন আগের ছবি দেখিয়ে বলে এই হচ্ছে আমাদের সূর্যনারায়ণ, তুমি সূর্যনারায়ণ হতে চাও। সূর্য বুঝতে পারে ওর নিজের অনুপস্থিতি ও বাবা মায়ের অসুস্থতার সুযোগে নিজের লোভ চরিতার্থ করতে চায় নায়েব। সব বুঝেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হয় সূর্য। একটু পরে লাঠিতে ভর দিয়ে সেই লোকটির হাত ধরে আসেন জমিদার বিপ্রনারায়ণ চৌধুরি, সূর্য বাবার নিকটে যেতে চায়, নায়েব হাত তুলে বাধা দেয়। সূর্য বলে বাবা আমি তোমাদের সূর্য। মা কেমন আছেন? আমাকে একবার মায়ের নিকটে নিয়ে চলো বাবা একবার। বিপ্রনারায়ণ সূর্যের দিকে একবার দেখবার চেষ্টা করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, নায়েবকে ডাকে ইশারায়। একটু পরে একজন লোক অনেক টাকার নোটের বান্ডিল এনে দিল নায়েবের হাতে, নায়েব টাকাগুলো সূর্যকে দিয়ে বলে এই নাও এতে তোমার অনেকদিন চলবে। সূর্য বলে নায়েব কাকা ..... কথা শেষ করতে দেয় না, নায়েব এই টাকাগুলো নিয়ে গেটের বাইরে চলে যাও। সূর্য বুঝতে পারল বাবা চোখেও দেখেন না। তাই ওই টাকাগুলো নিয়ে সূর্য আর ওখানে অপেক্ষা করেনি। দীপেন মুখের ভাবখানা এমন করল, আমার মনে হল আমার বলা কথাগুলো ওর একটুও ভালো লাগল না। দীপেন বলে তাহলে কি নায়েব সূর্যকে চিনতে পেরেছিল। আমি বলি হবে হয়তো। এবারে দীপেন বলে আরে নির্মল, সূর্যকে তুই তো দেখছি ভালোই জানিস। তবে আর যা জানিস সেটুকুও বল শুনি, বৃষ্টি তো হয়েই চলেছে। সময়টা ..... হয় হোক। আমি আবার শুরু করলাম। সূর্য নায়েবের নিকট থেকে অগত্যা টাকাগুলো নিতে বাধ্য হলো এবং গেটের বাইরে বের হয়ে গেল। বছর দুয়েক পরে, এবারে যা বলব সেই কথা সূর্যর কাকা শুভ্রনারায়ণ চৌধুরির নিকট থেকে শোনা। এই দুই বৎসরে অনেক জায়গায় ঘুরে আবার দেশে ফিরে এসেছিল মা-বাবাকে একবার দেখার জন্য। কিন্তু নিজের বাড়ির দিকে যেতে সাহস হল না, নায়েবের সেই চাহনির কথা। মনে মনে সূর্য ভয় পেয়েছিল। এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। এখন সূর্যকে কেউ চিনতে পারে না। এই দুই বৎসরে একগাল দাঁড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মলিন পোশাকের উপরে একখানা মলিন চাদর জড়ানো, চেনার উপায় নেই এই সূর্য নারায়ণ। দক্ষিণেশ্বর থেকে মহামায়া মাকে দর্শন করে গঙ্গা পার হয়ে বেলুড়ে যাবার জন্য নৌকায় চড়ছে। এই নৌকায় সহযাত্রী হয়েছেন সূর্যর কাকা ও কাকীমা। সূর্য একবার দেখেই চিনতে পেরেছে, কাকা কাকীমা প্রথমে চিনতে পারে নাই।কাকীমা অনেকক্ষণ দেখছেন, কেমন যেন চেনা মুখ হওয়াতে, কাকাকে বলেন শুনছো, কাকা বলেন কি হয়েছে? কাকীমা ইশারায় সূর্যকে দেখায়, এতক্ষণে কাকার নজর সূর্যর দিকে ঘোরে। সূর্য গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে

আছে, কাকা অনেকক্ষণ দেখে বলেন কেমন যেন চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে, কার মতন যেন মুখখানা দেখতে, তুমি বুঝতে পারছ? কাকীমা বলেন মুখখানা অনেকটা আমাদের সূর্যর মত লাগছে আমার। তুমি ঠিক বলেছ। নৌকা তখন মাঝ গঙ্গায়। কাকীমা চেনা মুখের আরও কাছাকাছি গিয়ে বসেন আরও ভালো করে দেখেন। স্থির বিশ্বাস হয় এ আমাদের সূর্য ছাড়া অন্য কেউ নয়। আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বাবাজি কোথায় থাকা হয়? সংসার আছে নাকি, আশ্রম করেছেন কোথাও কোথায় যাবেন?

কাকীমার কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না সূর্য। চুপ করে কাকীমার দিকে তাকিয়ে আছে। দুচোখের জলের ধারা ঝরতে থাকে এক সময় সূর্য নিজেকে আর সামলাতে পারে না। কাকীমা বরে চিৎকার করে কাকীমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে কাকীমা, মা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন? কাকীমা কাকা দুজনেই বলেন তোর মা তোকে একবার দেখবার জন্য কত কেঁদেছেন, তোর বাবাও তোকে কত খুঁজেছেন। তুই এত বৎসর কোথায় ছিলি। সূর্য চিৎকার করে বলে কাকীমা মা কেমন আছেন, সত্যি করে আমাকে বলো। কাকীমা কিছু বলতে পারেন না। তিনিও কেঁদেই চলেছেন। কাক বলেন, দাদা বৌদি আর এ জগতে নেই, তুই আমাদের সাথে দেশে চল। আমি দেশে গিয়ে কি করবো। কাকা আমি এখান থেকেই হরিদ্বারে আমার গুরুদেবের আশ্রমে ফিরে যাব। কাকা বলেন তা হয় না সূর্য, তোদের জমিদারি নায়েব আত্মস্যাৎ করছে। তুই না থাকলে আমার জমিদারি উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আর প্রজারাই বা আমাকে মানবে কেন। কাকা আমাকে নায়েব মেরে ফেলবে। নারে না নায়েব তোকে এখন চিনতেই পারবে না, তাছাড়া চোখেও এখন আর ভালো দেখতে পায় না। আর আমরা তো আছি। তুই সবসময় আমাদের বাড়ির ভিতরেই থাকবি। সূর্য রাজি হয় বেলুড় মঠ দর্শন করে কাকা কাকীমার সাথে দেশের বাড়িতে ফিরে যায়। সত্য সত্যই সূর্যকে কেউ চিনতে পারে না। চিনবেই বা কে, পুরাতন কর্মচারী যা দুই একজন আছে তাদের এখন বয়স হয়েছে, চোখেও ভালো দেখতে পায় না। বাকি সব কর্মচারীই নতুন, সূর্যকে কারোর চেনার কোন কথাই নয়। কাকা নায়েবকে ডেকে বলে দিলেন সমস্ত দলিল পত্র আপনার নিকট যা যা আছে সব ফেরৎ দিন। সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দিন। সূর্য আসছে। সে এখন শহরে আছে। আপনাকে তিনদিন সময় দিলাম, অন্যথায় অন্য ব্যবস্থা হবে। নায়েবেরও এখন অনেক বয়স চোখেও ভালো দেখেন না। সূর্যকে সম্মুখে দেখেও চিনতে পারলো না। সূর্য সমস্ত হিসাব ও দলিল পত্রাদি পেয়ে মা-বাবার পারলৌকিক কাজ করতে গয়াধাম যাবার কথা কাকা কাকীমাকে বলতে, কাকা কাকীমা অনুমতি দিলেন। সূর্য গয়াধামে মা বাবার কাজ পিন্ডদান করে দেশে ফিরে এল বটে, জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব কাকার হাতে তুলে দিল। কয়েক মাস এইভাবে কাটে। একদিন সকাল থেকে সূর্যকে আর দেখা গেল না। ঘরে ও বাইরে অনেক খোঁজ করে বিছানার তলায় পাওয়া গেল একখানা চিঠি। তাতে লেখা ছিল, শ্রীচরণেষু, কাকা ও কাকীমা আমাকে তোমরা পাবে না, খোঁজ করিও না, খুঁজে পাবে না আমি চলেছি অমৃতের সন্ধানে হিমালয়ের দুর্গম গভীরে। দীপেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি বল-াম এরপরে সূর্যনারায়ণ চৌধুরিকে আর দেখা যায়নি। দীপেন চায়ের পেয়ালাটা সামনে একটু ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, দীপেন ঘরের বাইরে পা বাড়াল।